প্রথম অংশ

মহীপাল

ত্রিবেণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

বর্ষার মেঘব্যাপ্ত নিবিড় নিশীথ। মেঘের প্রাকারে আকাশের সমুদায় আলো পৃথিবীর দৃষ্টি হইতে ঢাকিয়া দিয়াছে। চারিদিক্ সুপ্তিসমাচ্ছন্ন, কেবল নিবাত নিষ্কম্প বৃক্ষশাখা সকলের মধ্য হইতে অতি তীক্ষ্ণ ও প্রবল স্বরে ঝিঁঝিঁর অশ্রান্ত রব শুনা যাইতেছিল, আর বর্ষাজলধারাপুষ্ট ভেককলরবও সেই নিদ্রাচ্ছন্ন রাজধানীর অনাবিল স্তব্ধতাকে বিচ্ছিন্ন ও বিভেদ করিয়া দিতেছিল। ইহা ব্যতীত মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করিলে আরও একটি শব্দ শ্রবণে আইসে, তাহা—রাজকীয় সুদৃঢ় দুর্গ-পাদমূলে সুপ্রশস্তশরীরা পূর্ণাবয়বা নদী করতোয়ার অর্দ্ধস্ফুট বিলাপ-কল্লোল।

গৌড়েশ্বরের প্রাসাদ-অন্তঃপুরে নদীতীরস্থ একটি সুপ্রশস্ত কক্ষে গন্ধতৈলে তখনও প্রদীপ জ্বলিতেছিল। একটি তরুণবয়স্ক যুবা পুরুষ সন্তর্পণে সেই কক্ষদ্বার খুলিয়া ঘরে ঢুকিল ও কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়াই যেখানে সুসজ্জ পালঙ্কে কোমল শয্যাতলে অঙ্গ ঢালিয়া একটি সুন্দরী কিশোরী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল, তাহারই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল সে মুগ্ধ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সেই সুপ্তি-সুন্দর মুখখানি চোখ ভরিয়া দেখিল, তার পর ধীরে ধীরে নত হইয়া তাহার ঈষদ্ভিন্ন আরক্ত অধর

স্পর্শ করিতেই নিদ্রানিমগনা সহসা চমকিয়া জাগিয়া [illegible] ও ত্রস্তে কহিল, "না—যাও !"—

যুবক ততক্ষণে এক লম্ফে পালঙ্কে উঠিয়া পড়িয়াছে, লজ্জিতা সুন্দরীর পার্শ্বে শুইয়া পড়িয়া সে তাহার আরক্ত গণ্ডে দুইটী অঙ্গুলীর মৃদুমন্দ আঘাত করিয়া ভ্রূভঙ্গী পূর্ব্বক কহিল—"হ্যাঁ, যাবে বই কি! ঠাকুরাণীর ত বেশ ভালরূপ নিদ্রা দিয়ে নে'ওয়া হলো, আর আমি বেচারী বলে সারাদিন আর এই অর্দ্ধেক রাত্রি ধ'রে হাঁ ক'রে পথটি পানে চেয়ে বসে আছি। তা বাড়ীর লোকেদের পোড়া চোখে ঘুমও কি কিছুতে আসে না যে, রাত দুপরের আগে একটি দিনও চ'লে আসবো! আমি কিন্তু আর এমন ক'রে পারবো না, তা' তোমায় ব'লে দিচ্ছি, রাণি !"

কিশোরী সস্মিতমুখে প্রশ্ন করিল, "না পেরে কি করবে শুনি ?"

"সে তখন তুমি দেখতেই পাবে। কেন,—মেজ রাজার মতন আমিও কাল থেকে, দেখো তুমি, ঠিক সকাল সকাল চ'লে আস্‌বো। আর—"

ভীষণ লজ্জায় প্রবল উচ্ছ্বাসে আরক্তমুখী তরুণী বাধা দিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল—"না, না, যাও, তা হ'লে আমি লজ্জায় ম'রে যাব !"

কিন্তু স্ত্রীর এই প্রবল প্রতিবাদে তার স্বামীর দৃঢ় সঙ্কল্প কিছুমাত্র শিথিল হইয়াছে বোধ হইল না। সে উহার লজ্জারঞ্জনে রঞ্জিত মুখখানা দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া সকৌতুক হাস্যের সহিত উত্তর করিল—"ঈস্‌! ম'রে অমনি গেলেই হলো কি না! কেন, মেজ রাণী কি রোজ রোজ মরেই যাচ্ছে না কি, যে তুমি যাবে ? সে আমি শুনছি নে, এক প্রহর রাত হলেই ব্যস্‌—সশরীরে সামনে এসে উপস্থিত !"—

সন্ধ্যারাণী স্বামীর এই দুর্দ্ধর্ষ সাহসের কথায় এবার শুধু লজ্জিতাই নয়, ঈষৎ ভীতাও হইল। সে স্বামীর আলিঙ্গন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার চেষ্টায় ঈষৎ বল প্রকাশ করিল ও অভিমান দেখাইয়া

বলিল, "তাহ'লে আমিও তোমায় মজা দেখাব! ঠাকুর-কন্তার ঘরে গিয়ে সন্ধ্যা থেকে শুয়ে থাকবো, এ ঘরে আর আসবোই না। কি করবে তখন ?"

নিজের শালযষ্টিবৎ কঠিন বাহু দিয়া সেই ক্ষুদ্র অসহায় দেহলতাকে সবলে ধরিয়া রাখিয়া হাসিমুখে যুবক কহিল, "তা হ'লে কি হবে জানিস্ ?"

ঠোঁট ফুলাইয়া সন্ধ্যা বলিল—"যাও, আমি জান্‌তেও চাইনে।"

সেই ফুলানো ঠোঁটে চুম্বন করিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণচিত্ত তাহার তরুণ স্বামীটী তাহার এই শ্রবণ-অনাসক্তিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়াই হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিল, "আরে, একটু শুনেই রাখ্ না, না হ'লে তখন একেবারেই যে চম্‌কে যাবি!—শোন্ না বলি—আমি তা হ'লে—আমি তা হ'লে পা টিপে টিপে না গিয়ে, আর এম্‌নি করে আমার সন্ধ্যারাণীকে কোলে তুলে না নিয়ে, দে'ছুট !"—

এই বলিয়া হঠাৎ বিছানার উপর 'তড়াং' করিয়া উঠিয়া বসিয়া যুবক তাহার মহাভুজদ্বয়ে অবলীলাক্রমে ঐ কিশোরী তন্বীর ক্ষুদ্র দেহটুকু উঠাইয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গেই নিজ বাক্যের সম্ভাব্যতা প্রমাণ করিয়া দিল।

আকাশের মেঘ আর আকাশের কোন প্রান্তে স্থান খুঁজিয়া না পাইয়াই বুঝি শেষকালে ধরণীবক্ষে ধারাকারে নামিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে ? অচেনা পথে পথ দেখাইতে বুঝি বিজলীবালারা সহস্র সহস্র দীপশিখা জ্বালাইয়া গগনপথের ইতস্তত: ছুটিয়া বেড়াইতেছে ? রুদ্ধবায়ু এতক্ষণের পর নবীন অতিথিবর্গের সহিত স্বাগতসম্ভাষণে প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, হা হা হা হা হা !—

ভোর হইয়া আসিয়াছিল, নদীপরপারে আকাশের কিনারায় ঘন কালো মেঘের নীচে গোলাপের পাপড়ির মত গোলাপী রেখা দেখা দিয়াছে। সুপ্ত পুরীর প্রাসাদ-শিখরে বসিয়া দুই একটা ভিজা কাক

ডানা ঝাড়া দিতে দিতে প্রভাতী গাহিতেছিল। তোরণের নহবতে তখনও রাগ-ভৈরবের আলাপ আরম্ভ হয় নাই।

আধভাঙ্গা ঘুমঘোরে পাশ ফিরিতেই স্বামীর ঘুমন্ত মুখের গম্ভীর সৌন্দর্য্য সন্ধ্যারাণীর অর্দ্ধ-জাগ্রত চিত্তে সহসা যেন একটা কিসের প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া দিল। সে আর সেদিক হইতে সহসা তার মন্ত্রমুগ্ধ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে পারিল না। চিত্রার্পিতবৎ বহুবার দৃষ্ট সেই প্রিয় মুখখানি সে তাহার দেখার সুখে সম্পূর্ণ অতৃপ্ত দুই বুভুক্ষিত চোখের দৃষ্টি মেলিয়া পান করিতে লাগিল। দুই জনায় চোখে চোখে চাহিয়া এমন করিয়া ত কোন দিনই দেখা ঘটে না। তার মনে হইল, কেন সে সারারাত্রি জাগিয়া থাকিয়া, চুরি করিয়া, এই মুখ এত দিন এমন করিয়া দেখে নাই? এই ভাবিয়া গত রজনীগুলাকে তাহার একান্ত ব্যর্থ ও অভিশপ্ত বলিয়াই যেন বোধ হইতে লাগিল। তার পর সে দুঃসাহসিকা লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াও এই কথাটা মনে মনে বলিল, 'উনি যা বল্লেন, যদিও আমি তাতে ভারী মুস্কিলে পড়বো, সবাই নিন্দে করবে, ঠাট্টা করবে, কিন্তু তবুও তা' যদি করেন,—সে কিন্তু এক রকম বেশ হয়! ঐ ত মেজ-রাণীদিদি এবারে পাটলীপুত্র হ'তে এসে পর্য্যন্ত মেজ রাজাকে দিনের বেলাতেও তাঁর মহলে মহল্লিকাদের দ্বারায় ডেকে পাঠাচ্ছেন। ছিঃ! সে কিন্তু ভারী লজ্জা করে! না, সে কাজ নেই। মা গো, লোকে কি ব'লবে?"

নহবতের আলাপ আরম্ভ হইবার সূত্রপাত করিতেই সন্ধ্যা ব্যস্ত হইয়া ঘুমন্ত স্বামীর অঙ্গ স্পর্শ করিল—"ওঠো,—ওগো! ওঠো, বেলা হয়ে গিয়েছে।"

"কৈ বেলা হয়েছে?" বলিয়া ঘুমের ঘোরেই সন্ধ্যার হাতটা টানিয়া নিজের হাতের মধ্যে জড়াইয়া লইয়া যুবক আবার দিব্য একচোট ঘুম দিবার উপক্রম করিল। তাহা দেখিয়া সন্ধ্যা আর স্থির থাকিতে পারিল

না, দুই হাতে স্বামীকে নাড়া দিয়া সে তখন ঈষৎ ভীতভাবে ডাকিল, "এখনই যে বাড়ীর লোকেরা উঠে পড়বে, করচো কি ? উঠে পড়ো।"

যুবক এবার ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিল। "আঃ, একটু কি ভাল ক'রে ঘুমুবারও যো নেই রে ? এরই মধ্যে এম্‌নি সকাল হয়ে ব'সে আছে! সন্ধ্যা! যেমন আমায় তুই ঘুমুতে দিলিনে, দেখিস্‌ কিন্তু, আজ তোর সঙ্গে সঙ্গেই আমি যদি না তোর ঘরে এসে উপস্থিত হই ত আমার—"

সভয় লজ্জায় স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া সন্ধ্যা আতঙ্কে কহিয়া উঠিল—"করচো কি ?"

"তাই ত রে! কি করছিলুমই-ত! খুব বেঁচে গেলি রে রাণি! রাম-পালের মুখ দিয়ে একবার খেলাচ্ছলেও যে প্রতিজ্ঞা বার হবে, সে যে আর কোন মতেই ফিরতে পারে না, সে তুই ঠিক বুঝে নিয়েছিস,—না ? আচ্ছা, দু একটা পাথেয় সংগ্রহ ক'রে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক্‌ গে, তা হ'লে, এখন, সারাদিন এবং অর্দ্ধ রাত্রির মত।"

এই বলিয়া মগধ গৌড়পতি মহারাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী পরম কুশলী পরম ভট্টারক পরমসৌগত মহীপালদেবের সর্ব্ব-কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজকুমার ভট্টারকপাদীয় শ্রীমান রামপালদেব তথা-কথিত "পাথেয়" সংগ্রহ পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে অথচ অনিচ্ছা-মন্থর-পদে পুনঃপুনঃ পশ্চাতে চাহিতে চাহিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুর-বিভাগের অসংখ্য সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীর মধ্যস্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রধানতম প্রাসাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী একটি সুপ্রশস্ত কক্ষ। কক্ষভিত্তি অতি সুন্দর ও সুনিপুণভাবে রামায়ণ-কথিত চিত্রাবলী দ্বারা সমাচ্ছন্ন। বহুবিধ বর্ণসমাবেশে অঙ্কিত শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হইতে রাজ্যলাভ অবধি সমুদয় প্রধান প্রধান ঘটনাবলীই ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে, করে নাই কেবল এই দুঃখলব্ধ সুখের অব্যবহিত পরে যে অধিকতর মহা-দুঃখের অশনি অকস্মাৎ রঘুকুল প্রধানকে আজ সর্ব্বলোক-চক্ষুতে চির-জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে, সেই সীতা-বর্জ্জন ঘটনা। অসহনীয় বোধে এই দুঃখময় কাহিনীটিকে বর্জ্জন করিয়া শ্রীরাম-সীতার মিলন-মধুর মূর্ত্তি দুইটিকেই ইহার শেষ চিত্র করা হইয়াছিল।

রক্তপ্রস্তরবিনির্ম্মিত আরক্ত কক্ষভূমে সুরঞ্জিত ও সূক্ষ্ম[illegible]যুক্ত মাদুর বিছাইয়া পট্টমহাদেবী মহারাণী লজ্জাদেবী দ্বৈপ্রহরিক বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছেন। একজন মহল্লিকা তাঁহার পদসেবায় নিরত রহিয়াছে, আর এক জন মাথার কাছে বসিয়া তাঁহার আর্দ্র কেশপাশ ধূপদানী হইতে উত্থিত ধূপের ধূমে সুবাসিত এবং শুষ্ক করিয়া দিতে দিতে মৃদুস্বরে কোন সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছিল, এমন সময় ঘরের বাহির হইতে তৃতীয়া মহল্লিকা সসম্ভ্রমে আসিয়া জানাইল—মহারাজকুমার রামপালদেব তাঁহার সহিত সাক্ষাতাভিলাষী।

নিজের বিশৃঙ্খল বেশ-ভূষা সংযত করিয়া লইয়া পট্টমহাদেবী তাঁহাকে আনিতে আদেশ দিলেন।

রামপালদেব গৃহ-প্রবেশ করিয়া ভ্রাতৃজায়া মহাদেবীকে সসম্ভ্রমে প্রণাম পূর্ব্বক অপ্রসন্নমুখে মহল্লিকাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই মহাদেবী তাহাদের দিকে চাহিয়া এক জনকে বলিলেন, "পদুনা! তুই শীঘ্র ক'রে ছোট ঠাকুরপুত্রের জন্য কেয়াখয়ের দিয়ে পাণ সেজে আন।"

অপরাকে বলিলেন, "ঠাকুরকন্যার মহলে আজ ভাগবতপাঠ কোন্ সময় বসবে, তার খবর জেনে আয় দেখি"—

তারপর আর এক জনকেও বিদায় দিয়া বলিলেন, "খেতুরি। তোমার ধূপদানী সরিয়ে নাও, ধূপের গন্ধ বড় কড়া লাগ্‌চে।"

রামপাল হাসিমুখে মহাদেবীর পায়ের তলায় বসিয়া পড়িয়া তাঁহার আলতাপরা একখানি পা জোর করিয়া টানিয়া লইয়া নিজের বিশাল উরুর উপর স্থাপন করিলেন ও দুই হাতে সেই পাখানি টিপিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। লজ্জাদেবী মহা-বিব্রত হইয়া বার বার নিষেধ করিলে, পা টানিয়া লইতে গেলে, জোর করিয়া পা-খানি চাপিয়া রাখিয়া তাঁহার এই বয়ঃকনিষ্ঠে পুত্রবৎ এবং পরম স্নেহাস্পদ দেবরটি টিপি টিপি হাসিয়া বলিলেন, "আপনার একটু সেবা করলামই বা? বিশেষতঃ যখন মহল্লিকাদের আমারই জন্য উঠিয়ে দিতে হলো।"

নিরুপায় দেখিয়া মহাদেবী নিজের পা'খানি উঁহার হস্তে ছাড়িয়া দিয়া সকৌতুকে হাসিয়া কহিলেন, "তা হ'লে তুমি আমার পদসেবা করবার জন্যই এসেছ বোধ হয়? মনে আর কোন উদ্দেশ্য নাই ত?"

রামপালদেব ঈষৎ অপ্রতিভভাবে অধোমুখ হইলেও আবার তখনই মুখ তুলিয়া বলিলেন, "এছাড়া, শুধু আর একটা সংবাদও দিবার আছে।"

"কি সংবাদ?" লজ্জাদেবী ঈষৎ শঙ্কিতভাবে চাহিলেন, "আবার কোন কিছু কি—?"

রামপালদেব কহিলেন, "না, সে সব কিছু নয়। আমি শীঘ্রই মহোদয়ে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, এই খবরটা মাত্র আপনার চরণে দিতে এসেছিলাম।"

"সেকি কথা! মহোদয়ে যুদ্ধ বেধেছে না কি?"

রামপালদেব মুখ একটুখানি নত করিয়া বলিলেন, "না, এখনও বাধেনি বটে; কিন্তু বাধাতে আর কতক্ষণ! আমি মনে করছি, কতকগুলো সৈন্যটৈন্য নিয়ে গিয়ে ওদের রাজধানীটা হঠাৎ আক্রমণ করবো, আর তা হ'লেই ত যুদ্ধ বাধতে একটুও বাকী থাকবে না? ব্যস! তখন খুব লেগে পড়া যাবে। এমন নিরুদ্যম ভাবে ব'সে থাক্‌তে তো আর পারা যায় না, বারটী মাস।"

পট্টমহাদেবী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বল কি! মহোদয় আক্রমণ ক'রে তুমি জয়ী হ'তে পারবে, আশা কর? সে যে অসমসাহসের কায মহাকুমার, তা ছাড়া তোমাদের সে রকম সৈন্যবলই কি আছে? আর রাজাধিরাজ কি এটা সমর্থনই করবেন?"

রামপাল শান্তস্বরেই উত্তর দিলেন, "হলোই বা? না হয় হেরে যাব, ঘরে ব'সে ব'সে দিন-রাত কাটেই বা কেমন ক'রে? তা ভিন্ন সন্ধ্যা-বেলাতেই বিশ্রী রকম ঘুম পেয়ে যায়। সে হ'লে ত আর ঘুমাবার কোন উপায়ই থাকবে না, সেই বেশ হবে। ক্ষত্রিয়ের ছেলের আবার সাহসের অভাবটা কি? রাজা না পছন্দ করেন, একাই যাব। চাই কি, মাঝে থেকেও আপনাদের মহাসামন্তকেও টেনে নেওয়া যাবে।"

এবার মহাদেবী হাসিয়া উঠিলেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই সমাগতা তাম্বূল-করঙ্কবাহিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "খেতুরি! যা দেখি, একবার ছোট রাণীকে ব'লে আয় গে, তার সেই সুজনীর সেলাইটা নিয়ে আমার কাছে যেন এখনই চ'লে আসে, কি রকম হচ্চে, খারাপ ক'রে ফেল্‌চে কি না, আমি একবারটি সেটা দেখতে চাই।"

মহল্লিকা চলিয়া গেলে সোনার বাটায় সাজান তাম্বুলগুলি সম্মুখে ঠেলিয়া দিয়া চাপা হাসির মধ্যে লজ্জাদেবী বলিলেন, "দেখ, যে ক'দিন মহোদয় যাত্রা ঘ'টে না ওঠে, তুমি যদি এম্‌নি সময় একবার করে আমার মহলে এসো, আমি তোমায় একটি ভাল রকম কায দিই, তাতেও তোমার চক্ষে ঘুম থাকবে না!"

রামপাল মহাদেবীর দুই পায়ের তলায় হাত দিয়া, সেই হাতখানি নিজের মাথায় ঠেকাইয়া অতিশয় ভক্তি-নম্রস্বরে উত্তর করিলেন, "যে আজ্ঞে! আপনার আদেশ পালন ত আমায় করতেই হবে।"

পশ্চাদ্দ্বারে নূপুর ও কিঙ্কিণীর রুণু ঝুনু শব্দ হইতেই সেই শব্দের তালে তরুণ মহারাজকুমারের সর্ব্বশরীরের শোণিতের ধারা বিপুল বেগে নাচিয়া উঠিল। তাহা যে ছোট রাণীর পায়ের নূপুর, হাতের কাঁকন, সে সংবাদ আর কাহারও দিবার প্রয়োজন ছিল না।

খেতুরি আসিয়া ছোট রাণীর আগমনবার্ত্তা জানাইলে মহাদেবী তাহাকে বলিলেন, "দেখ্, তুই বাছা এই সময় তারাদেবীর পূজার জন্য সব দাসীদের কাপড় ছাড়িয়ে চারটি চারটি গুয়া বানাতে বসিয়ে দে'গে। আমার কাছে এখন আর কারুর থাকবার তো দরকার হবে না, ছোটুকে নিয়ে এখন আমায় ব্যস্ত থাকতে হবে।"

খেতুরি কহিল, "তাই যাই মা, মাগীগুলো ত গা মেলে মেলে মোষের মতন প'ড়ে প'ড়ে ঘুম দিচ্ছেক, উঠ্‌তে পারলে এখন বুঝি। আমারই যেমন দিনে-রাতে পোড়া চোক্ষে একটুক নিদ্‌্লী লাগেনি, তেমনটি ধারা ত আর সব্বাইকার নয়। কুশী মাগীকে ডেকে দে' যাই, তোমায় হাওয়া দেক্।"

লজ্জাদেবী হাত নাড়িয়া নিষেধ করিলেন; বলিলেন—"তাকে গুগ্-

গুলের ধূপগুলো তৈরী করবার জন্তে ব'লে রেখেছি, সেই কথা তাকে মনে করিয়ে দিস্।—যা, এখন তুই যা।"

খেতুরি প্রস্থান করিলে লজ্জা ও আনন্দের আভায় স্মিত ও সমুজ্জ্বল অথচ নতমুখ পরম স্নেহভাজন দেবরটির দিকে ফিরিয়া কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠে অথচ সহজভাবেই মহাদেবী কহিলেন, "যাও ত ছোট রাজা! ছোট রাণীকে ব'লে এস ত যে, এখন আমি ঘুমুবো, দণ্ড দুই পরে আমার ঘুম ভাঙ্গলে তার সেলাই আমায় দেখাবে, ততক্ষণ ঐ ঘরে ব'সে সে যেন আমার ঘুম ভাঙ্গার প্রতীক্ষা করে—যাও, তুমি ও ঘরে যাও—আমার ঘরের এই দোরটা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিয়ে যেও—না হ'লে কেউ এসে প'ড়ে আবার আমার কাঁচা ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে দিতে পারে।"

রামপাল একটি কথাও না কহিয়া নিঃশব্দ হাসিমুখে তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন ও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই ঘর হইতেই ইতঃপূর্ব্বে কিঙ্কিণী ও মঞ্জীরের রব শ্রুত হইয়াছিল।

তাঁহাকে দেখিয়াই ঘোর লজ্জায় চম্‌কাইয়া উঠিয়া রক্তবর্ণ মুখে সন্ধ্যা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এ কি! তুমি কেন এলে? না না, যাও!—"

ততক্ষণে তাহার বল্লরীকোমল ক্ষুদ্র দেহ নিজের বিশাল বক্ষে টানিয়া লইয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দের-কৌতুক-হাস্য কষ্টে রোধ করিতে করিতে রামপালদেব উত্তর করিলেন, "মহাদেবী যে কত বড় মহাদেবী, তা ত জানো না, রাণি! আমি যে তাঁকে সাত বছরে মা-হারা হয়েই পেয়েছিলুম এবং মা'র কাছে ছেলের যা পাওনা, তার উপর আবার বন্ধুর প্রাপ্যটাও তাঁর কাছ থেকেই সমানে পেয়ে আস্‌ছি। তুমি ভয় পেও না, মেজ রাজার মত আমি বোকা নই, মহাদেবীর পূর্ণ অনুমতি নিয়ে এসেছি, কেউ জানবেও না।"

কিন্তু এ সান্ত্বনাতেও এই অতর্কিত মিলনের সকলটুকু আনন্দকে

আড়াল করিয়া যে সশঙ্ক লজ্জা তীব্র হইয়া উঠিয়া সন্ধ্যার ক্ষুদ্র শরীরটুকু সরমে মুদিয়া দিতে চাহিতেছিল, তাহা অপগত হইল না। সে ফাটিয়া-পড়া পাকা ডালিমের মত আরক্ত গণ্ডে, নামিয়া-আসা পাতার আড়ালে আধ-ফোটা কমল-কলির মত নতচোখে, মিনতিভরা ভাঙ্গা গলায় কেবলই বলিতে লাগিল, "ওগো আমি তাঁর কাছে মুখ দেখাব কেমন ক'রে?—না, না,—তুমি যাও।"

রামপাল সেই ঘরে রক্ষিত একখানা আসনের কাছে তাহাকে টানিয়া আনিয়া বসাইয়াছিলেন, নিজে তাহার পার্শ্বে আসন গ্রহণ পূর্ব্বক ঈষৎ দুঃখিত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিলেন, "তাঁর কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে ভাবচো? তা'হলে আজও তুমি তাঁকে চিনতে পারনি সন্ধ্যা! লজ্জা তাঁর নামেই লজ্জা পায়! তিনি মূর্ত্তিমতী দেবী!"—

মনে মনে বলিলেন, 'আমার দুর্ভাগ্য জ্যেষ্ঠ তাঁর মত স্ত্রীর এত বড় অবমাননা যে কেমন করেই করতে পারেন, আমি তো ভেবে পাইনে!—অথবা, দেবীকে হয়ত নারী মনে করা সহজ নয়!'—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুবিখ্যাত পালবংশীয় গৌড়াধিপ নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল যখন জন্মগ্রহণ করেন, দেখিবার আগ্রহে সজ্জনগণ তাঁহাকে যেন 'লোচন-পুটে পান করিয়াছিলেন' বলিয়া কথিত আছে। "শত্রুকুল-কালরুদ্র" প্রভৃতি বাক্যেও তাঁহাকে বিশেষ প্রতাপশালী বলিয়াই জানা যায়।

"পীতঃ সজ্জন-লোচনৈঃ স্মররিপোঃ পূজানুরক্তঃ সদা,
সংগ্রামে চতুরোঽধিকঞ্চ হরিতঃ কালে কুলে বিদ্বিষাম্।

চাতুর্বর্ণ্য-সমাশ্রয়ঃ সিতযশঃপুঞ্জৈর্জগদ্রঞ্জয়ন্
শ্রীমদ্ বিগ্রহপালদেবনৃপতির্জজ্ঞে ততো ধামভৃৎ ॥"

তাঁহার শুভ্র যশঃপ্রভায় জগৎকে তিনি সুরঞ্জিত করিয়াছিলেন এবং চন্দনবারি সুশীতল করিয়া রাখিয়াছিলেন।

রাজ্যারোহণের অল্পকাল পরেই তাঁহার পিতার পুরাতন শত্রু চেদিরাজ কর্ণের সহিত তাঁর পুনশ্চ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কর্ণের পূর্ব্বতন গৌরবোজ্জ্বল দিন এখন চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার পূর্ব্বতন পরাজিত শত্রুগণ—পাণ্ড্য, চোল, মুরল, কুঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কীর, হূণ, গুর্জ্জর, গৌড় প্রভৃতি সকলেই একে একে বা একসঙ্গে মিলিত হইয়া পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতেছিল।

পালশক্তির নিকট পরাজিত হইয়া কর্ণরাজ সন্ধি প্রার্থনা করিলেন ও বিগ্রহপালের হস্তে নিজ কন্যা যৌবনশ্রীকে সম্প্রদান করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। এই মহিষী মহারাজাধিরাজ বিগ্রহপাল দেবের দ্বিতীয়া মহিষী, ইনি পট্টমহাদেবী নহেন। কারণ, ইঁহাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে তিনি বংশ-গৌরবে সম্মানিত রা[illegible]বংশীয়া মথনদেবের ভগিনী ভাগ্যদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভাগ্যদেবী সপত্নীকে পরম স্নেহে গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু অল্পদিন পরেই পট্ট মহাদেবী বুঝিলেন, নামে ভাগ্যদেবী হইলেও কার্য্যতঃ সৌভাগ্য তাঁহার সপত্নীকেই আশ্রয় করিয়াছে। বর্ষমধ্যে পুত্রবতী হইয়া যৌবনশ্রী ভবিষ্যৎ রাজমাতা ও পতির সোহাগিনী পত্নী হইয়া বসিলেন, নামে পট্টমহিষী হইলেও ভাগ্যদেবীই দুর্ভাগা স্ত্রীরূপে গৃহ-শোভার উপকরণমাত্র রহিলেন।

যৌবনশ্রীর পুত্র মহীপালের বয়স যখন সাত বৎসর, তখন ভাগ্যদেবীর গর্ভে একে একে শূরপাল ও ইঁহার চারি বৎসর পরে রামপালের জন্ম হইল। সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত অত্যন্ত সুন্দর শিশু! পুত্রমুখ দেখিয়া নৃপতি

গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। মনে মনে বলিলেন, "হে সুগত! ইহাকেই কেন তুমি প্রথমে পাঠাইলে না!"

প্রিয়তমা যৌবনশ্রীকে ভয় করিলেও মনের মধ্যে বিগ্রহপালদেব সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি ভাগ্যদেবীকে শ্রদ্ধা করিতেন। বিশেষতঃ শৈশবাবধি মাতৃ দ্বারা প্রশ্রয় প্রাপ্ত মহীপালের ঔদ্ধত্য ও যথেচ্ছাচারে তিনি তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অথচ প্রেয়সীর গঞ্জনা-ভয়ে মুখ ফুটিয়া তাহাকে কিছু বলিবারও উপায় নাই। যথাকালে মহীপালদেব যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন ও তাঁহার অনতিক্রান্ত কৈশোরে তাঁহার সহিত কর্ণাট-রাজকন্যা লজ্জাদেবীর শুভ পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। ইতোমধ্যেই রামপাল-জননী ভাগ্যদেবীর মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

বধূ লজ্জাদেবী শ্বশুরালয়ে আসিয়া সর্ব্বপ্রথম তাঁহার এই মাতৃহীন বালক দেবরটির প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। বয়সে তিনিও তখন বালিকা। শূরপাল রামপাল অপেক্ষা চারি বৎসর মাত্র বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও প্রকৃতির বিভিন্নতা বশতঃ তিনি রামপালের ন্যায় জন-প্রিয় ও আনন্দময় প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন না। শৌর্য্যে, বীর্য্যে, বিদ্যাবত্তায় প্রভৃত উন্নতিশীল থাকিয়াও রামপালদেব নিজের সুমধুর স্বভাবগুণে ইতর ভদ্র সকলেরই অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। রাজবধূ লজ্জাও তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে স্নেহ করিয়া বসিলেন। অবশ্য রামপালের বিমাতা বধূকে এ কার্য্যে যথেষ্ট বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, বধূর এই কার্য্য ফলে রামপাল তাঁহার সমধিক বিরাগভাজনই হইলেন, তথাপি ভ্রাতৃস্নেহ-বুভুক্ষিতা লজ্জাদেবী যে অনাস্বাদিত স্নেহের স্বাদ এই ভ্রাতৃপ্রতিম বালকের প্রতি ভালবাসায় লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। মহাদেবী যৌবনশ্রীর বিরাগভাগিনী হইয়াও গোপনে গোপনে ঐ সুদর্শন বালক দেবরটিকে নিজের স্নেহচ্ছায়ায় বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।

যুবরাজ পরমভট্টারক মহীপালদেব প্রথমাবধিই লজ্জাদেবীর প্রতি অনুরক্ত হইতে পারেন নাই। এই কর্ণাট-কুমারীটি তাঁহার পিতৃগৃহ হইতে যে উচ্চশিক্ষা ও মহাপ্রাণতা লইয়া তাঁহাদের মাতা-পুত্রের সঙ্কীর্ণতার মাঝখানে সমাগতা হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের অন্তরের কালিমা দিয়া ইঁহার দিকের আলোক শিখাকে ইঁহারা নিয়তই আড়াল করিয়া রাখিতে চাহিতেন এবং যেটুকুকে চাপা দিতে পারিতেন না, সেই তীক্ষ্ণ তীব্র অথচ কোমল রশ্মিচ্ছটায় নিজেদের মনের কালো যখনই কয়লার রঙে ফুটিয়া বাহির হইত, তখনই ঐ আলোকশিখাটারই পরে তাঁহাদের মনের জ্বালা ধরিয়া যাইত। যৌবনশ্রী এই বধূর প্রতি বিতৃষ্ণায় তাহার নামে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের নিকট কুৎসা করিতে ছাড়িতেন না এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিতা হইয়া পুত্রকে তরুণী নর্ত্তকী বিদ্যুৎমালার সাহচর্য্যে সময়ক্ষেপ করিতে উৎসাহিত করিয়া বধূর প্রতি শত্রুতাসাধন করিতেন।

লজ্জা গোপনে তাঁহার অন্তরের গভীর বেদনায় ভরা দুই বিন্দু অশ্রুজল নীরবে মুছিয়া ফেলিতেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁর সেই স্থির-ধীর গাম্ভীর্য্যময় ভাব ও অটুট কর্ত্তব্যপরায়ণতার এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটিতে কোন অবস্থাতেই দেখা যাইত না। স্বামীর অনাদর ও শ্বশ্রূর স্নেহহীনতায় মনের ভিতর তাঁহার যতই যাহা হউক, বাহিরে সেই একই প্রশান্ত গম্ভীর অথচ সহজ সানন্দ ভাব।

কর্ণাট-কন্যা বৈদিকধর্ম্মমার্গপরায়ণা। শ্বশুর বিগ্রহপাল নিজে সৌগত হইলেও তাঁহার রাজ্যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের দৃষ্টান্তে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ও জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ধর্ম্মচর্য্যায় কাহাকেও বাধা দিতেন না। নব-বধূও সেইমত নিজ উপাস্যদেবতার আরাধনায় অধিকারিণী হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, মহারাজাধিরাজ ইঁহার পূজার জন্য অন্তঃপুর-সান্নিধ্যে একটি দেবালয়ও নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে লজ্জাদেবীর ইচ্ছানুসারে শিবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

এক দিন শান্ত নির্ম্মল প্রভাতে লজ্জাদেবী পূজাগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কুমার রামপাল একগাছি অম্লান পুষ্পমাল্য লইয়া কাহার প্রতীক্ষায় উৎসুক হইয়া চাহিয়া আছেন। তাঁহার সুন্দর সুগৌর মুখখানি যেন ঈষৎ শঙ্কিতভাবাপন্ন, তাঁহার উজ্জ্বল আয়ত নেত্র দুইটিতে সংশয়ের ঘন ছায়া। লোহিতালোক-মণ্ডিত বালসূর্য্যের প্রদীপ্তাভায় বালসূর্য্যেরই মত তাঁহাকে সুন্দরতম দেখাইতেছিল। লজ্জাদেবীকে দেখিয়া বালক ছুটিয়া কাছে আসিল, লজ্জাস্মিত মুখে কহিল,—

"দেখুন, আমি কেমন সুন্দর মালা গেঁথেছি!"—তার পর ঈষৎ স্বর নামাইয়া কুণ্ঠাস্মিতহাস্যে বলিল, "আমার মালা কি আপনার ঠাকুর নেবেন না? দিলে কিছু দোষ হবে কি?"

লজ্জাদেবী এই প্রশ্নে ঈষৎ বিস্মিত হইয়া সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দোষ হবে কেন ভাই?"

ক্ষণমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া রামপাল নতনেত্রে উত্তর করিলেন, "আমি যে সৌগত।"

লজ্জাদেবী প্রসন্ন স্মিতহাস্যে বালকের মাথায় হাত রাখিয়া মৃদুহাস্যের সহিত কহিলেন, "তাতে কিছু দোষ হয় না। সুগতও তো ভগবানেরই অবতার।"

রামপাল এবার বধূরাণীর খুব কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া একবার ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে কহিলেন, "আপনার ঠাকুরের মাথায় দিয়ে ঐ মালাটা আপনি দাদার গলায় পরিয়ে দেবেন তো,—তা হ'লে দাদা আপনাকে খুব ভালবাসবেন। কাল আমি মহামাত্যের বাড়ী গেছলেম, সেখানে এক জন পণ্ডিত বলছিলেন, 'দেবতার অনুগ্রহ হ'লে সর্ব্বকার্য্যই সিদ্ধ হয়'।"

এই কথাগুলি চুপি চুপি বলিয়া মালাগাছি হাতে দিয়াই রামপাল

ছুটিয়া পলাইয়া গেলেন। আর রাজবধূ! যুবরাজ্ঞী লজ্জাদেবী?—তিনি তাঁর পরম স্নেহাস্পদ বালকটির তাঁহার প্রতি এই প্রগাঢ় ভালবাসার অপূর্ব্ব পরিচয়ে যেন বিস্ময়বিহ্বলতায় কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন এবং তার পর দেখিতে দেখিতে তাঁহার আনতনেত্র হইতে সহসা দুই বিন্দু অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িল।

যদিও এই দেব-প্রাসাদী ফুলের মালা লজ্জা তাঁর দুর্ল্লভ দর্শন পতি-দেবতার গলায় পরাইবার অবসর খুঁজিয়া না পাওয়াতে তাহা তাঁহার শয়ন গৃহের প্রাচীরবক্ষে দুলিয়া দুলিয়া শুকাইয়া গেল, কিন্তু এই শুভমুহূর্ত্তটুকুকে তিনি কোন দিনই আর ভুলিতে পারিলেন না। সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ের একান্ত শুভেচ্ছাটুকু যেন একটি অচ্ছেদ্য নিবিড় বন্ধন হইয়া তাঁহাদের দেবর-ভ্রাতৃজায়ার সম্বন্ধটিকে এমনই মধুরতর ও সুদৃঢ়তর করিয়া তুলিল যে, মহাদেবী, যৌবনশ্রী তাহা দেখিয়া দেখিয়া অস্থিমজ্জায় জ্বলিয়া উঠিলেন; এমন কি, তাঁহার মরণকালেও এর জন্য সুখ হইল না।

এই সময় সহসা মহারাজাধিরাজের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি মহামাত্যকে ডাকাইয়া তাঁহার হস্তে শূরপালকে সঁপিয়া দিয়া বলিলেন, "এর ভাল মন্দ তুমি দেখ।" লজ্জাদেবীকে ডাকিয়া কহিলেন, "মা! রামুকে আমি তোমায় দিলাম।"

মহীপাল গৌড়-মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই শূরপালকে মগধে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, রামপালকেও শূরপালের সঙ্গে রাজধানী হইতে দূরবর্ত্তী করিয়া দিবেন, কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না। মহাদেবী ইহার বিরোধী হইয়া বলিলেন, "রামপালের পাঠ সমাধা না হইলে সে কোথাও যাইবে না।"

স্বামি-স্ত্রীতে এই লইয়া বেশ একটুখানি কথা-কাটাকাটি হইয়া গেল। মহীপাল যখন কোনমতেই স্ত্রীকে রামপালের বিরুদ্ধে লওয়াইতে সমর্থ

হইলেন না, তখন রোষভরে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তা হ'লে তুমি এবার থেকে ওকে নিয়েই থাক, আমায় আর কখনও কিছু চেও না।"

বিষাদ-গম্ভীর মুখ সুধীরে উত্তোলন পূর্ব্বক ধীর শান্তকণ্ঠে লজ্জাদেবী ধীরে ধীরে কহিলেন, "আপনাকে ত আমি চেয়েও কোন দিন পাই নি! আপনি ত' তা' জানেন।"

মহীপালের ললাট বিরক্তির কুঞ্চনে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। নেত্রে তাঁহার কঠোর ব্যঙ্গের আভাস দেখা দিল। তিনি তীক্ষ্ণ পরিহাসের সহিত রূঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "ওঃ, তারই জন্য বুঝি আমার পরম শত্রুর পায়ের তলায় আত্মসমর্পণ ক'রে আমার উপর প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে!"

এই বলিয়াই তিনি রুষ্ট-বিদ্রূপে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া ঈর্ষা কুটিল হাস্য করিলেন।

এত বড় পরিবাদেও নবীনা পট্টমহাদেবীর এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না, তিনি এই দূষিত অভিযোগ শুনিয়াও যথাপূর্ব্ব অবিচলিত স্নিগ্ধ-গম্ভীর ধীর-কণ্ঠেই ইহার প্রত্যুত্তর করিলেন, কহিলেন, "রাজাধিরাজ! আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, এই দুইটা কথাই আপনার একান্ত ভিত্তিহীন।"

মহীপালের মুখ ক্রোধের উচ্ছ্বাসে আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনিও আত্মদমন করিলেন; সহজ কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কথাটা আমার ভিত্তিহীন?"

লজ্জাদেবী অপমানের ক্ষোভে আরক্ত মুখ নত রাখিয়া সংযতস্বরে কহিলেন, "মহাকুমার রামপালদেব আপনার পরম শত্রুও নন, এবং আমিও যে সেই পুত্রবৎ স্নেহাস্পদ বালকের চরণে 'আত্মসমর্পণ' করিনি, এ দুটো কথাই আপনার অবিদিত নয়।"

মহীপালের গর্ব্বিত চিত্ত এই অনবনত অথচ শান্ত, তেজস্বী অথচ অচঞ্চল নারীচিত্তের সমাহিত অথচ অকাট্যযুক্তিপূর্ণ তর্কে নিজেকে অত্যন্ত

অবমানিত বোধ করিতেছিলেন, তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া জলদ-গম্ভী স্বরে কহিলেন, "মহাদেবি! কি বলবো, তুমি স্ত্রীলোক এবং আম বিবাহিতা স্ত্রী, নাহলে রামপাল আমার শত্রু নয়, এ কথা অন্য বে উচ্চারণ করলে আমি তার জিভ কেটে ...ার কপালে তপ্ত লোহা দি 'মিথ্যাবাদী' এই ছাপ এঁকে দিতাম। রাম... —শুধু শত্রু নয়,—আম পরম শত্রু! সাম্রাজ্য শুদ্ধ লোক তারই পক্ষ... কেন? তাহা ত কুটিল ষড়যন্ত্রে—তার গভীর দুরভিসন্ধির ফলে! সে এতটুকু সুযে পেলেই কোন্ দিন বরেন্দ্রীর সিংহাসন অধিকার ক'রে বসবে। আর-জেনো যে তাতে তুমিই তাকে সাহায্য করচো। তুমি নিশ্চিত জে রেখ, মহাদেবি! আমি যদি তাকে না মারি, একদিন সে আম মারবে।"

লজ্জাদেবী সহসা সঘন কম্পিতকণ্ঠে বাধা দিলেন, "মহারাজাধিরাজ!"-

মহীপাল তাঁর সেই আর্ত্ত-কাতরস্বরে ভ্রূক্ষেপমাত্র ন করিয়াই ক্রূরক নির্দ্দয়ভাবে কহিলেন, "হয় স্বামীর ছিন্ন শির, না হ... প্রিয়বন্ধুর,—কো তোমার সহনীয় হবে বোধ হচ্ছে, সুবিধামত ... একটুখানি বিবেচ ক'রে দেখো দেখি।"

এই নির্ম্মম বাক্যবাণে বিদ্ধ স্তব্ধ অসাড় নতনেত্র নারীমূর্ত্তির প্র বারেক রক্তনেত্রে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টার মহীপালদেব সগর্ব্ব পাদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন। অতবড় মর্ম্মাঘাতে আহতার অবস্থাটা যে কিরূপ ঘটিল, তাহা আর ভাল করিয়া ফিরিয় দেখিতেও অবসর হইল না।

স্বামী পত্নী-সম্ভাষণ সমাধা করিয়া প্রস্থান করিলে, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত লজ্জাদেবী সেই স্থানে সেই একই ভাবে তাঁহার স্পন্দ দেহ ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট মন লইয়া অবসন্নবৎ বসিয়া রহিলেন। কতক্ষণই যে তাঁহার এ ভাবে

কাটিয়া গেল, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। যখন সেই মুহ্যমান অবস্থা কাটাইয়া, সুগভীর চিন্তাজাল ভেদ করিয়া মুখ তুলিলেন, তখন তিনি দেখিলেন, তিনি তখনও একা! ঊর্দ্ধে চন্দ্রমা তার কৃষ্ণা প্রতি-পদের পূর্ণ সৌন্দর্য্য চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছে, তাহারই সুপ্রচুর স্মিতরশ্মি মুক্ত বাতায়ন পথে প্রবেশ করিয়া শুভ্র সেফালিকার স্খলিত পুষ্পরাশির মতই হর্ম্ম্যতলে প্রসারিত হইয়া পড়িয়া আছে। দূরে-অদূরে দেবায়তনে সন্ধ্যারতির গম্ভীর ধ্বনি স্বর্গের দিকে উত্থিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে অদূরস্থ মহাবিহারমধ্য হইতে সমবেত সুধীকণ্ঠে ধার্ম্মিক ভিক্ষুগণের ত্রিশরণ-মন্ত্র ঘন ঘন উচ্চারিত হইতেছিল—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।"—

এই মহাবাক্যত্রয় সুগম্ভীর ঘণ্টা ও বিবিধ বাদ্যধ্বনি সহকারে উত্থিত হইয়া ভূলোকবাসীর জন্য দুর্ল্লভ স্বর্গদ্বার অনাবৃত করিয়া দিতেছিল। ধীরে ধীরে একটি গভীর প্রশান্তি যেন পাপীতাপী সকলেরই প্রাণের তীরে নামিয়া আসিতেছে।

একটা হৃদয়ভেদী গভীরতর দীর্ঘশ্বাস মোচনপূর্ব্বক গৌড়েশ্বর-মহিষী পট্ট-মহাদেবী উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহসা করযোড়ে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন—"হায় প্রভু! সকলই যখন ঊর্দ্ধগামী, তখন মানুষের মনটাকেই শুধু এমন নিম্নগ করে সৃষ্টি করেছ কেন? দীপ ঊর্দ্ধশিখায় জ্বলে, ধূপ উপরেই গন্ধ বিলায়, ফুলও তার সৌরভের ডালি ঊর্দ্ধ পথেই প্রেরণ করে, শুধু নদীর জল, আর মানুষের মনই কি কেবল তার নিজের গতিপথ খুঁজতে নীচুর দিকেই ছুটবে? না না, নাও দেব! এই হীনতার প্রবৃত্তি তার দূর ক'রে কেড়ে নাও,—দাও তাকে মহত্ত্বের, উদারতার, ত্যাগের মহিমময় ঊর্দ্ধচরণশীল উন্নত হৃদয়! উঃ, নতুবা এ বিশ্বরচনা যে তোমার নিরর্থক হয়ে যাবে।"

সেইদিন রামপালকে ডাকাইয়া এক সময় মহাদেবী তাঁহাকে বলিলেন,—

"মহাকুমার! আমার একটি অনুরোধ রাখবে ভাই?"

বিস্মিত ও স্মিতমুখ সাশ্চর্য্যে উত্তোলনপূর্ব্বক রামপাল কহিলেন, "আদেশ করুন, মহাদেবি!

"তোমার পক্ষে যতই প্রার্থনীয় হোক্, লোভনীয় হোক্, তবুও তুমি কোন অবস্থাতেই তোমার বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে কখন বিদ্রোহী হ'তে পাবে না, এই কথাটী আমায় দাও,—দেবে ভাই!"

মহাকুমার রামপালদেব স্মিত-গম্ভীর মুখে উত্তর করিলেন, "এ কথা আপনি আমায় না বল্লেও আমি কখন তা' করতাম না, মহাদেবি!—তিনি যে আপনার স্বামী।"

মহাদেবীর চোখের মধ্যে অশ্রুর মেঘ বর্ষণোন্মুখ হইয়া উঠিল, তিনি তাহা অতি কষ্টে রোধ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইহার পর জ্যেষ্ঠ মহীপালদেবের সকল অন্যায়-অবিচারই কনিষ্ঠ কুমার রামপালদেব নির্ব্বিবাদে সহ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি কোন দিনই তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্নেহ আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। এখানকার শিক্ষা সমাধা করিয়া তিনি বিক্রমশিলায় কিছু দিন শাস্ত্রাধ্যয়ন জন্য অবস্থিতি করিয়া তৎপরে দেশভ্রমণে বাহির হইলেন এবং নিজেদের রাজ্যসীমা সকল সন্দর্শন করিয়া তার পর রাষ্ট্রান্তরেও পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে মাতুলালয়ে গমন করিলে, অঙ্গাধিপ

মাতুল মথনদেব ও সুবর্ণদেব প্রিয় ভাগিনেয়কে সযত্নে গ্রহণ করিলেন। কথায় কথায় মহীপালের কথা উঠিতে মথনদেব কহিলেন, "তোমার পিতৃ-রাজ্যে তোমারই সিংহাসনপ্রাপ্তি সঙ্গত ছিল এবং তাহ'লে পালসাম্রাজ্য আরও কিছু দিন গৌরবোন্নত থাকতে পারতো। কেন তুমি এমন নির্ব্বোধের মত দেশ-ছাড়া হয়ে বেড়াচ্ছো? বল ত আমি তোমার সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।"

রামপাল আরক্ত নতমুখে নীরব রহিলেন। তাঁহার নিজ দেশেও তাঁহাদের সুহৃদ্‌বর্গ যথা—ভূতপূর্ব্ব মহামাণ্ডলিক-বীরদেব, এমন কি, পূর্ব্বতন মহাসেনানায়ক কর্ণভদ্র পর্য্যন্ত তাঁহাকে এই পরামর্শই দিয়াছিল।

তাঁহাকে চিন্তাকুল দেখিয়া মথনদেব কহিলেন, "কি বল? আমার সমস্ত বল, আর তা ভিন্ন আমার যত দূর বিশ্বাস, তোমার নিজ দেশেও তুমি অধিকাংশ লোকেরই সহায়তা লাভ করতে পারবে। চেষ্টা একবার করবে না কি?"

রামপাল বিষাদ-মলিনমুখে গভীর নিশ্বাস মোচন করিলেন, ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন,—"না।"

"চিরদিনটা এম্‌নি ছন্নছাড়া হয়েই কি বেড়াবে? অথচ তিন জনের মধ্যে তুমিই শক্তিমান! আর সে কথা বোধ করি তুমি ছাড়া আর সকলেই জানে।"

রামপাল অত্যধিক বিষণ্ণমুখেই মুখ তুলিয়া সকালবেলার দীপ্তিহীন বিদ্যুতের মত মৃদু হাসি হাসিলেন, "সে কথা আমিও যে না জানি, তা নয়। কিন্তু মামা! আমি, আমার যতই ক্ষতি হোক্, সে বরং সহ্য করতে পারবো, কিন্তু মহাদেবীর স্বামীর অণুমাত্র ক্ষতি করতে পারবো না।"

মথনদেব ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "তা বটে!"

তার পর কিছু দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "তিনিই তবে তোমার সকল উন্নতির অন্তরায় হয়ে রইলেন? তাঁর এই স্নেহই তা'হলে তোমার পক্ষে সকলের বড়ো আপদ্ হ'ল?—অদৃষ্ট!"

মাতুলরাজ্য হইতে বাহির হইয়া বহু স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে রামপাল ছদ্মবেশে সমতটে প্রবেশ করিলেন। সম্ভ্রান্ত বণিক্ বলিয়া সেখানে তাঁহার যথেষ্ট সমাদর হইল এবং সুদর্শন-মূর্ত্তি এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, উচ্চশিক্ষা, তেজস্বিতা ও অমায়িকতার একত্র সমন্বয় প্রভৃতি গুণে অল্পদিনের মধ্যেই রাজপুত্রগণের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ জন্মিয়া গেল। রামপাল ও তাঁহার চিরসাথী মন্ত্রিপুত্র বোধিদেব দুই জনেই অতিথিরূপে কয়েক মাস সমুদ্রতীরে বাস করিলেন। আ·

এক দিন...ন, সে দিন বসন্তের সায়াহ্নে আকাশ একান্ত নীলোজ্জ্বল, পশ্চিমের প্রান্ত...দেবী...সুবর্ণে ও লালিমায় মিশ্রিত হইয়া অভিনব বর্ণবৈচিত্র্য ...গ করি...অতি...য়াছে, সেই আলো অচঞ্চল গাম্ভীর্য্যময় সমুদ্রবক্ষে পতিত হইয়া ...কে ...নির্ব্বচনীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইয়াছিল।

সমুদ্র...তীরে স্থানে স্থানে বালুরাশির উপর আরণ্যক গুল্মজা...জন্মিয়াছে। ...ন্না আলো তাহাদের শ্যামশোভার উপর তাহার স্বর্ণ-রেণু মাখাইয়া ...য়া তাহাদেরও স্বভাবজাত সৌন্দর্য্যকে বর্দ্ধিততর করিয়া তুলিয়াছিল। আর তাহার সর্ব্বাপেক্ষা সার্থকতা হইয়াছিল, সেই বালুকাময় বেলাভূমির উপর উপবিষ্টা এক অপূর্ব্বদর্শনা কিশোরীর দেহজ্যোতিকে সংবর্দ্ধিত করিয়া। তরুণী তন্বী, চকিত-হরিণী প্রেক্ষণা ও তপ্তগৌরাঙ্গী। সঙ্গিনী তাহার এক বর্ষীয়সী নারী। নারী তাহাকে অপ্রসন্ন মুখে মৃদু মৃদু অনুযোগ ও ভর্ৎসনা করিতেছিল, আর সেই বিধাতৃ-সৃষ্টির আশ্চাভূতা অপূর্ব্বদর্শনা সুন্দরী ভীত চকিত নেত্রে স্তব্ধ থাকিয়া সেই উত্তেজনাপূর্ণ উপদেশগুলি শ্রবণ পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া উচ্ছলিত অশ্রুভারাকুল-নেত্রে অনন্ত জলধির

পানে চাহিতেছিল। সেই বাসন্তী অপরাহ্নের অব্যাহত রশ্মিজালের মধ্যে তাহার ব্যথিত বিহ্বল-মূর্ত্তিটী অত্যন্ত সকরুণ দেখাইতেছিল, তার শান্ত করুণ মুখখানিতে একান্ত ভীতি-কাতরতা।

রামপাল বিমুগ্ধ নির্ব্বাক্ নেত্রে সেই সকরুণ সুন্দর মুখখানির পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার মনে হইল, এত দিনের দেশপর্য্যটন যেন তাঁহার আজ সফল হইয়া গেল। অনেক সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখিয়াছেন, কিন্তু এমনটি যেন আর কখন তাঁহার চোখে পড়ে নাই।

একটুখানি নিকটবর্ত্তী হইতেই তাঁহার কানে আসিল,—"তুমি নিতান্ত অবোধ! শুনচো রাজরাজ্যেশ্বরী হবে, এতেও তুমি আপত্তি করচো? ছি ছি, এতটুকু বুদ্ধি তোমার নেই! এস, আর বিলম্ব করো না, শুভযাত্রার কাল উপস্থিত হয়েছে।"

তরুণী যথাপূর্ব্ব নিশ্চেষ্ট ও নীরবভাবে বসিয়া রহিল, শুধু তাহার বিশাল নেত্র দুইটিতে অশ্রুজল পরিপূর্ণ হইয়া আসিয়া তাহা যে পতনোদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, রামপালের নেত্রেও তাহা অদৃশ্য রহিল না।

বর্ষীয়সী নারী কহিতে লাগিল, "জ্যোতিষী তোমার করকোষ্ঠী গণনা করেও যখন তোমার জন্ম-পত্রিকার লিখিত বিষয়েরই পুনরুক্তি করলেন, তখন ত আর আমরা এ কথাকে আর অগ্রাহ্য করতে পারিনে! মহারাজচক্রবর্ত্তীর সঙ্গে তোমার বিবাহকাল আসন্ন হয়েছে এবং তিনি প্রত্যক্ষ তোমায় দেখে নিজে হ'তে আগ্রহ জানিয়ে বিয়ে করবেন,—এই তাঁর অভিমত। তখন নিশ্চয়ই আমাদের পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে যাওয়াই সঙ্গত। মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক মহীপালদেবই যে এই আমাদের ইপ্সিত 'মহারাজচক্রবর্ত্তী,' তা'তে কোনই সংশয় নেই। এ অবস্থায় আমরা তোমার ও মিথ্যা আপত্তি শুনতে পারি না।"

মেয়েটি বারেক তাহার অশ্রুসজল চোখ দুইটি ঈষদুত্তোলন পূর্ব্বক রুদ্ধ

কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "শুনেছি, তিনি লোক ভাল নন।" বলিতে বলিতে তার নেত্রপ্রান্তে উথলিয়া পড়া দুই বিন্দু অশ্রু তার নির্ম্মল পবিত্র অন্তঃকরণের অনির্ব্বচনীয় ব্যথা ব্যক্ত করিল।

আর কিছুই তাহাকে বলিতে হইল না, বর্ষীয়সী মহিলাটির সক্রোধ তিরস্কারে তরুণীর এই ক্ষীণ প্রতিবাদটুকু কোথায় যেন ডুবি[illegible] গেল। নারী তীব্র ভৎর্সনাপূর্ণ কণ্ঠে সরোষে কহিয়া উঠিল,—

"লোক ভাল নন'? মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব কত ব[illegible] প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা, তা'র তুমি সংবাদ রাখ? এক ফোঁটা মেয়ে! ছোট মুখে তোমার বড় কথা! এ বিবাহ হ'লে তোমার চতুর্দ্দশ পুরুষ যে উদ্ধার হয়ে যাবে, তার তুমি জানো কিছু? সাবধান! এমন অসংলগ্ন কথা আর জীবনে কখন বলো না যেন। এ কথা তোমার পিতার কর্ণগোচর হ'লে তিনি তোমার মুখদর্শনও করবেন না।"

ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব পশ্চাতের তরু-বীথিকার অন্তরালে অন্তর্হিত [illegible]য়া গেলেন। সুশ্যাম পত্রাবলী দেখিতে দেখিতে তাহার শ্যামলতা [illegible]রাইয়া নীলাভ হইয়া গেল। তখন সেই আগমনশীলা যামিনীর অবরো[illegible] পথের মহাসন্ধিস্থলে সমুদয় বিশ্ব যেন মহানীল-সরস্বতীর মহানীলিমায় বিমণ্ডিত হইয়া উঠিল। তখন জলে নীল, স্থলে নীল, আকাশের নীলিমায় অনাদি-নীল অনন্তভাবে সুবিস্তৃত হইয়া রহিল। কুমার রামপালের হৃদয়রাজ্যও বুঝি ঐ অসীম নীল সাগরের মতই তমসাবৃত হইয়া উঠিয়াছিল!

রামপালদেবের সংবিৎ ফিরিয়া আসিল, বন্ধু বোধিদেবের সপরিহাসবাক্যে—"সখে! দ্রষ্টব্য চ'লে গেলেও কি দৃষ্টি তার সঙ্গী হয়ে চক্ষু ছেড়ে চ'লে যায়? তোমার অবস্থাটা এখন 'সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ'—গোছ হয়ে পড়েছে দেখছি!"

রামপাল বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, নারী দুই জন কোন সময়ে চলিয়া

গিয়াছে। তিনি ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেও তাহা অপ্রকাশ রাখিয়া হাসিয়া কহিলেন,—"আমার প্রিয় সখাটী যদি ব্রহ্ম সূত্রধারী না হতেন, তবেই তাঁর দৃষ্টির বল বুঝতে পারতেম!"

"বটে! দৃষ্টি বুঝি আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ভেদবুদ্ধিটুকুও হিসাব ক'রে চলে? তবে ত সে মহাবিবেকী দেখছি! কিন্তু কাব্য-নাটকে ঠিক উল্টা কথাই রটনা ক'রে থাকে যেন!"

রামপাল ঈষল্লজ্জিত হইয়া মৃদু মৃদু কহিলেন,—"দৃষ্টিকে যে প্রেরণা দিয়েছে, তারই কথা আমি বলেছিলাম, কিন্তু এও বলি সখা! কাব্য-নাটকে প্রায়ই দেখা যায়, নিজ নিজ জাতি গোত্র অবস্থা সমস্তই স্থির রেখে নায়ক নায়িকারা প্রেমে পতিত হয়ে থাকেন।—কদাচ কখন এর ব্যতিক্রম দেখা যায় মাত্র, সেও আবার বহুস্থলে শেষ পৃষ্ঠার রহস্য ভেদে "সামঞ্জস্য হয়ে যায়,—যথা রত্নাবলী, মালবিকা ইত্যাদি।

বোধিদেব সহাস্যে কহিলেন, "বেশ, এস তবে এখন আমরা সেই বিবেকবুদ্ধি-প্রণোদিত সম্ভাব্য ঘটনা সম্বন্ধেই কথা কই! শুনলে ত, ঐ মেয়েটির কোন মহারাজচক্রবর্ত্তীর সঙ্গে বিবাহ হবে, এই কথা উপযুক্ত জ্যোতিষিক গণনায় স্থির হয়েছে। আবার 'দৃষ্টিকে যিনি প্রেরণা দান করেছেন,' তিনিও না কি সম্পূর্ণ উৎসুক আছেন, তাও দেখা যাচ্ছে,—অতএব এ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে তার আত্মকর্ত্তব্য সম্পাদনে আর অযথা বিলম্ব ঘটানটাও ত সঙ্গত হয় না,—কেমন না? আজ্ঞা কর, যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন ক'রে ফেলি।"

রামপাল এতক্ষণ পরে এই বার তাঁহার আনত দৃষ্টি তুলিয়া প্রিয়সখার মুখে তাহা স্থাপন করিলেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে আনন্দের সমুদয় স্মিতরশ্মিটুকু সন্ধ্যাগমে দিবালোকের ন্যায় একবারে নিঃশেষেই মুছিয়া গিয়াছিল।

"বোধিদেব! তুমি ত জানই যে, আমার পিতৃরাজ্যে আমার স্থান একটা পথের ভিক্ষুকেরও চেয়ে অনেক নীচে এবং জীবনও আমার বৃক্ষচ্ছায়ার মতই অনিশ্চিত, তবে কেন রাজচক্রবর্ত্তীর মহিষী-পদ প্রাপ্তিরূপ সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতীর সঙ্গে আমার মত দুর্ভাগার মিলনের মত অসম্ভব সম্ভবের মিথ্যা কল্পনা করচো?"

রামপালের এই যথার্থ সত্য এবং খেদপূর্ণ বাক্য শুনিয়া বোধিদেব কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, তিনি তাঁহার স্বভাবমৃদু স্নিগ্ধ হাস্যের সহিত উত্তর দিলেন, "ভাল! এই ঘটনাতেই তোমার ভবিষ্যতের একটা আভাস পাওয়াও ত যাবে। যদি ঐ কন্যা যথার্থই রাজরাজ্যেশ্বরীর সৌভাগ্য নিয়ে, জন্মেই থাকে, তোমার হাতে পড়লে ওর ভাগ্যফলের পরিবর্ত্তন ত আর ঘটতে পারে না?"

"কিন্তু বিবাহ ত শুধু তোমার আমার ইচ্ছাতেই হবে না, বন্ধু!—তুমি কি পাগল! যারা মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক মহীপালদেবের হস্তে কন্যা দান করতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন যাত্রা করছে, তারা কিসের দুঃখে আমার মত একটা পথের পথিককে সেই নিরুপমা কন্যারত্ন সঁপে দেবে? না না, কায নেই বোধিদেব! রামপাল যেমন চির-দুর্ভাগ্যকে আশ্রয় ক'রে জন্মেছে, তার তাই থাক, বৃথা আশায় নিজেকে সন্তপ্ত করা তার স্বভাব নয়।"

"দেখ সখা! গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন, কর্ম্মেই আমাদের অধিকার আছে; কিন্তু কর্ম্মফলে নাই। অতএব কাযটা আগে ক'রে দেখাই যাক্ না কেন, ফলানুসন্ধান না-ই বা করা গেল?"

রামপাল তখন প্রীতনেত্রে বন্ধুর দিকে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যের সংশয় মেঘ যে সম্পূর্ণরূপে অপনীত হয় নাই, তাহা তাঁহার ক্ষণমাত্র পরেই উচ্চারিত বাক্য হইতে জানিতে পারা গেল।

"কিন্তু তুমি কেমন ক'রে জানবে, তারা কে?"

রামপালকে সন্দিগ্ধ দেখিয়া বোধিদেব এবার উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

"মহারাজপুত্র! বৃথাই কি দর্ভপাণি, কেদারমিশ্র, প্রভৃতির বংশে জন্মগ্রহণ করেছি? এক দিন কি আমারও নামে রাজকবি আমার পূর্ব্বপুরুষের মতই শ্লোক রচনা ক'রে বলবেন না;—

'আ-রেবা-জনকান্মতঙ্গজমদৈস্তাম্যচ্ছিলাসংহতে-
রা-গৌরীপিতুরীশ্বরেন্দুকিরণৈঃ পুষ্যৎসিতিম্নোগিরেঃ।
মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণ-জলাদাবারিরাশিদ্বয়াৎ
নীত্যা যস্য ভুবং চকার করদাং শ্রী—'

এখানে দেবপালের পরিবর্ত্তে বসবে—শ্রীরামপালো নৃপঃ।"

"আঃ, কি যে প্রলাপ বকচো, বোধি! যা অসম্ভব, তা' নিয়ে বৃথা পরিহাস কেন? কিন্তু এ ক্ষেত্রে বৃহস্পতি-নিন্দিত মন্ত্রিবংশধর যে কোন্ নীতিকুশলতার পরিচয় দিলেন, তা ত বুঝলাম না?"

"কেমন ক'রে বুঝবে? তাই যদি ক্ষাত্রবুদ্ধিতে প্রবেশ করতো, তা হ'লে কি আর—নানা মদমত্ত মতঙ্গজ-মদবারিনিষিক্ত ধরণীতলবিসর্পি ধূলিপটলে দিগন্তরাল সমাচ্ছন্ন ক'রে দিক্‌চক্রাগত ভূপালবৃন্দের চিরসঞ্চরমান সেনাসমূহ যাঁকে নিরন্তর দুর্ব্বিলোক ক'রে রাখতো, সেই দেব সদৃশ দেবপাল নৃপতি উপদেশ গ্রহণের জন্য ব্রাহ্মণ দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায় তাঁরই দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকতেন? না প্রশস্তিকার রাজকবি বিষ্ণুভদ্র এমন কথাটার উল্লেখ করতে ভরসা করতেন?—

'দত্বাপ্যনল্পমুড়ুপচ্ছবিপীঠমগ্রে
যস্যাসনং নরপতিঃ সুররাজকল্পঃ।
নানা-নরেন্দ্র-মুকুটাঙ্কিত-পাদপাংশুঃ
সিংহাসনং সচকিতঃ স্বয়মাসসাদ।'

"আমার কিন্তু ঘোরতর সন্দেহ হয়, তুমি হয় ত আমার কাছে তোমার পূর্ব্বপুরুষের মত 'সচকিত' ভাবে থাকতে পারবে না। ..., তোমার সঙ্গে এতখানি বন্ধুত্ব করাটা একেবারেই আমার সঙ্গত হয় নি।"

কুমার রামপাল এবার আর তাঁহার অন্তরের অসহিষ্ণুতা ও আগ্রহ রোধ করিতে না পারিয়া ব্যগ্র হইয়া আগ্রহ স্মিতমুখে কহিয়া উঠিলেন,—"ভবিষ্যতে তখন এক দিন তোমার সাক্ষাতে না হয় আমি 'সচকিত' হয়েও 'আসন গ্রহণ' করবো না,—কিন্তু সে সকল আকাশ কুসুম,—কল্পনার রহস্য-কথা যেতে দাও, এখন কি উপায়ে এদের সন্ধান নিতে পারবে, তাই বল দেখি?"

মন্ত্রিপুত্র বোধিদেব হাসিয়া কহিলেন,—"সন্ধান আমি নিয়েছি। তুমি যে তখন দৃষ্টি-ক্ষুধায় আত্মহারা হয়েছিলে, তাই শুনতে পাওনি, ঐ মেয়েটির পিতৃনাম বসুভদ্র, মেয়েটির নাম সন্ধ্যারাণী।"

মহাকুমার রামপালদেব কোন বিখ্যাত রাজবংশের পরিবর্ত্তে মাত্র সমতট-নিবাসী নাগরিক বসুভদ্র পট্টনায়কের কন্যাকে বিবাহ করি[illegible] ঘরে আনাতে আর যাহারই যাহা মনে হয় হউক, তাঁহার সর্ব্বজ্যে[illegible] ভ্রাতা মহারাজাধিরাজের চিত্ত কতকটা যেন সুস্থির হইয়াছিল। অঙ্গাধিপ মাতুল মথনদেব একেই রামপালের পক্ষে বর্ত্তমান, ইহার পর অপর কোন প্রবল রাজশক্তির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইলে যে রামপালের পক্ষে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা আদৌ কঠিন হইবে না, তাহা মহীপাল বুঝিতেন এবং সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সতর্কতাবলম্বন করিয়াই চলিতেন। বিশেষতঃ রামপালের দেশভ্রমণে তাঁহার মনের মধ্যে যথেষ্ট সংশয় জন্মিয়াছিল যে, এই পরিভ্রমণের ভিতর কোন গূঢ় রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিহিত আছে। কিন্তু তাহাকে এই হীন সম্বন্ধ স্বীকার করিতে দেখিয়া তাঁহার মনে এত দিনে একটুখানি বিশ্বাস হইল যে, হয় ত বা রামপাল প্রজাবর্গের

পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও তাঁহার অনিষ্টচেষ্টায় চেষ্টিত নহে! নতুবা যে অনায়াসেই গুর্জ্জর, প্রতিহার, মহোদয় প্রভৃতি প্রবলপ্রতাপ রাজন্য-সুতা গ্রহণে স্বপক্ষকে যথেষ্ট বলশালী করিতে পারিত, সে কেনই বা এমন সামান্য ঘরে সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া বসিল? ঈষৎ প্রসন্ন চিত্তে তিনি কনিষ্ঠের জন্য সামান্য বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। রামপালও জ্যেষ্ঠের উদারতায় অনুগৃহীত বোধ করিলেন। বধূর সুন্দর মুখ দেখিয়া লজ্জাদেবী অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন।

কেবল মহামাত্য যোধদেব অন্যের অজ্ঞাতে নিজপুত্রকে ভৎর্সনা পূর্ব্বক কহিলেন, "দুইটা নির্ব্বোধ বালকে মিলে একটা অত্যন্ত অসঙ্গত কার্য্য করে এসেছ! কলিঙ্গপতি অনন্তবর্ম্মা, পীঠিপতি দেবরক্ষিত, মন্দারেশ্বর লক্ষ্মীশূর, মহোদয়াধিপতি এ সকলেই রামপালের হস্তে কন্যাদানে সমুৎসুক থাকতে, কোন্ অজ্ঞানিত সেনানায়কের কন্যা এনে তার ভবিষ্যৎটাকে একেবারে নষ্ট করে ফেলবার সাহায্য করা বিখ্যাত পালমন্ত্রিবংশীয়ের উপযুক্ত কাজ হয় নি!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজধানীর অপর এক প্রান্তে দিব্যোক ও রুদ্দোক কৈবর্ত্তদিগের কুটীর গুলি দারিদ্রব্যঞ্জক তো নহেই বরং তাহা ইহাদিগের স্বচ্ছল অবস্থারই বিশেষ পরিচায়ক। মধ্যে বড় একখানি আটচালা, ইহার একধারে কয়েকখানা সুন্দরভাবে মাজ্জিত সুসংবদ্ধভাবে অবস্থিত গৃহ, এবং অপর পার্শ্বে সারি সারি গোলা মরাই, ঢেঁকিশালা ও গো-গৃহ। পশ্চাতে ও পার্শ্বে সুবিস্তৃত বাগান এবং একটী পুষ্করিণী। তদ্ভিন্ন অনেক বিঘা ধান-জমীও তাঁহাদের

আছে। মোটের উপর ইহাদের অবস্থা আগের চেয়ে অনেকখানিই খাটো হইয়া গেলেও এখনও যথেষ্ট স্বচ্ছল বলা চলে।

পল্লীবাসীদিগের অধিকাংশই কৈবর্ত্ত ;—প্রায় পঁচিশ ত্রিশ ঘর হইবে। এই দিব্যোক এদিককার কৈবর্ত্ত-সমাজের সমাজপতিদের মধ্যের একজন। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একতা বা একপ্রাণতা যে কোন সমাজেরই অনু-করণীয় ছিল। এই কৈবর্ত্ত পাড়ার পরই কিছুদূরে বাগ্দীপাড়া। বাগ্দী-জাতীয় অধিকাংশ পুরুষই পাইক-পেয়াদার কার্য্যে ভর্ত্তি থাকে। দৈহিক বল ও বিক্রমে ইহারা প্রায় ক্ষাত্র শক্তির পার্শ্ববর্ত্তী হইতে সমর্থ—আর তাহা হইয়াও ছিল। রাজা জমীদার, ধনী সম্প্রদায় সকলেরই অধীনে বহু দিন অবধি বাগ্দী তীরন্দাজ পাইক বা দৌবারিকও অপরিমিত পরিমাণে পোষিত হইত। প্রতিবেশী বাগ্দী পালোয়ানের নিকট কৈবর্ত্ত যুবকরা রীতিমত লাঠি-খেলা ও সর্ব্বপ্রকার ব্যায়াম-কৌশল শিক্ষা করিত। রাজার সৈন্যদলে ইহারা অনেকেই সৈনিকের কাজ করিত, বিশেষতঃ নৌবাহিনীতে। সে সময়ে রুদোক কৈবর্ত্তের ছেলে ভীম কৈবর্ত্তের সমকক্ষ পালোয়ান সে অঞ্চলে প্রায় অপর কেহই ছিল না।

সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব আছে। গত বর্ষায় বৃষ্টি কম হওয়ায় ছোট-খাট ডোবা, পুকুর এ বৎসর শীতারম্ভেই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। দিব্যোক কৈবর্ত্তের বাড়ীর পুকুরটী বাসনমাজা ভস্ম-পঙ্কে ও তদুপরি পানায় এবং কলমীলতায় প্রায় মজিয়া উঠিয়াছিল, পানীয় জলের সংস্থান সেখান হইতে এ বৎসর আর হয় না, এখন এমন কি, যাবতীয় গৃহকার্য্যের জন্যই জল পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে দিন অপরাহ্ণে রুদোকের পুত্রবধূ ভীমের স্ত্রী উজ্জলা গৃহকার্য্য ত্বরিত হস্তে সম্পাদন করিয়া সকল কার্য্যশেষে চিন্তিত শ্লথ গতিতে কলসীকক্ষে জল আনিতে চলিয়াছিল। প্রায়শঃই ইহারা দলবদ্ধ হইয়া একসঙ্গে প্রায় দশ পনের জন মিলিয়া জল আনিতে নিকটবর্ত্তী কো-

গৃহস্থের গৃহসংলগ্ন পুষ্করিণীতে গিয়া থাকে, অধিক সময় রুদ্দোকের বাড়ীর পুকুরটীতেই সকলে সমবেত হয়; কিন্তু এ বৎসর বর্ষার অভাবে সকল পুষ্করিণীই সলিলশূন্য। কাজেই একটু দূরে মহীপালদীঘি নামক প্রকাণ্ড রাজকীয় দীর্ঘিকা হইতেই ইহাদিগকেও জল আহরণ করিতে হয়। সে দিন উজ্জ্বলার গৃহকার্য্য সমাধায় বিলম্ব ঘটিয়াছিল, কারণ, তাহার শাশুড়ীর চরকা কাটায় তাহাকে অনেকগুলি পাঁজ পাকাইয়া দিতে হইয়াছে, জ্যেষ্ঠ-শ্বশুরের পাকাচুল তুলিতে হইয়াছে, সাম্‌নে নবান্নপর্ব্ব আসিতেছে তাহার জন্য ছোট জায়ের সঙ্গে মিলিয়া নূতন আমন ধান কুটিতে হইয়াছে, ইহার মধ্যে নিত্য সঙ্গিনীগণ তাহাকে গা ধুইতে ডাকিতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, কাযেই আজ তাহার মনটা বেজার-বেজার ঠেকিতেছিল। পথটুকুও তো আর কম নয়, একাকিনী হাঁটিতেই মন যায় কি? বিরস মনে একটা তামার কলসী টানিয়া লইয়া সে বাহির হয় হয়, এমন সময় উত্তর-দাওয়ার এক ধার হইতে উজ্জ্বলার দিদিশাশুড়ী ডাক দিয়া বলিল, "ওলো নাতবৌ, জলকে যাচ্ছিস্ ত, আমার লেগে একটু আগুন ক'রে দিয়ে যা' না।"

উজ্জ্বলা এতক্ষণের খাটাখুটীর পরে বাহিরমুখো পা করিয়াই এই আদেশ পাইয়া মনে মনে একটু চটিয়া বলিল, "যাচ্ছি তা' কি আর জন্মের শোধ যাচ্ছি, এখুনি ত ফিরে এসে গোয়াল-ঘরে সাঁজাল দিতেই হবে, সেই সঙ্গে তোকেও আগুন দেবো'খন।"

শীত-ভীতা বৃদ্ধা এই উত্তরে মুখ খিঁচাইয়া উঠিল—"আ মর্ মর্ ছুঁড়ী! রূপ যৈবনের ভারে গরূরে যেন মেঝেতে পা পড়ে না! ওলো, আমাদেরও এক দিন রূপও ছিল, যৈবনও ছিল, চিরকাল কারুর এক সমান যায় না লো! আগুন এক দিন তোর মুয়েও কি না পড়বেক ভাবচিস্?"

"তার এখনও ঢের দেরী আছে, তোদের যে মাথার উপরে ঘুনিয়ে

এয়েচে”—অস্পষ্ট স্বরে এই কথা বলিতে বলিতে ক্রুদ্ধা উজ্জ্বলা কতকগুলা লতাপাতা খড়-কুটায় আগুন ধরাইয়া একটা মাটীর গামলায় করিয়া সেটা ব্যাধিগ্রস্তা বৃদ্ধার পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া নামাইয়া দিল ও তার পর একটি ছোট দেবর যেমন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, অমনই তাহার গালে সজোরে একটা চড় মারিয়া ঠেলিয়া দিয়া ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, “যা, যা, আর আদর কাড়াতে হবে না, জল না আন্‌লে এখুনি ত আবার ‘হাক্কা’ প’ড়ে যাবে। আগুন খেয়ে ত আর কারও ভর রাত কাটবে না।”

এই বলিয়া রোরুদ্যমান শিশুর দিকে দৃক্‌পাত না করিয়াই প্রকাণ্ড তামার কলসীটা টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া যায়, আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া প্রহৃত শিশুর গায়ে মুখে হাত বুলাইয়া, চুমা খাইয়া, তাহার কানে কানে মিষ্ট স্বরে কহিল, “চুপ কর বিশু, লক্ষ্মী দাদাটি আমার! ফিরে এসে রান্‌তে রান্‌তে আজ তোকে একটা রূপকথা শোনাব।”

বিশু তখন আদর পাইয়া আদরদাত্রীকে পাইয়া বসিল। তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সে জিদ করিয়া বলিল “আমায় তবে তোর সঙ্গে নিয়ে চল্।”

উজ্জ্বলা ধমক দিয়া বলিল, “মা—মা—মা! এ যে দেখি খেতে পেলে শুতে চায় রে! ভাল ত জ্বালা হলো রে, বাপু! এক পহর রাত হ’তে যায়, কখন্ অত পথখানি যাব, কখনই বা ফিরবো, যা—যা, ঘাড় থেকে নাম বল্‌চি। ও মা, বাদুড়ের মত গলা ধ’রে ঝোলে দেখ! শীগ্‌গির নাম্ বলচি! গেলে মেরে তোর হাড় ভেঙ্গে দেব’খুনি।”

বিশু তাহার ভ্রাতৃজায়ার আদরে শাসনে অভ্যস্ত হইয়াই এই চারি বৎসর বয়স কাটাইয়াছে, সে এই শাসনে ভীত না হইয়া তাহার আব্‌দার বাড়াইয়া দিল। তখন অনুপায় হইয়া সেই দুরন্ত ছেলেটাকে কোলে ও কলসীটা হাতে ঝুলাইয়া লইয়া উজ্জ্বলা দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, “চল্ তা

হ'লে, রাজার দীঘিতে তোকে আজ ভাসিয়ে দিয়ে একেবারেই নিচ্চিন্দি হয়ে ফিরে আসি গে।"

উহারা চলিয়া গেলে দিদিশাশুড়ী তাঁর মেয়েকে ডাকিয়া সব কথা কয়টি আরও তার সঙ্গে একটুখানি রসান দিয়া জানাইলেন, এবং নিজেও সেই সঙ্গে মন্তব্য করিলেন—"কি ডাকাত মেয়ে-মানুষই ভীমে ছোঁড়া বে' ক'রে আন্‌লেক মা! জ্যান্ত ছেলেটাকে বলে কি না 'আয় তোরে রাজদীঘিতে ভাসিয়ে দিয়ে আসি গে'!—একটু ডর-ভয়ও কি ওর পরাণটায় নেই লো?"

মেয়ে কহিল, "মা, তুই পাগল না কি? ওর যদি পরাণে ভয়-ডরই থাক্‌বে, তা হ'লে এই সাঁজ পহরে সেই কোন্ রাজার দীঘিতে জল আন্‌তে যায়?"

মা কহিলেন, "দে'না কেন ভীমের আর একটা বউ এনে? তোদের যেমন মায়ার শরীল! ভীমেকে ও যে পায়ের তলায় বেঁধে রেখেছেক, তাই না অত দজ্জালীপানা করতে ভরসা করে। ঘরে সতীন এলে কেমন দর্প চূর্ণ্যি হয়, দেখি তখন।"

শাশুড়ী কহিল, "আমার কি মা অসাধ? কতই যে ভজাচ্চি, তা না ভীমের মত আছে, না ওই অলপ্পেয়ে বুড়ো হুটোরই মত হচ্চে! ছুঁড়ী তুক্ করেছেক মদ্দামানুষ কটাকে, তা কি তুই চোখ মেলে দেখতে পাচ্ছিস্ নে যে, কেবল যখন তখন আমাকেই দুষিস্?"

"ও মা, তা আর পাই নে! কৈবর্ত্ত-পাড়ার ছাঁ-পো-ডিম সব্বাই-কারই যে উজ্জ্বলী বল্‌তে মুখ দিয়ে নাল পড়েক লো। এক রত্তি ছোঁড়াগুলোই দেখিস্ নে, মারচে, কাটচে, তবু সেই বৌ—আর বৌ, ও মা, কেন গো?"

মদী বিনিন্দিতা ভীম-জননী একটুখানি চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিলেন,—"ও, ওই ভদ্দর নোকদের মতন কটা চামড়াখানার গুণে লো, মা!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চৈত্য-বিহার-মন্দির সৌধ শোভাশালিনী বিপুলায়তন গৌড় রাজধানী মহানগরী পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনের প্রায় মধ্যভাগে মহীপালদীঘি অবস্থিত। দীর্ঘিকা অতি-বিস্তৃত, স্বচ্ছ ও সুস্বাদু সলিলরাশিতে পরিপূর্ণ। ইহার তীরদেশ ও সোপানশ্রেণী সুমসৃণ প্রস্তর-নির্ম্মিত; তদুপরি সুদৃশ্য কারুযুক্ত প্রস্তর-বিনির্ম্মিত সুদৃশ্য বিশ্রামাসন। ঐ দীর্ঘিকার চারি পার্শ্বে সুরচিত ও সুরক্ষিত রাজকীয় উদ্যানসমূহ।

হৈমন্তিক-সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বেই সেই জন-অধ্যুষিত জল আহরণার্থিনী মহিলাকুলসমাবৃত দীর্ঘিকাতীর জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। ভীম কৈবর্ত্তের তরুণী পত্নী উজ্জ্বলার যদিও দৈহিক শক্তির অভাব ছিল না, তথাপি অন্য-মনস্কতাপ্রযুক্ত সে আজ যে প্রকাণ্ড তাম্রঘট লইয়া আসিয়াছে, সেটি এমনই বৃহদায়তন যে, জলপূর্ণ কলস অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে একা সে কক্ষে তুলিতে পারিতেছিল না। ইহার উপর সঙ্গে একটা শিশু। এই দীর্ঘ পথ চলিতে চলিতে অন্ততঃ তাহার হাতখানাও মধ্যে মধ্যে ধরিতে হইবে! বিপন্না উজ্জ্বলা সাহায্যার্থীর বৃথা অন্বেষণে এ-দিক ও-দিক চাহিয়া দেখিয়া কলসীটা আর একবার টানাটানি করিল, তার পর অনুপায়ের কোপে অদৃশ্য শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করিয়া উঠিল, "গুষ্টির পিণ্ডি চট্‌কানো যে আর শেষ হয়ই না, বেলাবেলি এলে ত আর এমন বিপদ ঘট্‌ত না। দুবার করেই যে নিয়ে যেতে পারি। এখন উপায় করি কি? থাক্ গে যাগ, সব তেষ্টায় টাঁস ধরে মরে মরুক গে, নিয়ে যাব না ত জল।"

অনতিদূরের কামিনী ও কুরুবকের ঝাড় সহসা নড়িয়া উঠিল এবং

দেখিতে দেখিতে সেখান হইতে এক সুপরিচ্ছদধারী ভদ্রলোক-বাহির হইয়া জলের ধারে উজ্জলার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহাকে দেখিয়া সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর কোন উচ্চপদস্থ লোক বলিয়াই বোধ হইল। উজ্জলা এই আকস্মিক পুরুষ সান্নিধ্যে ঈষৎ বিপন্না বোধ করিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার সে ভাব দূরে চলিয়া গেল, কারণ, সে সবিস্ময়ে শুনিল যে, সেই সহসাগত ভদ্র ব্যক্তি অতি কোমল সহানুভূতিপূর্ণ মধুর স্বরে বলিতেছেন, "এসো, আমি তোমার কলসী উঠিয়ে দিচ্চি।"

আহা! কে গো এই দয়াময়! কৃতজ্ঞতার হর্ষে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া উজ্জলা সাহ্লাদে কলসী ছাড়িয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। বিশু ভীত ভাবে তাহার গা ঘেঁষিয়া আসিল।

আগন্তুকের সবল হস্তে পূর্ণ কুম্ভ অবলীলাক্রমেই উঠিয়া পড়িল। তিনি দুই হস্তে ধরিয়া তাহা কৈবর্ত্ত-যুবতীর ক্ষীণ কটিদেশে স্থাপন করিতে করিতে পুনশ্চ তেমনই মধুর স্বরে, পরন্তু করুণা তরল-মুগ্ধ কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,— "সুন্দরি! যে চারু নিতম্বে সুবর্ণ-মেখলা পরাতে পেলে এ জীবন ধন্য বোধ কর্‌তে পার্‌তাম, সেখানে এই গুরুভার পূর্ণকুম্ভ প্রদান করা যে নিতান্তই নিষ্ঠুরের কায! আজ্ঞা কর, দাসগণ এটাকে বহন ক'রে নিয়ে যাক।"

সুরূপ, সুপরিচ্ছদধারী, সম্ভ্রান্ত পুরুষের মুখের এই স্তুতির বাণী, আকস্মিক অপরিচিত বীণা-ধ্বনির ন্যায় দরিদ্র বধূর কর্ণে ষড়জ-গান্ধারে বাজিয়া উঠিল।

উজ্জলা সুন্দরী, চতুরা, হাস্যময়ী, কর্ম্মনিপুণা এবং হৃদয়বতী। দরিদ্র অশিক্ষিত গৃহে পালিতা হইলেও সে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা ছিল, তাহাতে ভদ্র-সংস্পর্শ থাকায় অন্তরের পূর্ণ আকর্ষণ তাহার ভদ্র-সমাজেরই সহিত। তাহার উপর জল আনার উপলক্ষে তার অনন্যসাধারণ অতুলনীয় রূপের সহায়তায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতীয় শিক্ষিত বধূ-কন্যাগণের সহিত তাহার

অল্প স্বল্প বন্ধুত্বও জন্মিয়াছিল। নিষ্ঠুর-প্রকৃতি শাশুড়ী প্রভৃতি পরিজনবর্গের নিকট কু-ব্যবহার পাইলেও, সর্ব্বদা শ্রমসাধ্য গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিলেও, তার অন্তরের নিভৃত কন্দরে একটা প্রচ্ছন্ন কাব্য-কল্পনা আত্মগোপন করিয়া বাস করিত। স্বামী ভীম চরিত্রবান, বিদ্বান এবং তার রূপে গুণে সে একান্তই মুগ্ধ। মাতা ও দিদিমাতার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সে আর দুই চারিটা বিবাহ করে নাই; কিন্তু উজ্জ্বলার প্রতি আকর্ষণ তার যতই প্রবল হোক, ঘরের মধ্যে যে দুর্দ্ধর্ষ মাতা ও দিদিমাতা খড়্গ-হস্তে পাহারা দিয়া ফিরিতেছে, তাহাদিগকে এড়াইয়া সদাসর্ব্বদা পত্নী-সম্ভাষণ তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কদাচিৎ এক এক রাত্রিতে সমস্ত সংসার নিশুতি হইলে পতি-পত্নীর নিভৃত সাক্ষাৎ ঘটিতে পায়। সে ঘটনাও আবার সর্ব্বদা ঘটে না। পাছে ছেলে সুন্দরী বধূর বশ হইয়া যায়, এই ভয়ে ভীম-জননী তার ছেলে বউকে সাধ্য পক্ষে একত্র হইতে দেয় না। ঘর কম, এই অছিলায় পালা করিয়া মেজ সেজ ছোট বধূর পর এক এক দিন উজ্জ্বলা স্বামীর সহিত রাত্রিবাস করিতে পায়।

উজ্জ্বলা যে সুন্দরী, সে সংবাদে সে নিজেও অজ্ঞ নয়, কিন্তু আজিকার পূর্ব্বে কোন পুরুষের মুখ হইতে তার অনন্যসাধারণ রূপরাশির এত বড় স্তবগাথা তার কর্ণগোচর হয় নাই; তাই ইহা শ্রবণে একটি-বারের জন্য তাহার সর্ব্বশরীর পুলক-লজ্জার তড়িৎস্পন্দনে শিহরিয়া উঠিল, প্রবল দ্বিধায় চোখের পাতা স্বতঃই নামিয়া আসিল, ও নিটোল গণ্ড সরমরাগে রক্ত-কমলের শোভা ধারণ করিল। সে যেন লজ্জায় ও বিস্ময়ে সহসা এক রকম অবশ হইয়া পড়িল।

সাহস প্রাপ্ত আগন্তুক তখন তার অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়া তেমনই আবেগ-কম্পিত কোমল কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—"আজ্ঞা কর,

ঐ বল্লরী-কোমল দেহলতা কি এই পর্ব্বত-ধারণের জন্ম সৃষ্ট হয়েছে? কোন্ পাষণ্ড বর্ব্বর এত বড় নিষ্ঠুরের কাজ করতে সমর্থ, তার নামটা আমার শোনবার জন্ম যে বড্ডই কৌতূহল হচ্চে! সুন্দরি! তুমি কোন্ ভাগ্যবানের গৃহ অলঙ্কৃত করে—কা'কে চরিতার্থ করেছো, এ হতভাগ্যকে জানাবে কি?"

উজ্জ্বলা নির্ব্বোধ নহে। ত্বরিত চক্ষে বারেকমাত্র সে তার সাহায্যকারী সম্ভ্রান্তবেশী পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সঙ্গে সঙ্গেই আকস্মিক সমাগত একটা মহাতঙ্কে তাহার আপাদ-মস্তক যেন কম্পিত হইয়া উঠিল, তখনই সচকিতে দূরে সরিয়া গিয়া সে সভয় উচ্চ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "আমি একজন সামান্য গরীবের ঘরের মেয়ে গো, আপনাদিগের কাছে পরিচয় দেবার যুগ্যিই নই। আপনি আমায় যে দয়া করেচেন, তার জন্যে আপনাকে এই গড় করচি।—ওরে,—আয় রে বিশু, চ'লে আয়।"

বলিতে বলিতে গুরুভার কলসী বহিয়া যতটা সম্ভব দ্রুতপদে উজ্জ্বলা সোপান অধিরোহণ করিতে আরম্ভ করিল এবং কিছু দূর উঠিয়া কটাক্ষে পশ্চাতে চাহিয়া যখন আগন্তুককে যথাস্থানেই স্থির থাকিতে দেখিল, তখন যেন তাহার দেহে প্রাণ ফিরিয়া আসিল। তখন সে একটুখানি দাঁড়াইয়া কলসী হেলাইয়া প্রায় অর্দ্ধেকখানি জল মাটিতে ঢালিয়া ফেলিল এবং রোরুদ্যমান বিশুর হাত ধরিয়া পুনশ্চ ত্বরিতপদে নিজ গন্তব্য পথেই অগ্রসর হইতে লাগিল। শিশু বিশু তাহার সহিত সমান গতিতে চলিতে না পারায় বারংবার পায়ে হোঁচোট খাইয়া পতনোন্মুখ হইতেছিল এবং এই সদ্য ভয় পাওয়ার সকলটুকু ক্রোধ এবং দুশ্চিন্তা ঐ প্রিয় শিশুটির উপর প্রয়োগ করিতে করিতে উজ্জ্বলা তাহাকে টিপিয়া টানিয়া গালি দিয়া অস্থির করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিল :—"আয় তোর গুষ্টীর পিণ্ডি দিই গে আয়!"

"বাপরে! লোকের মরবারও একটু সময় আছে, আমার তাও

নেই! সকল সময়ে ওঁদের ছরাদের পিণ্ডি চটকাতেই হবে। কা'ল থেকে দেখবো, কে জলকে আসে। তেষ্টায় 'টা-টা' ক'রে গলা শুকিয়ে থাকবে সাত গুষ্টীতে মরে!"—ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথাই সে বলিতে বলিতে বাড়ী আসিয়া ঢুকিল এবং ফিরিবামাত্রই শাশুড়ী ও দিদি-শাশুড়ী যেমন বিশুর পক্ষ লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিলেন, অমনই সে-ও তাঁহাদের দুই জনের সহিত রীতিমত কোন্দল সুরু করিয়া দিয়া শেষে শাশুড়ীর হাতের কিল খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গোয়াল-ঘরে সাঁজাল এবং রান্না-ঘরে আগুন জ্বালাইতে গেল।

সন্ধ্যার আকাশে চাঁদ দেখা দিয়াছে, লহরে লহরে [illegible]ত্রমালা গগন-পথের সর্ব্বত্র ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কুন্দ, কুরুবক, কে[illegible] কদম্ব ও সেফালিকা প্রভৃতি উদ্যান-কুসুমরা উদ্যানের সর্ব্বত্র প্রস্ফুট হ[illegible] উঠিয়াছে। আগন্তুক সর্ব্বক্ষণই নিশ্চল হইয়া উজ্জ্বলার প্রস্থানপথের শেষ [illegible]টি পর্য্যন্ত নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন, তার পর যখন সেই অর্দ্ধস্ফুট জ্যো[illegible]লোকের ক্ষীণ ছায়ায় সেই ভীত, ত্রস্ত, চলন্ত নারীমূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া [illegible]ল, তখন নিজের দৃষ্টিকে সে দিক্ হইতে ছিনাইয়া লইয়া আসিয়া মৃদু মৃদু আত্মগত এই কথা বলিলেন, "এমন রূপ অনেক দিন চোখে পড়েনি! এ যেন চন্দ্রার চেয়েও সুন্দরী! কিন্তু কে' এটী?"

সোপানের উপর কাহার পদধ্বনি শ্রুত হইল। প্রত্যাশিত নেত্রে চাহিতেই চক্ষে পড়িল, এক কর্ত্তিত-কুন্তলা, মসি-বিনিন্দিতা, বর্ষীয়সী রমণীর কুদর্শন মূর্ত্তি! তাঁহাকে দেখিয়া সেই রমণী লজ্জায় প্রায় আধ হাত ঘোমটা টানিয়া পাশের দিকে একটু সরিয়া দাঁড়াইল।—বড়ই লজ্জাশীলা!

কিন্তু ভদ্রলোকটি তার সেই নারীর ভূষণ-স্বরূপ লজ্জার আরাধনায় বিশেষ প্রীত হইলেন মনে হয় না এবং তাহার সম্মান রক্ষা করাও কর্ত্তব্য বিবেচনা না করিয়াই তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "ভদ্রে! জল

আহরণার্থ এসে থাকলে অনায়াসেই তা' নিতে পার, সঙ্কোচ করবার কোন প্রয়োজন নেই।"

এই আমন্ত্রণের পর লজ্জাবতী যেমন অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া এক পা এক পা করিতে করিতে জলের ধারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, অমনই কাছে আসিয়া তিনি সমবেদনাপূর্ণভাবে কহিয়া উঠিলেন,—"আহা, একটি পিত্তলের ঘটও কি আপনার নেই? এই নিন ধরুন, একটি স্বর্ণ-নিষ্ক আপনাকে দিচ্চি, এই দিয়ে আবশ্যকীয় তৈজস-পত্র ক্রয় ক'রে নেবেন"—এই বলিয়া একটি উজ্জ্বল স্বর্ণখণ্ড প্রদর্শন করিলেন।

বর্ষীয়সী চন্দ্রালোকে সেই অপরিচিতমূর্ত্তি স্বর্ণ-মুদ্রাটি দেখিয়া বিস্মিত ও লোভে চমৎকৃত হইল। মুখের লজ্জাবস্ত্র অপসৃত করিয়া ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ দন্ত-বিহীন মুখ আনন্দহাস্যে বিকসিত করিয়া তুলিয়া সাগ্রহে কর-প্রসারণ পূর্ব্বক সহাস্যে বলিয়া উঠিল, "রাজা হও বাবা! তোমার সোনার দোত-কলম হোক! আহা, গরীবের প্রতি তোমার এত দয়া! বেঁচে থাক, বেঁচে থাক।"

দাতা পুরুষ ঈষৎ হাস্য করিয়া আশীর্ব্বচন গ্রহণ করিলেন, পরে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁগা বাছা,—আসবার পথে কোন স্ত্রীলোককে দেখে এসেছ কি?"

"মেয়েমানুষ! না বাবা, কাউকে'ত দেখলুম না, জন-মনিষ্যির গন্ধটি পর্য্যন্ত কোথাও নেই, বাবা! আমার যেমন পোড়া বরাত—তাই এই রাত দুপুরে জল আন্‌তে এয়েছি বাবা, এমন ত আর কারুর হয় না বাবা! সবার ঘরেই বউ-ঝি আছে, দাসী আছে। আমার যেমন আগুন-লাগা বরাতে সব ম'রে-ত'রে উজোড় হয়ে গেল, তেমন ত আর রাজ্যের ভাল-থেকো ভাল-থাকীদের হয় না বাবা! আমার যেমন—"

আগন্তুক পুরুষ নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া অধৈর্য্যের সহিত বাধা দিয়া

পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, "তাম্র-কলস কক্ষে শিশু সঙ্গে কোন নারীকে কি উদ্যানপথ দিয়ে ফিরে যেতে দেখনি ?"

"ও মা, তাই বলুন! সে দেখবো না কেন ? দেওর সঙ্গে নিয়ে ও যে ভীমের বউটো বাড়ী ফিরছে দেখে এলুম।"

আগ্রহ-স্মিতমুখে প্রশ্নকর্ত্তা পুরুষ পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, "ভীমের বউ! কে' সে ভীম ?"

নারী উত্তর করিল ; "ঐ যে বাবা! দিব্য কৈবর্ত্তরই ভাইপো ভীম কৈবর্ত্ত! দিব্যি জোয়ান ছেলে বাবা! সেবার আমার নাতিটেকে জল থেকে তুলেছিল, আহা মায়ের কোলজোড়া ক'রে বেঁচে থাক! চমৎকার ছেলে!"

আগন্তুক পুরুষ অন্যমনা হইয়া আত্মগতই কহিলেন,—

"ভীমের স্ত্রী! ভীম কৈবর্ত্তের স্ত্রী! না, না, সে যে এক আশ্চর্য্য সুন্দরী!"

এতক্ষণের পর সহসা এই অপরিচিত দাতার অপর্য্যাপ্ত করুণার গোপন রহস্য পূর্ব্বতন সৌরোব্ধরণিকপত্নী, অধুনা বিধবা অবীরা রল্লার নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে তখন মুখ টিপিয়া একটুখানি অর্থপূর্ণ হাস্যের সহিত উত্তর করিল, "হ'লে কি হয় বাবা, সে ভীম কৈবর্ত্তের বউ উজ্লীই।"

"তুমি নিশ্চিত জান সে ভীমের স্ত্রী ?"

"হ্যাঁ বাবা! তোমার দিব্যি বাবা! আমি আর ওকে চিনি নে ? বাঘতটী গাঁয়ে ওর পালন-বাপের ঘরের পাশেই এক সময়ে আমরা থাকতাম যে। ওর বাপ মিন্‌ষে সে বছর বলিদ্বীপে গিয়ে আর ফিরলো না, কেউ বল্লে ম'রে গেছে, কেউ বল্লে, সেখানে বেঁচে আছে,—দিব্য ওকে বউ ক'রে আনলে না ?"

সেই পুরুষ তখন অন্যমনস্কভাবে মৃদুনিক্ষিপ্তশ্বাসে যেন কতকটা আত্মগতই কহিয়া উঠিলেন, "অদ্ভুত! রাজান্তঃপুরেও যে এত রূপ নেই!"

প্রগল্‌ভা প্রৌঢ়া এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "ঠিক কথাই বলেছেন বাবা, রাজবাড়ীতেও অমন রূপ নেই! তা হবে নাই বা কেন? ও ও ত আর ছোট ঘরের মেয়ে হয়ে জন্মায় নিন, ভাল ঘরেরই মেয়ে ছিল নি। বাজ্য করতে গিয়ে ওর বাপতো আর ফিরলোনা, মা'টাও মনের দুঃখে মরে গেল; তখন দস্যুতেই না কি ওকে বাঘতটী গাঁয়ের ঐ ভভট কৈবর্ত্তের কাছে সাতটি দ্রম্ম নিয়ে বিক্রী ক'রে যায়। নৈলে ওতো আর তার মেয়ে নয়। ভীমের কপাল ভাল, তাই সে ওকে বিয়ে ক'রে ঘরে এনেচে। তা শুধু কি রূপই? ওর শরীরে পাঁচটা হাতির মতন বলও আছে। সোজা কি গতর ছুঁড়ির! ভীম পালোয়ানের বৌ হ'বার যুগ্যি বটে! তা হ'লে এখন আমি আসিগে বাবা! ঘরে দুটো কচি ছেলে-মেয়ে নিয়ে বৌমাটি একা রয়েচেন ছেলেটা রাজার হুকুম পেয়ে তাঁর যশোধর্ম্মপুরের সৈন্যদলে কায করতে গেচে, ঘরে ত আর আমার দুটি নেই।"

ক্ষুদ্র মৃৎ-কলস পূর্ণ করিয়া বর্ষীয়সী সোপানারোহণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল, কতিপয় উল্কাধারী পাদ-মূলিক এবং রাজপাদোপজীবী যেন ব্যস্তভাবে ইতস্ততঃ কাহার অন্বেষণ করিতে করিতে এই দিকেই আগমন করিতেছে। তাহারা নিকটবর্ত্তী হইয়া রল্লাকে দেখিতে পাইয়া সমস্বরে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "এই মাগী! এ দিকে কি মহারাজাধিরাজকে আসতে দেখেছিস্?"

রাজ-ভৃত্যবর্গের এরূপ অবমাননাজনক সম্বোধনে মনে মনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেও প্রকাশ্যে ভয় সম্ভ্রমে জড়ীভূতপ্রায় হইয়া গিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিতে আরম্ভ করিয়া দিল, "আজ্ঞে না, বাবামশাইরে সব! এ দিকে কৈ কোথায়ও—"

কিন্তু তার সবটুকু কথা বলা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহার প

কাহার গুরু পদক্ষেপ শ্রুত হইল এবং তাহার সদ্যো-পরিচিত সেই সুবর্ণদাতা পুরুষের কণ্ঠ তৎক্ষণাৎ রাজভৃত্যবর্গের জিজ্ঞাসার উত্তরস্বরূপেই প্রত্যুত্তর করিল,—"শুভদাস! এই যে আমি।"

সে রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া ভূতপূর্ব্ব চৌরোদ্ধরণিক পত্নী তাহার পুত্রবধূ ইচ্ছার নিকট মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিল যে, রুদ্দোক কৈবর্ত্তের পুত্রবধূ উজ্জ্বলা এই বার কোন্ দিন পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সিংহাসনে যদি না উঠিয়া বসে, তবে সে তাহার নাসিকা এবং কর্ণ স্বহস্তে ছেদন করিয়া আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিবে।

বলা বাহুল্য, এ সংবাদ পরদিন প্রাতঃসূর্য্যের অভ্যুদয় সহ অর্দ্ধ-পৌণ্ড্র বর্দ্ধনেই সুপ্রচারিত হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভোর না হইতেই দিব্যোকের গৃহস্থালীতে বিষম রকম একটা সাড়া পড়িয়া যায়। কারণ, গৃহবাসী পুরুষগুলি প্রায় সকলেই ভোরের পাখী ডাকিতে না ডাকিতে, ঊষার আলো অস্ফুট থাকিতে থাকিতে, আকাশের গ্রহ-তারা নিবিতে না নিবিতেই ছোট বড় বালক বৃদ্ধ মিলিয়া ক্ষেত খামারে দলে দলে কাজ করিতে বাহির হইবে। আবার মধ্যাহ্নের অসহ্য সূর্য্য মাথার উপর বসিয়া যখন তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার অগ্নিময় বজ্রাঘাত করিতে থাকেন, মস্তকের কেশ হইতে পাদগ্রন্থি অবধি যখন আনখ কশাহত হইয়া রক্তস্রোতের মতই ঘর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, যে উদরের সমস্ত নাড়ীগুলায় প্রচণ্ড ক্ষুধায় টান ধরিতে থাকে, আপনিই তাহাদের বাড়ী ফিরিবার কথা মনে পড়িয়া যায়। তখন

আবার শ্রান্ত-শরীরে ক্লান্ত-পদে দীর্ঘ পথ ফিরিয়া আসা! ইহার ভিতর অশ্রান্ত পরিশ্রম পরায়ণ, এই পরিবারের বৃদ্ধ, যুবা এবং বালকের দলকে নদীতীরের ফসলক্ষেত্রে দেখা যায়। ছোট ছোট জেলে ডিঙ্গীগুলি মোচার খোলার মত নদীর স্রোতের বিপরীতে জাল টানিয়া লইয়া বেড়ায়। ধৃত মৎস্য আহরণে সমুৎসুক আরোহীর দল নদীবক্ষ মুখরিত ও সচকিত করিয়া তুলে। মধ্যে মধ্যে কোন প্রকাণ্ডাকার রোহিত-কুল-প্রদীপের সন্দর্শন মিলিয়া গেলে বিজয়ানন্দের উচ্চরোলে অপরাপর নৌকারোহী এবং স্নানার্থীর দলও চকিত হইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখে এবং সমুৎসুক হইয়া তাহাদের সেই আনন্দ-গৌরব উপভোগও করিয়া লয়, কৈবর্ত্ত বালক ও যুবকেরা কাজ করিতে করিতে নদীতে পড়িয়া সাঁতার কাটে, গামছা দিয়া মাছ ধরে এবং গলা ছাড়িয়া গান গাহিতে গাহিতে চাষের জমিতে হল চালায়।

কর্ম্মীর দল বাড়ী ফিরিলে তাহাদের পরস্পর সংলগ্ন গৃহগুলি একসঙ্গে ব্যস্ততা ও কলরবের কলরোলে মুখরিত হইয়া উঠে। একটুখানি বিশ্রামান্তে ভিজা ছোলা ও গুড় দিয়া জলযোগ এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আস্‌গোট কলাপাতে স্তূপীকৃতভাবে ঢালিয়া দেওয়া কখন আউস, কখন আমন ধান-কোটা আরক্তাভ অন্নরাশির ধ্বংস-সাধনে বসিয়া পড়া! এই সকল কার্য্য সমাধার পর কিছুক্ষণের জন্য গৃহস্থালী একটুখানি নিস্তব্ধ হইত, তবে দিব্যোকের বাড়ীতে না কি নিস্তব্ধতা জিনিষটার সহিত গৃহবাসীদিগের বিরোধ ছিল, তাই সে গৃহ দিবোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইয়া রাত্রি দেড় প্রহরাবধি সকল সময়েই প্রায় কোলাহলে ভরিয়া থাকিত। প্রথমতঃ রুদ্রোক-পত্নী ও দিব্যোক-পত্নী এই ভ্রাতৃদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি আক্রমণের জন্য স্থানকাল কোন কিছুরই বাধা বাধিত করিতে পারিত না, তার উপর রুদ্রোকের শাশুড়ীঠাকুরাণীটির না কি

ঐ বিদ্যায় পারদর্শিত্ব ঐ অঞ্চলের মধ্যে একান্তই সুব্যক্ত, এবং উক্ত ঠাকুরাণীটির নিজ গৃহে অগ্নি সংযোগ হওয়ায় এবং অপর সেবাধিকারী বর্ত্তমান না থাকায় জামাতৃ-গৃহবাস গৌরবে এ গৃহের কলহ-কাণ্ডে সুবর্ণযুগের আবির্ভাব ঘটিয়াছে বলা যায়।

বাতব্যাধিতে অষ্টাবক্রাবস্থায় দড়ি-ছাওয়া খাটুলীতে বসিয়া বসিয়া তিনি শ্যেনদৃষ্টিতে পৌরজনের ত্রুটি খুঁজিতে থাকেন, আর সুযোগ পাইবামাত্র সেই অনুসন্ধানফলগুলিতে (প্রায় সমান সমান, কখন বা কিছু মাত্রাধিক্যও ঘটিয়া যায়) বর্ণসমাবেশ পূর্ব্বক সেগুলি তাঁহার শান্ত প্রকৃতি-শালিনী কন্যারত্নের কর্ণকুহরে ঢালিয়া দিয়া তাহাকে পরিতৃপ্ত করেন। ফলে বাড়ীর মধ্যে সদাসর্ব্বদাই প্রায় রাম-রাবণের যুদ্ধ লাগিয়া থাকে।

সে দিন গৃহস্বামীদিগের গৃহে ফিরিতে বিলম্ব ঘটিয়া গিয়াছিল। প্রায় আড়াই প্রহরের প্রখর সূর্য্যতাপ ও নিদারুণ ক্ষুৎপিপাসার দুঃসহ জ্বালায়! গৃহাভিমুখীন কৈবর্ত্তরা সে দিন গৃহ-পথের দৈর্ঘ্যে যেন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। সকলেই ঘন ঘন অদূরস্থ ঘনায়মান নারিকেল-কুঞ্জের মাথার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কৈবর্ত্ত-পল্লীর দূরত্ব পরিমাপ করিতে করিতে চলিতেছিল, উহার পাশেই তাহাদের গম্যস্থান।—রাজপথে তাহাদেরই মত কর্ম্মব্যস্ত অল্পস্বল্প লোকজন গমনাগমন করিতেছিল, দুই ধারে বিপণি-শ্রেণীতে কেনা-বেচা ক্ষণকালের জন্য বন্ধ হইয়া রহিয়াছে, প্রাসাদ-ভবনে গৃহবাসিগণ দ্বৈপ্রহরিক বিশ্রাম-সুখভোগে নিরত। পথের প্রান্তে কুকুরগুলাও কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া পড়িয়া ধুঁকিতেছে।

কৈবর্ত্তেরদল পল্লীর মধ্যে পা দিয়াই একটা ঘোরতর কোন্দলের সাড়া পাইল। শব্দটা যে রুদ্রোক জেলের কুটীরের দিক্ হইতেই আসিতেছিল এবং ঐ কাংস্যকণ্ঠও যে ভীম-জননীর, তাহা অনুমান করিতে কাহারও অণুমাত্র বিলম্ব ঘটে নাই। আজ এই ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত ও বিশেষভাবে

পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াই এমন অসময়ে কোন্দলের কচকচি শুনিয়া সকলকারই মন একটু দমিয়া গিয়াছিল, বিশেষতঃ বয়স্ক দুই জন ইহাতে বিশেষ বিপন্নই বোধ করিল। কুন্তোক নিজের কপালে একটা ঘা মারিয়া কহিয়া উঠিল, "ওকেও যমে নেবে না, আমারও মরণ লেখেনি দেবতায়! এই তেতে-পুড়ে তেষ্টায় টাটা কয়ছে প্রাণ, এক্ষুনি আর ও বাজখেঁয়ে চীৎকার সয় কি!"

দিব্যোক গম্ভীর হইয়া জবাব করিল, "যেতে দাও! আমাদের মা-বেটীটা আছে,—ভাতটা জলটা সেই তো, দেয়।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাড়ী পৌঁছিয়া সে দিন দেখা গেল, ব্যাপার কিছু গুরুতর! গত রাত্রে দিদিশাশুড়ীর 'লাগানীর' দায়ে শাশুড়ীর হাতের ঠোনা খাইয়া উজ্জলা আজ সকাল হইতেই বাঁকিয়া আছে, সে আজ ভোরে উঠিয়াই তাঁর বাতে বাঁকা গায়ে পায়ে তেল ডলিতে যায় নাই; বিশু ও-বাড়ীর ধনার ছোট ছেলেকে ইট ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল বলিয়া তাহাকে দিয়া উহাদের কাছে সে মাপিয়া সাত হাত নাক-খত দেওয়াইয়াছে, ধান কুটিয়া প্রত্যহ প্রতিদিনের খরচের জন্ম চাউল করার বেশীর ভাগ খাটুনী তার বিবাহের পর হইতে সেই খাটে; আজ কিছুতেই ঢেঁকি-ঘরে সে পা মাড়াইল না। শাশুড়ী রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অমন বউকে ঢেঁকিতে ফেলে কুটে ফেলাই উচিত! উজ্জলারও ত মুখখানি বড় কম নয়, সে-ও তৎক্ষণাৎ শাশুড়ীর মুখের উপর ফেরতা জবাব দেয়—"ঢেঁকিতে ফেলে আমায় কুটলে গুষ্টীশুদ্ধর কুঁড়ো পাথরটা ভরাবে কে গো? ধানের গাদা ভানাটি

ত আর রোজ সোজা কথাটি নয়! তোমার আদুরে মেজুনী, সেজুনী, ছুটকী ওঁদের দিয়ে কি সে কাজটি এক বেলার তরে হবে?"

শাশুড়ী বলেন, "হয় কি না হয়, তুই গতরখাকি ব'সে থেকে একটা বেলা চোখের মাথা খেয়ে দেখ ত দেখি, কেমন বা না হয়! মুখের উপর আবার চোপা! কেন, তুই যখন এ বাড়ীতে আসিস্‌নি, তখন কি আমার স্বোয়ামী-পুত্তুররা সব উপোসীই থাক্‌তো না কি লা? শতেকখোয়ারীর ঝি! তোর দিব্যি রইলো, যদি তুই আজ কিচ্ছুটিতে আমার হাত ঠেকাবি!"

তাহার ফলে এই ঘটিয়াছে যে, বাড়ীশুদ্ধ মিলিয়া এতক্ষণে ধান ভানিয়া সেই ধান-ভানা চাউলের ভাত সবেমাত্র উনানের উপর চড়ানো হইয়াছে; তার উপর আথায় দিবার কাঠ ও আজ ফাড়া নাই এবং সেই মোটা কাঠের গুঁড়ি ফাড়িবার মত শক্তিও ইহাদের অপেক্ষা ঐ উজ্জ্বলারই বেশী। বিপন্ন হইয়া এখন উহাকে দু'খানা কাঠ চিরিয়া দিতে বলায় সে কথা যেন তার কানেই ঢুকে নাই—এমনই করিয়াই সে নীরব রহিল।

তার পর সকলকার কাঠ লইয়া ধস্তাধস্তি দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে সেখান হইতে উজ্জ্বলা গমনোদ্যতা হইলে তার সেজ ও ছোট 'জা' মিনতি করিয়া কহিল, "বড়দিদি ভাই, দুখান চেলিয়ে দিয়ে যা' না ভাই, হেঁই গো, তোর পায়ে ধরি।"

উজ্জ্বলা কোন উত্তর করিল না। তখন মেজবৌ নথ নাড়া দিয়া একটু তিক্তকণ্ঠে কহিল, "দিলে কি তোমার মান ক্ষয়ে যাবে গা? স্বোয়ামী-শ্বশুর এসে খেতে পাবে না—সেটা কি খুব আহ্লাদের কথা হবে নাকি?"

উজ্জ্বলা এবার গর্ব্বিত তাচ্ছীল্যের সহিত উত্তর করিল, "তা না পায় নাই পাবে,—আমার তাতে কি ব'য়ে গেল?"

এই বলিয়া সে দৃঢ় গম্ভীর পদক্ষেপে রান্না মহলের পিছন দিকে পগারের

ধারে গিয়া ঝুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল ও নিতান্ত শান্তভাবে বসিয়া কান খাড়া করিয়া গৃহস্থবর্গের দুরবস্থার সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। মুখে গাম্ভীর্য্য থাকিলে কি হয়, মনের মধ্যে তাহার যথেষ্ট তৃপ্তির আনন্দ উঁকি দিয়া উঠিতেছিল। সে না হইলে নাকি সংসার চলিতে পারে? আচ্ছা চলুক না!

এ দিকে কোন রকমে আধসিদ্ধ ভাতের তোলো দুই জনে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া ডাল চড়াইতে না চড়াইতেই পুরুষের দল হুড়মুড় করিয়া আসিয়া বাড়ী পৌঁছিল এবং তাহাদের আসার সাড়া পাইবামাত্রই রণরঙ্গিণী-মূর্ত্তি ধরিয়া ভীম-জননী সনকা গলা ফাড়িয়া বড় বধূর উদ্দেশ্যে গালির ফোয়ারা উৎসারিত করিয়া দিল।

"দূর ক'রে দে, দূর ক'রে দে; মুড়ো খ্যাংরা মারতে মারতে চুলের ঝুঁটি ধ'রে টানতে টানতে শতেক-খোয়ারীকে দূর ক'রে দে—জ্যান্ত মুখে নুড়ো জেলে দিয়ে আয়"—ইত্যাদি ইত্যাদি—

রুদ্রোক অঙ্গনে পা দিয়াই বিরক্তি-বিপন্ন কণ্ঠে উজ্জ্বলার উদ্দেশ্যে ডাকিয়া উঠিল,—"পাগলীবেটী! এক ঘটী জল নে' আয় ত, বাবা! তেষ্টায় গলা বুক কাঠ হয়ে গেছে! সর্ব্বশরীরে টাঁস ধ'রে যাচ্চে।"

সনকা বধূর প্রতি স্বামীর এই 'আধিখ্যেতায়' হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়াই থাকে, আজ আবার এ সময়ে তাহারই প্রতি এই অযোগ্য আদর দেখিয়া তাহার পিত্ত অবধি জ্বলিয়া উঠিল; কোপে কপিলবর্ণ ধারণ করিয়া কর্কশ চীৎকারে সে চেঁচাইয়া উঠিল—"দেবে, তোমার আদুরে বৌ তোমার ছরাদ্দর পিণ্ডি চটুকে দেবে! বড় যে বলা হয়, আমি মাগী যত না মন্দ? বেটার বৌ তোমার বড়ই না কি গুণবতী! এখন নিজের চোখ দুটোর মাথাটা যদি না একেবারে কচমচিয়ে খেয়ে ফেলে থাক, তা হ'লে সে দুটোকে

মেলে ধ'রে একবারটি নিজের চোখেই দেখে যাও দেখিন, তোমার বিশ্বেধরী পুতের বউ-ঠাক্‌রুণ এর ভেতর কোন্‌খানটায় আছেন! এত বড় দস্ত মেয়েমান্‌ষের—সকাল থেকে আজ একখানি কুটি ভেঙ্গে দুখানি করাতে পারলুম না! উনি কি না রাজার রাণী, আসনপীড়ি হয়ে ব'সে আছেন, আর আমি এই বুড়োবয়সে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে খেটে মরতে লেগেচি। কেন, আমার কি একার সংসার? আর কি কেউ গব্‌গবিয়ে গিল্‌বে না যে, আমায় একাই সব ভার বইতে হবে?"

সহসা সেই সময়ে বিরক্তি-পরুষ একান্ত গাম্ভীর্য্যময় ভীমের মুখের উপর চোখের দৃষ্টি পড়িতেই ভীম-জননীর কণ্ঠ হইতে আবার বর্ষাকাশের মেঘ গুরু গুরু শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল;—"বলি ওরে ও হতভাগীর পুত! বলি, কটা চামড়াখানা কি এতই মিষ্টি যে, তার লেগে ওই দস্যি দামাল মেয়ে-মান্‌ষের পায়ের তলায় ছুঁচো হয়ে প'ড়ে থাকতে হবে? এই তোকে ব'লে রাখলুম, ভীমে! যদি তিন দিনের ভেতর ওটাকে লাথি মেরে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়ে তুই আমায় আর একটা বউ এনে না দিবি ত তোর উপর তোর বাপের দিব্যি রইলো।"

ভীমের জলদ-গম্ভীর মুখে এই কঠোর মাতৃ-আদেশে মুহূর্ত্তমধ্যে একবারের জন্য একটা ব্যথার বিদ্যুৎ চকিত হইয়া উঠিয়াছিল; পরক্ষণেই সরোষ লজ্জায় সেটা ঢাকা পড়িয়া গেল। সে রোষ-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সবেগে বোধ করি মাকেই কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ বাধা প্রাপ্ত হইয়া সেই উদ্যত কঠিন কঠোর বাক্য প্রবাহ তাহার ক্রোধস্ফুরিত ওষ্ঠাধরের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রহিল। একান্ত বিস্ময়াশ্চর্য্যের সহিত সে শুনিতে পাইল, তার মায়ের কাছে চির সহিষ্ণু তার বুড়া বাপ আজ সম্পূর্ণরূপেই তার বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া যথাসাধ্য তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে—"খবরদার ভীম! আমার পাগলী মায়ের গায়ে হাত তুল্‌বি কি, আমি

তক্ষুনি তার হাতটা ধ'রে বাড়ীর বা'র হবো! বুঝে কায করিস্ ব্যাটা, বুড়ো বয়সে বাপকে তোর থানছাড়া করিস্ নে যেন।"

এই অলঙ্ঘ্য আদেশে ঝঞ্ঝা-তাড়িত নদীস্রোতের মত চঞ্চল-বিস্ময়ে ভীম স্তব্ধ হইয়া রহিল। কোন কথাই সে কহিল না।

"তা' হ'লে বউ নিয়ে আর বউ-সোহাগী বাপ জ্যেঠাদের নিয়েই তুই রৈলি ভীমে, পরব কৈবর্ত্তর-ঝি কারুর পায়ে তেল দিয়ে তার আট-চালাতে বাস করে না। এই রৈলো তোদের ঘর-কন্না, বুজে সমজে নিয়ে নিস্ সব, আমার বুড়ো মায়ের হাতটা ধ'রে গাছতলায় ব'সে ভিখ্ মেগে খাব, তবু তোর ধিঙ্গি-নাচন বউএর পা ধোয়াতে পারবো না?"—ক্রোধে কাঁপিয়া ফুলিয়া রণরঙ্গিণীমূর্ত্তি সনকা স্বামি-পুত্রের উপর একটা অগ্নি-দৃষ্টি হানিয়া সমবেত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তিনী, যষ্টি-হস্তে কোনমতে দণ্ডায়মানা মাতৃমূর্ত্তির উদ্দেশে হাঁকিয়া উঠিল—"আয় লো মা, আয়, আমরা মায়ে বেটীতে এ পোড়া বাড়ীর বা'র হয়ে যাই আয়। কিন্তু তুইও ভাল ক'রেই এই কথাটা আজকে থেকে জেনে রাখিস্ ভীমে! ঐ বউ হ'তেই তোর যদি সর্ব্বনাশ না ঘটে, তবে আমি তোর মা নই। তুই কি ভেবেছিস্, ও ছেরকাল ধ'রে তোর ঘরেই ঘর করবে? তুই কি মনে ভাবিস্, তোর প্রতি ওর অন্তরের কোণেও একরত্তা একটুকু টান আচে? ও ভদ্দরনোক-ঘেঁষা কটা-চামড়ার ছুঁড়ী, ও হ'তে যদি না এই সদ্দার-বংশের নাম ডোবে, তা হ'লে আমায় তোরা—"

"থেমে থাকো! ফের যদি একটা কথা কবে, তা হ'লে ঐ জিভখানাকে সাত হাত ক'রে টেনে বা'র ক'রে আঁস্তাকুঁড়ে ফেলে দেব। শাশুড়ী ব'লে মনের কোণেও তোমায় ক্ষমা দেব না।"

কৈবর্ত্ত পল্লীর দ্বিশতাধিক ব্যক্তি আজিকার এই রঙ্গভূমে সমবেত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ক্ষুৎপীড়িত শিশুর দল, ক্রীড়া-চঞ্চল বালক-

বালিকাবৃন্দ, শ্রমকাতর বৃদ্ধসকল এবং কার্য্যপরায়ণা গৃহিণী, কন্যা ও বধূগণ সকলেই নিজ নিজ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া গিয়া কেহ ভীত, কেহ বিস্মিত এবং কেহ বা পুলকিতচিত্তে এই কোন্দলের রসোপভোগ করিয়া লইতেছিল। উজ্জ্বলার দৃপ্তস্বভাব ও দীপ্তমূর্ত্তি এ সংসারের নারীদিগের মধ্যে—বিশেষ করিয়া আবার কম বয়সীদের মধ্যে অনেকেরই চক্ষুঃশূল। পথে, পল্লীতে, ঘাটে ও বাটে যে কেহ তাহাকে দেখে, সেই সবাইকে তুচ্ছ করিয়া তাহারই রূপের প্রশংসায় শতমুখ হইয়া উঠে। বড় ঘরের মেয়েরা বউরা তাহারই সহিত সাধিয়া কথা কয়। কৈবর্ত্ত সমাজের ধনীগৃহে তাহাকেই বিশেষ করিয়া লোকে আদর আপ্যায়ন দেখায়। আবার নিজের ঘরের পুরুষেরাও কি না তাহারই গৌরবে আত্মহারা! তার উপর, খাটিতে পারে সে অসুরের মত, তার নিজের শাশুড়ী ছাড়া অপর সমুদয় শাশুড়ীই নিজ নিজ বধূকে উঠিতে বসিতে তার কর্ম্মশক্তির উপমা দিয়া লাঞ্ছনা করিতে ছাড়েনা, বুড়ো-বুড়ীদের সে যেন চোখের মণি। কাহারও জাল মেরামত করিয়া দিতে, কাহারও মাথার পাকা চুল তুলিতে, উকুন বাছিতে, কাঁথা সিয়াইতে—সকল কাযেই উজ্‌লী-বউ আগেভাগে ছুটিবে। আবার ছোট ছেলেরাও কি না ঐ হতচ্ছাড়ীর তেমনই বশ! মার খায়, তবু সঙ্গ ছাড়ে না। কাহার গুলী-ডাণ্ডা তৈয়ারী করিতে হইবে, কাহার ভাঁটা গড়াইয়া দিতে হইবে, কাহার একটা ছাঁকনি-জালের দরকার, সবাই ঘুরিবে ঐ উজ্‌লী বউয়ের পাছে পাছে। আর এ সব ছাড়া সব চেয়ে বেশীর ভাগ বিরাগ সকলেরই এই জন্য যে, অন্য সকল কৈবর্ত্তর ঘরের ছেলেদের অনেকেরই দুই বা ততোধিক করিয়া বিবাহিতা এবং তাহারও উপর আবার কাহারও কাহার এক আধখানা উপসর্গ আছে বলিয়াও শুনা যায়; কিন্তু কোন কিছুই নাই নাকি কেবল একমাত্র ঐ উজ্‌লী-বউয়ের স্বামী ভীমেরই! এটা বড়ই অসঙ্গত ও যুবতীবৃন্দের পক্ষে

একেবারেই অসহনীয়! তাই উপযুক্ত সন্তানের প্রতি যখন তার জীবিত ও সশরীরে সেই স্থানে বর্ত্তমান পিতার দিব্য দিয়া স্ত্রীকে ঝাঁটা-পেটা করিয়া বাহির করিয়া অপর স্ত্রী গ্রহণ করিবার জন্য স্নেহময়ী জননী আদেশ প্রচার করিলেন, তখন অনেকগুলি নারীর ঠোঁটের পাশে হাসির বিজলী যে উঁকি ঝুঁকি মারিয়াছিল, তাহা বড়ই সুপ্রত্যক্ষ। উজ্জ্বলার দুই জা পিঙ্গলা ও সুভাগী এই প্রস্তাব শুনিয়া পরস্পরে চোখ ঠারিল, দুই জনে দুই জনের কানের কাছে ফিস-ফিস করিয়া বলিল—"তাই কথায় বলে যে 'অত বাড় ভাল নয়, ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে'।"

তার পর যখন কোথাও কিছু নাই, অমনই থামোকা গায়ে পড়া হইয়া রুদ্দোক বুড়া হঠাৎ ফোঁস করিয়া ফণা তুলিল, তখন অনেকগুলা বুকের মধ্যেই উন্নত আশার স্রোত ধাক্কা খাইয়া ছলাৎ করিয়া থমকিয়া পড়িল। কোন কোন নিরাশাহতা মহিলা ঐ অযাচিত করুণাপরায়ণ ও সম্পর্ক এবং বয়োবৃদ্ধ লোকটির উদ্দেশ্যে চোখের মধ্যে বিষ-বাণ হানিয়া মনে মনে উচ্চারণ করিল, "মরণ আর কি ড্যাক্‌রা মিন্‌ষের!"

এমন সময় সেই ত্রিশতাধিক কৈবর্ত্ত-পরিবার যেন আকস্মিক বজ্রপাত-রবে একসঙ্গে চমকিত হইয়া উঠিল। আজিকার এই রঙ্গভূমির প্রধানা অভিনেত্রী কোথায় অদৃশ্য থাকিয়া এতক্ষণের পর অতিশয় অতর্কিতেই আবির্ভূতা হইলেন। সকলেই যেন মনে মনে ইঁহারই প্রতীক্ষা করিতে-ছিল, তবে নিতান্ত দুই এক জন হিতৈষী ব্যক্তি প্রমাদ গণিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

উজ্জ্বলার এই আকস্মিক প্রবেশ ও তাহার প্রতি ঐ কঠোর মন্তব্যে ক্ষণকাল অভিভূতাবৎ থাকিয়া অবশেষে বর্দ্ধিতরোষা ভীম-জননী একবার তার স্বামিপুত্রের ক্রুদ্ধমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিল এবং তার পর গগন-বিদারী আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"ওরে, এত কালের কৈবর্ত্ত মরদগুলো সব

ম'রে গেছে রে! ওরে আমার সোয়ামী-পুত্তুর বেঁচে থা   আমার কখন বউএর হাতে মরণ ঘটে রে?—"

একে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, তাহার উপর এত বড় হট্টগোলে আজ ভীম মায়ের প্রতি একটু বিশেষভাবেই ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু পিতৃমাতৃভক্ত পুত্রের তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি না থাকায় ক্রোধের অধিকাংশই বধূর প্রতি ধাবিত হইতেছিল, এখন উজ্জ্বলাকে ঐ অতগুলি মান্তগণ্য পুরুষের সাক্ষাতে নির্লজ্জভাবে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া এবং তাহার মায়ের প্রতি অবমাননাজনক বাক্য প্রয়োগ ও আক্রমণোদ্যত ব্যবহারে তাহার বিরক্তিটা প্রবল ক্রোধের আকার ধারণ করিল। উজ্জ্বলার সেই দৃপ্ত মূর্ত্তির প্রতি ক্রোধ কঠিন দৃষ্টি হানিয়া সে দাঁতে-দাঁতে ঘর্ষণ করিয়া কহিল,—"তোর কি মরণ হয় না?"

উজ্জ্বলা স্বামীর মুখ হইতে এই তীব্র তিরস্কার লাভ করিয়া চঞ্চল তড়িৎ-স্ফূর্ত্তির মতই সবেগে তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল, মুখে তাহা অর্দ্ধাব-গুণ্ঠনমাত্র ঢাকা ছিল, তাহাতে তাহার বিদ্যুতে ভরা বিশাল ত্র ঢাকা পড়ে নাই, সেই বড় বড় কালো চোখে তীব্র রোষের আলো জ্বালিয়া সে অকুণ্ঠিতমুখে স্বামীর ভর্ৎসনার প্রত্যুত্তর করিল, "তা হ'লে মায়ের পছন্দসই আর একটা বউ এনে দেবে? তা' দাও না কেন,—বারণ করেচে কে?"

ভীম ক্রোধে পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়া তর্জ্জনস্বরে কহিল,—"ফের কথা?"

উজ্জ্বলা নির্ভয়ে দুই পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া স্বামীর ঠিক সম্মুখে দাঁড়াইল। উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল,—"কেন, মারবে না কি? তা মার না এসে, মায়ে যা করেছে, তাই করবে এস—দুষ্ট বউটাকে মেরে ধোরে দূর ক'রে দাওসে—আপদের শান্তি হোক!"

ভীমকে উত্তেজিত দেখিয়াই এতক্ষণকার নীরব সহিষ্ণুতায় সহকারী ভীমের জ্যেষ্ঠতাত দিব্যোক অগ্রসর হইয়া আসিল।

দিব্যোক আসিয়া উভয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিল, "এ কার ঘর মা! ভাল হোক, মন্দ হোক, এযে তোর নিজের ঘর, এ থেকে তুই কি কোথাও যেতে পারিস ?"

উজ্জ্বলা সত্যই আজ রাগিয়াছিল, গাল দুইটা তার ক্রোধের উত্তাপে আগুনে তাতার মত লাল হইয়া উঠিয়াছিল, সে ঝাঁকিয়া উত্তর দিল,—"খুব পারি, খুব পারি, পারি না তো কি ? যমের বাড়ীর চেয়ে তো আর এবাড়ী বেশি আপন নয় ?"

দিব্যোক কহিল—

"ভীম! ঘরের লক্ষ্মীর গায়ে যেন কারু কথাতেই কোন দিন ভুলেও হাত তুলিসনে, বাবা! আর যা করিস্ তা করিস্।"—উজ্জ্বলার দিকে চাহিয়া বলিল, 'ছোটলোকের মেয়ের মতন খাওয়া-খাওয়ি করা কি ভাল ? যা', শাশুড়ীর পায়ে ধ'রে মাপ চাই গে, নে, চট্ করে চলে আয়।—এস, আমার মা এস!"—

উজ্জ্বলা বিদ্যুতের মত ছিট্‌কাইয়া পিছনদিকে সরিয়া গেল, স্বামীর দিকে একটা তীব্র রোষদৃষ্টি হানিয়া লইয়া সে ক্রোধগম্ভীর স্বরে উত্তর করিল—"আমার ব'য়ে গেছে পায়ে ধর্ত্তে, আমি আর এদের বাড়ী থাক্‌বো কি না।"

বলিয়া সে খর-চরণে খিড়কীর দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। তাহা দেখিয়া তাহার কালিন্দী-সদৃশী শাশুড়ী দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় করিয়া কহিল —"যাবি কোন চুলোয় লো চুলোমুখী! কোন্ কুলে তোর কে' আছে যে সেইখানে যাবি ? তবে যদি—"

শাশুড়ীর এই সুমন্তব্যের মাঝখানে হঠাৎ দাঁতে দাঁতে চাপিয়া পিছন ফিরিয়া উজ্জ্বলা তীব্রস্বরে কহিয়া উঠিল, "আবার ঐ কথা!" তার পর পিছন ফিরিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

বৃদ্ধ দিবোক ব্যাকুল চক্ষে তার প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখের দিকে চাহিল। তার পর ভাইপোর দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহাকে নির্বিকার দেখিয়া কাতর হইয়া কহিল—"কোথায় গেল, দেখ দেখি রে—"

ভীম আজ উজ্জলার নির্লজ্জতায় বিরক্ত হইয়াছিল, সে রাগে গুম্ হইয়া উত্তর করিল, "যাক্ গে, জ্যেঠামশাই! ওর বড্ড বাড় হয়েচে দেখছি, একটু কমতে দিন" বলিয়া সেও দুম্‌দুম্ শব্দে তাহার বলিষ্ঠ পা ফেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ভীমের মা তখন নির্ভয় তেজের সহিত কটূক্তির বহু ভাষা বধূর উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিতে করিতে মন্তব্য করিলেন—"এখনই আবার আস্‌বে না ত যাবে কোথায়? তবে যদি—হুঁঃ, তবে যদি আর কোন কিছু—"

প্রবীণ দুই জনেই দুই হাতে দুই কানে আঙ্গুল গুঁজিল দিবোক নিশ্বাস ফেলিয়া উচ্চারণ করিল—"আরে ছ্যাঃ! এ মাগীর মুখে কোন দিন পোকা না পড়ে! সতীলক্ষ্মীকে অমন সব কথা বলে কি করে আমার মার মত মেয়ে এ তল্লাটে কি দুটো মিলবে!"

নবম পরিচ্ছেদ

নগরীর বাহিরে ইহার উত্তরপূর্ব্ব ভাগে জনশূন্য নীরব প্রান্তর; বহু বহু—দূরে তাহার দিক্‌চক্রবালরেখা যেন নীল গিরিশ্রেণীর মতই অচল ও কঠিন হইয়া অনিমেষে চিরকাল চাহিয়া আছে। প্রান্তর-পথ তৃণহীন, গৈরিকবর্ণ তপ্ত বালুকা মরুর মত দেখাইতেছে, তাহার আশে-পাশে কোথাও দুই একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হরিদ্রাপুষ্পখচিত কাঁটাভরা আরণ্যগুল্ম। চলন-পথের কোনখানে এতটুকু একটু ছায়া নাই, অনেক দূরে দূরে ক্বচিৎ

কোথাও এক একটা শাল, তাল প্রভৃতি যেন সেই বনপথের প্রহরী-স্বরূপে একা একা দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের উন্নত শিরের সমুচ্চ উষ্ণীষ রৌদ্রতপ্ত বায়ুর বেগে অতি সামান্যমাত্রই আনত হইতেছিল। পদতলে তাহাদেরই রৌদ্রবর্ণ দীর্ঘচ্ছায়া।

মধ্যাহ্নের সেই জ্বলন্ত সূর্য্য বিশ্বের অঙ্গ নিজের অগ্নিময় কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া শেষে নিজেও যেন সেই পরিতাপে অবসন্নশরীরে অবসানের পথে ঢলিয়া পড়িলেন। সেই দারুণ রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া জ্বরতপ্ত দগ্ধদেহে পাগলের মত জনারণ্য ও নির্জ্জন পথে পথে ভীম সারাদিন ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার ঐ ক্ষিপ্তমূর্ত্তি দেখিয়া পরিচিতগণ সবিস্ময়ে পথ ছাড়িয়া দিতেছিল। অপরিচিতগণ তাহার দশা দেখিয়া 'আহা কাদের বাছা রে! ক্ষেপে গেছে!' বলিয়া সহানুভূতি জানাইতেছিল। ভীম কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত পর্য্যন্ত করিল না, সারাদিনের উপবাসে, উদ্বেগে ও পরিশ্রমে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তাহার হৃদয় ফাটিতেছিল,নদীর তীরে তীরে বালুকা-রাশির উপর দিয়া ছোট দুটি পদচিহ্নকে সে প্রাণপণে অনুবর্ত্তন করিতে-ছিল, পাছে সে রেখাটি হারাইয়া ফেলে, তাই নদী-নীর নিতান্ত সমীপবর্ত্তী হইলেও এক বিন্দু জলও সে স্পর্শ করিল না। সারা অপরাহ্ণ এমনই করিয়া একটা পথভ্রান্ত দৈত্যের মতই সে সারা নদীকূল ও পরিশেষে নগরীসীমার পরপারে এই নির্জ্জন প্রান্তর-পথকে তন্ন তন্ন করিয়াছে, কোথাও তাহার হারানো বস্তু সে খুঁজিয়া পায় নাই।

উজ্জ্বলা যখন দুর্জ্জয় রোষভরে বাড়ী ছাড়িয়া গেল, তখন ক্রোধাতিশয্যে ভীমের মনে তার জন্য এতটুকুও দুশ্চিন্তার উদয় হয় নাই। শাশুড়ী-বউয়ে ইহাদের প্রায়ই কলহ হয়, এবং অনেক দিন উজ্জ্বলাও রাগ করিয়া বলে যে, সে এ বাড়ীতে আর থাকিবে না এবং একটুখানি পড়সী-বাড়ী বা আদাড়ে-পাঁদাড়ে ঘুরিয়া বেড়ায়, তার পর বিশু প্রভৃতিরা ডাকিতে

গেলেই ভালমানুষটির মত চলিয়া আসিয়া আপন নিত্যকর্ম্ম আপনার হাতে-মাথায় তুলিয়া ত লইয়াই থাকে, উপরন্তু সে দিন তার কাজের ঝোঁক যেন আরও সাতগুণ বাড়িয়া উঠে। কোথায় কি জঞ্জাল জমা হইয়া আছে, কোন্ কাপড়গুলা ক্ষারে চড়াইতে হইবে, ছেলেগুলার মাটীমাখা গায়ে খইল মাখাইয়া ধোয়াইয়া দেওয়া, এমন কি, দিদি-শাশুড়ীর বাতের ব্যথায় সেক-মালিসের সময়টাকে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া হয় ত বা তাঁহার মুখ হইতে একটা ভাল কথা আদায় করা-রূপ আশ্চর্য্য ঘটনাও কখন কখন সে এই উপলক্ষ্যে ঘটাইয়াছে। এই সব দেখিয়া ভীম বরং কত দিন কৌতুক করিয়া তাহার কানের পাশাটা ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া হাসিয়া বলিয়াছে,—"যদি সেই গুষ্ঠীশুদ্ধর খোসামোদ ক'রেই মরবি, তবে দশ হাত বুক ক'রে সবার সাথে যুঝতে যেয়ে মরিস্ কেন?"

উত্তরে উজ্জ্বলাও হয় ত ভীমের ঘনায়মান গোঁফের প্রান্তটা টানিয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিয়া উঠিত—"খুব করি, আমার খুসী।" না হয় বলিত—"ওরা আমায় ঘাঁটায় কেন? সবাইকার জন্যে আমি রাত্তির দিন সাতটা গতর বা'র ক'রে খেটেও মরবো, আবার ওদের সব্বাইকার ঝ্যাঁটা-লাথিও খাবো? অত আমি পারিনে!"

ভীম কত দিন উজ্জ্বলার এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া তার সেই ভ্রূকুটি-কুটিল সুন্দর ললাটে আদরের গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছে—"পারিস্ তুই সেই সবই—কেবল একবার শরৎকালের মেঘের মতন গর্জ্জে ওঠা তোর রোগ! আচ্ছা, আচ্ছা, যা করেছিস, বেশ করেছিস্; শুধু আমার এই কথা, পেটে ধরেছিল, যাই হোক মা ত আমার বটে? মন্দ হ'লেই বা করছি কি? একটু খানি সামাল দিস্, বে-ধড়োক কিছু ব'লে বসিস্নি যেন ফস্ ক'রে।"

আজও ভীমের বিশ্বাস ছিল, এই রকমটাই ঘটিবে। বিশেষতঃ আজিকার এই বিবাদফলে বাড়ীশুদ্ধ সকলের বিশেষতঃ জ্যেঠামশাইএর অনাহার ঘটায় এবং নিজেকেও তাহার ফলভোগ করিতে হওয়ায় তাহার মনে উজ্জ্বলার প্রতি বিরক্তিটা কিছু অধিকতরই হইয়াছিল। সে বেশ জানে যে, এই কাজটার ভার সে না রাখিলে এই রকমই বিপ্লব ঘটে; অথচ জানিয়া শুনিয়া তাহার বুড়া বাপ জ্যেঠা হইতে শিশু ভাইটার পর্য্যন্ত উপবাসের ব্যবস্থা করিয়া নিজে অনায়াসেই নির্লিপ্ত হইয়া রহিল? না, উজ্জ্বলার স্পর্দ্ধা সত্য সত্যই কিছু বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

ভীম ঘরে ঢুকিয়া দরজার হুড়কো টানিয়া দিল। ঘরের মধ্যে একখানা তালপাতার চেটাই বিছানো, তাহারই এক প্রান্তে লম্বা একটা বালিস ও দুখানা মোটা কাঁথা জড় করা আছে, বালিসটা টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িয়া সে মনে মনে দৃঢ় করিয়া কহিল, "সত্যিই-ওকে জব্দ করা দরকার হয়েছে একটু দেখছি।"

তাহার পর কয়েক দণ্ড ধরিয়াই স্ত্রীকে জব্দ করিবার নানারকম উপায় সে আবিষ্কারচেষ্টা করিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনটাই শেষ পর্য্যন্ত তার মনঃপুত রহিল না। সর্ব্বপ্রথম সে স্থির করিল, উজ্জ্বলা বাড়ী ফিরিলে আজ সে তাহাকে খুব কড়া করিয়া ভৎ‍র্সনা করিবে, মার আদেশমত ঘা কতক বসাইয়া দিলেও মন্দ হয় না। এই কথা মনে মনে করিতে গিয়াই সে জিভ কাটিল। সেই রাজোদ্যানের মর্ম্মর-মূর্ত্তির মতই শুভ্র ও সুকুমার দেহে আঘাত! মনে হইতেই নিজের লজ্জায় সে নিজেই নতমুখ হইল।

তার পর ভাবিল, 'নাঃ ও-সব নয়; তবে বড় তার দেমাক হয়েছে। বুঝেছে যে, ওর ঐ রূপের পায়ে আমি বিকিয়ে গেছি, লোকে যা বলে, তা বড় মিথ্যেও ত নয়? হয় ত আমি তাই গেছিও! তা' এইবার সেই গুমোরটাই তার ভাঙ্গতে হবে। আর একটা বিয়ে ক'রে দেখি, তা

হ'লেই সত্যিকারের জব্দ হবে।" এই উপায়টার আবিষ্কারে ভীম মনে মনে ঈষৎ উৎফুল্ল হইল। মনে মনে বলিল, "এই ভাল; মা'ও খুসী হবে, ও' ঠাণ্ডা হ'তে পথ পাবে না, আর আমার? —তাই বা এমন মন্দ কি? মনসাদেবীকে ত মাসের মধ্যে সাতাশ দিনই মান ভাঙ্গাতে প্রাণ যায়, দু'জন থাকলেই তখন মানের বদলে কচু আসবে! বাঃ, যাকে বলে এক ঢিলে দুটো পাখী মারা! সেই ভাল, এই আমি করবো—যাই মা'কে ক'নে ঠিক করতে ব'লে আসিগে।'

এই ভাবিয়া উঠিতে গিয়া ভীমের দৃষ্টি তাহার সম্মুখের গৃহভিত্তির উপরে পতিত হইল। ঐ দেওয়ালটির গায়ে আলিপনা দ্বারা একটি পদ্ম-সরোবর চিত্রিত হইয়াছিল; সরোবরে দুইটি মরাল ভাসিতেছে, সপত্র, সনাল, বিকসিত ও মুদিত কমলের শ্রেণী।

চিত্রটির অঙ্কন-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া গিয়া ভীমের চিত্ত হইতে সহসাই নব-পরিণয়ের সচেষ্ট আগ্রহ অপসৃত হইয়া গে[illegible]। ক্ষণকাল চিত্রার্পিতবৎ চাহিয়া থাকিয়া সে একটা মৃদু শ্বাস মোচন [illegible]ল ও আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল, "কোন্ কাযটাই বা তার আট্‌কা[illegible]? রূপেও যেমন, গুণেও তার জোড়া মেলা ভার! তাই তাকেও তারা ক্ষেপিয়ে তোলে। জ্যেঠামশাই বলেন, মন্দ আমার বাড়ীর লোকেরাই তা ঠিকই! নাঃ, পাগল! কা'কে কোথা থেকে এনে ওর পাশে বসাব? কৈবর্ত্ত-পাড়ায় ওর পা ধোয়াবার মতনও কি কেউ আছে? আরে ছ্যাঃ! আমার কি ওর বদলে একটা কোন্ পেত্নীকে এনে পাশে শোয়াতে ঘেন্না করবে না? নাঃ, বিয়ে-টিয়ে আমি করছি নে।' ও নিছক মিথ্যে কল্পনা যাই, দেখি গিয়ে কি হলো।"

ভীমকে বাহির হইতে দেখিয়া তার ছোট বোন্ সল্লা আসিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে জানাইল যে, ধর্ম্মঠ কাকার শালীর মেয়ে সুগলার সহিত

ভীমের বিবাহের কথা পাকা হইয়া গিয়াছে। তিন দিনের দিন গোধূলি লগ্নে বিবাহ।

সংবাদ শুনিয়া মুখ খিঁচাইয়া ভীম উত্তর দিল, "তবে আর কি? আমি রাজা হয়ে গেছি!"

সন্না এইটুকুতেই দমিবার পাত্রী নহে, সে হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে একটু দূরে সরিয়া গিয়া বলিতে লাগিল, "রাজা না হও, আমাদের রাণী বৌয়ের এইবার ত দফা শেষ হ'ল! যেমন কম্ম, তার তেমনই ফল!"

একটি ক্ষুদ্র বালিকার এই একান্ত অনাবশ্যক ঈর্ষ্যা-সংযুক্ত অবজ্ঞা প্রকাশে ভীমের মুখ ক্রোধ পরুষ হইয়া উঠিল, সে সক্ষোভ বিরক্তির সহিত "হোগ্ গে, তোর তাতে কি!" বলিয়া অগ্রসর হইল।

সনকা তখন রান্নাঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া মধ্যমা বধূর উপর শ্বশ্রূত্ব প্রকাশ করিতেছিল, ছেলের গলার সাড়া পাইয়া "অ ভীম! আয়, ভাত খেয়ে যা রে"! বলিয়া তাহাকে সাদরে আহ্বান জানাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই পোড়া কাঠের মত নীরস মুখে অনেকখানি হাসি ফুটাইয়া তুলিয়া উৎফুল্ল-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "সব ঠিক ক'রে এলাম, সুগলী মেয়ে খুব ঠাণ্ডা, মেরে যদি তাকে কুট্টেও ফেলাও তবু সে একটু রা' কাড়তে জানে না। এইবার ওকে ঠাণ্ডা করতে পারি কি না দেখ।"

ভীম অসহিষ্ণু চোখে চারিদিকে চাহিতেছিল, মায়ের ঐ কথাটা শুনিয়াই সে এক লম্ফে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

তার পর সেই শরতের রৌদ্র দীপ্ত তপ্ত-পথে তাহার বাকি দিনটাই কাটিয়া গেল। কোথাও সে উজ্জ্বলার চিহ্ন পাইল না। অবশেষে ভীমেরই এক বন্ধু হরির সঙ্গে দেখা হইয়া গেল, বন্ধু হরি তাহাকে দেখিয়াই মুখ টিপিয়া হাসিল, "ব্যাপার কি ভীমচন্দর! উড়োপাখীর সন্ধানে ছুটেছিস্ না কি?"

ভীম দাঁড়াইয়া পড়িল,—"দেখেছ কি ? কোন পথে গেছে ?"

হরি টিপি-টিপি হাসিতে হাসিতে মুখ-ভঙ্গী করিয়া বলিল, "যদি বলি রাজপ্রাসাদের পথে গেছে ?"

ভীম সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি ?"

বন্ধু কহিল, "সত্যি-মিথ্যে জানিনে, এই রকমই ত শুনৃচি! আর তাও বলি, সেইটেই কিন্তু ওর পক্ষে সব চেয়ে স্বাভাবিক, আর সঙ্গত—বাপ—"

ভীমের পালোয়ানী হাতের বিষম কিল খাইয়া বন্ধু তাহার রসিকতা অর্দ্ধপথেই পরিত্যাগ পূর্ব্বক উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল।

ভীম তখন নদীকূল ছাড়িয়া প্রান্তরের পথ ধরিয়াছে।

উজ্জ্বলার প্রতি ভীমের মনের মধ্যে যে কতখানি প্রেম প্রসুপ্ত ছিল, সে বোধ করি নিজেও সেটা বেশ ভাল করিয়া জানিত না। সংসারে যে জিনিষটাকে আমরা বড় সহজেই পাইয়া বসি, সেটার বাস্তব মূল্য নিরূপণ করিতে আমরা বড় সহজেই ভুল করিয়া ফেলি। এমন কি, তাহার যে কোন মূল্য আছে, এমন কথাও হয় ত সকল সময় আমাদের মনে পড়ে না, তা সে জিনিষটা যতই কেন দুর্ম্মূল্যই হউক না। ভীমেদের ব্যাপারটাও সেই রকম ঘটিয়াছিল। এই অপরূপ-রূপসী বালিকা তাহাদের ঘরে এতই সহজে আসিয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার এই অযোগ্য বা অপ্রত্যাশিত আগমনের সম্বন্ধে কাহারও মনে এতটুকু আগ্রহ বা বিস্ময় জাগ্রত হইতে অবসরমাত্র ঘটে নাই। মাতৃ-পিতৃহীনা পরাশ্রয়-পালিতা অনাথাকে দিব্যোক তাহার অভিভাবকের কাছে চাহিতেই তাহারা তাহার নিতান্ত বাল্যকালে সামান্যমাত্র পণ লইয়া তাহাকে তাহার হাতে দিয়াছিল, ভীমও তখন বালকমাত্র। সেই জন্যই ইহার অপরূপত্বটা তার কাছে অতি সহজ ও সাধারণরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। ভীম তাহাকে স্নেহ করিত, ভালবাসিত

না, তাহাও নয়, তবে সে ভালবাসার মধ্যে কোন প্রকার উন্মাদনা ছিল না। ছিল কি, না, তাহার পরীক্ষারও কোনদিন অবসর ঘটিতে পায় নাই। যেহেতু তাদের একান্ত সখা-সখীত্বর কোনদিন বিচ্ছেদাশঙ্কাও জাগে নাই, যাহাতে প্রেমের উত্তেজনা জাগিয়া উঠিবে। আজ সহসা তার প্রতি নিজের ব্যবহার স্মরণ করিয়া সে এককালে জাগ্রত, সন্তপ্ত ও অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। উজ্জ্বলার সেই অবমাননায় দলিতা সর্পীর মত ক্রোধ-ক্ষুব্ধ মূর্তি মনে পড়িয়া তার বুকের মধ্যে একটা ব্যগ্র-ব্যাকুলতার সৃষ্টি করিয়া তুলিল। কোন্ প্রাণে তাহাকে—যাহার পক্ষে 'রাজপ্রাসাদই স্বাভাবিক ও সঙ্গত স্থান', তাহাকেই সে অবমাননার উপরে আবার অমন করিয়া অপমান করিল? যদি সত্যই তাহার উপর অভিমান করিয়া উজ্জ্বলা আজ মরিয়া গিয়া থাকে? ভীমের পদনখ হইতে কেশাগ্রাবধি এই ভীষণ চিন্তায় একেবারে শিহরিয়া কাঁটা দিয়া উঠিল। তাহার তখনই মনে হইল, যেন বিশ্বসংসারটা এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই তার কাছে এককালে অন্ধকারের মধ্যে ডুব খাইয়া ডুবিয়া গেল।

সে তখন ঘর্ম্মাক্ত-শরীরে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে এক রকম ছুটিয়া চলিল। এই পথ দিয়া দিন দুই চলিলে ব্যাঘ্রতটীতে পৌঁছান যায়, এই খবরটুকু যে উজ্জ্বলার জানা আছে, সে কথা সেও জানিত। কারণ, রাগ করিলেই সে এই বলিয়া শাসাইত যে, সে এখনই বাঘতটীতে চলিয়া যাইবে।

দশম পরিচ্ছেদ

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের পশ্চিম বিভাগে গগনস্পর্শী চূড়াবিলম্বিত বাশিভা-সঙ্ঘারাম বিরাজ করিতেছে। ইহার সন্নিকটেই চির-প্রসিদ্ধ ভারত-সম্রাট্ অশোকের বিখ্যাত সমুন্নত স্তূপ ও বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি-সম্বলিত বিহার। এই মহাচৈত্য কৈলাস-পর্ব্বতের সম্ভ্রমকেও পরাভূত করিয়া হিমানী-দ্যুতিসম্পন্ন কুন্দ-সুন্দর যশোরাশির সমুন্নত পুঞ্জরূপে প্রতিভাত হইতেছে। ইহার অত্যুচ্চ শিখরাগ্র নিবদ্ধ শরচ্চন্দ্রের শুভ্র শোভাবিশিষ্ট পতাকায়, নভোমণ্ডল যেন নূতন মঞ্জরী মোচন করিতে করিতে শোভা বিস্তার করিতেছিল।

চাতুর্ম্মাস্যকালে আজকাল নগরের উপনগরস্থ সমুদয় চৈত্য বিহারাদি উজ্জ্বল আলোকমালায় বিভূষিত করা হইয়া থাকে। আজিও তদনুসারে এই বিহার স্তূপ ও সঙ্ঘারাম অত্যুজ্জ্বল উল্কালোকে আলোকিত। চাতুর্ম্মাস্য অনুষ্ঠানের নিয়ম অনুসারে দ্বারদেশ সকল পত্র পুষ্প-বিভূষিত। স্তূপপাদমূলে ও চৈত্যসম্মুখে বহুতর এ দেশী ও বিদেশী শ্রমণ ও ভিক্ষু একত্র হইয়া বুদ্ধ সঙ্ঘ ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সত্যতত্ত্বালোচনায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। চৈত মধ্যবর্ত্তী অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, মারিচী, বজ্রপাণি, ও রাষ্ট্রপাল, এই পঞ্চ বোধিসত্ত্বের দেবপ্রতিমার সম্মুখে অনির্ব্বাণ ঘৃতদীপ প্রজ্বলিত। কাষায়ধারী মুণ্ডিত মস্তক প্রশান্তমূর্ত্তি মহা স্থবির আচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ-শান্তি ভাব-গম্ভীরস্বরে প্রজ্ঞা পারমিতা পাঠ করিতেছেন, দূর হইতে সেই গাম্ভীর্য্যময় শব্দলহরী জাহ্নবী-করতোয়ার সম্মিলন-কলনাদের ন্যায় আশ্চর্য্য-মধুর শুনাইতেছিল। একটি ভারতেতর প্রদেশীয় পর্য্যটক একখানি মৃগচর্ম্মাসনে বসিয়া সশ্রদ্ধ মনোযোগের সহিত ধর্ম্মপাঠ শ্রবণ করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে একখানি

তুলোট কাগজে লেখনী দ্বারা কিছু কিছু লিখিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। ইনি কয়েক বৎসর যাবৎ বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষার্থ নালন্দা মহাবিহারে অবস্থিতি করিয়া তথাকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। চাতুর্ম্মাস্য-নিয়মে পর্য্যটনকারী ভিক্ষুদলের সহিত রাজধানী-প্রধান পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দর্শনে আসিয়াছেন। এভিন্ন পূর্ব্ব-ভারতের বহুতর বিখ্যাত আচার্য্য এক্ষণে এই বাশিভা-সঙ্ঘারামে সমাগত। ইঁহারা অধিকাংশই মহাযানমতাবলম্বী, কচিৎ কোন হীনযানীয় পর্য্যটককে পাইলে উভয় পক্ষে অতি জটিল ও সূক্ষ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় মহাতর্কের সৃষ্টি হইতেছিল, সে তর্কের আর মীমাংসা হইয়া উঠিবার ভরসা দেখা যাইতেছিল না,—বুঝি আজিও তাহার সমাধান ঘটে নাই! হয় ত বা কোন দিনই তাহা ঘটিবে না।

যাহা হউক, এই চাতুর্ম্মাস্যকালে প্রতি বিহার-সঙ্ঘারাম যেন এক একটি রাজপুরীর শোভা ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল—সহস্র সহস্র জনাকীর্ণ নগরীর প্রতিচ্ছবি ধারণ করিয়াছিল। শিক্ষক, ছাত্র, আগন্তুক, অভ্যাগতে মিলিয়া সর্ব্বদা পাঠ, পাঠনা, তর্ক, আবৃত্তি ও আনন্দ কোলাহলে সঙ্ঘারাম মুখরিত হইয়া রহিয়াছে। আবার এই উৎসবকালেই বহুতর ভিক্ষু শ্রমণকে পর্য্যটনে বাহির হইয়া যাইতে হওয়ায়, তাহাদের বিরহ-দুঃখও সহপাঠী তরুণ শ্রমণদিগের চিত্তকে গোপনে কথঞ্চিৎ ম্রিয়মাণ করিতেছিল। সকলেই—যে মুনীন্দ্র জীবহিত-প্রবৃত্ত সাধুচিত্ত-বৃত্তি প্রভাবে প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব অধিগত করিয়া ক্লেশ-নিপীড়িত জনসাধারণের পক্ষে পাপ-কুম্ভীর-সমাকুল দুরতিক্রমণীয় সংসার সাগর উত্তরণের হেতুরূপে বর্ত্তমান,—তাঁহার সম্বন্ধীয় আলোচনায় আনন্দিত।

নগরের পূর্ব্বাভিমুখে সিদ্ধপীঠ মন্দারেশ্বর শিবমন্দির ও পাট্টলাদেবীর মহাপীঠস্থান। মন্দিরপুরোহিত কৌশিকবংশীয় কেশব দীক্ষিত, শাস্ত্রজ্ঞান-পরিশুদ্ধবুদ্ধি এবং শ্রোত্রীয়ত্বের সমুজ্জ্বল যশোরাশিবিমণ্ডিত। কেশবের

পূর্ব্বপুরুষ হিন্দুকুলশেখর মহারাজাধিরাজ জয়ন্ত বা আদিশূরের নিকট যে কয়খানি গ্রাম দেবোত্তররূপে প্রাপ্ত হন, তাঁহার মৃত্যুর পরের অরাজকতায় মাৎস্যন্যায়ের কালে তাহা তাঁহাদিগের হস্তস্খলিত হইয়া যায়; সে সময় কেবল স্থানীয় লোকের ইচ্ছার উপরেই দেবসেবা নির্ভর করিয়াছিল। ইহার ফলে সকল দিন দেবতার ভোগ্য বস্তু বা দেবসেবকের অন্নসংস্থান হইত না। ইহার পর স্বধর্ম্মপালনে এবং চাতুর্বর্ণনির্ব্বিশেষে সর্ব্বধর্ম্মের পরিপোষক বিখ্যাত-কীর্ত্তি উত্তর-ভারতের প্রায় একচ্ছত্র সম্রাট্ মহারাজাধিরাজ পরম-ভট্টারক পরমসৌগত শ্রীধর্ম্মপালদেব তাঁহার ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বিনী পট্টমহাদেবী ন্নাদেবীর ইচ্ছানুসারে এই সুপ্রাচীন পীঠস্থানের জীর্ণসংস্কার পূর্ব্বক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী কোটিবর্ষবিষয়ান্তর্গত কয়েকখানি সুসমৃদ্ধ াম 'যাবচ্চন্দ্রদিবাকর' এখানের সেবাপূজার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার পম্বন্ধে দেবসেবা ও দেবসেবকগণের ব্যয় সুনির্ব্বাহই হইত; কিন্তু প্রতি এক মহাবিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে! বর্ত্তমান মহীপাল মহারাজাধিরাজ ীয় মহীপালদেব এক নূতন নিয়ম প্রচার করিয়াছেন যে, তাঁহার পুরুষগণের বদান্যতা দত্ত বিস্তর গ্রাম যাহা দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তরে ণত হইয়া নিষ্কর রহিয়াছে, তাহাদের উপর একটা রাজকর ধার্য্য করা ব এবং যাহাদের সম্পত্তির উপস্বত্ব বার্ষিক এক শত নিষ্ক মুদ্রার ঊর্দ্ধ, াদের সম্পত্তি হইতে সেই অংশটা বাহির করিয়া লইয়া উক্ত জমী সরকারভুক্ত করা হইবে। কারণ, ব্রাহ্মণদিগের উদরপূর্ত্তির জন্য ঐ াণ অর্থ থাকিলেই যথেষ্ট। উহার বেশী অর্থাগম হওয়া না দেবতা না পর পক্ষে প্রয়োজনীয়। স্থানে স্থানে রাজদত্ত বৃত্তিও লোপ গেল।

বৌদ্ধ-বিহারের সম্বন্ধে ঠিক একই রূপ ব্যবস্থা না হইলেও ইহা হইতে শী প্রভেদও ঘটে নাই। রাজসাহায্য হইতে প্রায় সমস্ত বিহারই

দিনে দিনে বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছিল। এমন কি, সুবিখ্যাত বিক্রমশিলা এবং নালন্দার মহাবিহার সকলে ও বিশ্ব-বিখ্যাত বিশ্ব-বিদ্যালয়েও রাজকোষ হইতে দেয় সুপ্রচুর অর্থসাহায্য অতি হীনসংখ্য হইয়া আসিয়া প্রায় মিলাইয়া যাইবার উপক্রম করিতে লাগিল। এই সকল অনীতি-কার্য্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মী এবং সৌগত, একসঙ্গেই সমপরিমাণে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মগধের মহাসামন্ত মহাকুমার শূরপালও এই লইয়া বিশেষ অপ্রসন্ন ও উত্তেজিত হইয়া পত্র লিখিলেন।

এ দিকে আবার শুধু তাহাই নহে;—রাজার অর্থাভাবের ত শেষ নাই! পাল-রাজগণের বিশেষত্বই এই ছিল যে, তাঁহারা বিদ্বজ্জনপ্রতিপালক এবং ধার্ম্মিকগণের রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বিহার সকলে অসংখ্য অভিধর্ম্মী ছাত্র, শ্রমণ, ভিক্ষু অধ্যয়ন করিতে পাইত; তাঁহাদের সহায়তাপ্রাপ্ত শত দেবায়তন-সংশ্লিষ্ট বিদ্যাগারে শত শত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মী বেদবিদ্যা লাভ করিত। ফলে সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তাবধি বিদ্বান্ সুধী ব্যক্তির অভাব ছিল না। বিদ্যা ও ধর্ম্ম গৌরবে দেশ তখন জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের প্রিয় শিষ্য মহারাজাধিরাজ নয়পালদেব পুনশ্চ নবোৎসাহে নূতন নূতন বিদ্যাপীঠের স্থাপনা ও প্রাচীনের সংস্কারকার্য্য সমাধা করিয়া সমগ্র উত্তরাপথেই যেন ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা নবোৎসাহ আনয়ন করিয়াছিলেন। পুরাতন সুগতধর্ম্মও সেই সঙ্গে জীর্ণ-সংস্কৃত হইতেছিল। গুরুর আদেশে তিনি রাজধানীমধ্যে একটি বিশাল চৈত্য-বিহার-সমন্বিত ভিক্ষুণীসঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ তারাদেবীর মন্দির তাঁহারই অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছিল।

এতদ্ব্যতীত ভূমি-সম্পত্তি প্রদানের প্রশস্তি-রচনা তাঁহাদের প্রত্যেকেরই রাজ্যকালে রাজসচিবগণের নিত্য কার্য্যেরই অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু সে দিন আর নাই। মহারাজাধিরাজ বিগ্রহপালদেবের মৃত্যুর

সহিত এ রাজ্যে দানধর্ম্ম বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। তবে এখনও যে তাহা সম্পূর্ণভাবেই লোপ পাইতে পারে নাই, তাহার একমাত্র কারণ পট্টমহাদেবী। তাঁহার অশেষ করুণা ও মহাপ্রাণতায় এ দেশে এখনও দয়া-ধর্ম্ম একেবারেই বিলুপ্ত হয় নাই বটে, তবে তাঁহারই বা সামর্থ্য কতটুকু? এমন কি, অনেক সময় দানপ্রাপ্তিকালে অনেকেই বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া লক্ষ্য করিয়াছেন যে, তাঁহাদের অভাব ঘুচিল যাহা দিয়া, তাহা স্বুবর্ণ নিষ্কের পরিবর্ত্তে পট্টমহাদেবীর অঙ্গের রত্ন-আভরণ!

তাহার পর রাজকোষ পূর্ণ করিবার জন্য আরও নানা প্রকারেই রাজপক্ষীয়ের অশেষ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের অভাব ছিল না। কৃষকদিগের উৎপন্ন শস্যের উপর দ্বিগুণ কর ধার্য্য হইল, জালিকদিগের ধৃত মৎস্যের উপরও সেইরূপ। পথকর, অশ্বকর, যানকর, হট্টিকা ও বিপণিকর, মানুষের সর্ব্বপ্রকার উৎপন্নের উপরেই সেইরূপ প্রচুররূপে রাজকর বসিল। কেবল বাকী রহিল—মানব রসনা হইতে উৎপাদিত বাক্যাবলীর উপরে কর ধার্য্য হওয়া মাত্র! তবে সেটাও যে একেবারেই হয় নাই, তাহাও জোর করিয়া বলা চলে না! এ বিষয়ে যে বা যাহারা আপত্তি জানাইল, তাহাদের অদৃষ্ট ফল বিশেষ ভাল ফলিল বলা যায় না। দেশের সর্ব্বত্রই একটা অসন্তোষের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ধূমায়িত হইতে লাগিল।

ভিন্নদেশীয় লোক দেশের রাজা হইলে দেশের উপর অত্যাচার ঘটিয়া থাকে; যাঁহারা রাজার স্বজাতি, দেশীয় লোক অপেক্ষা তাঁহাদের প্রাধান্য ঘটে, তাহাতে সাধারণ প্রজা পীড়িত হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাজা দূরদেশে থাকিলে স্বুশাসনের বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে এ সকল কারণ বর্ত্তমান না থাকিলেও ফল কিন্তু প্রায় সমানই দাঁড়াইয়াছিল। ‘রাজার স্বজাতি’ বলিতে এখানে রাজার [illegible] রিগণকেই বুঝাইত। মহাপ্রতীহার, মহামাণ্ডলিক, দণ্ডোপাসিক, মহাসন্ধিবিগ্রাহিক সমুদয় উচ্চ শক্তিমান

রাজকর্ম্মচারী রাজার স্বেচ্ছাচার-স্রোতে ইন্ধন যোগাইয়া দিয়া নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিতে ব্যস্ত থাকিতেন। মহামন্ত্রী যোধদেব যথাসাধ্য সদুপদেশ দিয়াও রাজাকে অনীতিকার্য্য হইতে ফিরাইতে না পারিয়া, সম্প্রতি তীর্থবাস সঙ্কল্প লইয়া বারাণসীক্ষেত্রে প্রস্থান করিয়াছেন। যাত্রাকালে আর একবার শেষ চেষ্টা করিতে গেলে অবজ্ঞার শ্লেষযুক্ত হাসি হাসিয়া মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব প্রত্যুত্তর করেন—"আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, বানপ্রস্থই এখন আপনার অবলম্বনীয়। আমারও যখন ঐ বয়স হবে, ভোগ-তৃষ্ণা আপনিই ক্ষয় হয়ে আসবে, আমিও না হয় তখন আপনার দৃষ্টান্ত নিয়ে হয় মৃগদাবে, না হয় বোধিক্ষেত্রের পুণ্যধামে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক পরলোকের চিন্তা করবো, আপাততঃ সে বিষয়ে মস্তিষ্কের বৃথা অপব্যয় উভয়তঃই নিষ্প্রয়োজন।"

বৃদ্ধ মহামাত্য দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "রাজাধিরাজ! আমার রাজা হলেও আপনি আমার পুত্র তুল্য স্নেহাস্পদ! এই সুবিস্তৃত পাল-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর আপনি,—যে মহাসম্মানিত রাজাসনে একদিন চাতুর্ব্বর্ণ প্রজাসমূহ দ্বারা সম্পূজিত হয়ে তাদেরই সমবেত চেষ্টা যত্নে পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ গোপালদেব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, যে সিংহাসনে ধর্ম্মপালদেব—যে ধর্ম্মপালদেবের সম্বন্ধে কবিগণের অমর গাথায় গ্রথিত আছে যে, 'ইন্দ্র কেবলমাত্র পূর্ব্বদিকেরই অধিপতি, দিগন্তরের অধিপতি ছিলেন না, এবং বৃহস্পতির ন্যায় মন্ত্রী বর্ত্তমানেও সেই একটি দিকেও দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন, কিন্তু আমি সেই পূর্ব্বদিকের অধিপতি ধর্ম্ম নামক নরপতিকে অখিল বিশ্বের স্বামী ক'রে দিয়েছি,' এই ব'লে তাঁর মহামন্ত্রী গর্গদেব বৃহস্পতিকে উপহাস করতেন, রাজন্! সেই গর্গবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে আমি এই শেষবারের জন্য আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যে, প্রজা-রঞ্জন ভিন্ন এ রাজদণ্ড কখনই স্থির

থাকবে না। যাদের দ্বারা আপনারা এই অশেষ সম্মানিতপদ প্রাপ্ত হয়েছেন, তাদের দ্বারাই আবার তা অপহৃত হ'তে পারে, এই কথা বিশেষরূপে স্মরণ করবেন। আপনার পূর্ব্বপুরুষরা বুদ্ধিমান্ ছিলেন, তাঁরা সৌগত, সনাতন ধর্ম্মী, কারও প্রতি কোন দিন ভেদবুদ্ধি প্রদর্শন না ক'রে প্রজাগণের মনোরঞ্জনকারী হয়ে সাম্রাজ্য প্রতিপালন করেছিলেন ব'লে, তারাও তাঁদের জন্য নিজেদের প্রাণপাত ক'রে এই মহা সাম্রাজ্যের পুষ্টিসাধন ক'রে এসেছে। প্রজার চিত্তই যে রাজ্যের মেরুদণ্ড, এ কথা বিস্মৃত হ'লে রাজ্যের সর্ব্বনাশ নিকটবর্ত্তী হবে। এই চির-হিতৈষী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই কথাটা শুধু স্মরণ রাখবেন।"

মহীপাল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে মুক্তির আশা নাই দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এখন নিতান্ত অভদ্রভাবেই পুরুষ কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"তবে কি আপনার মতে রাজা প্রজার দাসত্ব করবে নাকি ?"

মহামাত্য অধিকতর বিষণ্ণ ও হতাশ হইয়া কহিলেন,—"কি আর বল্‌বো ? আপনি যখন না বুঝবারই পথ ধরেছেন, তখন আমার আপনাকে এ সব কথা বলাই বৃথা ! তবে যে কথা আপনি বিদ্রূপ ক'রে বল্লেন—সে কথা এক প্রকারে ঠিকই ! রাজাকে প্রজার দাসত্বই কর্‌তে হয়। নতুবা তারাই বা রাজাকে তাঁর সহস্র অত্যাচার-অনাচার সমেত সহ্য কর্‌বে কেন ? শ্রীরামচরিত্রে কি এরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে পান না ? আপনার পূর্ব্বপুরুষ নৃপতি-কুলতিলক পরমভট্টারক ধর্ম্মপালদেব, দেবপালদেব প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ভূপতিবৃন্দকেও কবিগণ ঐরূপ উচ্চ সম্মানভূষণে যে ভূষিত ক'রে গিয়েছেন, তার প্রধান কারণ—তাঁরা প্রজাবৃন্দের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট ছিলেন। নিজ হীন স্বার্থ-সাধনকার্য্যে নিরত থাকলে কখনই তাঁরা পৃথু, রঘুকুল-তিলক ভগবান্ রামচন্দ্র, নল প্রভৃতি সর্ব্বগুণাধার, প্রজাসুখে

আত্মসুখ-বিসর্জ্জনকারী ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য নরপালগণের সঙ্গে তুলনীয় হ'তেন না।"

মহীপালদেব এই যুক্তিপ্রদর্শনের বিপক্ষে ঈষন্মাত্র হাসিয়া কহিলেন, "মহামন্ত্রি! ভয় করবেন না,—আমারও মৃত্যুর পরে আমিও অমনই কুন্দেন্দু-ধবল অম্লান যশোরাশিতে বিভূষিত হয়ে উঠবো, এবং যদি ইচ্ছা করি, জীবিত থাকতেও—আপনি কি পরীক্ষা করতে চান?"

হৃদয়োত্থিত দীর্ঘশ্বাস পুনর্মোচন পূর্ব্বক বংশানুগত চিরসুহৃদ্ ও সম্রাটবংশের একান্ত হিতকামী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভগ্নচিত্তে উঠিয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শাসননীতির এই নবসংস্কারে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া একটা ঘোরতর অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই অপ্রসন্ন প্রজাসাধারণ স্থানে স্থানে প্রকাশ্য ও গুপ্ত সভায় সমবেত হইয়া আপনাদের সেই অপ্রসন্নতা পরস্পরকে বিজ্ঞাপিত করিতে এবং ইহার প্রতিবিধান খুঁজিতেও আরম্ভ করিয়াছিল। সকলেই এই কথা বলিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছিল যে, এমন করিয়া অত্যাচার সহ্য করিতে থাকিলে অত্যাচারও তাহাদের এমনই করিয়াই পাইয়া বসিবে যে, তাহার আর একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত থাকিবে না। রাজকীয় অত্যাচারের স্বভাবই যে এই! যদি তাহা প্রথমাবধি প্রশ্রয় পাইয়া বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, প্রশ্রয়-প্রাপ্ত আব্দারে শিশুর মতই তাহা নিত্য নিত্য নূতন নূতন বায়না তুলিয়া নব নব উৎপাতের সৃষ্টি করিতে ছাড়ে না। অতএব যে পর্য্যন্ত অন্যায় সহ্য করা হইয়া গিয়াছে, সেই যথেষ্ট,— ইহার বেশী আর তাহারা সহিতে সম্মত নহে।

যখন এই পর্য্যন্ত বলাবলি হইয়া গেল, তখন এই একটা বিশেষ জটিল প্রশ্ন উঠিয়া পড়িল যে,—আচ্ছা, না হয় তাহারা আর রাজকীয় যথেচ্ছাচার সহিতে সম্মত নাই হইল, সেটা ত সোজা কথাই; কিন্তু সম্মত না হইয়াই বা তাহারা করিবে কি? সমস্যাটা এইখানেই যে সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। এই সমস্যার সমাধানই না দুরূহ? অত্যাচার সহিতে কোনও কালে কোনও দেশে এবং কাহাদেরও ভাল লাগে নাই; আজও না, তবে যে সেটাকে লোকে সহ্য করিয়া চলে, তার একমাত্র কারণ—শুধু তাহারা ইহার প্রতিরোধের উপায় খুঁজিয়া পায় না বলিয়া। নতুবা সাধ করিয়া বা শ্রদ্ধা করিয়া কাহারাও রাজ-অত্যাচারকে মাথায় তুলিয়া বহন করে না। তত বড় রাজভক্তি কোন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে যদি কোন দেশে বা কালে থাকে থাক, সাধারণ মানুষের ইহা ধর্ম্ম নহে। তবে মানুষের হাত পা না কি ঐখানেই বাঁধা পড়িয়া আছে, তাই নিরুপায়ে সহিতে হয়। কারণ, দেশের যত কিছু ধন-বল, জন-বল তাহার সবখানিই যে রাজার হাতে। আর সকল মানুষের সুখ, স্বার্থ, রুচি ও প্রবৃত্তিও ঠিক এক রকম নহে। বিশেষতঃ রাজপ্রসাদভোজী ধনি-সম্প্রদায় অন্তরে না হইলেও মুখে প্রায়শঃ রাজভক্ত হইয়া থাকে; বিশেষতঃ রাজা যতই অত্যাচারী হইবেন, ঐ সম্প্রদায়ের লোকগুলির পক্ষে ততই লাভ। কারণ, ইঁহারাও ত অনেক সময় রাজার পাপের সহপাপী এবং তাঁহার অনাচারের অন্ততঃ অর্দ্ধেকখানিরও হয় ত স্রষ্টা। কাজেই সাধারণ প্রজা মরিল কি রহিল, সাধারণতঃ এই শ্রেণীর লোক বড় একটা প্রণিধানযোগ্য বলিয়া বোধ করে না এবং নিজের সময়-রত্ন অযথা পরচর্চ্চায় নষ্ট করিয়া ফেলিবার কোন বিষম আগ্রহও ইঁহাদের নাই। দেশ রাজকরে প্রপীড়িত, সেই করভারের মোটা অংশ অবশ্য তাঁহাদেরও বহন করিতে হয়। তা হয় বটে, কিন্তু হইলই বা? এক দিকে তাঁহাদের যেমন দিতে হয়, তেমন পাওনাও ত আছে? মোটা মোটা বেতন আছে,

জমীদারীতে রাজানুকরণে কর ধার্য্য তাঁহারাও করিয়া থাকেন, তাহার উপর যাঁহাদের সুযোগ আছে, রাজকোষের অর্থও তাঁহারা শোষণ না করেন, তা'ও নয়। সেই হেতু প্রজা-সাধারণ ও প্রজা-অ-সাধারণ অর্থাৎ ধনিসম্প্রদায় প্রায়শঃই সহজে এক দলবদ্ধ হইতে পারে না এবং কথনও কোন দিনই হয় না। কিন্তু তাহার জন্য খুব বেশী ক্ষতিবৃদ্ধিও অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত ঘটিতে দেখা যায় নাই।

এ দিকে মহীপালদেবের অবিচার ক্রমশঃই তাঁহার অত্যাচার রূপে বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। রাজার অবিবেচনা সহানুভূতিহীনতা প্রভৃতি ছাড়িয়াও তাঁর অ-নীতিকার্য্যারম্ভেরও অনেক ছোট-বড় কাহিনী শুনা যাইতে লাগিল। সম্প্রতি এক নূতন গুরু-করণের পর হইতে পঞ্চমকার-সাধনা-প্রসঙ্গে অনেক কথাই উঠিয়া পড়িল। সে সকল অনাচারের কাহিনী শুনিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মিগণ কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক উচ্চারণ করিল, "বাসুদেব!"—সৌগতগণ দীর্ঘশ্বাস সহকারে সখেদে কহিয়া উঠিলেন, "হায় বুদ্ধ! এ'কি কুবুদ্ধি!"

জনকয়েক নির্ভীক ও বীর্য্যবান্ যুবক—বুকে সাহস যাহাদের বেশী এবং মরণকে ভয় যাহাদের কম, তাহারাই একটা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বৌদ্ধ বিহারে গিয়া সঙ্ঘস্থবিরগণকে, দেবায়তনে গিয়া ব্রাহ্মণদিগকে উত্তেজিত করিতে চাহিল—"এত বড় অন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়াও আপনারা নীরব কেন? কেহ কোন প্রতীকারচেষ্টা করবেন না?"

তাঁহারা তাঁহাদের অষ্টোত্তরী সাহস্রিকা, প্রজ্ঞাপারমিতার ও বেদের ভাষ্য করা স্থগিত রাখিয়া বিমর্ষমুখে উত্তর করিলেন, "আমরা কি করতে পারি? বিশেষতঃ রাজা যখন কোন ধর্ম্মই মানেন না, তখন রাজার সঙ্গে লাগ্‌তে গেলে রাজার হাতে আমাদের ধর্ম্ম শুদ্ধ অত্যাচারিত হতে পারে। হয় ত বা বিহার মন্দির লুণ্ঠিতই হ'বে! পুথিপত্র অগ্নিসাৎই হয়ে যাবে!

কে জানে? তাহা ভিন্ন ও সব রাজনীতি, আমরা ত আর রাজনীতিজ্ঞ নই, ধর্ম্ম এবং নীতি এই দুইটিই আমাদের অস্ত্র—যাদের সঙ্গে বর্ত্তমান রাজাধিরাজের কোন সম্পর্কই দেখতে পাওয়া যায় না।"

যুবকের দল তথাপি নাছোড়বান্দা, তাহারা তর্ক তুলি... "এ দেশে চিরদিনই রাজনীতি ও সমাজনীতি কি ধর্ম্মনীতির উপরেই প্রতি...ত ছিল না? ধর্ম্মনীতির সঙ্গে আজ রাজনীতিকে কি প্রকারে বিভেদ করছেন?"

মহামান্য ব্রাহ্মণ-কুলশেখর এক ব্যক্তি সে সময় নিবিষ্ট-মনে একাগ্রচিত্তে কাক-চরিত্রের, আলোচনায় গভীরভাবে নিমগ্ন ছিলেন, তিনি এই সময় মুখ তুলিয়া সখেদে উত্তর দিলেন, "আমরা এ বিষয়ে যোগ দিব কেমন করে? ঐ শুন! গৃহের বহির্ভাগে তোমাদেরই পশ্চাতের নিমগাছে কাক আজ কোন্ সুরে ডাক পাড়ছে! 'কঃ কঃ', ইহার অর্থ বুঝতে পার? ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, শুধু রাজোপদ্রব! এ যে একেবারে নিশ্চিত অখণ্ডিত, এর কি কিছু প্রতিবিধান আছে? আবার ঐ শোন—শোন! ওরা স্বর বদলেছে! বলছে, 'কৌলো কৌলো'—অর্থাৎ কি না নিষ্ক... ক্ষতি! কে তা' স্বীকার করতে যাবে?"

বাশিভা সঙ্ঘারামের সন্ধ্যারতি সমাধা হইয়া গিয়াছিল। মন্দির-মধ্যে ধ্যানমগ্ন ভগবান্ বুদ্ধের প্রকাণ্ডাকার স্বুবর্ণমূর্ত্তি বিরাজমান। অগুরুচন্দন, গুগগুল, কর্প্ূরাদির ধূমে এবং অসংখ্য দীপাবলীর উজ্জ্বলালোকে দেবস্থানকে যেন যুগপৎ ছায়ালোকে মণ্ডিত ও মূর্ত্তিকে যেন সজীব বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। এই বিশ্ব-বিশ্রুতকীর্ত্তি পালসাম্রাজ্যের কীর্ত্তি-দীপান্বিত পাদপীঠতলে দাঁড়াইয়া আজ যে গৌড়রাজলক্ষ্মী তাঁহাদের নিকট সমস্ত ঋণজালকেই বিস্মৃতির অতল জলে ডুবাইয়া দিয়া বিদায়গ্রহণে সমুদ্যতা—সে জন্যও সেই মহাত্যাগী স্মর-রিপুর চিত্তে যে কোনই বিকার উপস্থিত হয় নাই—তাহা তাঁহার সেই স্মিতহাস্যে অনুরঞ্জিত ও চিরপ্রশান্ত মুখচ্ছবি

দ্বারাই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছিল। কেনই বা হইবে? একমাত্র নির্ব্বাণ ব্যতীত যাঁহার চিত্তে স্বর্গাদি ভোগলিপ্সারও স্থান হয় নাই, জাগতীয় এবং জগদতীত সকল সুখ-সম্পদই যাঁহার কাছে নশ্বর ও তৃণাদপি তুচ্ছ, শত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনে তাঁহার সেই শান্তরসাস্পদ চিত্তে বিক্ষোভ কেমন করিয়াই বা আসিবে?

দেবমূর্ত্তির সম্মুখস্থ সুপ্রশস্ত কক্ষের স্তম্ভগুলি জাতকের নানাবিধ ঘটনা-বৈচিত্র্য লইয়া চিত্রিত। তাহাদের মাথার উপরকার ছাদ খিলানের ভাবে অর্দ্ধবক্রাকারে অবস্থিত। ভাস্কর্য্যের আদর্শীভূতা মৎস্য-নারীগণের হস্তে ধৃত হইয়া সেই সভাগৃহের সুবৃহৎ ছাদ স্থির রহিয়াছে। তাহারও অভ্যন্তরভাগে সুনিপুণ চিত্রকর দ্বারা উজ্জ্বল বর্ণ সমাবেশে শাক্য-সিংহ বুদ্ধের লুম্বিনী উদ্যানে জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কুশী নগরীর উপকণ্ঠস্থ শালবন মধ্যে মহাপরিনির্ব্বাণলাভ পর্য্যন্ত সকল দিনের সকল ঘটনাই সুনিপুণ চিত্রণে চিত্রিত রহিয়াছে। এমন কি, ঘৃণ্যা নারী আম্রপালীর উদ্ধারসাধনরূপ মহৎ কার্য্যও ইহাতে বাদ পড়ে নাই।

মঠের সভা-মণ্ডপে মঠাধ্যক্ষ সভাচার্য্য মহাস্থবির সর্ব্বজ্ঞশান্তি আসীন, আর তাঁহাকে ঘেরিয়া অসংখ্য পীতবাসধারী মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষুক ও ভিক্ষুণী শান্তভাবে উপবিষ্ট। শ্রমণ ও শ্রামণের কয়েকজন ইঁহাদের পশ্চাতের আসন লইয়াছেন। বৈদেশিক দিন কয়েকমাত্র এ স্থান হইতে প্রস্থিত হইয়া সমতটাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

এক দল যুবা নাগরিক আসিয়া শাস্ত্রচর্চ্চার মাঝখানে বাধা দিয়া উত্তেজিত ব্যগ্র কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "পুথিপত্র বন্ধ ক'রে সকলে সমবেত হোন—দেশ যে অরাজকতার অ-নীতিতে ডুবে গেল! আজ পারমিতা পালন ক'র্‌বে কে? দোহাই সুগতের! সঙ্ঘ আজ সঙ্ঘ-শক্তির বল দেখাক।"

মহাস্থবির সর্ব্বজ্ঞশান্তি তখন জগতের নশ্বরত্ব ও নির্ব্বাণের অথৈতুক শান্তিরস সম্বন্ধে প্রোজ্জ্বল মুখে ও জ্বলন্ত ভাষায় উপদেশ দিতেছিলেন। তরুণ বিদ্রোহী দলের নেতৃবৃন্দকে সম্বোধন পূর্ব্বক শান্তস্বরে কহিলেন, "পুথিপত্র বন্ধ ক'রলেই কি সেই অনীতি-কার্য্যের চরমে গিয়ে পৌঁছান যাবে না বৎস? রাজনীতির সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মনীতির কোনই সংযোগ নাই। হিংসার পরিবর্ত্তে বরং অহিংসাকে আশ্রয় করবে এস, ধর্ম্ম নিয়ে আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি, পরন্তু অধর্ম্মের জন্য নয়।"

নেতা অসহিষ্ণুতায় উত্তেজিত হইয়া কহিয়া উঠিল, —"আত্মমর্য্যাদা-রক্ষার চেষ্টা যদি অধর্ম্ম হয়, অরাজকতার উচ্ছেদ চেষ্টা বিরহিত নিশ্চেষ্ট পুঁথিপাঠই যদি ধর্ম্ম হয়,—তবে সে ধর্ম্ম যত শীঘ্র আর্য্যাবর্ত্তের বাইরে বেরিয়ে চলে যায়, ততই তার পক্ষে মঙ্গল! যাতে মানুষকে জড়ত্ব দান করে, অমানুষে পরিণত করতে চায়, সে অধর্ম্ম, তা কখনই ধর্ম্ম নয়।"

মহাস্থবির ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "দেশ যে অনীতিতে ডুবে গেছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তুমি নিজেই!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নবীন যৌবনের আশা-আনন্দ যে কত সহজেই সমস্ত ভবিষ্যৎটাকে চির জ্যোৎস্না-জড়িত সন্তানক-পারিজাত-সৌরভামোদিত নন্দন-কাননে কল্পনা করিয়া ভূতলে স্বর্গসুখানুভব করিতে থাকে, তাহা সেই নবীন জীবনই শুধু জানে—অথবা সেও বুঝি তাহা জানে না। মহারাজকুমার রামপালদেবের সুখের পাত্র যেন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। প্রভাত হইতে না হইতেই তিনি সকল কর্ম্মের মধ্য দিয়া উৎকর্ণ ও

উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রহর গণনা করিতে থাকিতেন ; সূর্য্যের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সুগৌর মুখ আলোহিত হইয়া উঠিত, পট্ট-মহাদেবীর মহল্লিকা দ্বারসন্নিহিত হইবামাত্র এক লম্ফে পালঙ্ক ত্যাগ করিয়া হর্ষস্মিতমুখে অন্তঃপুরাভিমুখী হইতেন। সেখানে প্রথমতঃ মহাদেবীর পাদবন্দনাদি যথারীতি সমাধা পূর্ব্বক তাঁহারই আদেশপালনার্থ পার্শ্ববর্ত্তী ঘরের দিকে আগ্রহভরা চিত্ত এবং ব্যগ্র বাহুদ্বয় বিস্তৃত করিয়া প্রবেশ করিতেন। সেখানে প্রবেশ করিবার পর ? পূর্ব্বের সেই সলজ্জ তিরস্কারের সহিত সেখান হইতেও "না,—তুমি যাও"—এ অভ্যর্থনা লাভের যে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়! এমন কি, সে দিক্ দিয়াও যে একটি তরুণ হৃদয় এমনই অধীর প্রতীক্ষায় উৎসুক হইয়া থাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, এ সন্দেহ জন্মিবার পক্ষেও অবস্থা নিতান্তই প্রতিকূল ছিল না। এই নব প্রেমমোহে ও ইহারই মায়াস্বপ্নে বিমোহিত হইয়া মহারাজ-কুমার রামপালদেব নিজের সাংসারিক লাভ-ক্ষতি সমস্তকেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন ;—এমন কি তাঁর মাথার উপর দোদুল্যমান নিষ্ঠুর মৃত্যুর খড়্গাঘাতকে পর্য্যন্ত।

এমনই সময় এক দিন বাহিরের দিক্ হইতে একটা অপ্রিয় জনরব তীব্রস্বরে ভাসিয়া আসিয়া, এমন কি, রাজবাড়ীতেও প্রবেশপথ করিয়া লইল। কথাটায় অবিশ্বাস করিবার বিরুদ্ধে বড় বেশী প্রমাণ পাওয়া যায় না—অনেকেই ইহা নির্ব্বিচারে বিশ্বাস করিল, ইহাদের মধ্যে রামপালদেবও এক জন। কিন্তু তিনি সযত্নে এই জনরবটাকে অন্তঃপুর-প্রাচীরের সীমার বাহিরে রক্ষাচেষ্টা করিয়াই গোপনে ইহার যথার্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানে সচেষ্ট হইলেন। কঠিন প্রতিঘাতময় সংসার আবার যেন বাস্তব মূর্ত্তিতেই প্রকটিত হইল। হায় জগতের সুখ! কি ক্ষণস্থায়ীই তুমি ?

সে দিন যখন মহল্লিকা সিদ্ধা মহারাজকুমারের নিকট পট্টমহাদেবীর

আহ্বানবার্ত্তা দিতে আসিল, তাঁহার মুখ ম্লান দেখাইতেছিল। মহাদেবীকে প্রতিদিনের মতই পাদ-বন্দনা করিলেন, কিন্তু মুখে তাঁহার সে দিন আর সেই হৃদয়োৎসারিত হাস্যচ্ছটা মুহুর্মুহুঃ চকিত হইতেছিল না এবং রহস্যপূর্ণ সরস বাক্যাবলীও কণ্ঠসীমায় রুদ্ধ হইয়া রহিল। মহাদেবী উৎকণ্ঠিত বিস্ময়ে পুনঃ পুনঃ দেবরের মুখ নিরীক্ষণ করিলেন, সংশয়পূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরীর সুস্থ আছে ত ?"

নতমুখে ঈষৎ আগ্রহ দেখাইয়া রামপালদেব উত্তর করিলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদে এ'ত লোহার শরীর !"

পুনশ্চ সন্দিগ্ধ দৃষ্টি উঁহার আনতমুখে প্রেরণ করিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে লজ্জাদেবী কহিলেন, "রাত্রে ছোট রাণীর সঙ্গে ঝগড়া করেছ কি ?"

এবার রামপালদেব সত্য সত্যই হাসিয়া ফেলিয়া মাথা নাড়িলেন। কিন্তু সে হাসি দেখিয়াও তাঁহার কথায় লজ্জাদেবীর পুরাপুরি বিশ্বাস হইল না, তাই তিনি পুনশ্চ নির্ব্বন্ধ সহিত কহিলেন, "আমার দিব্য, কিছু ঘটে নাই ?"

রামপাল এবার বিশেষ বিপন্ন বোধ করিলেন। ভ্রাতৃজায়াকে তিনি মাতৃবৎ ভক্তি ও সম্মান করিতেন, মাতৃহীন রামপালকে তাঁর ভ্রাতৃজায়াও ঠিক তেমনই ভালবাসিতেন। সেই লজ্জাদেবী যখন তাঁর দিব্য দিয়া বিষণ্ণতার কারণ জানিতে চাহিতেছেন, তখন উঁহার নিকট গোপন রাখা তাঁহার পক্ষে কঠিন। অথচ বলিবেনই বা তিনি কি ? ঈষৎ চিন্তা করিয়া সচেষ্টায় মুখে হাসি আনিয়া কহিলেন, "আপনার দিব্য মহাদেবি ! ঝগড়া আমি করিনি এবং কখন করি-ও না। আপনার যে ঐ ক্ষুদ্র দাসীটি—ঐ ছোট বোন্‌টি আপনাদের সাক্ষাতে নিতান্ত শান্তমূর্ত্তি, কিন্তু মোটেই উনি ভালমানুষটি ন'ন, ঝগড়া ঐ উনিই ক'রেন, আমার কোন দোষ নেই।"

এই উত্তর মহাদেবীর সংশয়ভারাক্রান্ত চিত্ত লঘুতর করিয়া দিল,

স্নেহ কোমল কৌতুকহাস্যে তাঁহার কোমল ওষ্ঠাধর অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। প্রীতিমধুর স্বরে তিনি সহাস্যে কহিলেন, "তুমি ভাই মোটেই ঝগড়াটে নও! তা নইলে আর বাড়ীতে ব'সে তোমার ঝগড়ার সাধ মেটে না, ঝগড়া বাধাতে মহোদয় পর্য্যন্ত তোমায় ছুটতে হয়? তা যাও, এখন কোন্দল ভেঙ্গে ভাব-সাব ক'রে ফেল গে, আজ কিন্তু একটু সকাল সকাল ক'রে ছুটী দিও। বিকালে ভাগবতকথা শুনতে পায় যেন।"

রামপাল বিনীত ভাবে "যে আজ্ঞে"—বলিয়া পুনশ্চ তাঁহার পদধূলি লইয়া উঠিয়া পড়িলেন, কিন্তু লজ্জাদেবী ঠিক এমনটি না কি প্রত্যাশা করেন নাই, তাই তাঁহার এই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ব্যবহারটাও তাঁহাকে কিছু বিস্মিত করিয়াছিল। তিনি আশা করিতেছিলেন, তাঁহার এই চাঞ্চল্যময় তরুণ দেবরটি এখনই মুখর রবে হাসিয়া উঠিয়া সেই হাসিমুখে বলিয়া বসিবে,—"ভাগবতকথা শুনে আর কি হবে? তার চেয়ে আমার কথাই বরং একটু বেশী ক'রে শুনিয়ে দেবো এখন"—এবং এইরূপ বেফাঁস কথা বলার জন্য তিরস্কৃত হইয়া অধিকতর হাসিবে।

সন্ধ্যা সে দিন সবিস্ময়ে দেখিল, সে প্রতীক্ষা করিতে থাকিলেও তার ক্ষুদ্র দেহ তার স্বামীর সবল ভুজে আকৃষ্ট হইয়া তাঁর নিবিড় আলিঙ্গনবদ্ধ হইল না। তিনি গৃহ-প্রবিষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে তার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া অদূরে দাঁড়াইলেন। তাঁর উভয় বাহুই নিজের বক্ষোবদ্ধ হইয়া রহিল, তাঁর হাস্য-সরস ওষ্ঠাধর ম্লান ও পরস্পর দৃঢ় সংযুক্ত হইয়া রহিল, তাঁর প্রশস্ত ললাটে গভীর চিন্তারেখা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তাঁর সমুজ্জ্বল আয়ত নেত্রে ব্যথার চিহ্ন প্রকটিত হইয়া রহিল, কি যেন একটা নিদারুণ দুশ্চিন্তার ভারে বক্ষ তাঁহার গভীর ভারাক্রান্ত রহিয়াছে, ইহা স্পষ্টই জানা যাইতেছিল। সন্ধ্যার বৎসরাধিককাল বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু স্নেহময় সদানন্দ স্বামীর এমন চিন্তা-গভীর মুখ ও নির্লিপ্তভাব সে কোন

দিনই প্রত্যক্ষ করে নাই। তাই তার ক্ষুদ্র বক্ষ সংশয়ে ও ভয়ে দুলিয়া উঠিল, মনে মনে বুঝি একটুখানি অভিমানও জাগিয়া উঠিয়াছিল; ঈষৎ সরিয়া দাঁড়াইয়া নতমুখে সে পায়ের আঙ্গুল দিয়া কক্ষভূমির রক্ত প্রস্তর খুঁটিতে লাগিল। স্বামী নিশ্চয়ই তার উপর বিরক্ত হইয়াছেন, মনে করিয়া, তার আদর-প্রত্যাশী স্নেহচ্ছায়া-রক্ষিত ভীরু চিত্ত কুণ্ঠাজড়িত হইয়া গেল, দুটি নেত্র অভিমানে ছলছল করিয়া আসিল।

রামপাল লজ্জাদেবীর নিকট অতি কষ্টে যে ধৈর্য্যের বাঁধ বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে আসিয়াই তাহার বেগ সম্বরণ করা তাঁর মত সবলচিত্ত পুরুষেরও পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল; তাই ক্ষণকাল নিঃশব্দ বেদনায় স্তব্ধ থাকিয়া সযত্নে আত্ম সংবরণ করিয়া লইতেছিলেন। ঐ পবিত্র-চরিত্রা ও মধুর-স্বভাবা মহীয়সী নারীর একান্ত দুর্ভাগ্য-জীবনের কথা স্মরণে একটি সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন পূর্ব্বক মনে মনে সখেদে কহিলেন—'তুমি আমায় সবই দিয়েছ, কিন্তু আমি তোমার একটুখানি ঋণও যে শোধ করতে পারলাম না,—আমার মনে এই বড় দুঃখ রইলো!'

সেই গভীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দে সন্ধ্যা গভীরভাবে চমকিয়া উঠিল। এত বড় দীর্ঘনিশ্বাস সে ত আর কখন কাহাকেও ফেলিতে শুনে নাই? সে জানে—শুধু এইটুকুই জানে যে, অনেকখানি দুঃখ না পাইলে কেহ দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে না। আর এত বড় নিশ্বাসের মূলে যে অনেক বড় ব্যথা নিহিত আছে, সেই বালিকার মনে তৎক্ষণাৎই এই সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। সে নিজের অনাদরের ব্যথাভিমান নিমেষমধ্যে বিস্মৃত হইয়া চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল—এ কি! তার স্বামীর সেই অনিন্দ্যসুন্দর সৌম্যমুখ কি অপরিসীম বেদনা ম্লান!

"কি হয়েচে তোমার? অমন ক'রে কেন তুমি চেয়ে আছ?"—এই

কথা কয়টি অতিশয় সঙ্কোচের সহিত বলিতে বলিতে সন্ধ্যারাণী স্বামীর খুব কাছের দিকে সরিয়া আসিল। তার ইচ্ছা করিতেছিল, নিজের ক্ষুদ্র দুইখানি হাত দিয়া তাঁর সেই সকল চিন্তাম্লানতাকে এক মুহূর্ত্তেই সে ঠেলিয়া সরাইয়া দেয়, কিন্তু যতই হউক, হৃদয়ে তার যত বড়ই প্রেমের উৎস সহস্র ধারায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার জন্য উদ্যত হইয়া থাকুক, তবুও সে বালিকা—ক্ষীণা, দুর্ব্বলা, লজ্জাবতী নবোঢ়া—সে অফুরন্ত স্নেহধারার অজস্র বর্ষণকে ইচ্ছাসুখে সে ত এখনও উৎসারিত করিয়া দিতে ভরসা করে না। সরমে বাধিয়া যায় যে! তাই মনের বাসনা মনের মধ্যেই সংযত রাখিয়া সে শুধু তার করুণা-কাতর চোখ দুটিকে মেলিয়া দিয়া, বিমলিন উর্দ্ধমুখে স্বামীর মুখের পানেই চাহিয়া রহিল।

ততক্ষণে মহারাজকুমারেরও সহসা নিজ ব্যবহারের অসঙ্গতি বোধগম্য হইয়াছিল। অনর্থক একটি সুকুমার কোমল চিত্তে বেদনা দিয়া ফেলিয়াছেন বুঝিয়া তিনিও অনুতপ্ত ও যথাসম্ভব আত্মদমন পূর্ব্বক ঈষৎ হাসিবার চেষ্টা করিয়া স্ত্রীর হাতখানি ধরিয়া কহিলেন,—"দেখছিলুম, তুই কি করিস।"

"কক্ষনো নয়, তুমি নিশ্চয় আমার উপর রাগ করেছ—বল, আমি কি করেছি?"

এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে অভিমানিনী আদরিণীর নীলোৎপলনেত্র অভিমানাশ্রুতে ভরিয়া উঠিল ও দেখিতে দেখিতে শুক্তি-শুভ্র স্বচ্ছ গণ্ডের উপর সেই নির্ম্মল অশ্রুবিন্দুগুলি যেন অম্লান নিটোল মুক্তাবলীর মতই ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া রামপালদেব ব্যথিত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন; কহিলেন "তোর উপর তোর শত্রু যে, সে-ও যে রাগ করতে পারে না, রাণি! আমি কেমন ক'রে পারবো?"

সন্ধ্যা সলজ্জ হাস্য-স্মিত মুখে চোখ মুছিয়া গভীর লজ্জাভরে স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইল।

"তুই যে সত্যি সত্যি কেঁদে ফেল্লি, রাণি! ভারী কিন্তু ছেলেমানুষ তুই! আচ্ছা, কাঁদ্‌লি কেন বলত?"

সন্ধ্যা তাহার অরুণাভাযুক্ত মুখখানাকে স্বামীর বিশেষ চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াও জোর করিয়া লুকাইয়া রাখিয়া সুখোৎফুল্ল কণ্ঠে [illegible] কৃতকার্য্যের জন্য ঈষল্লজ্জিত ও ভগ্ন স্বরে মৃদু স্খলিত বাক্যে উত্তর করিল, "[illegible] আমার সঙ্গে কথা কইলে না? আমার বুঝি ভয় করে না, হ্যাঁ!"

সন্ধ্যার এই অভিমান-প্রচ্ছাদিত সরল অভিব্যক্তিতে সহসাই রামপাল-দেবের আহত হৃদয়ের ঈষৎ উপশমিত বেদনা-বহ্নি পুনঃপ্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কি জন্য যে তাঁর আজ তাঁর একমাত্র প্রাণতমার নিকট অনবধানতার অত বড় ত্রুটি ঘটিতে পারিয়াছিল, সেই বিষম স্মৃতিজ্বালা তাঁহার বক্ষতলে আবার ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তি[illegible] সেই কথাটাই ভাবিয়া আবার একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন।

"ঐ দেখ!" বলিয়া সন্ধ্যা সচমকে স্বামীর বক্ষে লুকানো মুখ আপনা হইতেই ত্রস্তে উঠাইল।

"ঐ দেখ,—আবার তুমি তেম্‌নি ক'রেই নিশ্বাস ফেল্‌চো! আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌চি, তোমার মন ভাল নেই। কিন্তু তুমি রাজপুত্র, তোমার কিসের অভাব? তা হ'লে নিশ্চয়ই আমার কোন দোষের জন্যে তোমার মনে দুঃখ হয়েছে, তাই—"

বলিতে বলিতে সন্ধ্যার স্বর গাঢ় হইয়া আসিতে লাগিল ও তাহার সুন্দর মুখখানি সান্ধ্য-কমলের মতই ম্লান হইয়া গেল।

তখন মহারাজকুমার পুনশ্চ একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী আসনে বসিয়া পড়িয়া ব্যথাক্ষুব্ধ কণ্ঠে মৃদুস্বরে কহিলেন,

"রাজপুত্র হ'লেই কি সুখী হয়, সন্ধ্যা? যারা হয় তারা উপকথার রাজপুত্র, সত্যকার নয়। আমার মনে হয়, রাজপুত্র, রাজরাণী এরাই সংসারে সবার চাইতে বেশী অসুখী। বসো, রাণি! আমার দুঃখের কথা তা' হ'লে তোমায় আজ একটু বলি, শোন! কা'কেই বা বলি?—আমি তখন ভাবছিলুম, আমাদের বাড়ীতে এই যে নিত্য নিত্যই দেবতার অবমাননা ঘটতে দেওয়া হচ্চে, এর পরিণাম কখন কি ভাল হ'তে পারে? এর কি সত্যই কোন প্রতীকার নেই? অথবা নিতান্ত স্বার্থপর আমরা, শুধু নিজেদের সুখ-স্বার্থ টুকু আগলে ব'সে থেকে এর কোন প্রতিবিধানের চেষ্টা করছি না? তা যদি হয়, তবে রামপালের বেঁচে থাকাকেই শত ধিক্!"

সন্ধ্যা এ কথার অর্থবোধ করিতে না পারিয়া ম্লানভাবে চাহিয়া রহিল। রামপাল আপনার মনের উচ্ছ্বাসেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"যখন আমার জ্যেষ্ঠের বিয়ে হয়, আমি তখন বালক, ভাল করে জ্ঞান হ'বার পর মা দেখিনি। সৎমা ছিলেন, তিনি আমাদের দিকে চেয়ে-ও দেখতেন না। নিজের মায়ের মুখ ভাল ক'রে মনে পড়ে না; কিন্তু 'মা' শব্দটা মনে হ'লেই আমার—চোখে ভাসে, আমার ওই জ্যেষ্ঠা-ভ্রাতৃবধূর করুণাপূর্ণ মুখ! আমার রাজরাজ্যেশ্বরী জননীর স্নেহভরা হাসিটী! ও মুখ সুন্দর কি কুৎসিত, যুবতীর কি প্রৌঢ়ার, তা আমি জানিনে, রাণি! আমি জানি, বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য, সকল ঐশ্বর্য্য, সকল মহিমা, সকল গরিমা আমার ঐ রাজেন্দ্রাণী মা'র মুখে ভরা আছে! লোকে কি চোখ নিয়ে দেখে, জানিনে, আমি ত আমার ঐ দেবী-মূর্ত্তির মধ্যে মহামায়ার মহিমাময়ী ভাব, বাণীর বুদ্ধিমত্তা, কমলার কোমলতা একাধারে সবটুকুই পরিপূর্ণ দেখতে পাই। আর আমার সেই মা'কে যখন অবমানিতা—অনাদৃতা হ'তে দেখি, সন্ধ্যা! ভেবে দেখ দেখি"—

সঙ্কুচিতা সন্ধ্যা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, তার যোদ্ধ্ পুরুষোচিত সবলচিত্ত স্বামীর কণ্ঠ ও নেত্র সজল এবং স্বর বাষ্পাবেগে প্রায় অবরুদ্ধ ও কম্পিত। তাহারও ক্ষুদ্র করুণ চিত্ত স্বামীর এই সুস্পষ্ট চিত্ত চাঞ্চল্য দর্শনে আবেগে আলোড়িত হইয়া উঠিল। স্বামীর সহিত সহানুভূতি জানাইবার প্রবল ইচ্ছা হইল, কিন্তু সরলা বালিকা কেমন করিয়া তাহা প্রকাশ করিবে, তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাইল না, তাই নিরুপায় অসহিষ্ণুতায় বিপন্ন হইয়াও নীরব রহিল এবং নীরব থাকার কুণ্ঠায় নিজের প্রতি মনে মনে দারুণ বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

রামপাল ক্ষণপরে পুনশ্চ একটা দীর্ঘতর শ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে তাহা পরিত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "তুমি জান না, রাণি! তাঁর জন্য মনের মধ্যে আমার কত অশান্তি। তোমার কাছে এতটুকু একটু আদর পেলেও আমার মনের মধ্যে ক্ষোভের হাহাকার হা হাঁ ক'রে জেগে ওঠে, মনে হয়, আমার স্নেহময়ী মহাদেবী কোন দিনই হয় ত এমন ক'রে স্বামীর প্রতি তাঁর ভালবাসা জানাতে অবসর পাননি! এই মনে ক'রে বুকে আমার যে ব্যথা লাগে, তাতে আমার সুখের রাত্রি কতবারই বিষাদ-নিশায় পরিণত হয়ে উঠেছে।—না:, থাক, তোমার চোক দিয়ে জল পড়চে! বালিকা তুমি, সরলা তুমি, এ সব অসহ্য দুঃখের ভার তুমি বইবে কি ক'রে? অথচ তোমরা সকলেই দেখছো, যাঁর জন্য আমার মনে এত দুঃখ, নিজে তিনি লোকের চোকে নিজের কোন গৌরবকেই এতটুকু খর্ব্ব হ'তে দেন নি! তাঁর অন্তরের কন্দরে কন্দরে যে আগ্নেয়গিরির অগ্নিজ্বালা অহরহঃ উথলিত হচ্চে, সে কি কেউ কোনদিন ধারণা করতে পেরেচ? আমার নিজের অভাব—নিজের দুঃখ আমি তাঁর কথা মনে হলে একেবারেই ভুলে যাই।"

সন্ধ্যা অত্যন্ত ভীরুভাবে স্বামীর কাছে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া আসিয়া

তাঁর পায়ের কাছটিতে বসিয়া পড়িল, একখানি হাত তাঁর জানুর উপর স্থাপন করিয়া সেই হাতটির উপর নিজের চিবুক রাখিয়া অত্যন্ত মৃদু ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এর কি কোন উপায় হয় না ?"

রামপাল অকস্মাৎ এই প্রশ্নে যেন স্বপ্নাচ্ছন্নাবস্থা হইতে চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। "এর কোন উপায় ? হ্যাঁ, এর কোন উপায় যাতে হয়, তাই আমায় এবার করতে হবে—না হ'লে আমার বিবেকই আমায় যে কৃতঘ্ন ব'লে ধিক্কার দিচ্চে, সে আমার আর সহ্য হচ্চে না। এস রাণি ! আজকের মত আমরা বিদায় নিই। আজ আমায় একবার কোনক্রমে রাজাধিরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই হবে। অবশ্য তা'তে যে বেশী কিছু ফল হবে, এমন কোন আশা দেখিনে, তথাপি এ যেন আমার কর্ত্তব্য ! পিতার মৃত্যুর পর সাত বৎসরও এখন অতীত হয়নি, অথচ এরই মধ্যে সাম্রাজ্যের এ কি শোচনীয় অবস্থা হয়ে এল !—আর এই যে গৃহের মধ্যে গৃহদেবী সততই লাঞ্ছিতা হ'তে লাগলেন, এতে কি রাজ্যের মঙ্গল হ'তে পারে ? আমি তাঁর ভাই,—আমারই এর প্রতিবিধান-চেষ্টা করা কর্ত্তব্য এবং আমি তা' করবো।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সেদিন অপরাহ্ণে ভ্রমণোপযোগী বেশে কুমার রামপাল অশ্বারোহণে একাই বাহির হইয়া গেলেন, কিন্তু প্রতিদিনের নিয়ম মত বোধিদেবের গৃহে গিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আজ বেড়াইতে বাহির হইলেন না, রাজ-প্রাসাদ হইতে কতক দূরে মহীপতি মহীপালের নব-নির্ম্মিত "মহীন্দ্র-ভবন" নামধেয় সুরম্য প্রাসাদ ভবনাভিমুখী হইলেন। এই মহীন্দ্র-ভবন নামক

সুরম্য পুরীটীও পুরাতন রাজপ্রাসাদের মত ন... উপরেই সংস্থাপিত। বর্ষাবারি রাশি উন্মুখ আগ্রহে বাহু প্রসারিত ক...াসিয়া যেন তাহাকে নিজবক্ষে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছে। নদীর প্র... বিশালবক্ষে ইহার সুরম্য উদ্যান মধ্যবর্ত্তী সুধা-ধবলিত সৌধকুলের সমুন্ন...র্দ্ধদেশ প্রতিবিম্বিত হইয়া যেন চিত্রার্পিত হইয়া আছে। নদীর কু...র সলিল রাশির অতি নিকটেই অজস্র ফুটন্ত কুসুমসম্ভারে সমাচ্ছন্ন বৃক্ষা... যেন শৈল সুতার নিত্যপূজার শ্রদ্ধাঞ্জলি পাতিয়া রাখিয়াছে। শ্বেত রক্ত ...াটল-নীল বিবিধ বর্ণের জবাকুসুম প্রতি প্রভাত সন্ধ্যায় অজস্র পরিমাণে ...ফুটিত হইয়া দাতার অভাবে আপনারাই যেন জবাকুসুম সঙ্কাশের উদ্দে... আপনাদের অর্ঘ্য স্বরূপে সজ্জিত করিয়া দিতেছিল। এতদ্ভিন্ন ...ক-চামেলি, কুন্দ-কুরুবক্ কৃষ্ণচূড়া-কৃষ্ণকলি, সন্ধ্যামণি-সূর্য্যমুখী, মল্লিকা-ম..., কামিনী কাঞ্চন, এবং অপরাজিতা ও অতসী কাহারও অভাব দে... যায় না। নদীতীরে পাথরে বাঁধা ঘাটের পাশে সুসজ্জ প্রমোদ তরণী রা...—আরোহীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

সুপ্রশস্ত শ্রেণীবদ্ধ সোপানের উপর সুবিস্তৃত পাষাণ চত্বর। চতুরস্র সেই সুমার্জ্জিত চত্বরের উপর মূল্যবান রক্তবর্ণের কারু-খচিত মহাচীনদেশজ অত্যুৎকৃষ্ট আসন বিস্তৃত, ইহার চারিপাশে রাজ-বন্ধুদিগের জন্য বিশ্রামাসন সকল সংস্থাপিত, মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব অপরাহ্ণের পুষ্পবাস সুরভিত, নদী জলকণাসরস বায়ু সেবন করিতে করিতে সখাগণের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন।

ইহাঁদের একপার্শ্বে কতকগুলি বাদ্যযন্ত্র লইয়া জন কয়েক লোক একখানি সুদৃশ্য আসনের উপর আসিয়া বসিল এবং ইহাদেরই সমভি-ব্যাহারিণী এক অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণী আসিতেই সপারিষদ স্বয়ং মহা-রাজাধিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক হাত

ধরিয়া আনিয়া নিজের শিল্প কৌশলের সারভূত প্রশস্ত আসনের অর্দ্ধাংশে বসাইলেন! চারিদিক হইতে একটা প্রশংসাসূচক কলরবও উত্থিত হইল, কিন্তু সে শব্দটা কতকটা জড়িত ও অস্ফুট কণ্ঠের এবং সেই মদমত্ত অর্দ্ধস্ফুট স্বরলহরী একটা অর্থহীন কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াই অতি সহসা থামিয়া পড়িল।

পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব হর্ষগদ্‌গদকণ্ঠে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান কালের নর্ত্তকীশ্রেষ্ঠা চন্দ্রকলাকে বলিতে লাগিলেন, "সঙ্গীত-বিদ্যার জীবন্ত সরস্বতী! নৃত্যকলার বর্ত্তমান ভরতমুনি! নাট্যলীলার নটরাজ! আপনার আগমনাশায় আমরা এই দেখুন, উৎকণ্ঠিত হয়ে পথ চেয়ে রয়েছি।—আপনাকে স্বাগত জানাচ্চি।"

নর্ত্তকী চন্দ্রকলা তার মন্মথের পুষ্পধনুতুল্য ভ্রূযুগলে তীক্ষ্ণ গুণ চড়াইয়া হাস্যকুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সুখালস মৃদু মৃদু স্বরে উত্তর করিল, "রাজাধিরাজ! কত যে ঠাট্টা করতেই পারেন! হুঁ আমি কিছুই জানি নে' কি না? ও সব ব'লে আমায় কেন মিথ্যে স্তোক দিচ্চেন!"

মহীপালদেব সুরাপান বিহ্বল কলকণ্ঠে ব্যস্ত হইয়া প্রতিবাদ করিতে গেলেন, কহিতে লাগিলেন, "না সুন্দরি! বাস্তবিকই আমি তোমার একান্ত গুণমুগ্ধ! বসন্তলেখা, বিদ্যুন্মালা তোমার তুলনায় কা'কেও আমি আর এখন সুন্দরী বোধ করতে পারি নে'। বিশেষতঃ যে দিন থেকে তোমার গান শুনেছি, আমি জীবন্তে মরেছি!"

নর্ত্তকী কহিল, "হাঁ গো মহারাজাধিরাজ! তার জন্যেই বুঝি এই সে দিন সিংহলদেশ থেকে মুক্তাহার আনিয়ে তাকে পুরস্কার দেওয়া হ'ল?"

রাজপাদসেবী দাস দ্বারা আনীত স্বর্ণপাত্রপূর্ণ সুধাসার গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা চন্দ্রকলার অধরে ধরিয়া উৎসুক আবেদনে রাজাধিরাজ কহিলেন "এর জন্য আর দুঃখ কিসের নর্ত্তকীকুলেশ্বরি? তোমার জন্য এ

মাসের মধ্যে সপ্ত সাগরের তলদেশ ছেনে মুক্তাশ্রেষ্ঠ আহরণ করিয়ে তোমার চরণবিলম্বী হার গাঁথা হ'বে, এই তোমায় কথা দিলাম। হ্যাঁ, ভাল কথা! পট্টমহাদেবীর মুক্তা মালা এখনও তো রাজভাণ্ডারে পড়েই রয়েছে!"

নর্ত্তকী প্রফুল্ল হইয়া উঠিল ও ক্ষণপরে রাজাজ্ঞায় তাহার সমস্ত শিক্ষা ও কণ্ঠ-মাধুর্য্য দিয়া তাঁহাদের চারিদিকের এই সমস্ত কদর্য্য মদোন্মত্ততা ডুবাইয়া, তাহার মধুর কণ্ঠ মুক্ত শুভ্র উদার আকাশতলে ভাসিয়া উঠিল। বোধ হইল, যেন একসঙ্গে কোকিল, পাপিয়া, দোয়েল আজিকার এই শান্ত সুপ্রসন্ন প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া গিয়া তাহাদের সমস্ত কণ্ঠ-সুধাকে উজাড় করিয়া ঢালিয়া বিশ্ব-সংসারকে সেই মাধুর্য্যের মধ্যে মগ্ন করিয়া দিতেছে। এই সুমধুর সঙ্গীত-সুধাধারা পান করিতে করিতে রাজাধিরাজ তাঁর সুরাপানোৎফুল্লচিত্তে যেন আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন এবং গানের পর গান আদেশ দিতে থাকিলেন। তখন চন্দ্রকলা উঠিয়া নানা ভাব ও অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্যারম্ভ করিল। [illegible]কগণ দ্বিগুণ উৎসাহে বাদ্যবাদন আরম্ভ করিয়া দিল, আর চতুর্দ্দিক্ হ[illegible] সুরাপান-বিহ্বল শিথিল করে করতালি দিয়া মহাসন্ধিবিগ্রাহিক, মহামাণ্ডলিক, প্রান্তপাল, দণ্ডনায়ক মহাপ্রতীহার ইত্যাদি রাজবন্ধুবর্গ এই নৃত্যশীলা অপ্সরার অতি অপরূপ নৃত্য-গীতের সকল মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক একটা বিপুল বীভৎস রসের অবতারণা করিয়া তুলিল এবং স্বয়ং মহারাজাধিরাজও ইহাদের সহিত যোগ দিলেন। দেখিতে দেখিতে কলাভূমি তাণ্ডব-ভূমিতে পরিণত হইল।

ধীরে ধীরে রাজপাদসেবী দাস আসিয়া সকুণ্ঠ-ভয়ে মৃদু বচনে জানাইল, "মহাকুমার পরমভট্টারক রামপালদেব সমাগত, বিশেষ প্রয়োজনে এক মুহূর্ত্তের জন্য রাজদর্শন প্রার্থনা করছেন।"

এই আবেদন প্রথমতঃ রাজাধিরাজের কর্ণগোচর হইল না। দুই তিন বার জানাইবার পরে যখন হইল, তখন তাঁহার অবস্থা বিশেষরূপ মন্দ, বসিয়া থাকার শক্তি লোপ পাওয়ায় তখন তিনি তাঁর প্রশস্ত আসনের উপর প্রায় শুইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তখনও সুধাসারপূর্ণ স্বর্ণপাত্র তাঁর ওষ্ঠ স্পর্শ করিতেছিল। অপ্রিয় সংবাদে মুখ বিকৃত করিয়া তিনি কহিয়া উঠিলেন, "ব'লে দাও, এখন দেখা হবে না।"

প্রতীহার সবিনয়ে ও সভয়ে পুনশ্চ নিবেদন করিল যে, সে কথা সে ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহাকে জানাইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোনই ফলোদয় হয় নাই,—মহাকুমার নির্ব্বন্ধ-সহকারে বলিতেছেন যে, তাঁহার কার্য্য বিশেষ প্রয়োজনীয়, এক বার নির্জ্জনে সাক্ষাৎ নিতান্তই আবশ্যক।

মহারাজাধিরাজ বিরক্তি-বিপন্নভাবে কহিলেন, "তবে তাকে এইখানেই ডেকে আন্।"

প্রতীহার প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল ও ক্ষণমাত্র পরে সমধিক ভীতি-বিপন্নভাবে ফিরিয়া আসিয়া সসঙ্কোচে কহিতে লাগিল, "আশ্রিতজন-প্রতিপালক! ভট্টারকপ্রধান মহারাজাধিরাজ! দাসের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়,—পরমভট্টারক মহাকুমার পুনশ্চ নিবেদন কর্‌লেন, তাঁর বক্তব্য তিনি ভট্টারক-প্রধান পরমসৌগত মহারাজাধিরাজকে নির্জ্জনে নিবেদন করতে চান।"

মহারাজাধিরাজের মন যদিও তখন সুধাসাগরের অতল পাথারে তলাইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহার মধ্যে যেটুকু সংজ্ঞা তাঁহার ছিল, সেইটুকু চিত্তই তাঁহার এই একান্ত অবিনীত দার্ঢ্যের বশে অসহিষ্ণু ও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। এমন অসময়ে এমন একটা রসভঙ্গ করিতে অকস্মাৎ আসিয়া হানা দিবার তার কিসের এতই প্রয়োজন? ক্রোধভরে কহিলেন, "ব'লে আয়, ইচ্ছা হয় এখানে এসে দেখা ক'রে

যাক্, ইচ্ছা না হয়, বাড়ী ফিরে যাক্ ; আমার এখন এখান থেকে স'রে যাবার সময় হবে না।"

সামান্যক্ষণ পরেই ক্ষোভ, লজ্জা ও বিরক্তিতে আ-ললাট রক্তিম করিয়া মত্ত আরক্ত নেত্রে অথচ দৃঢ় ও স্থির পদক্ষেপে মহারাজ-পুত্র রামপালদেব সেই সুরা ও সুর-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত রঙ্গভূমে প্রবেশ পূর্ব্বক এই তাঁর অদৃষ্ট-পূর্ব্ব দৃশ্য-দর্শনে থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা-ভ্রাতাকে উপস্থিত দেখিয়া রাজামাত্যের দল পূর্ব্বের মতই মহাকোলাহলে তাঁহার সমুচিত সংবর্দ্ধনা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এখন না কি তাহাদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাই কেহ কেহ রাজপুত্রকে সম্মান দেখাইবার [illegible] উঠিয়া দাঁড়াইতে গিয়া নিজের দেহের ভার সামলাইতে না পারিয়া সশ[illegible]পৃষ্ঠে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং সেখান হইতে উঠিয়া দাঁড়াইবার স[illegible] না থাকায় তদবস্থাতেই পতিত রহিল। যাহাদের জড়িত জিহ্বা [illegible]ৎ বশীভূত হইয়াছিল, তাহারা বিকৃতকণ্ঠে উচ্চারণ করিল,—"দীর্ঘ[illegible] হউন,—মহারাজকুমার!"

রামপালদেব সুগভীর ঘৃণাভরে উহাদের দিকে এক নিমেষের কোপ-কটাক্ষমাত্র নিক্ষেপ করিয়া সেই প্রমত্ত পারিপার্শ্বিকব্যূহ ভেদ পূর্ব্বক রাজার উদ্দেশ্যে ভিতরে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বর্ত্তমানকালের নর্ত্তকী-শ্রেষ্ঠা সুন্দরী চন্দ্রকলা তাহার অপূর্ব্ব নৃত্যলীলা স্থগিত রাখিয়া তাঁহাকে ভূমিস্পর্শ পূর্ব্বক সাবলীল ভঙ্গী সহকারে অভিবাদন জানাইল, রামপালদেব তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্রও করিলেন না ; দেখিয়া মানব-শিকারিণী তার চটুলহাস্য বিভাসিত সূক্ষ্ম অধরপুটে কুন্দকলিকাকান্তি শুভ্র দশন দিয়া বিরক্তিভরে চাপিয়া ধরিল, কিন্তু চঞ্চলনেত্রে তার যে বিস্ময়-প্রশংসার সসম্ভ্রম রেখা দুইটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সে দুইটিকে সে

মুছিয়া লইতে পারিল না, বরং অকস্মাৎ গতি-হারা এবং গীত-হারা হইয়া গিয়া নিস্পন্দলোচনে সেই উন্নত মহিমময় দেবোপম মূর্ত্তি সে নিমিষহারা-নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভাব দেখিয়া মনে হয়, যেন তার সেই বিমুগ্ধ দৃষ্টি বলিতেছিল,—উদ্দন্তপুর-মগধ হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পর্য্যন্ত অনেকই ত দেখিলাম? কিন্তু এমন ত কোথাও আর দেখি নাই!

মহারাজকুমার কোনমতে পথ করিয়া লইয়া যখন রাজ-সন্নিধানে পৌঁছিলেন, তখন মহারাজেরও অবস্থা তাঁহার পারিষদবর্গের অপেক্ষা কোন অংশেই উন্নত ছিল না।

রামপালদেব সবিনয়ে চরণস্পর্শ পূর্ব্বক বন্দনা করিলে কষ্টে সৃষ্টে চোখ তুলিয়া তিনি একবার কোনমতে কনিষ্ঠের দিকে চাহিলেন, স্খলিতকণ্ঠে কহিলেন, "কি এমন অত্যাবশ্যকীয় পরামর্শের জন্য অনর্থক এমন অসময়ে আমায় কষ্ট দিতে এলে রামপাল? নর্ত্তকীকুল-শোভিনী চন্দ্রকলা এতে যে তোমায় কি অসভ্য মনে করবে, তা' ও কি একটু বিবেচনা করতে পারলে না?"

রামপালদেবের ভূমিন্যস্ত দৃষ্টি বৃথাই আরক্ততর হইয়া উঠিয়া দারুণ মনস্তাপে তাঁর বিশাল বক্ষতলে বজ্রসূচী বিদ্ধ করিয়া দিল, তিনি ক্ষোভ-কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আমার বক্তব্য আমি শীঘ্রই শেষ করে ফেলতে চাই, তবে রাজাধিরাজ যদি দয়া করে একটু নির্জ্জন স্থানে গমন করেন, অথবা—"

"অথবা এদের বিদায় করে দিই?—না, না, সে সব কিছুই আমি করচি নে। কে জানে যে আমায় একা পেলে তুমি রাজ্যলোভে আমায় হত্যা করবে না?"

"ওঃ, রাজাধিরাজ!"—রামপালদেব এমনই স্বরে এই শব্দটুকু উচ্চারণ করিলেন যে, যেন মনে হইল, সহসা তাঁর বুকের মধ্যে—তাঁর মর্ম্মস্থলে রাজা-

ধিরাজের সেই স্খলিত-জড়িত অসংযত রসনা একখানা ক্ষুরধার সুশানিত তরবারি সবলে বসাইয়া দিয়াছিল।

"রাজাধিরাজ!—ভুলে যাবেন না, আমি আপনার ছোট ভাই।"

তাঁর চোখের দৃষ্টি হইতেও সেই একইরূপে নিদারুণ আঘাতপ্রাপ্ত আহতের আর্ত্ততা সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া ব্যক্ত হইতে চাহিল।

কিন্তু এই করুণা-মধুর ব্যথা-ব্যাকুল যুক্তিটুকু শুনিয়া পরমভট্টারক মহীপালদেব সবিদ্রূপ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন,—"সেইটেই ত হচ্চে এর ভিতরকার সব চেয়ে নির্ভুল ও সাজ্ঘাতিক সত্য!—তুমি আমার ছোট ভাই! ছোট ভাইরাই ত চিরদিন বড় ভাইয়ের সিংহাসনখানিকে নিজের ক'রে নে'বার জন্য প্রলুব্ধ হয়ে নানা ষড়যন্ত্র ও ছলচাতুরী প্রদর্শন করে—কোথাও অকৃতকার্য্য, আবার কোথাও কোথাও বা কৃতকার্য্যও হয়ে থাকে। বলি, ইতিহাসে তা'কি পড়েছিলে? না, না? তার পর ভাই তুমি আমার বটে, তবে কিনা বিমাতার ছেলে ভাই!—সৎমা যেমন মা, তার ছেলেও আবার তেমনই সৎ ভাই! কি বল চন্দ্রকলা? এ কথাটা কি আমি ঠিক বলিনি? সৎমার ছেলে ভাই সৎ-ভাই—অর্থাৎ কি না অ-সৎ ভাই! আর এটা ত নামেই প্রমাণ হচ্চে, যে, সে অ-সৎমায়ের চেয়ে আরও অসৎ।"

নর্ত্তকী চন্দ্রকলা চকিত কটাক্ষে চাহিয়া দেখিল, জ্যেষ্ঠের এই ভীষণ ও হীন অভিব্যক্তিতে সেই তেজোদীপ্তশ্রী তরুণ পুরুষের অতিসুন্দর মুখখানা একবার গাঢ় রক্তিমায় ফাটিয়া পড়ার মত হইয়াই পুনশ্চ তাহা কি মলিন শুভ্র-শবমুখের মতই নিষ্প্রভ হইয়া গেল। আজানুবিলম্বিত শালপ্রাংশু মহাভুজদ্বয় তার মুহূর্ত্তের চঞ্চলতায় অধীর হইয়া উঠিয়াই পুনশ্চ যেন ঘোর নির্ব্বেদ বশে অবসন্নবৎ দুই দিকে শিথিল হইয়া পড়িয়া গেল। ক্ষণমাত্র পরে তিনি রোষ-ক্ষুব্ধ অথচ বিনীত কণ্ঠে কহিলেন,—"আমার নিকট হ'তে

কখনও কি কোন হীনতার পরিচয় আপনি পেয়েছেন, রাজাধিরাজ? তবে কেন সুযোগ পেলেই এ সব মিথ্যা অপবাদ দিতে ছাড়েন না ?"

মহীপাল এ অভিযোগের উত্তরে চন্দ্রকলাকে সাক্ষ্য মানিয়া গোলমাল করিয়া কহিতে লাগিলেন, "এস ত তুমি চন্দ্রকলা! এস সখি! আমার পাশে এইখানে ব'সে এই অজ্ঞ রামপালটাকে আমার হয়ে বুঝিয়ে দাও দেখি, যে, মানুষ যখন ষড়যন্ত্র করে, তখন সে নিশ্চয়ই যার বিরুদ্ধে সেটা করচে, তাকে জানিয়ে করে না। তারপর যখন তার সেই ষড়যন্ত্র বাইরে প্রকাশ পায়, তখন তাই থেকে বার হ'বার আর কোন পথই খুঁজে পাওয়া যায় না। দেখ, ভারত-সম্রাট্ সেই যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন থেকে আরম্ভ ক'রে ভারতেশ্বর চন্দ্রগুপ্ত, অশোক পর্য্যন্ত সবার নামের সঙ্গেই এই ভ্রাতৃদ্রোহ বিজড়িত। বিশেষতঃ কাশ্মীরের ইতিহাসখানি যদি আলোচনা করতে বসো, ত দেখবে, সেখানে পিতৃদ্রোহ আর ভ্রাতৃদ্রোহের নায়ক ত একাধারে সব্বাই! ভাগ্যে আমার সন্তান জন্মায়নি, তাই ঐ একটা ভয় থেকে আমি বেঁচে গেছি। কিন্তু এই ভ্রাতৃ-দ্রোহের ভাবনার জ্বালায় জ্বালায় আমার মনে এত সুখের মধ্যেও বিন্দুমাত্র শান্তি নেই। তাও আবার বৈমাত্র ভাই! নিজের মা বেচারী তবু ভদ্র ছিল, আমি বই আর কারুকে সে গর্ভেই ধরেনি। কিন্তু ভদ্রাদেবী আমার সৎমা কি না, তাই আমার সঙ্গে এই বাদটি সেধে রেখে গেছেন। তুমিই বল দেখি চন্দ্রকলা! এটা তাঁর ন্যায়সঙ্গত কায হয়েছে কি? রাজবংশে এক সন্তান জন্মাবে, এইটাই ন্যায়সঙ্গত। যেমন 'একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি' ইত্যাদি—সেই রকম আর কি!—কি বল, নয়?"

নর্ত্তকী চন্দ্রকলাকে সাক্ষ্য রাখিয়া পরমসৌগত মহীপালদেব না জানি রামপালের বুকের উপর আরও কতগুলি বিষের বাতি জ্বালিতে থাকিতেন, কিন্তু তাঁর এই নিতান্ত লজ্জাহীন ও নির্দ্দয় ব্যবহারে পতিতা গণিকারও চিত্তে লজ্জার উদয় হইতেছিল। সে এতক্ষণ নির্নিমেষ মুগ্ধনেত্রে

সেই পাশবদ্ধ গজরাজ সদৃশ ক্ষণ দৃপ্ত ক্ষণ ম্লান অপূর্ব্ব মূর্ত্তির ভাব পর্য্যবেক্ষণে তন্ময় হইয়া রহিয়াছিল। তাঁর এই অসাধারণ আত্মসংযম দেখিয়া সে আশ্চর্য্যানুভব করিল ও সহসা তার চির-তরল চিত্ত এই অভূত-পূর্ব্ব সংযমের দৃশ্যে যেন একটা গভীরতরভাবে সম্মোহিত প্রায় হইয়া আসিতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ রাজার দ্বারা সম্বোধিত হইয়াও সে তাই তাঁহার আহ্বানে কর্ণপাতও করিতেছিল না। রাজা তার নাম ধরিয়া যত বারই সোহাগভরে ডাকিতেছিলেন, এই আগন্তুক শ্রোতার দুই নেত্র তখনই এক এক বার করিয়া যে আভ্যন্তরিক মহারোষে অগ্নিকণা বর্ষণ করিয়াই পুনশ্চ তাহা সংহরণ করিয়া লইতেছিল, তাহাও ঐ মানব-চিত্ত-লেখা-পাঠকার্য্যে পটীয়সী চতুরা নারীর অজ্ঞাত থাকিতেছিল না। তবে সেই অনলের সহিত অতি তীক্ষ্ণ যে বিদ্বেষের জ্বালা নিহিত ছিল, তাহার সবটাই যে ভীষণ ঘৃণামাত্রই নহে, আরও একটা তীব্রতর সন্তপ্ত অভিমান, সেই খবরটুকুই শুধু সেই রামপাল-চরিত্রে অনভিজ্ঞা ব্যাপিকা জানিতে পারিল না। তাই রাজা যখন তাহাকে তাঁর নিজ পার্শ্বে বসিবার জন্য সাদর আহ্বান জানাইলেন, তখন এই সুগভীর ঘৃণাভার-বিতৃষ্ণ-চিত্ত রাজভ্রাতার সম্মুখে নিজের প্রতিপত্তি প্রদর্শনের মহামোহে বারেকের জন্য নর্ত্তকী চন্দ্রকলার ঐশ্বর্য্যভোগ-বিলাসী গর্ব্বস্ফীত চিত্ত উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে তার অদূরবর্ত্তী সেই সুঠাম সুন্দর বীরমূর্ত্তিতে যে একটা অকথ্য দাহজ্বালাপূর্ণ উদ্দামতেজ অনুভব করিল, তাঁর সেই রক্তকমলের মতই আয়ত ও আরক্ত নেত্রে যে সুপ্ত অগ্নি-পর্ব্বতের একটা ঝলক নিঃসৃত হইয়া উঠিতে দেখিল, ভয়ে ও বিতৃষ্ণায় তাহার সেই দর্পিত চিত্তও যেন তাহাতে গুটাইয়া এতটুকু ছোট হইয়া যাইতে পথ পাইল না। তার পর সব চেয়ে চমৎকৃত হইতেছিল,—সে এই এতখানি আগুনের দাহিকা-শক্তিকে ক্রমাগতই অন্তর্নিহিতভাবে সংযত রাখিতে দেখিয়া—

যখন প্রতিক্ষণেই সে সেখান হইতে একটা ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কা করিতেছিল। তরল-চিত্ত প্রমত্ত-নর্মমণ্ডলী যার চিরসহায়, সে এই সংযত-চরিত্রকে অনুসন্ধান করিবে কোন্ সম্বল লইয়া? তাই রাজাধিরাজকে মূঢ়ের ন্যায় ক্রমাগতই এই প্রসুপ্ত অগ্নি-পিণ্ডে হস্ত প্রদান করিতে যাইতে দেখিয়া সে আর তাঁর উপর নিজের বিরক্তি ও বিতৃষ্ণাকে গোপন করিতে পারিল না; তীক্ষ্ণকণ্ঠে সহসা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"রাজাধিরাজ! আমায় কেন মিথ্যা অপরাধিনী করচেন?"

মহীপালদেব বিস্ময়াহতভাবে একটুখানি উঠিয়া বসিতে গেলেন—অভিযোগটা তাঁর কাছে যেন সম্পূর্ণ নূতনতর ঠেকিল। তিনি সবিস্ময়ে ও আবেগ ভরে বলিতে লাগিলেন—"প্রিয়ে-চারুশীলে! তোমায় অপরাধিনী—"

রামপালদেব এই সময়ে এক পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া সসম্ভ্রমে অথচ সম্পূর্ণ দার্ঢ্য সহকারে কথা কহিলেন; বলিলেন,—"আমার কথাটা এইখানেই ব'লে নিয়ে তা হ'লে আমি চ'লে যাই—আমার এই বক্তব্য যে—"

বাধা দিয়া মহারাজাধিরাজ কহিলেন—"তোমার মাসিক বৃত্তি কিছু বাড়িয়ে দিতে হবে ত? কিন্তু সে সব আশা এখন আর ক'র না, বরং নিজেদের খরচপত্র কিছু কিছু কমিয়ে ফেল। একে ত পট্টমহাদেবীকে হাতে রেখে তুমি ও তোমার স্ত্রী আমায় যথেষ্ট দোহন ক'রে নিচ্চো, তার উপর—"

রামপাল কহিলেন,—"রাজাধিরাজ! আমার নিজের জন্য আমি আপনাকে জ্ঞানতঃ কখনও কিছু নিবেদন করি নি, আর আজও তা করতে আসিনি; প্রজা-সাধারণের জন্যই আমি নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধে আপনাকে আজ দু-একটি যুক্তিমাত্র দেখাতে চাই এবং আমার আসার উদ্দেশ্যই এই যে—"

তাঁর এই কথাগুলিতে কি গভীর অভিমান ও বেদনা প্রকাশ

পাইল, তাহা যাঁর উদ্দেশ্যে তা' বলা হইল, তাঁহার বুঝিবার সাধ্য বা প্রবৃত্তি ছিল না বটে, তবে তাহা এখানে উপস্থিত অপর এক শ্রোতার চিত্তে বিপুল বলে গিয়া আঘাত করিল।

রাজাধিরাজ তখন যেন নিতান্তই নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়া গভীরভাবে একটা শ্বাস গ্রহণ ও মোচন পূর্ব্বক অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে উত্তর করিলেন—"তা হ'লে আর সে কথাটা তোমার না বল্লেও চ'লে যাবে, রামপাল! প্রজা-সাধারণের সম্বন্ধে অনেক কথাই আমি প্রত্যহ অনেকের মুখেই অনেকবার ক'রে শুন্‌তে পাচ্চি, এর জন্য তোমায় আর এতখানি কষ্ট স্বীকার ক'রে এত দূরে এসে আমার এই বিশ্রামকালের আনন্দটুকুতে ব্যাঘাত না করলেও চল্‌তে পারতো। তা' যা' হয়েছে, হয়েছে—এখন তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করগে। প্রজাসাধারণের ভাবনায় মাথা খারাপ করবার তোমার কোন প্রয়োজন আমিত দেখতেই পাচ্চি নে! কারণ, সে ভাবনাটা আমার—তোমার নয়—তোমার পক্ষে সেটা বরং অনধিকার চর্চ্চা! তাদের ভাবনা যদি ভাবি, ত আমি নিজেই ভাববো। আর না যদি ভাবি, কেউই তা' আমায় জোর করে ভাবাতে পারবে না। বুঝলে? তোমার বাবাই যখন তা' প্রথম থেকে পেরে ওঠেননি, তখন তুমি কোন্ ছার! যাও, যাও,—এখন বাড়ী ফিরে যাও।—কৈ? কোথায় তুমি চন্দ্র-কলা? প্রিয়ে!—প্রেয়সি! এস, কাছে এস! আহা, এমন আকস্মিক রসভঙ্গ! কি নিদারুণ পরিতাপ! আহা হা, গাও—গাও—চন্দ্রকলা—

"দুল্লহো পিবেনাতস্‌সিং ভবাই অন্তঃ। নিরাসং—" *

চন্দ্রকলা সভয় কটাক্ষে অবমানিত রাজেন্দ্রকুমারের দীর্ঘশ্বাসস্ফীত ক্ষুব্ধ মূর্ত্তির পানে বারেক চাহিয়া দেখিয়াই দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া বিরক্তি বিরস-

* প্রিয়বস্তু প্রাপ্ত হওয়া অতি দুর্লভ।

কণ্ঠে তাচ্ছীল্য ভরে প্রত্যুত্তর করিল—"দারুণ শিরঃপীড়ায় আমায় কাতর করেছে, এখনই আমি বিদায় নিতে চাই।"

মহাকুমার রামপালদেবের পশ্চাতেই নর্ত্তকী তার দলবল লইয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ক্ষোভে ও রোষে মুখ বিকৃত করিয়া মহীপালদেব তাঁর পারিষদ্‌বর্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়া উঠিলেন—"দেখলে ত! হিংসুকেটা এসে পড়ে অনর্থক আমার আজকের সন্ধ্যাটাকেই মাটী ক'রে দিয়ে গেল!"

রাজবন্ধুবর্গ রাজার মনোরঞ্জনার্থ সমকণ্ঠে সাগ্রহে কহিয়া উঠিলেন—"সৎমার ছেলের কাছে আর কতই ভাল ব্যবহার প্রত্যাশা করেন, মহারাজাধিরাজ?"

রাজা কহিলেন, "তা ঠিক! একে ভাই,—তা'তে আবার সৎমার ছেলে!—দেখ দেখি, আমার নিজের বাড়ীতে আমার স্ত্রী-টাকে ত আয়ত্ত-গত ক'রে রেখেইছে, তাই না হয় রাখুক, তাকে ত আমি এক কাণাকড়িরও গ্রাহ্য করিনে;—তার উপর আজ আবার এই নন্দন-বনে বৃত্রাসুরের মত হঠাৎ এসে প'ড়ে, দেখ দেখি, অনর্থক এই নর্ত্তকী-কুলেশ্বরী চন্দ্রকলার মাথা ধরিয়ে দেওয়া! ওর মাথাটাকে স্কন্ধচ্যুত না করলে এ অত্যাচারের প্রতিবিধান হবে না দেখছি! নাঃ, দুধকলা খাইয়ে খাইয়ে মহাদেবী এই একটা মস্ত বড় কালসাপকে পোষণ করচেন!"

মহাপ্রতিহার কহিলেন—"এখন কোন্ দিন না—কোন দিন আপনাকে বিষদাঁতের ছোবলটা না বসিয়ে দেয়, সেটাও একটুখানি দেখবেন!"

রাজাধিরাজ ততক্ষণে অন্যমনা হইয়া চন্দ্রকলার গীত অসমাপ্ত সঙ্গীতের একটী চরণ জড়িত-জিহ্বায় মৃদু মৃদু গাহিতেছিলেন,—

"নাহ! মং পরাহীণং তুহ গণতা সতিন্নম্।" *

---

* নাথ! আমি পরাধীনা—তোমাতেই অনুরক্তা জানিবে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণের আলোকোজ্জ্বল পথের উপর দিয়া একটি শ্রান্ত-শরীরা নারী আপন মনে চলিতেছিল। এই পথ কত দূর হইতে রাজধানীর বুকের উপর দিয়া বহিয়া আসিয়া, আবার এই নগরপ্রান্তবর্ত্তী শস্যক্ষেত্র সকল ও তাহার পর প্রান্তরবক্ষ ভেদ করিয়া কোন্ দূরদেশের অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। এ পথ এখন নির্জ্জন, কদাচিৎ কোন গৃহাভিমুখী কাঠুরিয়ার দল বা গলঘণ্টার রব তুলিয়া গোষ্ঠগমনশীলা গাভীর পশ্চাতে একটি রাখালবালক মাত্র এই পথ ধরিয়া তাহাদের সুদূর গৃহ পানে ফিরিয়া চলিয়াছিল; তাহারাও এখন অগ্রগামী হইয়া পড়িয়াছে, নারী একাই চলিয়াছে।

পথে লোকসমাগম নাই, তথাপি সেই মূর্ত্তি যেন কাহাকে দেখিবার জন্য একটুখানি দাঁড়াইয়া, পশ্চাতে যত দূর দেখা যায়, সেই পথে তার উৎপ্রেক্ষিত দৃষ্টি প্রেরণ করিল। তার পর ক্ষণকাল স্থির হইয়া থাকিয়া পুনশ্চ মুখ ফিরাইয়া লইয়া চলিতে লাগিল; কিন্তু এবার আর তার চলনে যেন গতি ছিল না, গন্তব্য স্থান যেন অনির্দ্দিষ্ট; গমনে যেমন অনিচ্ছা, তেমনই অপ্রয়োজনীয়তাও সূচিত হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে ক্ষণপরে সেই শ্লথ গতিটুকুও রুদ্ধ হইয়া গেল, পথচারিণী যেন গতিহারা হইয়া পথিপার্শ্বে একটা আরণ্যক গুল্মমূলে শিথিল শরীরে বসিয়া পড়িল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। গৌরবোজ্জ্বল শরতের গোধূলি-রঞ্জিত পশ্চিমাকাশ কপিশ-ধূসর বর্ণে ম্লান হইয়া আসিল। অপরাহ্ণের শান্ত বাতাসের সঙ্গে কার যেন গভীর অনুতপ্ত শ্বাস অজ্ঞাতে মিশ্রিত হইয়া

তাহাকে ঈষৎ উত্তপ্ত করিয়া দিল, কাহার যেন উদাস প্রাণের বেদনা-রাগিণী স্তব্ধ আকাশে মিলাইতে চাহিল,—আর সেই উদাস প্রকৃতির ক্ষীণ বিষণ্ণ ঔদাস্যের মধ্যে ডুবিয়া রহিল কে এই উদাসিনী ?—এ নারী উজ্জ্বলা।

উজ্জ্বলার মনটা আজ বিশেষভাবেই আহত হইয়াছিল। এই যে বাড়ীতে বাস করিয়া সে তার বাল্য, কৈশোর অতিক্রম পূর্ব্বক পূর্ণ যৌবনে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এখানকার আদর আপ্যায়ন তার জন্য ত চিরদিন এই রকমই। নিতান্ত কম বয়সে আসিয়া শাশুড়ী-ননদদের গঞ্জনা-লাঞ্ছনা, এমন কি, সময় সময় চড়, কিল, ঠোনাটাও তাহার গায়ে সহিয়া গিয়াছে, তার জন্য তার খুব বেশী ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না; তাদের ঐ গালির বদলে সেও যে তাদের ছাড়িয়া কথা কহে, তাহাও ঠিক বলা যায় না, এবং মায়ের মারের শোধ সে-ও বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের উপর দিয়া তুলিয়া লইয়া এই রকম করিয়াই ত এত বড়টা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আজ যেন কোথায় কি একটা গলদ ঘটিয়া গিয়াছিল, তাই এই তার জীবনের সনাতন বিধিকে সে আজ আর চিরাভ্যস্ত পথে সহজভাবে নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। যেটা এত দিন তার কাছে নিতান্তই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল, সেইটাই আজ তার অসহিষ্ণু উদ্ধত চিত্তের স্পর্শ পাইয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও একান্তই অসহনীয় হইয়া উঠিয়া তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া দিল। ইহার একটুখানি হয় ত পূর্ব্ব কারণও আছে।

যে দিন সন্ধ্যাকালে উজ্জ্বলা একাকিনী রাজদীঘিতে জল আনিতে গিয়া কোন্ এক ভদ্রবেশধারী যুবা পুরুষের নিকট সেই কয়েকটিমাত্র স্তুতির বাণী শুনিয়া আসিয়াছিল, সেই দিন হইতেই যেন তার জীবনের স্রোত শ্যাম-মুরলী-রব-মুগ্ধা যমুনা স্রোতের মতই বিভিন্নমুখাবলম্বিনী হইয়া বহিতে-ছিল। সে রব যেন তার চির-অশ্রুত, অথচ যেন সেই রবেরই প্রতিধ্বনি

তার হৃদয়-কন্দরের গুহায় প্রতিধ্বনিত হইয়া রহিয়াছিল। এ যেন তার অজানা নয়, অশোনা নয়, এই এমনই অজস্র প্রগল্ভ প্রণয়স্তুতি তার সমস্ত হৃদয়-প্রাণ যেন সকল সময়েই তাহাকে শ্রবণ করাইতেছে,—শুধু সে ধ্বনি অস্ফুট, আর ইহা স্ফুটিত। নতুবা ইহার কল্পনা, ইহার গুঞ্জন সে ত তার অন্তরে অন্তরেই অনুভব করিতেছিল। তার ঘুমন্ত যৌবন যেন সেদিন সহসাই জাগিয়া উঠিল। সে বিস্মিত হইল না বটে, কিন্তু সহসা তার মনে হইল, সে যেন আর সে উজ্জ্বলা নাই! তার যেন কোন্‌খান দিয়া বড় রকম একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। যখন সংশয়সঙ্কুল চিত্তে ও শঙ্কিতপদে ঘরে ফিরিয়া আসিল, তার মনে হইল, এ ঘর যেন তার পক্ষে নিতান্তই ছোট। যেন এর মধ্যে তাহাকে আর আঁটিতেছে না। সে বিস্মিত হইয়া ভাবিল, সে এত দিন কেমন করিয়া এইটুকুর মধ্যে তার সুখ-দুঃখের নীড় রচনা করিয়া দিন কাটাইয়া যাইতেছিল? কখন্ যে তার হৃদয় তার চারিধারের অসংখ্য প্রকারের বাধা-বিপত্তি কাটাইয়া উঠিয়া তত বড় বিশাল হইয়া উঠিয়াছে সে যেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

এই বিশালতার প্রভাব তাহাকে এমনই অভিভূত করিয়া তুলিল যে, কর্ম্মপটু কৈবর্ত্ত-বধূ তার অনলস কর্ম্ম-শক্তিকে যেন আর কোনমতে গৌরব দিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না। রান্না-ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তার মনে হইল, কেমন করিয়া এইটুকুর মধ্যে সে দণ্ডের পর দণ্ড অতিবাহিত করিবে? বিশু প্রমুখ ছাপান্নটা ছেলেমেয়ে রূপকথার জন্য ছাঁকিয়া ধরিলে, নিজ-কথিত রূপকথার তুচ্ছত্বে তার মনটা তিক্ততর বোধ হইল। ঘরের কায ও পরের সেবা যেন আর শেষই হয় না! অবশেষে যখন মধ্যরাত্রিতে অবসর মিলিল, তখন ঠেঁটির আঁচলে গা-মাথা ঢাকিয়া অর্দ্ধ-নিদ্রিত জ্যেষ্ঠশ্বশুর, শ্বশুর ও শাশুড়ীর পায়ে তেল ডলিতে তার যেন একটু-

খানিও শ্রদ্ধা হইতেছিল না। তার মনে হইল, শ্রম-কাতর নিদ্রালু পরিজনের চরণ-সান্নিধ্যে বসিয়া একটা অজ্ঞাত তীব্র তাপযুক্ত দুরন্ত ক্ষুধার বশে তার সমস্ত শরীরের রক্ত যেন ঘন তাপে বদ্ধ-পাত্রের জলের মতই তাতিয়া উঠিয়া ফুটিতে লাগিল। একটা উদ্দাম ও অতিশয় ক্ষুব্ধ আকাঙ্ক্ষার স্রোত তার ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত খরতর বেগে চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। নব বাসনার অনাস্বাদিত অতৃপ্তিতে তার সারা চিত্ত যেন বুকের মধ্যে লুটাপুটি করিতে লাগিল। সে বুঝিল, সে চাহে, সে-ও পাইতে চাহে এবং তার এই সর্ব্বপ্রথম মনে হইল যে, সে চাওয়া তার এতটুকুও অসঙ্গত নহে।

দীপহীন, জাগ্রত প্রাণীর সাড়াশব্দ-বিহীন, অন্ধকার, বিজন কক্ষে নিদ্রাহীনা যুবতী নারী সর্ব্বপ্রথম অনুভব করিল, তার এই রূপযৌবনের ভারে ভরা দেহ, তার এই সহস্র বাসনা-কামনায় পরিপূর্ণ মনপ্রাণ সে যাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে সঁপিয়া দিয়াছে, সেখান হইতে সে কতটুকুই বা ফিরাইয়া পাইল? আরও অনেক বেশীই যে তার পাওয়া উচিত ছিল, সেই চিরকর্ম্মরতা চঞ্চলা হাস্যময়ী কর্ত্তব্যপরায়ণা নারী, যে শুধু এত দিন সকলকে সবকিছু দিয়াই আসিয়াছে, সে আজ সহসা কে জানে, কিসের প্ররোচনায় একটুখানি পাইবার লোভে কাঙ্গাল হইয়া উঠিল এবং সে পাওয়াতেও যেন সে আর বড় বেশী দেরী সহিতে পারিতেছিল না।

সেরাত্রে সে ঘুমাইতে পারিলনা, খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে স্বামীকে দালানের বিছানায় গভীর নিদ্রায় সুপ্ত দেখিয়া তার মনের মধ্যে সহসা একটা বিদ্বেষের বহ্নি ধোঁয়াইয়া উঠিল। রাগ করিয়া সে ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিল। সে স্থানও তার মনঃপূত হইল না। অঙ্গন পার হইয়া সব্জী ক্ষেতের এক পাশে যেখানে ভীম ও তার ভাইয়েরা মিলিয়া শিব-ভবানীর পূজার জন্য নিজের হাতে

একটুখানি ফুলের বাগান রচনা করিয়াছিল, পায়ে পায়ে আসিয়া সেইখানেই উন্মুক্ত আকাশের তলায় দাঁড়াইল। আশপাশের পুষ্পবৃক্ষ হইতে সদ্যঃ প্রস্ফুটিত ফুলগন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে, সম্মুখে ধানের ক্ষেত জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত,—মৃদু বাতাসে ঈষৎ তরঙ্গায়িত নদীবক্ষের মতই প্রতীয়মান হইতেছিল। সে চাহিয়া রহিল। একবার চোখ তুলিয়া দূরে—উর্দ্ধে নক্ষত্রালোকিত আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, সহসা দূরশ্রুত বংশীধ্বনির মতই তার কানের কাছে আবার বাজিয়া উঠিল, "সুন্দরি! যে চারু-নিতম্বে সুবর্ণমেখলা পরাতে পেলে এ জীবন ধন্য বোধ করি, সেখানে এই গুরুভার পূর্ণকুম্ভ প্র[illegible] করা যে একান্ত নিষ্ঠুরতার কাজ!"

উজ্জ্বলা সর্ব্ব শরীর মনে কম্পিত হইয়া উঠিল। সু[illegible]! সে সুন্দরী! সে রূপসী! সে রূপরাণী? এক জন সম্ভ্রান্ত পুরুষের [illegible] তার মত এক নগণ্যার সম্বন্ধে এত বড় বড় স্তুতির বাণী! দেহ ত[illegible] 'বল্লরীকোমল,' ভুজ তার 'মৃণালসদৃশ',—এ কথা ত কৈ কখন সে এতদিনের মধ্যেও জানিতে পারে নাই? এমন করিয়া ত কেহ তাহাকে জানায় নাই!—একটা অপূর্ব্ব শিহরণে তার বহিরন্তরটা ভরিয়া উঠিল। সে সুন্দরী! সে রূপসী! রূপে তার ভদ্রসমাজেও স্তুতির মোহিনী বাণী স্বতঃই উৎসারিত হইয়া উঠে! সে তুচ্ছ নয়,—সে সামান্য নয়!—

সহসা তার মাথার উপর দিয়া দুই একটা নিশাচর পক্ষী কর্কশ চীৎকারে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে কোথায় উড়িয়া চলিয়া গেল। ঘুমন্ত নিঝুম রাত্রি যেন ইহাদের অমঙ্গলসূচক সতর্ক রবে বারেক ত্রস্ত হইয়া উঠিল। উজ্জ্বলাও সেই শব্দে চকিত হইয়া উঠিয়া দেখিল, সে কোন্ সময় আত্মহারা হইয়া গিয়া কল্পনায় সেই মধুরভাষী উপকারকের বাণী কয়টি তার নিজের স্বামীর মুখে আনিয়া দিয়া যেন

স্বামী-সোহাগে গলিয়া তুই কান দিয়া সেই অজস্র সুধাধারা পান করিতেছে।

স্বপ্নভঙ্গে একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস সহকারে সে মনে মনে হাসিয়া আত্মগতই কহিল—"তেমনই আমার বরাত কি না! চোকের দেখাই একবারটী তুজনে দেখতে পাইনে তা' আদর সোহাগ!"

ঘরে ফিরিয়া দেখিল, সূচীভেদ্য গাঢ় অন্ধকারের রাশি এবং তাহারই মধ্য হইতে মাত্র তার ঘুমন্ত জায়েদের শ্বাসপ্রশ্বাসের সমতালধ্বনি শ্রুত হইতেছে। স্বামীর প্রতি একটা উগ্র অভিমানে মন তার ভরিয়া উঠিল। টান নেই, একটু টান নেই, তা নৈলে কি এমন করে ছাড়াছাড়ি থাকতে পারে! উজ্জ্বলা না হয় স্ত্রীলোক, সে ত পুরুষ, ইচ্ছা থাকলে উপায় কি হয় না!

ক্ষুব্ধচিত্তা তরুণী সুন্দরী ধীরে ধীরে আসিয়া তার স্বামিহীন শূন্য শয্যার এক প্রান্তে শুইয়া পড়িল। কিন্তু বহুক্ষণ জাগ্রতে এবং তার পর স্বপ্নেও স্বামীর কথাই সে ভাবিতে লাগিল।

সকালে উঠিয়াই উগ্রচণ্ডা শাশুড়ীর তর্জ্জন-গর্জ্জন সে দিন তাই উজ্জ্বলার কাছে যেন বেজায় বেসুরা লাগিয়াছিল। তার পর ভীম বাড়ী ফিরিয়া যখন মায়ের পক্ষ অবলম্বন করিল, কথায় কথায় আর একটা বিবাহেরও প্রতিজ্ঞা করিতে গেল, তখন একটা নবোদ্ভূত রোষে ও ক্ষোভে তার হৃদয়-প্রাণ যেন ভীষণতর বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। তার অন্তর জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া গেল। আহত গোক্ষুরের মত গর্জ্জন করিয়া সে তাহাদের দংশন করিতেও উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু শেষকালে শাশুড়ী যে হীনকথা মুখ দিয়া উচ্চারণ করিলেন, তাহাতে তাহাও তার ভাল লাগিল না। মনটা তার এমনই একটা ধিক্কারে ভরিয়া উঠিল যে, কোনমতেই আর এই সব হীন সঙ্গ তার সহ্য হইল না। সে তাই

তৎক্ষণাৎ তাহাদের সংস্রব ছাড়িয়া, যে দিকে তার দুই চোক যায়, সেই পথেই বাহির হইয়া পড়িল। কোথায়, যাইবে, কি করিবে, সে সব কিছুই সে ভাবিয়া দেখেও নাই, ভাবিবার অবসর রাখেও নাই। তার পর সারা দিন নিষ্ফল ক্রোধে জর্জ্জরিত হইয়া গভীরতর বেদনা ও অভিমানের দহন-জ্বালায় পুড়িতে পুড়িতে শ্রান্তক্লান্ত অবশ দেহে এতক্ষণে এই নগরী প্রান্ত-সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এইবার যে তার পথ কোন্ দিকে, স্থান কোথায় তাহারও কোন নিশানা সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না, কিন্তু যখনই তার মনে পড়িতেছিল, আবার তাহাকে যাচিয়া সাধিয়া সেই ঘরেই ফিরিতে হইবে,—তখনই একটা প্রবল বিতৃষ্ণায় ও অপরিসীম লজ্জায় তার অনাহার শুষ্ক শ্রান্তি-মলিন মুখখানা প্রদোষাকাশের মতই টকটকে লাল হইয়া উঠিতেছিল—সে বরং মরিবে, তবু সে ঘরে আর কখন যাইবে না। দুঃখ তার যেন সংক্ষুব্ধ সাগরের মতই উত্তাল হইয়া উঠিতে লাগিল। নিষ্ঠুর! সত্যই সে নিষ্ঠুর! উজ্জ্বলা কি এতই মন্দ যে, তাকে একটা ভাল কথাও বলা যায় না? নাঃ, স্বামী যখন তাকে চায় না, তখন তাদের ঘরে ঘর করার অপেক্ষা বরং মরণও ভাল। কিন্তু এই কথাটা ভাবনার পরই সে বুঝিল, যে এই যে সুখে-দুঃখে মেশানো ঘরে সে সাত বৎসর বয়সে ঢুকিয়াছিল,—তার উপর তার কি দুঃচ্ছেদ্য মায়া! আর চিরদিনের ক্রীড়া-সঙ্গী স্বামীর প্রতিও তার যে প্রাণের টানের শেষ নাই!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সেই পথের ধারে একা অসহায়ভাবে বসিয়া বসিয়া উজ্জ্বলা অনেকক্ষণ ধরিয়াই ভাবিল, সায়াহ্নের শান্ত প্রকৃতি তাহার সমুদয় শান্তিধারা বর্ষণ করিয়াও কিন্তু তার অন্তরের গভীর অশান্তি দূরীভূত করিতে পারিল না। বুকের মধ্যে যেন তার একটা ক্ষোভের অনল ঝড় বহিতেছিল। সেই

আগুনে তাতিয়া উঠিয়া তার চারি দিক্‌টাও যেন অগ্নিময় বোধ হইতেছিল। সম্মুখে পথের পাশেই দিগন্ত বিস্তৃত উন্মুক্ত শস্যক্ষেত্র। উজ্জ্বলার মনে হইল, এর মধ্যে যেন এতটুকু কোন কোমলতা নাই! তার আশেপাশে বর্ষা-জলধারা-পুষ্ট ঝোঁপঝাড়গুলা শ্যামলতায় ভরিয়া উঠিলে কি হয়, তার বোধ হইল, এরাও যেন কৈবর্ত্ত-পরিবারের অনুকরণেই মুখ ভার করিয়া আছে। আকাশে যে সন্ধ্যাছায়ার কাল কাল রেখাগুলা জমিয়া উঠিতেছিল, তার মধ্যে উজ্জ্বলা যেন তার শাশুড়ীর ভ্রূকুটি-ভঙ্গিমাযুক্ত মুখচ্ছবি ফুটিয়া থাকিতে দেখিতে পাইল।

সন্ধ্যার ছায়া ধূসর হইয়া মাঠের উপর নামিয়া আসিল, আকাশে দুই একটা নক্ষত্র দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় অদূরে একসঙ্গে বহুসংখ্যক অশ্বপদধ্বনি শ্রুত হইল এবং দেখিতে দেখিতে প্রায় জন দশ বারো অশ্বারোহী দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটাইয়া প্রায় উজ্জ্বলার গায়ের উপরেই আসিয়া পড়িল।

কিন্তু এ কি? ঐ অশ্বারোহী দলের মধ্যবর্ত্তী, মাথার উপর যার মুক্তাখচিত শ্বেতচ্ছত্র শোভা পাইতেছে, মস্তকের শিরস্ত্রাণে সূর্য্যদীপ্ত হীরকখণ্ড প্রভা বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতেছে, কে' ঐ পুরুষ? উজ্জ্বলার সর্ব্বশরীর বিস্ময়-কণ্টকিত হইয়া উঠিল। এ কি সেই—যার কাছে সে দিন জল আনিতে গিয়া সে উপকৃত হইয়া আসিয়াছে? যার মুখের সেই কথা কয়টীকে কয় দিন সে ভুলিতে পারে নাই?

অশ্বারোহী দল সহসা থামিয়া পড়িল। আপনা হইতে থামে নাই, তাহাদের পরিচালকের ইঙ্গিতেই থামিয়াছিল, তাহাদের মধ্যস্থ সেই ছত্র-তল-বর্ত্তী পুরুষই এই আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বারেকমাত্র চাহিয়া দেখিয়াই দীনবেশিনী উজ্জ্বলাকে চিনিয়াছিলেন। অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিতে নামিতে সানন্দ উল্লাসে উচ্চ ধ্বনি করিয়া কহিয়া উঠিলেন,—"এ কি

জিভ কাটিয়া ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ! বল কি গো! রাজা হয়ে গরীবের মেয়ের কাঁকালে জল-ভরা কলসী তুলে দিলেন? আশ্চর্য্যি ত! আহা, যেন সাক্ষাৎ রামচন্দ্র গো!"

এই রাজ-উপকারের আশ্চর্য্য গুণানুকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে ক্রমশঃই ভীম ধৈর্য্যহারা হইয়া উঠিতেছিল; সে স্ত্রীর এই সবিস্ময় শ্রদ্ধাতিশয্যে বিরক্তিতে গম্ভীর হইয়া উঠিল এবং অপ্রসন্ন পরিহাসে তীব্র করিয়াই উত্তর দিল, "আমি রাজা হ'লেও এমন সরু মাজার উপর কলসী তুলে দিতে পেলে নিজের জন্মটাকে সফল বোধ করতুম। নে, এখন তুই ঘরে আয় ত। সারা দিন না খেতে পেয়ে, আর সারা সহর খুঁজে ফিরে গা-মাথা আমার ঘুরে পড়তে লেগেচে।—আয়, ওঠ, আর কক্ষনো তোকে উঁচু কথাটি পর্য্যন্ত কৈবো না, দেখিস। আচ্ছা, কখনও কি কিছু বলেছি? কি করি, তুই যে মার সঙ্গে বড় লাগিস্! যাই হোক আমার মা তো, মন্দ বলে কি ফেলে দোব?"

"আর যখন নতুন বউটি হবে?"

ভীম বলিল, "হয় যদি ত তুই আঁশবটী দিয়ে তার নাক কেটে তাকে বোঁচা ক'রে দিস্। নে হ'ল ত? না হয়ে থাকে, আমায় দু' ঘা ধরে মার,—শোধ যাবে না?"

উজ্জ্বলা এবার হাসিয়া ফেলিল, সলজ্জে বলিয়া উঠিল, "অবাক্! কথার ছিরি দেখ!"

এই দুইটী আত্ম-বিস্মৃত শৈশব সখা-সখী আজ এই বিপ্লবে ভরা বিরহের মধ্য দিয়া যেন তাদের বিস্মৃত যৌবনকে খুঁজিয়া পাইল, এতদিনে তাদের মনে পড়িল, তারা পরস্পরের কে!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সেদিন রাজোদ্যান হইতে অবমানিত ও ভগ্নমনা হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় মহাকুমার রামপালদেব এতই অন্যমনে অশ্বচালনা করিতেছিলেন যে তাঁর তেজস্বী অশ্বও যেন তাঁরই মত হতোদ্যমে সংশয়-জড়িতপদে অতি ধীরে ধীরে পথ চলিতেছিল।

পূর্ব্বাকাশ তখন অস্তাচলাবলম্বী সূর্য্যের অভাব-বেদনায় কালিমাময় হইয়া পড়িয়াছে। আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে তখনও একটি ক্ষীণ পাণ্ডুরাভা মানবজীবনের শেষ আশারশ্মিটুকুর মতই অতি মৃদুভাবে বিস্তৃত হইয়া আছে, তাও যেন প্রতি মুহূর্ত্তেই ক্ষীণতর হইয়া চারিদিকের নিবিড় কালিমার মধ্যে বিলয়প্রাপ্ত হইতেছিল। রামপালের ললাটে নেত্রেও নিরাশার কালিমা যেন ঐ গগনব্যাপী অন্ধকারের মতই আঁধার চিত্তের প্রতিচ্ছায়ায় কৃষ্ণতর হইয়া উঠিতেছিল। তাঁর গতিপথ ও গমনের উদ্দেশ্য যেন অনির্দ্দেশ্য ও অপ্রয়োজনীয় বোধ হইতেছিল। অনিশ্বসিত একটা দারুণ বেদনা তাঁর চিত্তকে মথিত করিয়া কেবলই তাঁর কানের কাছে অস্ফুট গর্জ্জনে গুমরিয়া বলিতেছিল —

"ধিক্—ধিক্, রামপাল! তোর এই ব্যর্থ জীবনে ধিক্!"

অর্দ্ধদণ্ডের পথ চলিতে বোধ করি বা সেদিন অশ্বরাজ "হিমগিরির" দণ্ডাধিক কালই লাগিয়া থাকিবে। অবশেষে যখন বাশিভা-সঙ্ঘারামের দ্বারদেশে পৌঁছিলেন, মহাকুমার যন্ত্রচালিতের মত চির-অভ্যাস প্রযুক্তই সসম্ভ্রমে জোড়করে দেবমূর্ত্তির উদ্দেশ্যে নীরব প্রণাম নিবেদন করিলেন, তাঁর ব্যথিত অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল, "এ রাজ্যের কি পরিণাম নির্দ্দেশ করেছ—হে শাস্তা?"

তরুণ নাগরিকের দল সঙ্ঘারামের বিশাল তোরণপথে বাহির হইতেছিল, সকলের নেত্রে আশাভঙ্গের ক্ষুব্ধ ভ্রূকুটি, ললাটে তীব্র হতাশার রুদ্ধ ছায়া। সহসা তাহারা সমবেতকণ্ঠে সহর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল—

"মহাকুমার রামপালদেবের জয় হৌক!"

কুমার শিথিল অশ্বরশ্মি শ্লথতর করিলেন, অশ্ব তার মৃদুগতি সংবরণ করিল।

"এইবার আমরা উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পেয়েছি!"

"না, আমরা খুঁজে পাবো কেন? যিনি খুঁজে দেবার তিনিই খুঁজে পাঠিয়েছেন! নতুবা আমরা অস্থানে অপাত্রেই ত বিশ্বাস ন্যস্ত করে বৃথাই দিনের পর দিন ঘুরে মরছিলাম।" "হ্যাঁ, এই ত ঠিক যোগ্যব্যক্তিরই দর্শন পেলেম। হে সুগত! তোমার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হোক! মহারাজকুমার রামপালদেবের জয় হোক! আমরা আপনার কোদণ্ডতুল্য বিশাল বাহু-যুগলের ও আত্ম-প্রত্যয়শীল উদার চিত্তের শরণাশ্রয়ী হলেম। শরণাগত-গণের রক্ষা রাজধর্ম্ম, বিশেষতঃ বিশ্ব-বিশ্রুতকীর্ত্তি প্রথিত-যশা পাল সম্রাট-গণের জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন তো সর্ব্বজনবিদিত। এ বিষয়ে উত্তরে হিমগিরির তুষারশৃঙ্গোপরিস্থ তিব্বতবাসী, উত্তর-পূর্ব্বে মহাচীন ও চীনদেশজগণ, পশ্চিমে যাবনিকদল এবং দক্ষিণে মহাসাগরমধ্যবর্ত্তী সিংহল-বাসী সিংহলীগণ সকলেই অবগত আছে, আমরা আর অধিক কি বলবো? তাই ভরসা হয় মহাবীর রামপালদেব তাঁর কুলধর্ম্মরক্ষার্থ আমাদের দুঃখ-নিবেদনে কর্ণপাত করবেন এবং রাজধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তার প্রতিবিধান চেষ্টাতেও নিশ্চেষ্ট থাকবেন না।"

মহারাজকুমার রামপালদেব সূচনা শুনিয়াই বক্তাদলের বক্তব্য বিষয় বুঝিয়াছিলেন। তাঁর অশান্ত হৃদয় এই নূতন আর একটা অশান্তির পূর্ব্বাভাসে যেন ঈষৎ বিপন্ন বোধ করিল। অসন্তুষ্ট জনসাধারণ যে

ভিতরে ভিতরে একটা বিদ্রোহ বহ্নি প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে সে সংবাদ তিনিও জানিতে পারিয়াছিলেন, তবে তাহা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, অথবা এখনও মাত্র স্ফুলিঙ্গাবস্থাতেই আছে, সে সংবাদ তিনি জানিতেন না। এখন নিজের সম্মুখেই সেই স্ফুলিঙ্গকে বহ্নিশিখারূপে পরিবর্ত্তিতাকারে দেখিয়া তাঁর চিত্তে বিস্ময়ের সহিত হয়ত বা ঈষৎ বিভীষিকারও উদ্রেক করিয়াছিল ; তিনি এত শীঘ্র যেন ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

তরুণদলের দলপতি স্থানীয় দুইজন যুবক অগ্রসর হইয়া আসিল। যশোধর্ম্মা ও ইন্দ্রবর্ম্মা মহামাণ্ডলিক কৃতিবর্ম্মার পুত্র, রামপালের বিশেষ পরিচিত। ইন্দ্রবর্ম্মা কহিল—"আপনাকে আমাদের পরিচালনার ভার নিতে হবে, এ কার্য্যে আপনিই একমাত্র যোগ্যতম ব্যক্তি এবং এবিষয়ে যে সাম্রাজ্যের সকল ব্যক্তিই একমত হবেন, তাতে আমাদের কিছুমাত্র সংশয় নেই ; অতএব আমরা আপনাকে আমাদের মহানায়কপদে বরণ ক'রে নিলেম।"

এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই জনৈক ব্যক্তি কদলীপত্রে জড়িত কুন্দপুষ্প গ্রথিত মাল্য আনিয়া ইন্দ্রবর্ম্মার হস্তে প্রদান করিল, ইন্দ্রবর্ম্মা তৎক্ষণাৎ সেই মালা উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া সহাস্য গম্ভীরমুখে ধীরক... কহিল,—" 'জাগরণ' সমাজের মহানায়করূপে এই মাল্য দ্বারা অ... আপনাকে বরণ করলেম—কিন্তু হয় আপনি নেমে আসুন, না হয়... মালা নিয়ে নিজের হাতে নিজকণ্ঠে ধারণ করুন, আপনি যে এখ... আমাদের অনেক ঊর্দ্ধেই রয়েছেন।"

রামপাল ততক্ষণের মধ্যে আত্মস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি সেই প্রসারিত সম্মান-মাল্য গ্রহণ না করিয়াই ধীরে ধীরে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া আসিলেন, তাঁহাকে নামিতে দেখিয়া নব-জাগ্রত তরুণদল গভীর উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। এদিকে ইন্দ্রবর্ম্মাস্মিত গম্ভীরমুখে মালা লইয়া

অগ্রসর হইতেছিল, মহাকুমার ইঙ্গিতে তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া গম্ভীর শান্ত-স্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ব্যস্ত হয়োনা, ভাই, এখনও আমাদের যথেষ্ট সময় আছে!—এখন এস দেখি, প্রথমতঃ শুনে নেওয়া যাক্ তোমাদের এই 'জাগরণ' সমাজের উদ্দেশ্য কি, এবং আমার মত তুচ্ছের দ্বারা তোমরা কোন্ ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র কার্য্যের সমাধান আশা করছো?"

ইন্দ্রবর্ম্মা মাল্যধৃত কর নত রাখিয়া হাসিয়া কহিল, "মহারাজাধিরাজ পরমসৌগত বিগ্রহপালের প্রিয়পুত্র তীক্ষ্ণধী ভট্টারক রামপালদেবের কি এখনও আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে বাকী আছে? না এটা চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর পৌনঃপৌনিকত্ব হিসাবেই উচ্চারিত হচ্চে? তাহলে অবশ্য আমরা বলতে বাধ্য হব,—কিন্তু সব কথা ত এখানে দাঁড়িয়ে বলা হবে না, তা হলে আপনাকে কৃপা করে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

রামপাল ঈষৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"সে না হয় পরেই শুনব, শুধু মূল উদ্দেশ্য?"

কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়াই ইন্দ্রবর্ম্মা ও যশোধর্ম্মা স্বচ্ছন্দস্বরে একসঙ্গে উত্তর করিল,—"রাজপরিবর্ত্তন! আপনাকে পাল-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আমরা স্থাপিত করতে চাই।"

রামপালদেব ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, ক্ষণকাল স্তব্ধ রহিয়া পরে একটা দীর্ঘশ্বাস লইয়া কহিলেন,—"রাজাধিরাজকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে? এও কি তোমাদের দ্বারা সম্ভবে?"

ইন্দ্রবর্ম্মার সঙ্গেসঙ্গেই আর একটি তরুণ বীরক্রুদ্ধ ঈষৎ ব্যগ্র হইয়া উত্তর দিল—"কেন নয়?"

মহাকুমার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—"কিন্তু এত বড় প্রবল রাজশক্তিকে তোমরা পরাভব করতে পার ব'লে তোমাদের ভরসা হয়?"

অসঙ্কোচে উত্তর হইল, "আপনাকে সহায় পেলে নিশ্চয়ই হয়, এবং

নিশ্চিত সাফল্যের সম্পূর্ণরূপ ভরসাই আমরা করতে পারি। আপনি হয় ত জানেন না, কিন্তু আমরা ত জানি কত আগ্রহের সঙ্গেই সমস্ত রাজ-অত্যাচার অধ্যুষিত প্রজাসাধারণ আপনাকে তাদের রাজা দেখতে চাইচে। আপনার জন্য তারা প্রাণপণ করবে।"

রামপাল পুনশ্চ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অত্যাচার নিপীড়িত তাঁর পিতৃপ্রজাবর্গ কাতর হইয়া তাঁহাকে ডাকিতেছে? অত্যাচার! হাঁ, প্রবল অত্যাচার! সে যে কত বড় অত্যাচার, তাহা হয়ত তাঁহার নিজের মত অপর আর কেহই তার সকলটুকু সংবাদ জানে না। তিনি নিজে শুদ্ধ এই স্বেচ্ছাতন্ত্রতার অতি নিকৃষ্ট হীনতম অবিচারে অবিচারিত,—আর সেটা এ রাজ্যের অতি দীনতম প্রজার প্রতি কি পরিমাণেই না ব্যবহৃত হইতেছে! তথাপি মৃদুসংশয়ে কহিলেন, "এ রাজশক্তি যে কত বড় তার ধারণা তোমাদের আছে? না কেবলমাত্র মানসিক উত্তেজনার প্রবল উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হয়ে এই বিপদ সমুদ্রের উন্মুক্ত তরঙ্গে ঝাঁপ দিতে এসেছ? এ সাম্রাজ্যের ভিত্তি ভূমি মধ্যে সুদৃঢ় প্রোথিত, বিমান-বিনির্ম্মিত নয়, কোন ক্ষুদ্র শক্তি একে টলাতে সমর্থ হবে মনে হয় না।"

বীরক্রম সহসা সতেজে কহিয়া উঠিল, "মহাকুমার! সামান্য এতটুকু একটু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রকাণ্ড একটা জনপদ ও বিশাল অরণ্যানীকে দহন করতে সমর্থ হয়, তা কি ভুলে গেছেন? তবে যত ক্ষুদ্রই হোক, সেটুকু যদি প্রকৃত আগুনেরই ফুলকি হয়!"

রামপাল নীরব হইয়া রহিলেন।

তখন তাঁহার মৌনকে সম্মতিলক্ষণ বোধ করিয়া উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া সাগ্রহে ইন্দ্রবর্ম্মা কহিলেন, "মহাকুমার! আপনার পিতৃরাজ্যে এই যে অন্যায়ের অজস্র স্রোত ব'য়ে চলেছে, এই যে দুর্ভিক্ষ মহামারী অপ্রতিবিধেয় হয়ে বারোমাস এ দেশে বসবাস করতে

চললেও রাজপক্ষ নীরব নিশ্চলভাবে করের উপর কর ধার্য্য করে দরিদ্র প্রজাকে একেবারে নিঃস্ব করে ফেলছেন, এই যে অনাহারে ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ উঠলেও তাতে কর্ণপাত না ক'রে তাদের মরণ-মূল্যে ক্রীত রাজাও রাজ-সখা-সখিদের প্রকাণ্ড প্রাসাদমালা, বিপুল সৈন্যসামন্ত, বিলাস দ্রব্যের সমাবেশে ও সমারোহে চোখ ধেঁধে যাচ্ছে; এই যে রাজার অনাদরে দেশের শিল্প নষ্ট হচ্ছে, বাণিজ্যপোত সকল বণিকদের অর্থহীনতার জন্য ও রাজ-সাহায্য না পাওয়াতে সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে, এর ফলে দুদিন পরে আর্য্যাবর্ত্তের বিশাল বাণিজ্যতরীগুলি হয়ত একদিন সুদূর ভবিষ্যতের পণ্ডিতমণ্ডলীর গবেষণার স্থল হয়েই দাঁড়াবে! আর্য্যসভ্যতা, শিল্প, ধর্ম্ম ঐ বাণিজ্যব্যপদেশেই এতদিন পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিতরিত হচ্ছিল; এই সঙ্গেসঙ্গেই সমস্ত জগতের সেই মহাগৌরবান্বিত ব্যবসায় উঠিয়ে দিতে হবে, এ কি সামান্য পরিতাপ মহারাজকুমার? এ ক্ষতির জন্য শুধু আজ কেন, সমস্ত অনাগতকাল ধ'রে সমস্ত ভবিষ্যৎ জাতিটাই হয়ত চিরদিন তাদের এই অপকারকগণের বিরুদ্ধে অক্ষমনীয় তীব্র অভিশাপ বর্ষণ করবে। জগৎসমাজে আর্য্যজাতির যে শ্রেষ্ঠত্ব গৌরব এত দিন ধ'রে অপ্রতিহতভাবে চলছিল, যে ধর্ম্ম—গৌরবে তারা অর্দ্ধ জগতের ধর্ম্মাচার্য্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সে সবই যে এই সমুদ্রপথে বাণিজ্যতরী প্রেরণ করার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট, এ সবওকি আপনাকে আমাদের বুঝিয়ে বলবার দরকার ছিল? আমরা জানি আপনি সুবিদ্বান্, সুচরিত্র, প্রতাপশালী এবং রাজনীতিজ্ঞ, এক কথায়, পালসাম্রাজ্যের আপনিই যোগ্যতর সম্রাট! তবে অনর্থক কেন বৃথা সংশয়ে কালক্ষেপ করছেন? আমরা নায়ক চাই,—রাজা চাই, আপনার কোন আপত্তিই আমরা শুনব না; আপনাকে আমাদের ভবিষ্যৎ মহারাজাধিরাজরূপে আমরা আজ বরণ করে নিলেম।"

রামপাল কহিলেন, "আমি তোমাদের রাজা হতে পারব না, ইন্দ্রবর্ম্মা।"

ইন্দ্রবর্ম্মা অধর দংশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কারণ ?"

রামপাল কহিলেন, "তাহ'লে আমায় আমার ভাইয়ের বিদ্রোহী হ'তে হবে।"

ইন্দ্রবর্ম্মা হাস্য করিয়া কহিল, "রাজনীতিতে ভ্রাতৃত্বের স্থান কোথায় মহাকুমার ?"

বীরক্রম ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে কহিয়া উঠিল, "আর ভাই ত আপনার উপর কতই স্নেহশীল! জানেন কি মহাকুমার! তিনি যে কোন মুহূর্ত্তেরই সুযোগে আপনার শিরকে স্কন্ধচ্যুত করতে বা করাতে এর এক কড়ারও দ্বিধা দেখাবেন না,—এটা কিন্তু ধ্রুব সত্য! আপনি কি তা' নিজেই জানেন না বলতে চান ? আপনি সেরূপ নির্ব্বোধ হলে আপনাকে আমরা এত ক'রে চাইতাম না।"

মহাকুমার রামপাল শুধু কহিলেন, "আমি জানি।"

"তবে আপনি কার জন্য নিজের রাজধর্ম্মে, ক্ষাত্রধর্ম্মে এবং মানুষেরও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে চান ? কিসের মূল্যে এত বড় ত্যাগ স্বীকার করছেন ?"

রামপাল নীরব রহিলেন।

যশোধর্ম্মা ও ইন্দ্রবর্ম্মা রামপালের পায়ের কাছে ধূলির উপর নতজানু হইয়া কহিল, "মহাকুমার! নিজের জন্য না-ই বা হ'ল, দেশের জন্য এ ভার আপনাকে নিতেই হবে। এর জন্য সকল স্বার্থ ই বিসর্জ্জন দিন। অবশ্য জানিনা, কোথায় আপনার তত বড় স্বার্থ নিহিত আছে—যার জন্য এত বড় সাম্রাজ্যকে পায়ে ঠেলে প্রত্যাখ্যান করতে পারছেন! আপনার এ চরিত্র যে দেবতাদেরও অজ্ঞেয়! সত্যই কি এটা ভ্রাতৃনিষ্ঠা ? এও কি মনুষ্যলোকে সম্ভব ?"

রামপাল পাষাণ-রচিতের মতই অস্পন্দ হইয়া রহিলেন, তাঁর গভীর লজ্জাহত চোখের দৃষ্টি মৃত্তিকান্তর ভেদ করিয়া গেল কি না বলা যায়না, অন্ততঃ তাঁর দৃষ্টির ভাষাটা ঐ সমুৎসক জনগণের দৃষ্টির অদৃশ্যই রহিল।

"মহারাজকুমার! উত্তর দিন। গৌড়রাজ্যের রাজ-পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী—এ একেবারে অনিবার্য্য! তবে কথা এই যে, আমাদের পিতৃগণ আপনার পিতৃ-পিতামহাদির কাছে বহু স্নেহ ঋণে সংবদ্ধ। পাল-সম্রাটগণের অখণ্ড প্রতাপ তাঁদের প্রজাপুঞ্জমধ্যে অক্ষুণ্ণ হয়েছিল, তাঁদের জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমানভাবে প্রজাপালনগুণে। তাই বৈদিক, বৌদ্ধ সকলেই তাঁদের প্রতি সমানকৃতজ্ঞ; তাই আমরা আপনাকে চেয়েছিলাম, কিন্তু আপনি যদি আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ না করেন, আমরা নিরুপায়! অগত্যা জনান্তরেই আশ্রয় নিতে হবে। ফলে হয়ত সে পরিবর্ত্তনে পাল-সম্রাটদের সব কিছুই ভেঙ্গে পড়তে পারে, হয়ত তার ফলে আপনার ও আপনার পরিজনবর্গও বিপন্ন হতে পারেন,—বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজের জীবন সম্বন্ধেও সর্ব্বপ্রথমেই যথেষ্ট সংশয়! ভেবে দেখুন, কি আপনি চান?"

এই ভয়াবহ ভবিষ্য চিত্রখানা আশাহত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে একটা তীব্র আশানন্দের সঞ্চার করিয়া দিল,—ইহার পর কখনই আর মহাকুমার রামপাল তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই সেই নতমুখ স্তব্ধমূর্ত্তি হইতে যে স্খলিত জড়িত অস্ফুট উত্তর শুনা গেল, তাহা বোধ করি তাহাদের প্রত্যেকেরই ধারণার অতীতই ছিল। তাহাদের তখন এমনও ধিক্কার বোধ হইল যে যেন এতদিন দেবতা বলিয়া একটা বানরেরই বা—তারা পূজা করিয়া আসিতেছিল,—আজ অকস্মাৎ সেই দারুণ ভুলটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে!

রামপাল ঐ অত কথার সেই একই উত্তর দিলেন,—"আমার পক্ষে অসম্ভব!"

জনতা গর্জ্জিয়া উঠিল—"ধিক ধিক্ মহাকুমার রামপালদেব!"

ইন্দ্রবর্ম্মার দুই চক্ষে অবমানিত ক্ষোভের একটা সমুজ্জ্বল জ্বালা-চ্ছুরিত হইয়া পড়িল। ক্ষমাহীন কঠোর হাস্য করিয়া সে যাত্রাকালে কহিয়া গেল, "এর জন্য একদিন আপনাকে গভীর অনুতাপানলে দগ্ধ হ'তে হবে, মহাকুমার! কাযটা কিন্তু ভাল করলেন না।"

তাহারা সদলবলে চলিয়া গেলে, আরও কিছুক্ষণ তেমনই সংজ্ঞাহীন, শক্তিহীন, প্রাণহীনবৎ অভিভূতাবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া তার পর একটা বেতালগ্রস্ত মৃতদেহের মতই বিবর্ণমুখে ও প্রায় অস্পন্দ শিথিল শরীরে রামপাল অশ্বারোহণ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখী হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রামপালের শরীর মনে একটা বিষের বাতি জ্বালিয়া দে'ওয়া হইয়াছিল, ঠিক তেমনই একটা আগুনের জ্বালা তাঁর ভিতর বাহিরে ধরিয়া রহিয়াছিল; সেটা তাঁকে একবিন্দু স্বস্তিপর্য্যন্ত পাইতে দিতেছিল না। এমনই গুরুভারাতুর এবং অনুপায়তার ক্ষোভে জর্জ্জরীভূত হৃদয়মন লইয়া তিনি গভীর রাত্রে শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেদিন তখন পর্য্যন্ত সন্ধ্যা জাগিয়া থাকিয়া তাঁর প্রতীক্ষা করিতেছে, আজ এই আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্যে আনন্দ কৃতার্থতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠার পরিবর্ত্তে তাঁর বিরক্তিপূরুষচিত্ত ইহাতে যেন নিজেকে বিপন্ন বোধ করিল। এই নির্ব্বোধ শিশু-প্রকৃতি বালিকার সঙ্গে আবোল তাবোল বকিবার মত মনের অবস্থা আজ তাঁর একেবারেই ছিল না।

সন্ধ্যাই আজ প্রথম কথা কহিল, ঈষৎ অভিমান-মিশ্র স্নেহের সহিত কহিল, "সারাদিনটা তীর্থের কাকের মত মশাইএর পথ চেয়ে বসে রইলেম, মহাদেবী কত না ব্যস্ত হয়ে তিন তিনবার ডেকে ডেকে পাঠালেন, আসা

হলোনা যে বড় ? আমার জন্য না-ই হোক, তাঁর জন্যেও একটীবার আসা উচিত ছিল।"

এই অনুযোগের উত্তরে রামপাল নীরস-বিরাগ-ভরা কণ্ঠে কহিলেন, "এমনও কি হ'তে পারেনা যে, তোমাদের আজ্ঞাপালন করা ছাড়াও আমাদের অন্য কোন কাজ আছে ?"

সন্ধ্যা স্বামীর এমন সুস্পষ্ট রূঢ় উত্তরটাকেও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রচ্ছন্ন পরিহাস মাত্র বোধে মনে মনে আশ্বস্ত হইল এবং সমধিক অভিমানের সহিত ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল,—"থাকে থাক, কিন্তু মহাদেবী আজ ভারী দুঃখিত হয়েচেন। তোমার আসা উচিত ছিল,—সব কাজ ফেলে রেখেও একবারটী আসা উচিত ছিল।"

রামপাল এবার রোষগম্ভীর স্বরে অপ্রচ্ছন্ন বিরক্তির সহিতই উত্তর করিলেন,—

"হয়ে থাকেন হয়েছেন, তার জন্যে আর করচি কি! তিনিই তো আমার ভাগ্যের শনি,—তাঁর মুখ দেখায় আর আমার প্রবৃত্তিও বড় বেশি নেই।"

সন্ধ্যারাণী যেন অকস্মাৎ স্বামীর হাতে মার খাইল, এমনই করিয়া সে ভীষণভাবে চমকাইয়া সাতঙ্কে বলিয়া উঠিল,—"কি বল্‌চো তুমি ?—ও'কি বল্‌চো তুমি ?—পাগল হয়ে গ্যাছ নাকি ? পট্টমহাদেবী—দিদি তোমার শনি! যে দিদিকে তুমি মার চেয়ে সুহৃদ্‌ ভাবো, দেবতার উপর ক'রে ভক্তি করো,—সেই দিদিকে এই অপমান করতে পারলে? 'তাঁর মুখ দেখতে প্রবৃত্তি নেই'—এত বড় কথা বলতে পারলে ?"

সন্ধ্যার কণ্ঠে এই কথাগুলি যে ভয়ার্ত্ত বিস্ময়ার্ত্ত স্বরে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, তাহার রেশ দুঃখে ক্ষোভে রোষে আত্ম-বিস্মৃতপ্রায় মহারাজকুমারের কানের তারে গিয়াও বাজিয়াছিল, নিজেরও এই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত মনোভাবের

এত সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিতে তিনি সহসা একান্ত বিস্ময়াহত ও স্তম্ভিত প্রায় হইয়াও পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু বুকের মধ্যে আর সর্ব্ব শরীরের রক্তে আজ তাঁর যে অবজ্ঞার, অপমানের ভীষণ জ্বালা ধরিয়া রহিয়া, তাঁকে পাগল করিয়া তুলিতেছিল, সে আজ কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করিল না। নিরীহ সন্ধ্যাকেও যে মিথ্যা একান্ত অসহিষ্ণুতায় উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই নির্ম্মম মিথ্যাকেও আজ পরম সত্যের মতই সবলে চাপিয়া ধরিয়া সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত নূতন রামপাল তাঁর স্বভাব বহির্ভূত ক্রোধকম্পিত উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন।

"তিনি যে আমার কত বড় শত্রু, তাই যদি তোমার বুঝতে পারবার শক্তি থাকবে, তা'হলে আমার দুঃখই বা কি! এখন বুঝতে পারচি, এই জন্যই তোমায় বিয়ে করাতে আমার যথার্থ হিতৈষীরা আমার 'পরে বিরক্ত হয়েছিলেন কেন। উচ্চতম মহত্তম রাজবংশের রক্তধারাতো তোমার গায়ে নেই, কেমন করে তুমি জানবে যে তার কতবড় মর্য্যাদা—কি তার উচ্চতম মূল্য! পিতৃ-পুরুষের সম্মান রক্ষার জন্য কতখানি দিতে হয়, কত বড় বড় স্নেহ প্রেম ভালবাসাকে তুচ্ছ বস্তুর মত অবলীলাক্রমে জলাঞ্জলি দিয়ে, কত বড় আত্মোৎসর্গ ক'রে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তুমি তার বুঝবে কি? আমার সেই পথটাকেই যে জন্মের মত রুদ্ধ করে দিয়েছে, তার চেয়ে বেশি শত্রু আর আমার কে?"

স্বামীর এই তীব্র হৃদয়ভেদী স্বর এবং নির্ম্মম অবমাননাকর অভিযোগ এ যে একেবারেই নূতন ও অপ্রত্যাশিত! বিশেষতঃ তার আভিজাত্য হীনতার প্রতি এই তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতে অভিমানিনী ও আদরিণী সন্ধ্যা নিবিড় অভিমানে ও বিস্ময়ে যেন অভিভূত ও আহত হইয়া পড়িল। সে কথা কহিতে গেল, কিন্তু তার স্বর ফুটিল না, উষ্ণ জলের প্রবাহে দৃষ্টি তার অন্ধ হইয়া গেল।

রামপাল নিজেও ইহাতে কম অস্বস্তি বোধ করিলেন না, কেমন করিয়া যে এমন নিষ্ঠুর ভর্ৎসনা তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিল, ইহাতেও তিনি প্রচুর বিস্ময়ানুভব করিতে লাগিলেন, কিন্তু উথলিয়া পড়া ক্রোধ-সিন্ধুকে তখন আর সংহত করিবার সাধ্য তাঁরও ছিল না, তাই ক্রুদ্ধ ক্রূর কঠোরকণ্ঠে উত্তপ্ত হাস্য করিয়া আরও খানিকটা বিষোদ্গার করিলেন,—

"হ্যাঁ, কাঁদ! আর কি?—কেঁদে ফেল!—রাঙ্গা ঠোঁটে হাসি, আর কাল চোকে জল! যথেষ্ট! পুরুষ-পশুকে কৃতার্থ করতে এর চাইতে তোমরা আর বেশি কি দেবে? বুকে ধ'রে আদর করা,—না হয় পায়ে ধরে মানভাঙ্গা। হায়রে বিলাসের ডালি! হায়রে খেলা ঘরের সাজান পুতুল!—এই আমাদের অর্দ্ধাঙ্গিনী! সহধর্ম্মিণী এই এরই নাম?"

সন্ধ্যার কান্না এতবড় কঠিন অভিযোগেও এবার আর বাধা মানিল না, উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া ফেলিয়া সে শয্যাতলে মুখ লুকাইল। দেখিয়া রাম পালের নেত্র যুগল আরক্ততর হইয়া উঠিল, তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকিলেন, "সন্ধ্যা!"

সন্ধ্যা মুখ তুলিল না, তার ক্রন্দনবেগে ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দটা আরও একটু সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিল মাত্র। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া একটু পরে একটা দীর্ঘ শ্বাস মোচন পূর্ব্বক রামপাল কহিলেন, "আমিই আদর দিয়ে দিয়ে তোমায় ননীর পুতুলটী তৈরী হয়ে ওঠবার সাহায্য করেছি, সন্ধ্যা! সবটাই তোমার দোষ, তা' নয়। তখন ভেবেছিলুম, যখন এজন্মে আর আমার পিতৃরাজ্যের লাভ ক্ষতির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই রইলোনা, তখন রাজনীতির সকল চর্চ্চাই জন্মের মত পরিত্যাগ করে, পরম সুহৃদ ও স্নেহময় মাতুল মথনদেবের সংশ্রব ছেড়ে দিয়ে একমাত্র তোমার মধ্যেই সকল ক্ষতিকে আমার ডুবিয়ে দিই। তোমার প্রেমে আত্মহারা হয়ে সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ভুলে যাই। আর কিছু না হোক, জীবনের একটা দিক ত

আমার পূর্ণতর হয়ে উঠুক, সুপ্রচুর ও সুবিমল পারিবারিক সুখসম্ভোগ—সেও তো একটা মস্তবড় পাওয়া, বিশুদ্ধ সতীপ্রেমের অম্লান পারিজাত মাল্য ত আমি বুকে ধরতে পেরেছি—আমার এই ঢের, আমার এই থাক, আমি আর কিছু চাইনে।”

রামপালের সতেজ ও তীক্ষ্ণ হৃদয়ভেদীস্বর ক্ষোভ-মৃদুও সখেদ হইয়া আসিয়াছিল, সহসা আবার তাহা তীব্রতর হইয়া উঠিল,—

“তা’ হয় না সন্ধ্যা ! তা’ হয় না ! এখন দেখছি সে হয় না,—সেরকম হওয়া অসম্ভব ! ক্ষত্রিয়ের ছেলে আমি, রাজার ছেলে, একটা অতি তুচ্ছ নাগরিকের মত নারী-প্রেমে মগ্ন থেকে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করবো, আর আমার চির সম্মানিত পিতৃ-পিতামহের অম্লান যশোভাতি ঘোর মসীলিপ্ত করে দিয়ে সেই বংশে প্রসূত,—এক—এক কু—কুলাঙ্গার, আমারই পিতৃ-রাজ্যের আশ্রিত প্রজা সাধারণকে অত্যাচারে অনাচারে জর্জ্জরিত করে তুল্লেও ; আমি তার কোন প্রতিবিধান করতে সমর্থ হবোনা ;—অন্নহীন, বস্ত্রহীন, রাজকীয় দুর্ব্যবহারে একান্ত মর্ম্মপীড়িত করভারগ্রস্ত, অনীতি-কার্য্যে অপমানিত প্রজাপুঞ্জ তাদের দুঃখবেদনা জ্ঞাপন ক’রে, কাতর আবেদনে সাহায্য ভিক্ষায় পায়ে পড়ে আর্ত্তনাদ করলেও না,—আর—মাথার উপর মর্ম্ম-কাতর অনাদৃতের তীব্ররোষে ভরা জ্বলন্ত অভিশাপ অগ্নিবৃষ্টির মতই বর্ষণ করে গেলেও না—মূক আমি, বধির—আমি, আমার কারুকে কিছু বলবারও নেই, আমার কোন কিছু করবারও নেই ! উঃ কি ভীষণ, কি ভীষণ এই জীবন্মৃত হয়ে থাকা !”

ক্ষণকাল নীরব হইয়া থাকিয়া পুনশ্চ উত্তেজিকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, “সেই কঠোর শব্দ হাজারটা বজ্রধ্বনিকেও উপেক্ষা করে এখনও আমার দুই কর্ণরন্ধ্রে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে,—‘ধিক্ ধিক্ রামপালদেব !’ আর তাদের সেই হীন ঘৃণ্য জঘন্য ধিক্কারকে সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গেই

অভিনন্দিত করে নিয়ে আমিও তাদের অনুকরণে বলি,—'ধিক্—ধিক্ রামপাল! তোর জন্মে ধিক্! তোর জীবনে ধিক! আর এই অকর্ম্মণ্য মিথ্যা জীবন ভারকে বহন ক'রে তোর বেঁচে থাকাতেও শত ধিক—সহস্র ধিক্!"

স্বামীর এই উন্মত্ত প্রলাপের মত ভীষণ দারুণ অভিব্যক্তি অকস্মাৎ সন্ধ্যারাণীর ক্ষুদ্র দেহ মনে একটা নিদারুণ ভীতিশিহরণ আনিয়া দিল। একটা অকথ্য মহাভয়ে তার মস্তকের কেশ হইতে পদাঙ্গুলীর প্রান্তটী পর্য্যন্ত সঘনে কাঁপিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ সেই অভিমানাশ্রু পরিপ্লাবিত আরক্ত বিশুষ্কমুখে উঠিয়া বসিয়া সভয় আর্ত্তকণ্ঠে দ্রুত কহিয়া উঠিল,—

"এ সব তুমি কি বলচো? তুমি কি রাজদ্রোহী হতে চাও?"

রামপাল উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, তাঁর সেই অস্বাভাবিক উচ্চ তীক্ষ্ণ হাস্যধ্বনিতে সন্ধ্যার পালিত শুকপক্ষীটী তার নিশীথ পিঞ্জর-শয্যায় চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া সেই স্বরের একটা ব্যর্থ অনুকরণ চেষ্টা করিল, রামপাল হাসিয়া কহিলেন,—

"ভয় নেই সন্ধ্যা! রাজা চিরজীবী হোন, তাঁর অশেষ শুভাকাঙ্ক্ষিণী সহধর্ম্মিণী ও ভ্রাতৃবধূর শঙ্খ সিন্দুর অক্ষয় হয়ে থাক, রাজদ্রো[illegible] করবার মত সৌভাগ্য নিয়ে এই হতভাগ্য রামপাল জন্মগ্রহণ করেনি। অত্যাচারী, ব্যভিচারী, প্রজা-পীড়ক রাজার পাদ-পূজক হয়েই তার এই অভিশপ্ত জন্মটাকে গোঙাতে হবে; এর আর ব্যতিক্রম হবে না।"

সন্ধ্যা কথা না কহিলেও সে যে মনে মনে কিছু আশ্বস্ত হইয়াছে তাহা জানা গেল। কারণ সে একটা কণ্ঠরোধকারী উর্দ্ধশ্বাসকে ঈষৎলঘুভাবে মোচন করিল। বোধ করি তাহার নিশ্চিন্ততার আভাসটুকু রামপালের কাছে গোপন ছিলনা, তিনি বারেকমাত্র আহত বিরক্তিতে কঠিন চক্ষে সন্ধ্যার সন্ধ্যা কমলের ন্যায় ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, মুখে তিনিও কিছু বলিলেন না।

রাত্রি গভীরতর হইতেছিল, পুর-তোরণে দ্বিতীয় প্রহর ঘোষিত হইয়া গেল। রাজপথে নগর-প্রহরী হাঁকিতে লাগিল,—

"প্রভু বুদ্ধের অমরবাণী স্মরণ করো। জীবন ভঙ্গুর, ধন জন-সম্পদ সমুদয় পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতই অস্থায়ী, মান কীর্ত্তি এ সমস্তও অবিনশ্বর নহে, অতএব হে বন্ধুগণ! হে ভ্রাতৃবৃন্দ! হে পুত্র ও পুত্রি সকল! নিশীথ অন্ধকারকে তোমাদের এই প্রতিমুহূর্ত্তে অনিশ্চিত সদা চঞ্চল ধন জন মানও জীবনের উপভোগ হেতু পাপকার্য্যের পরিপন্থী না করিয়া এই শান্ত মৌন নির্জ্জনতাকে সেই সর্ব্বত্যাগী চির-বিরাগীর পদাঙ্কানুসরণ জন্য সুহৃদুত্তমরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক মানব জন্মকে সফলতা দান করো—ধন্য হও! ধন্য হও!"

রামপাল নতমুখে দাঁড়াইয়া সেই চিরশ্রুত ঘোষণার বাণী কয়টী শুনিলেন তারপর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন পূর্ব্বক আত্মগতই কহিলেন,

"হে সুগত! তোমার পথ সে তোমারই পথ, আমার পথ কোনদিনই তোমার নির্দ্দিষ্ট পথ রেখায় মিলিত হতে পারে না। তুমি চেয়েছিলে নির্ব্বাণ, তার জন্য অনায়াসে রাজ্যধন ছেড়ে দিলে,—আমি চাই রাজ্য! সামান্য এই ধূলার ধরণীতে ক্ষুদ্র ছত্রদণ্ড আর তার ফলে এক আদর্শ মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করে আমার এই দেশকে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ সম্মান-মুকুটে ভূষিত করে রেখে যেতে চাই। দ্বিতীয় রামরাজ্যই আমার একমাত্র আদর্শ! এত ক্ষুদ্র আমার কামনা, তা'ও কি পূর্ণ হ'বার উপায় নেই?"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

“মহাকুমার! ও মহাকুমার! বলি, ব্যাপারখানা কি, বলতে পার? আগে ত আমার মহল ছাড়তেই চাইতে না, এখন সাতশো তেরবার ডেকে পাঠালেও আর চুলের টিকিটী পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া ভার? তার উপর কাল রাত্রে ছোটুটাকে কি কতকগুলো তিরস্কার করে গেছ, সে ত আজ সারাদিন ওঠেনি, খায়নি, কেবলই কাঁদচে, একবার যাও দেখি—”

মহাকুমার স-বিরক্তি ব্যঙ্গের স্বরে কহিলেন, [illegible]তা’ ভিন্ন সমতটের মেয়ের আর বেশী কি করবার আছে? জানেন [illegible] সে দেশে লোণা জল খুব শস্তা!”

এই উত্তরে মহাদেবীর চিন্তাভারাকুল চিত্ত ঈষৎ [illegible] হইয়া আসিল, তিনিও ঈষৎ হাস্য করিয়া সস্মিতমুখে কহিলেন, “[illegible] জল ত আমার বাপের দেশে কল্যাণেও খুব বেশি দুষ্প্রাপ্য নয় ভা[illegible] কিন্তু সত্যি, তামাসা নয়; তুমি যখন তখন যা’ তা বলে ছোটুটাকে বড় কাঁদাও।—”

রামপাল গম্ভীরমুখে ঈষৎ বক্রস্বরে কহিলেন,—“যে কাঁদে তাকেই কাঁদাই, তোমার মত কঠোর—পাষাণ ফাটিয়ে জল ঝরানো তো আর সহজ সাধ্য কাণ্ড নয়, তাই সেই অসাধ্য সাধনে অগত্যাই বিরত আছি।”

মহাদেবী পুনশ্চ হাসিয়া ফেলিলেন, হাস্য-স্নিগ্ধ স্মিতমুখে কহিলেন—“অর্থাৎ কি না আমি পাষাণী?”

রামপাল তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—“তুমি পাষাণী? না পাষাণের চেয়েও তুমি বেশী কঠিন। অতবড় নির্দ্দয় না হ’লে তুমি আমায় হাতে পেয়ে আমার এত বড় দুর্দ্দশা ঘটিয়ে রাখতে পারতে? আমি বিশ্ব-বিশ্রুতকীর্ত্তি রাজরাজ্যেশ্বরদের বংশধর, আজ তোমার হাতের একটা ক্ষুদ্রতম ক্রীড়নক

হয়ে পড়ে আছি, এ কার নিষ্ঠুরতায়? এই যে সমস্ত দেশ জুড়ে আমার পিতৃ প্রজাবর্গ অত্যাচারে পিষ্ট হয়ে হাহাকার করচে, আর্ত্তনাদে পৃথিবীর সর্ব্বংসহা বুককেও ফাটিয়ে দিচ্চে, অভিসম্পাতে চির বধির আকাশকেও দীর্ণ বিদীর্ণ করে তুলচে, আর আমি আমার দুই কানে তুলো ঠেসে বিলাস-ব্যসনে নারী সঙ্গে হাস্য রহস্য নিয়ে একটা তুচ্ছ ঘৃণ্য নাগরিকের মতই আমার জীবনটাকে কোনমতে অতিবাহিত করে যাচ্চি, এ কার নির্ম্মম স্বার্থপরতার অনুরোধে, মহাদেবি? তোমার স্নেহের ফাঁস গলায় পরে জীবন আজ আমার কাছে দুর্ব্বহ হয়েছে। হাজার মণের পাষাণ ভার তুমি আমার বুকে তুলে দিয়েছ, তুমি কি কম পাষাণী!"

মহাদেবী স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাঁর স্মিত প্রফুল্ল মুখখানি দেখিতে দেখিতে আতপ শুষ্ক পদ্মের মতই পরিম্লান হইয়া আসিল, শান্ত অথচ উজ্জ্বল নেত্র দুটীতে একটী উৎকট ব্যথার তীব্র আভাস জাগিয়া উঠিল, বুকের মাঝখানে অকস্মাৎ বড় বেশী আঘাত লাগিলেই বুঝি সেই রকম ত্রস্ত ব্যাকুলতা চোকের দৃষ্টিতে ফুটিয়া ওঠে।

রামপাল কহিতে লাগিলেন, "তুমি আমার যা করেছ, আমার অতি বড় শত্রুতেও তা' করতে পারতো না। ক্ষত্রিয়ের ছেলেকে তুমি একটা ভীরু জড় নির্জ্জীব ক্লীবে পরিণত করে রেখেছ, এর চেয়ে আর বেশি কি করবার আছে? আশ্রিতকে আশ্রয় দে'বার আমার উপায় নেই, আর্ত্তকে অভয় দিতে আমি অক্ষম, অত্যাচারীদের অত্যাচারের প্রতিবিধান চেষ্টা আমার সাধ্যাতীত,—এই জীবন? ক্ষত্রিয়ের, সবলের, পুরুষের জীবন এই? এমনই চিরশৃঙ্খলাবদ্ধ গৃহপালিত জীবের মত করে তুমি আমায় চিরজীবী রাখতে চেয়েছিলে? হায়রে নারীর স্নেহ! এমন নির্বীর্য্য নিরীহ ভালবাসার পাত্র হওয়ার চাইতে শতবার মৃত্যু ভাল, সহস্রবার মৃত্যু ভাল।"

"মহাকুমার!"—এ যেন কা'র কণ্ঠে কে' কথা কহিল!

বোধ হইল যেন অতি দূর দূরান্তর হইতে কাহার চির অপরিচিত স্বর-লহরী ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতম ভাবে অতি ধীরে ধীরে ভাসিয়া আসিতেছে; কিন্তু সে কথা শেষ হইল না। রামপাল মাঝাতে বাধা দিলেন তিনি তীব্র বেদনা-বিদ্ধ কণ্ঠে সবেগে কহিয়া উঠিলেন,—

"'মহাকুমার!' না না, তুমি রামপালকে ও হাস্যাস্পদ উপাধীতে সম্বোধন করোনা মহাদেবি! ও অভিধানটা যে আমার কতবড় মিথ্যা সে কথাটা তো আর কেহই তোমার চেয়ে বেশি করে জানেনা, তবে এ ব্যঙ্গ-অভিধানে অভিহিত করে কেন আমায় অপমানের উপর অপমান করচো? মহাকুমার? মহাকুমার রামপালদেব তার মর্ম্মপীড়িত পিতৃ-প্রজার কাতর আবেদনে বধিরের মত নীরব থেকে, তাদের তীব্র নৈরাশ্যের বেদনায় সম্পূর্ণ ঔদাস্য দেখিয়ে ফিরে এসে, ফিরে এসে—উঃ একি অভিশপ্ত জীবনই আমার তৈরি করে দিলে মহাদেবী? তুমি কি এই সহস্রের ধিকৃত, কর্ত্তব্য পালনের অসমর্থতায় ক্ষাত্রধর্ম্ম বিচ্যুত, ভগ্নহৃদয় রামপালকে শুধু তার ভাইয়ের ছুরী থেকে প্রাণটুকু নিয়ে বেঁচে থাকতে দেখেই সুখী হ'তে পারবে ভেবেছিলে? তার যে এতে কি হবে, সে এতটাই সইতে পারবে কি না, সে সব কথা কি একেবারে কিচ্ছুই ভাবোনি?"

মহাদেবী এইবার কথা কহিলেন, এবার সেই চিরস্থির শান্ত সহজ স্বরেই তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় কথা কহিলেন, এই কণ্ঠ, এই স্বর তাঁর একান্ত স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ নিজস্ব। তিনি কহিলেন—

"আজ থেকে তুমি সর্ব্বতোভাবেই প্রতিজ্ঞামুক্ত হ'লে রামপাল!"

রামপালের মুখ এক নিমিষের জন্য উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ঘন মেঘাক্রান্ত প্রশস্ত সুগৌর ললাট প্রভাত-পূর্ব্বাকাশের মতই মুহূর্ত্তকাল অরুণ রাগ দীপ্তশ্রী-মণ্ডিত দেখাইল; কিন্তু তাহা ক্ষণমাত্র! ঊষার নির্ম্মলশ্রী-বিমণ্ডিত গগনপটকে যেমন অতর্কিতে শরতের মেঘখণ্ড আসিয়া আড়াল

করিয়া দেয়, তেমনই করিয়া তাঁর সেই ক্ষণিকের আনন্দজ্যোতিকে একখানা করাল দুশ্চিন্তা মেঘ আসিয়া ম্লান করিয়া দিল। নিরানন্দ স্বরে রামপাল উত্তর দিলেন,

"তা আর হয়না মহাদেবি! আমি কি তোমার হাতের পাশা যে এক চাল চালা হয়ে গেলে ফের আবার হাতে ফিরিয়ে তুলে নেবে? যে তীর তূণ থেকে বেরিয়ে গেছে সে আর শত চেষ্টাতেও তোমার তূণীরে এসে ঢুকতে পারে কি?"

মহাদেবী একথায় একটুও বিচলিত হইলেন না, শান্ত-স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু আমার মৃত্যুর পর তো এর খণ্ডন হতে পারবে?"

রামপাল বারেক শিহরিয়া উঠিলেন, ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া পরক্ষণে ম্লানমুখে মাথা নাড়িলেন, কহিলেন,—"তাও কি কখন হয়? হয় আমার না হয় তাঁর—এর একজনের মৃত্যু না হলে আর এর খণ্ডন নেই!" বলিয়াই তিনি একটা অগ্নিগর্ভ সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন।

মহাদেবীর আয়তনেত্র অকস্মাৎ অগ্নিময় হইয়া উঠিল, তিনি দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "তবে তাই হোক, হয় তুমি না হয় তিনি এর একজনই না হয় মর।"

রামপাল এবার হাসিয়া উঠিলেন, ভূমিকম্পের সময় পৃথিবীর অভ্যন্তর-ভাগে গলিত স্খলিত, তরল গৈরিক-নিস্রাব যেমন ভীষণ অট্টহাস্য করিয়া ভূপৃষ্ঠ বিদারণ করিতে ফেনাইয়া উঠে, ভীষণ ঝটিকাকালে উন্মাদ তরঙ্গ যেমন সর্ব্বনাশা হাসি হাসিয়া আবর্ত্তে পতিত ভয়ার্ত্ত আরোহীর মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদকে ডুবাইয়া দিয়া অসহায় পোতকে আক্রমণ করে, উদ্যত অগ্নিশিখা যেরূপ চণ্ডহাস্যে সমগ্র গ্রামকে নিজের ক্ষুধিত জঠর মধ্যে গ্রাস করিতে থাকে, তেমনই উন্মত্ত জ্বালাময় হাসি হাসিয়া রামপাল কহিলেন,—

"তবে আমাকেই এবার মরতে দাও, কারণ তাঁকে মারবার অধিকার তো আর আমার হাতে তুমি রাখোনি।"

মহাদেবি রামপালের মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ধীরকণ্ঠেই বলিলেন,—

"তোমার হাতে নাই থাক, আমিই তোমার পথ মুক্ত করে তোমার পিতৃ-প্রজাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করবো, মহাকুমার!"

অকস্মাৎ বিনা মেঘের সহস্র বজ্রাঘাতে যেন সমস্ত বিশ্ব একই কালে বিহ্বল হইয়া পড়িল! পৃথিবীর সচলতা অকস্মাৎ রুদ্ধ হইয়া গিয়া তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বুঝি শেষ হইয়া গেল! রামপালের বোধ হইল তিনি যেন শূন্য পথে উড়িয়া যাইতেছেন, পৃথিবীর মাটির সঙ্গে যেন আর তাঁহার যোগ নাই। উঃ অতবড় গুরুভার, সেও যে এ লঘুত্বের [illegible] ভাল ছিল রে! তখন কোনমতে একটু শ্বাস লইয়া তিনি সেই [illegible] বর্ত্তিত মূর্ত্তি শান্তশ্রী-সম্পন্না বিচিত্র-চরিত্রা নারীর সহিষ্ণু মুখের দিকে ব্যাকু[illegible] চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহারই উদ্দেশে কোন কিছু বলিতে গেলেন, কিন্তু [illegible] তাঁর স্বরোচ্চারণের সহায়তাটুকু পর্য্যন্ত করিল না।

মহাদেবী তখন পুনশ্চ ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন,—"[illegible]জকের প্রজানায়ক কে? তার নামটা তুমি আমায় বলে দাও,—তারপর সব ভার আমার—"

ততক্ষণে আত্মস্থ হইয়া উঠিয়া রামপাল তাঁহাকে বাধা দিয়া শান্ত স্বরে উত্তর করিলেন,—"না, কোন ভারই তোমার নয়। মহাদেবি! মা আমার! সন্তানের অপরাধ ক্ষমা কর। আমি জানি আমার নির্ম্মম, পাষণ্ড জ্যেষ্ঠের প্রতিও তোমার মনে ভালবাসার অন্ত নেই!—তা' ভিন্ন আমি তোমায় কারু জন্য কারও কোন স্বার্থের জন্য, তা' সে যত বড় সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যেরই জন্য হোক না, স্বামীর বিরুদ্ধাচারিণী হ'তে দেবোনা। সীতা সাবিত্রীর পাশে তোমার আসন অটল হোক, বরং আরও উর্দ্ধগামিনী হও। সতীধর্ম্ম আর রাজধর্ম্ম ঠিক এক নয়, তাই স্বার্থের বশে, অখ্যাতি কু-যশের ভয়ে

:তোমায় রূঢ়বাক্যে আঘাত দিয়ে ফেলেছি, কিন্তু তোমার ঐকান্তিক স্নেহের াাবধানতায় আমার ধর্ম্মে আজ আঘাত লেগেছে বলেই তোমার ধর্ম্মকে আহত করে তার শোধ তুলে নেবে, তত বড় হীন তোমার পালিত সন্তান য়, এ'ও তুমি বিশ্বাস রেখ, মা!"

এই বলিয়া রামপাল স্তব্ধ নিশ্চল মহাদেবীর পায়ের তলায় মাথা াখিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক অতি ত্বরিৎপদে প্রস্থান করিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

মানুষের মনের ভিতরের নিভৃত কোণে কোথায় যে কার কতখানি র্ব্বলতা লুকানো থাকে, অনেকদিন পর্য্যন্ত তার কোন খোঁজ খবরই য়ত থাকে না, আবার হঠাৎ একদিন এমনই একটা তুচ্ছ ঘটনায় নটার এতই আকস্মিক বহিঃপ্রকাশ হইয়া পড়ে যে. সে অভিব্যক্তিতে াার পাঁচজনের কথা ছাড়িয়া দিলেও তার নিজেরও মনে ইহা াস্ময়ের আবির্ভাব করে। এমন নীরবে, সঙ্গোপনে যে কেমন করিয়া ই তুচ্ছ বস্তুটা বাড়িতে বাড়িতে আজ এই বড় হইয়া উঠিয়াছিল, াসেক আগেই বা এ খবরটা কে জানিত? আসল কথা সকল মানুষের ়তরেই দুইটা দিক্ আছে—তাহার মধ্যে একটা বাস্তবের দিক্, আর কটা কল্পনার দিক্। তা'র মধ্যে কাহারও একটা, আবার কাহারও ়তর অপর অংশটাই সমধিক প্রবলতর। নিছক বস্তু-তান্ত্রিক বা নিছক াব-তান্ত্রিক লোক সংসারে কম। ভীম লোকটিকে লোকে এবং সে জেও এতদিন ধরিয়া সোজাসুজি বস্তু-তান্ত্রিক বলিয়া জানিয়া রাখিলেও াৎ সেদিনের সেই ঘটনায় তা'র বাহিরের বহিরাবরণ খসিয়া পড়িয়া গেল,

আর ভিতরের দিক হইতে যেন একটা উদ্দাম ভাবের স্রোত পর্ব্বতমালার প্রচণ্ড বাধা ঠেলিয়া দুর্জ্জয় বেগবান্ নির্ঝর ধারার মত আতপ তপ্ত মরুবক্ষে সুশীতল সলিল প্রবাহী তরঙ্গিণীর সৃষ্টি করিয়া তুলিল। জীবনের সেই দিব্য ক্ষণে চিরপরিচিতার এই নব পরিচয়ের মুহূর্ত্তে জীবনকে আজ যেন তার সম্পূর্ণ নবীন ও স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হইল। সন্ধ্যার শুভশঙ্খ যেন তাহাদের এই মিলন মুহূর্ত্তটিকেই শুভতর করণের সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া পুনঃপুনই সান্ধ্য-গগনকে আনন্দ চকিত করিয়া তুলিল, দূরস্থ সঙ্ঘারাম হইতে পবিত্রভাবে উচ্চারিত থেরী-গান সেদিন তাহাদের মঙ্গল-মিলনের মন্ত্রপাঠ বলিয়াই তার বোধ হইল। মনে মনে সে নিজের ইষ্ট দেবতা শিব-ভবানীর চরণোদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণিপাত করিল।

দুইজনে পাশাপাশি পথ চলিতেছিল। ক্ষুৎপিপাসা দুজনকেই কিছু ক্লিষ্ট করিলেও এই নবোন্মাদনার নবীনতর অভিব্যক্তিতে তাহারা সেই তুচ্ছ অসুবিধাটাকে সম্পূর্ণরূপেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল, মন যখন কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠে, ভরানদীর বিশাল বক্ষের মতই তখন তাহাতে স্বতঃই অসীমের ছায়া পতিত হইয়া তাহাকেও সেই ছায়ানুপাতে উদারতর করিয়া দেয়। ক্ষুদ্রতার সহিত তখন যেন তার সকল সম্বন্ধই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। চপলতা তাহাকে তখন কোন মতে আর স্পর্শ করিতে পারে না।

কথাবার্ত্তা তাদের মধ্যে বেশী কিছু হয় নাই। নির্জ্জন পথের শেষে জন-বহুল বিপণি পরিশোভিত সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্মের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াই উজ্জ্বলা তার মোটা ঠেটীর আঁচল তাহার চরণবিলম্বী কেশের রাশির উপর দিয়া মাথায় ভাল করিয়া টানিয়া দিল এবং চুপি চুপি ভীমের উদ্দেশ্যে কহিল,—"একটু আগ বাড়িয়ে চলে চলো গো, আমি একটু পাছ করে যাই, কে কোথা দিয়ে বন্ধু-কুটুমে দেখে ফেলবে।"

ভীম হাসিয়া তার নাকের নথ্‌নিখানায় দোলা দিয়া দিল—"এ তোর মিছে লজ্জা! যখন বাড়ী ছেড়ে লাফ পাড়তে পাড়তে এই পথটা দিয়েই ছুটেছিলি, তখন বন্ধু-কুটুমের ডর ভয় কার চালের বাতায় গুঁজে রেখে দিয়েছিলি বল ত?"

উজ্জ্বলা স্বামীর প্রতি সপ্রেম অনুযোগে কুটিল কটাক্ষ হানিয়া হাসিয়া জবাব দিল—"তখন যে আমায় ভূতে পেয়েছিল, তখন কি আর আমি, আমি ছিলুম গো!"

এক প্রহর রাত্রে পতি-পত্নী যুগলে আসিয়া তাহাদের সারাদিনের পরিত্যক্ত গৃহে প্রবেশ করিল। সে গৃহ তখনও কলরব মুখর হইয়া রহিয়াছে, অঙ্গনের মধ্যস্থলে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া বিশু তারস্বরে চেঁচাইয়া কাঁদিতেছে—"আমার লাঙ্গা বউতা কোতা লে! আমায় লুপ কথা বত্তে আয় না লে!"

তার মা তাহাকে চুপ করাইতে না পারিয়া ক্রমান্বয়ে দুইজনেরই উদ্দেশ্যে গালির বান ডাকাইয়া দিয়াছেন এবং হস্ত সীমানার অভ্যন্তরে যেটাকে পাইয়াছেন, দুজনকার ভাগের মারটা তাহারই উপর নিক্ষেপ করিতেছেন। রান্নাঘরের দিক হইতে আরও একটা মৃদু করুণ ক্রন্দনধ্বনি হুঁ হুঁ শব্দ করিয়া প্রেতিনী-জাতীয়ার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ অবিশ্বাসীর চিত্তেও সন্দেহোদ্রেক করিতেছিল।

উজ্জ্বলা ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে সাপ্‌টাইয়া ধরিয়া শিশু দেবরটিকে কোলে তুলিয়া লইল, আঁচল দিয়া তার অশ্রুধারার সমপরিমাণে ধূলিলিপ্ত মুখখানা মুছিতে মুছিতে স্নেহবিগলিত সম্ভাষে তার কানের কাছে কহিল, "এই যে আমি এলাম রে বিশে! রূপকথা আমিই তোরে শোনাব আয়।"

শিশু আনন্দে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল। "ওরে আমার লাঙ্গা-উ এয়েচে লে! তোলা দেব্বি আয় লে।"—বলিয়া একটা উল্লাসধ্বনি

করিয়া উঠিয়াই তার গলাটা দুই হাত দিয়া দৃঢ় করিয়া সাপ্টাইয়া ধরিল।

"দুত্তু ছেলে! কেন তুই পাইয়ে গিইছিলি? দাবি? আর কক্ষণো দাবি? শীগ্গীল বল। দলি দিয়ে তোকে বেঁদে লেকে দোব না। তোকে মালবো না! তোকে বকবো না—"

সে যে অপরাধীকে লইয়া কত শাস্তিই দিবে, অথবা কি করিবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া অবশেষে তার আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত গালের উপর ফোঁটাকয়েক অশ্রুবিন্দু দেখিয়াই গভীর অনুতপ্ত লজ্জায় একেবারে মর্ম্মবিদ্ধ হইয়া সাশ্চর্য্য বেদনায় চমকাইয়া উঠিয়া বলিল—

'তুই তান্‌চিস্ বউ? না না তোকে মালবোনা, তিচ্ছু তল্‌বোনা' তুই চুপকল,"—বলিয়া মিনতি ভরা চোখে চাহিয়া তার অশ্রুসিক্ত গালের উপর পুনঃ পুন চুম্বন করিতে লাগিল এবং তার নিজের চোকেও আবার জল দেখা দিল।

উজ্জ্বলাও স্নেহ কৃতজ্ঞতায় ভরা প্রাণে উহাকে আদর করিয়া ভুলাইয়া কোলে করিয়া দাওয়ায় উঠিল।

"আই—আই কি লজ্জা লো! বলি পাড়া চলানি! পাড়া চলিয়েও তোর হ'লনা? শেষে কিনা দেশ চলালি! কোন্ মুখ নিয়ে ঘরে ঢুকলি লো চুলোমুকি?"

দিদিশাশুড়ীর এই স্বাগত-সম্ভাষণে পরম আপ্যায়িত বোধ না করিলেও আপনাকে সংযত রাখিয়া উজ্জ্বলা তার ক্রোড়স্থ শিশুকে বলিল, "বারেকের তরে নেমে দাঁড়াতো দাদামণি! আগুন দেখচি করা হয়নি, একটু করে দিই।—"

বিশু তাহাকে দুইটা রোগা রোগা হাতের কাঁকড়ার দাড়ার মত সরু আঙ্গুল-কয়টা দিয়া সাপ্টাইয়া ধরিয়া রাখিয়া প্রবল আপত্তিতে সজোরে

ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তুই আমায় কোলে কলে আগুন কল, আমিতো নাম্‌বোনা।"

অন্য দিন হইলে এই অসঙ্গত আবদারের প্রশ্রয় নিশ্চয়ই উজ্জ্বলা দিতনা, আজ কিন্তু স্নেহ-সকরুণ মৃদু হাস্যের সহিত তার অকৃত্রিম ভালবাসায় সে গলিয়া গেল।

"চল তবে তাই সই—"বলিয়া অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্য রাক্ষসী-মূর্ত্তি বুড়ীটার সান্নিধ্য এড়াইল,

"বলি সেই তো মল খসালি, তবে লোকটা ক্যানে হাঁসালি! বলি সেই ঘরেই যদি ফিরলি, তবে ঠ্যাকার দেখিয়ে মদ্দর মতন সাত হাত লাফ পেড়ে পথেই বা বেরুলি ক্যানে?

"ও লো বড় দিদি! হ্যাঁলা তোর সাথে সাথে মরদ পারা কারে যেন দেখ্‌লাম না? বলি আবার একটা মিন্‌ষে জুটিয়ে আন্‌লি কমনে থেকে লো? ওকি রাজবাড়ীর দরোয়ান না কি লা? তোরে পৌঁছুতে এয়েচে?"

উজ্জ্বলা তার দুই জায়ের দুই রকম প্রিয় সম্ভাষণের উত্তরে একটুখানি ক্ষমার হাস্য করিয়া সেজজায়ের কথারই উত্তরটা দিল,—"মরণ! বলি, জলজ্যান্ত ডাহা ভাসুরটাকেও চিনতে পাল্লিনে ছুঁড়ি? এই বয়সে, চোকে কি তোর চাল্‌সে ধরলো লো? সেজ দেওরকে বলিস যেন এইবেলা বদ্যিবাড়ী থেকে ফোঁটারত্তি পদ্মমধু এনে দেয়।"

ভীম যে নিজেই সঙ্গে করিয়া তার পলাতকা স্ত্রীকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিয়াছে, এই সংবাদ সেজ বৌএর বুকে যেন ফুটন্ত ভাত শুদ্ধ হাঁড়িটাকে চুল্লীর উপর হইতে টানিয়া আনিয়া কে বসাইয়া দিয়াছে, এমনই তার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল। মুখখানা কেলে হাঁড়ির মত ভারী করিয়া, কণ্ঠের মধ্যে একমণটাক বিষ ভরিয়া সে তার প্রতি একটা বিষাক্ত শরক্ষেপ করিল,

"কি জানি ভাই, শুনতে পাচ্চি আজ কাল তোমার নাকি রাজা-

মহারাজার সাথেই পরিচয়টা বেশী, তা' আমার গরীব মানুষ ভাসুরের কপালে যে তোমার সাথে পথ চলবার সুখ ঘটেচে, তা' কেমন করে জানবো বল?"

এই তীক্ষ্ণ এবং নিহিতার্থক বিদ্রূপবাণে উজ্জ্বলার নির্ভীক এবং নব আশা প্রাপ্ত সুখ-লঘু চিত্তকে সে বাস্তবিকই বিঁধিতে পারিয়াছিল। উজ্জ্বলা সহসা চঞ্চল-বিমনা হইয়া উঠিল। এ সংবাদ কেমন করিয়া ইহাদের কর্ণগোচর হইল? বিশু ভিন্ন সে দৃশ্যের ত সাক্ষী কেহই ছিলনা? আর বিশুও কিছু তাঁহাকে চিনিত না, তবে?—এ কি প্রহেলিকা!

কিন্তু এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কোন কথা উঠাইবার ভরসাও উজ্জ্বলার নির্ভীক মনের মধ্যে আদৌ হইল না। স্বামীর কাছে সেত সবই জানাইয়াছে, কিন্তু এদের? অসম্ভব! কে তার কথায় প্রত্যয় করিবে? কপালে তার ঘাম দেখা দিল।

আর সব যাই হোক, স্বামীর আদর, স্বামীর প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া উজ্জ্বলার বুকখানা আজ এতই পূর্ণ হইয়া রহিয়াছিল যে, সেখানে ভয়, চিন্তা, বিদ্বেষ, অপমান কিছুরই যেন ভাল করিয়া স্থান হইতে পারিতে ছিলনা। শাশুড়ী আসিয়া-দেখিলেন, রান্নাঘরের মধ্যে উজ্জ্বলা ডালে কাঠি দিতে দিতে দ্বারে উপবিষ্ট একদল ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে রূপকথা বলিতেছে,—যেমন সে রোজই করে ঠিক তেমনই। মনে হইতেছিল যে যেন কোন কিছুই ঘটে নাই,সে যেন ঝগড়া করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায় নাই, কিছুই না। এদৃশ্যে যদিও শাশুড়ীর মনটা একদিকে একটুখানি ঠাণ্ডা হইল, অর্থাৎ গতর খাটাইবার মানুষটাকে তার নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া ওদিকটার সম্বন্ধে মন নিশ্চিন্ত হইল, কিন্তু আজ না কি শুধু ঐটুকুতেই সাঙ্গ করার অবস্থা ছিলনা,তাই মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়াও তাঁর খুসী হওয়া চলিলনা। কি একটা নূতন কথা মনে পড়িয়া যাওয়াতে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া গম্ভীর

কঠোর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আলো কালামুখি! বলি, দেশ শুদ্ধত গুণ গৌরব সব ঢাক বেজে গেছে! বলি, তারই জন্যে বুঝি অত বড় বুকের পাটা হয়ে উঠেছিল, না লো বারুণ-খাকি! তা গেছলি যখন, তখন রাজার রাণী হয়ে পাট শালে গিয়ে বস্‌লেই ত হ'ত? ছোটলোকের ঘরকে ফিরে আলি কেনে বলত? লোক হাসাতে? নে, আপ্তরক্ষে করতে চাস ত উঠে লহড় দে,—নৈলে হেঁতালীর বাড়িতে আজ তোরে যোমার ঘরকে পাঠিয়ে দোব।"

সেজ বধূর মুখে যে আসন্ন ঝড়ের আভাস সে বাড়ী ঢুকিয়াই পাইয়াছিল এখন তাহাকেই উদ্যত দেখিয়া উজ্জ্বলার যেন মাথা ঘুরিয়া গেল। এই যে ভীষণ কলঙ্ক তাহার রটাইয়া তোলা হইতেছে, ইহার এতটুকু আভাস ইঙ্গিত ও যে তার কোনদিন সহ্য হয় নাই, আজ সকালেও সে শাশুড়ীকে এই হীন ইঙ্গিত দিতে উদ্যত দেখিয়া তার জিভ টানিয়া আঁস্তাকুড়ে ফেলিতে গিয়াছিল, শাশুড়ী বলিয়া মানে নাই। আর ইহারই মধ্যে এত বড় ভয়ানক কথা কেমন করিয়া রটিয়া উঠিল, তাহা ভবানীই জানেন! আজ এত খানি গ্লানিরও সে ভাল করিয়া একটা প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিতে পারিতেছিল না, অথচ তাহার মন ত ভাল করিয়াই জানে যে ইহার মধ্যে একটু খানি সত্য সংবাদ থাকিলেও এই ভয়ঙ্কর অপবাদের কতখানিই মিথ্যা!

চিরমুখরাকে নির্ব্বাক্ ও অধোমুখী দেখিয়া সনকা যেন বিজয়োল্লাসে নাচিয়া উঠিল।—"আলো বারুণ খাকি! আমি তোরে আগে হতেই চিনেছিলুম, মন্তর দিয়ে শেকড়-মাকড় দিয়ে জ্যেঠ-শ্বশুররে আর "পো"-টারে আমার বশ কর্‌লি, তাই তোর এত দেমাক চল্‌লো। নৈলে তোর,—ঐ যে কথায় বলে,—

'ঘরে আকা বাইরে বাঁধে
অল্প কেশ ফুলিয়ে বাঁধে
ঘন ঘন চায় উলটি ঘাড়,
এমেয়ে হতে ঘর উজাড়।

এ আমি শতেক দিন হ'তেই জানি। ভীমেকে এমন কথা আমি বলেওছি, কতেক দিন—এলি রে ভীমে! শোন কথা! আজ সিদ্ধা, মেজুনি, সেজুনি সব মইপাল দীঘির জলকে যেয়ে সেখানথে শুনে এসেছে যে, তোর এই খণ্ড-কপালী সোহাগে বউ রাত-বিরেতে জলকে যেয়ে মহারাজাধিরাজের সঙ্গে ঠাট্টা-হাঁসি করে আসে, এ না-কি কেউ কেউ আপন চোক্ষে দেখে তবে বলেছে। আমি তোকে বলিনি, ভীম? যে ও কটা চামড়া তোর জন্যে নয়। মায়ের বাক্যি কি মিছে হয়রে হাবা।"

স্বামীকে আসিতে দেখিয়া উজ্জ্বলার দুশ্চিন্তা-ভীত ব্যাকুল চিত্ত কতকটা শান্ত হইয়াছিল। সে উচ্ছলিত অশ্রু নিরোধপূর্ব্বক উপবাসকৃশ পরিম্লান মুখে ঈষৎ ঘোমটা খসাইয়া কাতর আত্মসমর্পণের ভাবে স্বামীর মুখের দিকে সতৃষ্ণ চক্ষে চাহিল। তাঁর ভাগ্য এখন শুধু তার স্বামীর মনুষ্যত্বের উপর নির্ভর করিয়া আছে, সে যদি এই সময় বুকে একটু বল করিতে না পারে, তবেই অভাগিনীর সকল আশা জন্মের মতন ফুরাইয়া যায়। নব-জীবনের জীবন প্রভাত কতটুকু আগেই বা তার তরুণ-চিত্তকে তরুণ উষার সোণালী রঙ্গে স্বর্ণ-মণ্ডিত করিয়া দিয়াছিল। আর ইহার মধ্যেই কি তার সকল সুখের নূতন জ্বালান প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে?

ভীম মায়ের এই নিদারুণ অভিযোগে একটু খানি মাত্র নীরব থাকিয়া একবার দুঃখ-স্নিগ্ধ করুণ চোখে বধূর মুখের পানে চাহিয়া দেখিল। তার পর বাস্তবিকই সংক্ষুব্ধ চিত্তে মায়ের অভিযোগের প্রতিবাদে কহিল,—"ও সব কথা মন্দ লোকের রটনা মা, তোরা সকলের সকল কথাই শুনিস কেন? নে, এখন গাল তুলে ধরে দুমুটো কিছু খেতে দিতে বল্ দেখি, সারাদিনটা যে তোমাদের এই ঝগড়ার জ্বালায় উপস দিচ্ছি, সেটা কি একবার ভাবিস নে?"

ছেলের মুখের উত্তরে মায়ের মনে বিস্ময়ের সহিত ক্রোধ সমান ওজনেই

দেখা দিল, তিনি অবাক আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া জবাব করিলেন,—"আই লো আই! হাঁারে পোয়ে! বউটোর বিজুলী পারা রংটাই কি তুই বড় করলি রে? গড় করি তোর পরবিত্তিকে! বউ ছিনালপানা ক'রে বুল্লেও তোর গোঁস্সা আসেনা রে! এ যে ডুম্বের ঘরের অধিক হলো!"

বনের বাঘিনীকে ধরিয়া তাহাকে পিঁজরায় পুরিয়া খোঁচা মারিলে তার অবস্থা হয়, উজ্জলারও সেই দশা হইয়াছিল। কিন্তু এমনই সঞ্জীবনী মন্ত্র আছে গভীর ভালবাসার মধ্যে যে, উপবাস-ক্লিষ্ট স্বামীর কথা সে তার এত বড় ক্ষোভের মুহূর্ত্তেও আজ কোনক্রমে ভুলিতে পারিল না, ইহা ভিন্ন তার সকল মনের জ্বালাকে পরাস্ত করিয়া দিয়া আরও একটা প্রবল চিন্তা তার সংক্ষুব্ধ-সাগর সদৃশ অপমান ও ক্রোধে তরঙ্গিত বক্ষের মধ্যে উত্তাল হইয়া উঠিতেছিল, ছাড়িয়া গিয়া বুঝিয়াছে, স্বামীকে সে কোন মতেই ছাড়িতে পারিবে না। ইহার জন্য তাহাকে যত অপমানই সহিতে হয় সে সহিবে। কিন্তু এত বড়টা! এই অসতী নামটাতেই যে সে সবচেয়ে অসহিষ্ণু হইয়া উঠে, এটাকে যে সে কোনমতেই সহিতে পারে না। এও কি সহিতে হইবে? ভবানী! এ কি তার দুর্দ্দশা করিলে? সেই রাজ উপকারের প্রতি সকল কৃতজ্ঞ-শ্রদ্ধা তার মন হইতে একই নিমিষে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়া গেল এবং একটা তীব্র বিদ্বেষে মনটা তার কঠিন হইয়া উঠিল। নিশ্চয় এ তাঁরই কাজ! আর ত কেউ সেখানে ছিল না! কিন্তু সহ্য করিবে, সব সহ্য করিবে, একথা জোর করিয়া মনে করিতে থাকিলেও সেটা তার পক্ষে যেন প্রতি মুহূর্ত্তেই অসহ্যতর হইয়া উঠিতেছিল, অথচ এ কি এ সম্মোহন মন্ত্র তার সম্মুখে! ঐ যে অনুত্তেজিত প্রশান্ত স্মিতমুখ, উহার উপর চোখ পড়িতেই যে তার বুকের মধ্যের সহস্র নাগিনী স্তব্ধ হইয়া তাদের উদ্যত ফণা নত করিয়া ফেলে ও ক্রোধের রুদ্র-

আগুনে বর্ষার সহস্র ধারা বর্ষিত হইতে থাকে। ঐ স্থির দৃষ্টি যে তাকে জানাইয়া দিতেছে যে, যে যাহাই বলুক না, আমি জানি, তুমি সতী!

ভীম কহিল, "মা, ডোমের ঘর ঝগড়া-কচকচিতেই হয়ে ওঠে, তা কি ভেবে দেখনা? ছেলে যে উপোসী রয়ে গেল, সে তোর খেয়াল হলো না, মিথ্যে বউটার বদনাম করছিস পরের রটানে কথা শুনে? ওসব কথা আমি জানি, তোমার বউ-ই আমারে বলেছে, যা সত্যি করে ঘটেছিল। সে দোষ তো তোদেরই। ভরা বয়েসকালে সাঁজ-সন্ধ্যেয় কোন্ শাশুড়ী তার বৌকে এক কোশ পথ জল আনতে রাজার পুকুরে পাঠায় বল্‌তো? ও যেই খুব ডাকাবুকো মেয়ে তাই ডরভয় করেনি, ধর্ম্ম রেখে ফিরে এসেছিল, আর কেউ হলে তাও পারতো কিনা সন্দেহ।"

স্বামীর এই পক্ষ সমর্থনে গভীর কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বলার চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া একগঙ্গা জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, সে তখন ফিরিয়া বসিয়া ডালের হাঁড়িটা নামাইয়া আবার আগুনে মস্তবড় ভাতের হাঁড়িটা চাপাইয়া দিল। ওবেলার ভাত ঢালা আছে, ইচ্ছা করিতেছিল, গরম ডাল দিয়া সেই ভাত স্বামীকে দুটি বাড়িয়া দেয়, কিন্তু শাশুড়ীর অনুমতি বিনা ত তেমন দুষ্কার্য্য করিতে পারে না। মনে মনে স্বামীর উদ্দেশ্যে গড় হইয়া প্রণাম করিল, কৃতজ্ঞতায় প্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া মনে মনে বলিল, "ঐ চরণে মতি রেখে তোমার পায়ে যেন আমি মরতে পারি।"

সনকা ছেলের ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিল, আজই যে উজ্জ্বলা তার স্বামীর উদ্দেশ্যে নূতন কিছু মন্ত্র করিয়া আনিয়াছে, সে কথা বুঝিতে বাকি থাকিল না। একেবারে হতাশ হইয়া গিয়া সে নিজের কপালে ঘা মারিল,—"মরেছিস্ ভীমে! কালামুখীটা তোরে একেবারে দাঁতে ক'রে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে! রাত-বিরাতে গবুরাণী তোর বৌকে আমি এক ক্রোশের মাথায় পুকুরঘাটে জলকে পাঠাই? কি অধুম্মে রে তোরা? বলে,—

'নিয়র পোখরি দূরে যায়,
পথিক দেখিয়ে আউড়ে চায়,
পর সম্ভাষে বাটে থিকে,—
এ নারী কখন ঘরে না টিকে!'

তার চেয়ে আমার কথাটা নে, এখনও মানে মানে ওরে ছেড়ে দে, ও যাক্ রাজার পাটশালায়, তুই সুগলী ছুঁড়ীটাকে বিয়ে কর, সুখ হবে, সে মেয়ে ভাল। কটা চামড়ায় আছে কি? মেয়েমানুষের চামড়া কটায় ছিনাল হয়, তুই কি জানিসনে? কোট্টে ধরেছি, মা ত বটি, কথাটা নে'।"

ভীমের মুখে চোখে জ্বলন্ত ক্রোধের তীক্ষ্ণরশ্মি বিদ্যুদ্বেগে ফুটিয়া ছুটিয়া গেল, ক্ষণকাল সে ক্রোধ-স্তম্ভিত থাকিয়া পরে সখেদে উত্তর করিল, "ঐখানেই ত তুই আমায় মেরে রেখেছিস্! তাই ভাবি কেন যে তোর পেটে আমি এসেছিলুম!"

এইটুকু শুনিয়াই উজ্জ্বলার বুক গুরুগুর করিয়া উঠিল, সে আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল, "হেঁই গো!—তা' বলে আমায় তুমি দূর করে দিও না গো! তুমি ত জানো আমি তাকে চিন্‌তেও পারিনি, আর সে আমায় কোন অমন্দ কথাও তো বলেনি।"

ভীম তাহার ভীতি-বিহ্বলতা দেখিয়া ঈষৎ দুঃখের হাসি হাসিয়া তেমনই দুঃখ-গম্ভীর স্বরে কহিল "বিদায় তোকে সেই এক দিনই করব জেনে রাখিস, যেদিন যমে তোকে টেনে নেবে। তা বই আর কেউ পারবে না তোকে বিদায় করতে! মা, তোমায় বলি, শোন! ছড়ার উপর ছড়া কাটানো তুলে ধ'রে ছেলের পেটে দুটো ভাত দেওয়াও দেখি! তোর রকম দেখে আমার সন্দ হয় যে তুই হয়ত আমার মা নোস্, আমার সৎমা-ই বা হবি! বাবাকে আজ ভাল ক'রে কথাটা পুঁছতে হবে।"

ছেলের দত্ত এই ভীষণতর অপবাদে মার মনে বুঝি হঠাৎ একটা লজ্জা

দেখা দিল, রুদ্ধ মাতৃত্ব বুঝি অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিল। তখন বিচারকার্য্যে আপাততঃ ইতি টানিয়া তিনি বধূকে আদেশ করিলেন, "কানের ত মাথা খাস্‌নি বাপু, শুনতে কি আর পাচ্ছিস্ নে? দে'না চারটে ভাত ফেলে, ছেলেটা খাক্। আয় রে ভীম! আয়—জলঘট্‌টে দে' যা ত ছোটুনী! আই, আই! এখনও শাঁকচুন্নির মত চিঁ চিঁ করতে লেগেছে। দেখ্‌চ! সেই সাঁজ জ্বালাবার আগে গাই দোয়াতে গিয়ে দুধ-ঘট্‌টে ফেলে দিলি বলে চ্যালার বাড়ি ঘা দুত্তিন বসিয়ে দিলুম, তা সেই থেকে আর কান্না কি থামে নি? বলি আলো ছুঁড়ি! অমন কত চ্যালার উপর চ্যালা যে বড়্‌কির পিঠে গায়ে সাতখান করে ভেঙ্গে ফেলেচি, তার চোখে একটা ফোঁটা জল পড়েছে কি? বলি, ঐ যোমা-গোদার মায়ের মতন কালো মোষের চামড়া, ওকি তার চাইতে অতই নরম না? তোর গায়ে ত রক্ত পড়লেও তা গায়েই মিলিয়ে থাকে, তার গায়ে যে টুস্কি দিলে রাঙ্গা হয়ে শালুক ফুটে ওঠে, সে ত কই কাঁদে না?"

ছোটবধূর প্রতি ক্রোধের মুখে বেফাঁস হইয়া এত বড় সত্য কথাটাকেও আজ সঙ্গে সঙ্গেই সনকাকে স্বীকার করিতে দেখিয়া উজ্জ্বলা ও ভীম দু'জনই দু'জনের চোখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ সুখের হাসি হাসিল, অর্থাৎ সত্য চিরদিন গোপন থাকে না।

বিংশ পরিচ্ছেদ

অনন্ত-বিস্তৃত নীলাম্বরে অসংখ্য হীরাহার ঝলমল করিতেছে। জ্যোৎস্না তার অলস তনুখানি বিশ্রাম-শয়নে এলাইয়া দিয়াছে, তাহার শুভ্র অঞ্চল চঞ্চল পবনের লঘুস্পর্শে করতোয়ার স্নিগ্ধবক্ষে লীলায়িত হইয়া পড়িয়াছে। এক একটা রাত্রিচর পাখী মাঝে মাঝে মানবের অবোধ্য ভাষায় ডাকিয়া যাইতেছিল। দিনের আলোর অবিচারের বিরুদ্ধে বোধ করি,

তাহাদের প্রাণের প্রবল প্রতিবাদই ইহারা ঘোষণা করিয়া রজনীকে সু-স্বাগত জানাইতেছিল।

প্রাসাদ-উদ্যানের সর্ব্বশেষে পাষাণ-সোপানশ্রেণী তাহাদের দৃঢ়, রূঢ় মূর্ত্তি লইয়া সুবিস্তৃতভাবে একেবারে করতোয়ার জলতলে নামিয়া গিয়াছে। জলের মধ্যে কতকগুলি সোপানের শ্রেণী নিমজ্জিত হইয়া আছে। সোপান-শ্রেণীর প্রত্যেকটির দুই ধারে দুইটি করিয়া পুষ্পবৃক্ষ। কোনটির দুই দিকেই চম্পক, কোনটির দুই ধারে বকুল এবং কাহারও উভয় পার্শ্বেই কাঞ্চন, শিরীষ, কুরুবক ও কদম্ব। প্রস্ফুট জ্যোৎস্নায় পুষ্পিত-বৃক্ষের ছায়াগুলিও তাহাদের পার্শ্বে পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে পতিত হইয়া এবং বায়ু-সন্তাড়নে মন্দ মন্দ ভাবে আন্দোলিত হইতে থাকিয়া যেন সজীব বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। একটা প্রমত্ত কোকিল সেই বৃক্ষশ্রেণীর একতমের মধ্যে আশ্রয় লইয়া স্ফুট জ্যোৎস্নালোকে মধ্যে মধ্যে পঞ্চম-স্বরে গাহিয়া উঠিতে-ছিল—"কু—কু-উ—কু-উ!" আবার সে মধ্যে মধ্যে কুহু কুহু কুহু রবে নিজের কণ্ঠস্বরকে উচ্চগ্রামে তুলিয়া যেন দূরস্থ শ্রোতাকে নিজের অপূর্ব্ব স্বর-মহিমা শ্রবণ করাইতেছিল।

ভরাসন্ধ্যার এই শান্ত নির্জ্জন নদীতীরে কুমার রামপাল একাকী পাষাণ সোপানোপরি বসিয়া ছিলেন। একেবারে জলের ধারেই তিনি বসিয়া ছিলেন। তাঁর পাদুকাহীন নগ্নপদ যে সোপানটির উপর স্থাপিত ছিল, নদীতরঙ্গ মধ্যে মধ্যে চঞ্চল নৃত্যে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে প্লাবিত করিয়া দিয়া আবার তথা হইতে সরিয়া যাইতেছিল।

রামপাল নিতান্তই বিমনা হইয়া বসিয়া ছিলেন। যে তীব্র বেদনার সঙ্ঘাত রাত্রিদিন তাঁর বুকের সমস্ত শিরা উপশিরার মধ্যে গুরু স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া ঘুরিতেছিল, তাঁর তরুণ হৃদয়ের সমস্ত তৃষ্ণা-চাপল্য যে রুক্ষ ব্যথার রুদ্রস্পর্শে অশান্ত চাঞ্চল্যে একান্ত উদ্বেগ-ক্ষিন্ন ও বিপর্য্যস্ত

হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহারই জ্বালাময় দুঃখ দুর্য্যোগভরা কঠোর স্মৃতি তাঁহাকে যেন শোক-মুহ্যমান এবং স্তব্ধ ও নিস্পন্দ করিয়া তুলিয়াছিল। প্রমত্ত অন্তরের অধীর আবেগকে প্রবল শক্তিপ্রয়োগে সজোরে চাপিয়া ফেলিয়া ভগ্নহৃদয় রামপাল সমস্ত জগতের জনসঙ্গ হইতে নিজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া একা—একবারে একা এই বিজনতার মধ্যে ডুব দিয়াছিলেন।

রামপালের মাথার উপরে আশেপাশে সান্ধ্য প্রকৃতির এই শোভা-সম্ভার। তাঁর চক্ষের সম্মুখে এক চন্দ্রের কোটি প্রতিবিম্ব বক্ষে লইয়া নৃত্য-কুশলা লহরীমালা নানা ছন্দে শত কৌতুকে নাচিয়া, চলিয়া চলিয়া যাইতে-ছিল। তাঁহার শ্রান্তি-খিন্ন ললাটের স্বেদস্রুতি জলকণবাহী মন্দ পবন ধীর স্নেহস্পর্শে মুছিয়া লইতেছিল, তাঁর পিতৃ-পিতামহ-জননী স্নেহময়ী তরঙ্গিণী কলকল গদগদ নাদে না জানি কি আশার বাণীই তাঁর কর্ণকুহরে বলিতে চাহিতেছিল, তথাপি তাঁর সেই আত্ম-বিস্মৃত বিহ্বল স্তব্ধতা কেহই একা অথবা তাহাদের সমবেত চেষ্টা দ্বারাও বিদূরিত করিতে পারিতেছিল না। তাঁর অন্তরের কেন্দ্রে কেন্দ্রে দীপ্ত, সজাগ হইয়া রহিয়াছিল, একনিষ্ঠভাবে শুধু ঐ মর্ম্মন্তুদ বেদনার কশা দিয়া লিখিত তিনটী বাণী— "ধিক্! ধিক্! রামপালদেব!"—আর ঐ প্রবল ধিক্কারের সহিত অত বড় দৃঢ়চিত্ত বীর-হৃদয় যেন শতখান হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিতেছিল। মন হইতে সহস্র চেষ্টাতেও এই দুরন্ত ভীষণ স্মৃতিটাকে তিনি কোনমতেই যেন বিদায় দিতে পারিতেছিলেন না; দিবার কোন উপায় যেন ছিল না।

কিন্তু তাই বলিয়াই ত আর রামপালের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় না। তিনি যে তাঁর রাজ-ভ্রাতার বিরুদ্ধে কোন দিনই বিদ্রোহে যোগ দিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তাঁর সমুদয়

আত্ম-মর্য্যাদাকে ভূ-লুণ্ঠিত এবং সুনামকে বিসর্জ্জন আজ তাঁহাকে দিতেই হইবে, ইহা যে অপ্রতিবিধেয়। অতএব এখন উপায় কি?—ইহার আর উপায় কি? দুর্গতির দুর্গম অরণ্যে যখন দুই চক্ষু বন্ধ করিয়া নিজেই আসিয়া প্রবিষ্ট হওয়া গিয়াছে, তখন আর তার মধ্য হইতে মুক্তির রাজপথ তাঁহাকে কে দেখাইয়া দিবে? —মহাদেবী—না, নিশ্চয়ই না, অত বড় দস্যুতা করিয়া কাড়িয়া ছিনাইয়া গলায় ছুরি মারিয়া যে নিজের পথ মুক্ত করা—ওঃ—না, রামপাল তেমন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে ঘৃণা বোধ করে। যত ক্ষতিই সহ্য করিতে হয় হোক,—এখন মহীপালের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে যাওয়ার সহজ অর্থ-ই এই যে, তাঁর স্ব-কৃত প্রতিজ্ঞাভঙ্গ।

সজোরে ও সগর্ব্বে রামপাল মনে মনে কহিলেন, "মনে আমার যত অশান্তিই থাক, যত বড় অভিশাপই আমার মাথার উপর হয় বর্ষিত হোক, এ আমায় সহ্য করতেই হবে আর যখন তা সইতেই হবে, তখন সহিষ্ণুতার সঙ্গে সওয়াই ভাল। আমার বুকের ভিতর এর জন্য যত বড় জ্বালাই জ্বলতে থাক সে আগুনের তাপ ও দাহে এমন করে আর অপরকে দগ্ধ করবো না। সমস্ত দুঃখ, সকল লাঞ্ছনা, সব অপমান—এ আমারই নিজস্ব এ কেবল আমার।

রাত্রি গভীর হইয়াছিল। সচন্দ্র তারকারা প্রাণপণে নিজেদের পূর্ণজ্যোতি বিচ্ছুরিত করিয়া আকাশের, পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মিলন-সন্ধিস্থল সমূহকে জ্যোতিঃ-প্রজ্বলিত করিয়া তুলিয়াছিল। সুপরিস্ফুট অজস্র রজতধারাকারে জ্যোৎস্নালেখা সমস্ত চরাচরকেই ধৌত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া দিয়াছে। সু-উচ্চ প্রাসাদশিখর হইতে নদীতলশায়ী পাষাণবর্ত্ম পর্য্যন্ত সেই খরকিরণবর্ষী জ্যোৎস্নালোকে সুস্পষ্টীকৃত। রামপালদেব সহসা বাসঘোষকুলের কণ্ঠকলরবে রজনীর গভীরতা সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিলেন।

তখন ত্রস্তপদে সোপানশ্রেণী অধিরোহণপূর্ব্বক রাজোদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে সহসা তিনি শুনিতে পাইলেন, রাজপথে দ্বৈ-প্রহরিক ঘোষণা ঘোষিত করিয়া পুর-প্রহরী হাঁকিতেছিল—"তাপিত ও সন্তাপিত বিনিদ্র নর এবং নারিগণ! ক্ষয়শীল যৌবন, ভঙ্গুর জীবন এবং তদপেক্ষাও অচিরস্থায়ী ধন জন মান গর্ব্ব পদ ও প্রতিষ্ঠার ক্ষণস্থায়ী প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া বৃথা রাত্রি অতিবাহিত করিও না। এ সকলেরই অপেক্ষা জন্ম মৃত্যু জরাই মানবের প্রধানতম শত্রু। এই প্রবলতম অরাতির হস্ত হইতে যদি আত্মরক্ষায় ইচ্ছুক হও, তবে প্রভু বুদ্ধের শরণাগত হইয়া প্রাণ ভরিয়া বল 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি! বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি! বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি!' সকল সন্দেহের সমাধান হইয়া যাইবে। অশান্ত হৃদয় প্রশান্ত হইবে।"—

কুমার রামপালের সহসা মনে হইল, তিনি যে দিক্ চিহ্ন হীন মহাসমুদ্রে ভাসিয়া চলিয়াছিলেন, তাহারই উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষোভের মধ্যে যেন এক-খানি ভগ্ন কাষ্ঠ তাঁহার হস্তস্পৃষ্ট হইল। সেইখানে সেই জ্যোৎস্না-সমুজ্জ্বল মধু যামিনীর শান্তসুপ্ত মাধুর্য্যভরা, সহস্র সুগন্ধি কুসুমের অজস্র সুরভিনন্দিত মুক্ত উদার বিমানতলে উর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া, ব্যোমপথ বিহারশীল অসংখ্য কৌতূহলী গ্রহ নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া তিনি আজ মন্ত্রমুগ্ধের মতই উচ্চারণ করিলেন—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি!"

তার পর নিতান্ত অশক্ত অবশভাবেই তিনি সেইখানে সেই অনাচ্ছাদিত ধূলি কঙ্কর মণ্ডিত পথের পরেই ঘুরিয়া বসিয়া পড়িলেন। এই শান্তির মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে হইল, এ জগতের সহিত যেন অদ্যাবধি তাঁর একটা গভীর বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল। এ জগতে তিনি যেন এখন হইতে একেবারেই একা—এই একাকিত্বকে লইয়াই, এই নূতন মন্ত্রের

সাধনা করিয়াই তাঁহাকে তাঁর সমস্ত প্রকৃতির বিরুদ্ধে চির-বিদ্রোহ করিয়া, জীবনের প্রত্যেকটি পলবিপলকে ক্ষয় করিয়া লইতে হইবে। তবু এই মন্ত্র, এই অশরণের, অসহায়ের মন্ত্রই আজ হইতে তাঁর একমাত্র পাঠ্য হইল—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি!"

একটা নূতনতর নিষ্ঠুর বৈরাগ্যে সহসা রামপালের চিত্ত ভরিয়া উঠিতে লাগিল। একটা সম্পূর্ণ নূতন চিন্তা চক্ষের নিমেষে বিদ্যুদ্বেগে তাঁহার মনের মধ্য দিয়া খেলিয়া গেল। তবে কেনই বা—"সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" —বলিয়া তিনি তাঁর সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূলোৎপাটন পূর্ব্বক আজিকার এই জনহীন নিশুতি স্তব্ধ রাত্রিতেই জন্মের মত রাজপুরীর বাহির হইয়া না যাইবেন? বিরাগী শাক্যসিংহ প্রাণের তীব্র প্রেরণার দ্বারা যে কার্য্য করিয়াছিলেন, আজ গৌড়-মগধের মহারাজকুমার অনুপায়তার দৃঢ়পাশবদ্ধ অহোরাত্র বিদগ্ধ জীবনের সকল সমস্যার সমাধানহেতু যদি তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ করেন, ক্ষতি কি?—না, ক্ষতি কিসের? বরং ইহাতে লাভই আছে। যাহারা আজ ভীরু, কাপুরুষ, অক্ষম, অশক্ত রামপালকে ধিক্কার দিয়া গিয়াছে, তাহারাই আবার কাল এ সংবাদে তাঁর ভীরুতাকে বৈরাগ্য,—কাপুরুষের নিস্পৃহা, অশক্ততাকে আসক্তিহীনতা ও অক্ষমতাকে ধর্ম্মজ্ঞতায় পরিবর্ত্তিত করিয়া অনুতপ্ত পরিবাদে গালি ফিরাইয়া লইয়া বলিবে—"ধন্য! ধন্য তুমি মহাকুমার রামপালদেব! এত বড় সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র ছত্রপতিত্বকে অনায়াস বিরাগে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক এই যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ, এ আর কার সাধ্যে ছিল!"

দ্বিতীয় বুদ্ধাবতার বলিয়া হয় ত কালে এক দিন তাঁহারও স্মৃতি জন-পূজ্য হইয়া রহিবে।

নাঃ! এত বড় প্রলোভন আর রামপাল ছাড়িতে পারেন না, এই

তাঁর জীবনের পথ! এই তাঁর ভাগ্যলিপি! এই একমাত্র অশরণের আশ্রয়ে তাঁর সকল লজ্জা, সমস্ত ধিক্কার এবং সমুদয় জ[illegible]ই অবসান হইতে পারিবে।

কুমার রামপালদেব সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সেই জগৎ-ভরা জ্যোৎস্নার বন্যা-প্লাবনে শুধু রাজকীয় উদ্যানভূমিই নহে, পরন্তু রাজকীয় কক্ষ সকলও আনন্দ-প্লাবিত হইতেছিল। স্নিগ্ধ-মধুর বাতাস আসিয়া গন্ধদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তার জন্য কিছুমাত্র অভাব বোধ হয় নাই। প্রশস্ত শুভ্র কোমল শয্যার উপর সেই অপূর্ব্ব সুন্দর জ্যোৎস্নালোক যেন তরঙ্গায়িত হইতেছিল, আর [illegible]র মধ্যে তাহারই মত স্নিগ্ধ, সুন্দর ও কোমল দেহলতা অলসভাবে [illegible]ইয়া দিয়া সন্ধ্যারাণী একাকী জাগিয়া পড়িয়া আছে।

রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইতেছিল, বিশাল রাজপুরী ক্রমশঃ জন কোলাহল হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইয়া স্তব্ধ, শান্ত, প্রসুপ্ত হইয়া গেল, ক্রমে সুদূর রাজবর্ত্মে প্রহরীর ঘোষারাব অস্পষ্টভাবে শ্রুতি গোচর হইল, প্রাসাদ-তোরণে দ্বৈ-প্রহরিক নহবৎ বাজিয়া বাজিয়া আবার স্তব্ধ হইয়া গেল। সন্ধ্যার অভিমানাহত ব্যথিত ক্ষুব্ধচিত্ত এতক্ষণে একটা সন্দিগ্ধ আতঙ্কের তাড়নায় সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। একটা উগ্র তীব্র ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার আতঙ্কে তার সর্ব্বাঙ্গ যেন বারেক স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াই একেবারে অসাড় আড়ষ্ট হইয়া পড়িল। এতক্ষণকার নীরব নিষ্ফল অভিমানটা যেন রূঢ় কঠিন হস্তে তার গলাটাকে নির্ম্মমভাবেই টিপিয়া ধরিল।

এ কি হইল? এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল? এত রাত্রি হইয়া গেল, তবু ত দেখা নাই!—আর গত রাত্রির সেই বিবাদ-কলহের পর! না, নিশ্চয়ই কিছু একটা ভয়ঙ্কর অ-ঘটন ঘটিয়াছে।

সন্ধ্যা আর স্থির থাকিতে পারিল না। উচ্চ পর্য্যঙ্কের আস্তরণ-মণ্ডিত সোপান-শ্রেণী দ্রুত অবতরণ করিয়া সে কিছুক্ষণ উৎসুক উৎকণ্ঠিত চিত্তে কক্ষের মধ্যেই পদচারণ করিতে লাগিল। একবার উগ্র ব্যাকুলতায় ব্যগ্রভাবে আসিয়া বাতায়ন-নিম্নস্থ নদীবক্ষে চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিল। নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে জ্যোৎস্নার নর্ত্তন-লীলা, শুভ্র চন্দ্রকরে হৈম চন্দ্রচ্ছায়ায়, সুবর্ণ-রজতের গলিত জ্যোতি-প্রপাতরূপে সে এক অলৌকিক অনৈসর্গিক রূপ ধরিয়াছে, ক্ষুদ্র সন্ধ্যার এই বিপুল বেদনাতঙ্ক অনুভব করিবার আজ তাহাদের অবসর কোথায়?

অবশেষে দুশ্চিন্তা এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, ভয়ের তাড়নায় প্রবল লজ্জাও আজ সম্পূর্ণরূপে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া গেল। অস্থির দ্রুত চরণে প্রায় ছুটিয়া আসিয়া সন্ধ্যা মহাদেবীর দ্বারের নিকট দাঁড়াইল।

ভিতর হইতে নিদ্রা-জড়তা বিহীন শান্ত স্বরে প্রশ্ন হইল—"ওখানে কে?"

সন্ধ্যা ঘরে ঢুকিল। ঘনশ্বাসে তাহার বক্ষ বসন সঘনে আন্দোলিত হইতেছিল, চক্ষুর জলভার অসম্বরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল, সে সকল দ্বিধা ও সমস্ত লজ্জাকে পরিহার পূর্ব্বক ঘন কম্পিত রুদ্ধ শ্বাসে কহিয়া উঠিল—"দিদি! কি হবে দিদি?"

মহাদেবীর গৃহস্থিত শয্যাস্তীর্ণ দ্বিরদ-রদ-খচিত পর্য্যঙ্কের দিকে দৃষ্টি করিলেই দেখা যাইত, সে শয্যা এখন পর্য্যন্ত অভুক্ত রহিয়াছে। তিনি বাতায়নতলে বাহুর আশ্রয় রাখিয়া তাহারই উপর ন্যস্ত-গণ্ড হইয়া বিমনা-ভাবেই বসিয়াছিলেন। একা—সে কথা আর বলিবার অপেক্ষাও করে

না। তাঁর জীবনের এই একাকিত্ব আজিকার রাত্রে এই প্রথম বারের নয়। তাঁর দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে স্বামিসঙ্গের হিসাব হয় ত তাঁর অঙ্গুলীগণনার মধ্যেই পাওয়া যায়! পরম ভট্টারক, পরম-সৌগত, মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব নিজের বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীর নীরস সঙ্গে জীবনের পরমেপ্সিত সুখরাত্রির অপব্যয় করিয়া ফেলিবার পাত্র ছিলেন না, বিশেষতঃ এমন সব চন্দ্রালোক-পুলকিতা মধু-যামিনী! ইহার মধ্যে তাঁর ধর্ম্মপত্নীর স্থান কোথায়?

পট্টমহাদেবী যে সুগভীর চিন্তাজালে সমাচ্ছন্না হইয়া গিয়া রাত্রির গভীরতা পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে সমর্থা হয়েন নাই, এই অসম্ভাব্যরূপে রামপাল পত্নীর গৃহ প্রবেশে তাহা হইতে তিনি ত্রস্ত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিয়া সুকোমল কণ্ঠে কহিলেন—"কি হয়েছে রে, বোনটি? আজ আবার সে তোকে কি বলেছে?"

সন্ধ্যার ঠোঁট থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল, চোখের জল ঝর ঝর করিয়া ঝরে-ঝরে হইল, সে প্রায় ফুঁপাইয়া উঠিয়া বলিল, "সে বল্লেও ত আমার ঢের ভাল হতো! সে যে এখনও আসেনিই দিদি! ও দিদি! কি হবে?"

"কে আসেনি, রে? তোর বর?"

অন্য সময় হইলে এই "তোর বর" শব্দটুকু কানে ঢুকিলেই লজ্জায় সন্ধ্যার মুখ সন্ধ্যাকাশের মতই লাল টক্‌টকে হইয়া উঠিত। কিন্তু আজ তার সে রকম জাগ্রত অবস্থাই যে ছিল না। সে এতক্ষণ ধরিয়া তার কম্পিত অধরকে দাঁত দিয়া চাপিয়া অনিবার্য্য ক্রন্দনকে প্রাণপণে সম্বরণ চেষ্টা করিতেছিল, সহসা অসম্ভব বোধে সেই অসাধ্য-সাধনে বিরত হইয়া তাহাকে একবারেই মুক্ত ধারায় উৎসারিত হইতে দিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "হ্যাঁ দিদি! সে কেন এখনও এলো না? আমার মন

যে বড্ড অস্থির হয়ে উঠেছে, দিদি গো! কি জানি, যদি কোন অমঙ্গল হয়ে থাকে?"

এই ক্ষুদ্র বালিকার অহেতুকী চিন্তা কাতরতা ও অসহায় অশ্রুজল দৃঢ় চিত্তের বলকেও আজ যেন ঈষৎ শিথিল করিয়া তুলিল। অন্য দিন হইলে হয় ত, সর্ব্বত্র অজেয় রামপাল সম্বন্ধে সহসা একটা বিপদচিন্তা তাঁর চিত্তে স্থান প্রাপ্তই হইত কি না, বলা যায় না। হয় ত এই সরলা শিশু-প্রকৃতি বালিকাকে বুকে টানিয়া তাহাকে সহানুভূতিপূর্ণ সপরিহাস ব্যঙ্গে ভুলাইয়া তাহাকে নিজের এই বৃথা ভয়ভাবনার জন্য লজ্জায় রাঙ্গাইয়া তুলিতেন, কিন্তু আজিকার সেই বিদায়-দৃশ্য, সে যে এখনও চোখের উপর জ্বলন্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই ধরিত্রী-হৃদ্-বিদারণ-নিঃসারিত গৈরিকস্রাবতুল্য অগ্নিময় বাণীসকল তাঁহার উভয় কর্ণকুহর যে নির্ম্মমভাবেই দগ্ধ করিতেছিল, যে স্মৃতির অসহ্য দাহ তাঁহাকেও আজি এই সর্ব্বজন প্রসুপ্ত তৃতীয় প্রহর রাত্রে বিনিদ্র রাখিয়াছে, তারই জন্য এই অশ্রুমুখী বিহ্বলা বালিকায় আনীত সংবাদ তাঁর চিত্তে ভয় এবং ভাবনা এই দুইটাকেই আজ প্রচুরভাবে টানিয়া আনিল। মনের কত বড় অস্থিরতায় সেই অবমাননার পঙ্ক-লিপ্ত তেজস্বী যুবাকে না জানি আজ তার ভাগ্যস্রোত কোন্ বিপথেই বা টানিয়া লইয়া গেল! প্রতিজ্ঞা যখন তার এতই অ-ত্যাজ্য হইয়া রহিল, আবার মহাদেবীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় যখন সে বিন্দুমাত্র আঘাত দিতেও অসমর্থ,—তখন অভিমানী অনবনত চিত্ত আর কি করিতে পারে?—যদি না সে নিজের পরেই সকল প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া—

লজ্জাদেবী আর ভাবিতে পারিলেন না, তাঁর সকল ধৈর্য্য যেন একই ক্ষণে টুটিয়া গিয়া তাঁহাকেও সেই মুহূর্ত্তে সন্ধ্যার অপেক্ষাও অধিকতরই ভয়ার্ত্ত দেখাইল। তথাপি ঈষৎ শুষ্ক হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভয় কি

রাণি! সে কি তোকে ফেলে সত্যি সত্যি কোথাও যেতে পারবে? এখনি আসবে সে—"

কিন্তু সন্ধ্যা যে আজ তার চিরনির্ভরতা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সে এই প্রবোধবাক্যে যেন সম্পূর্ণ নির্ভর রাখিতে না পারিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কি জানি, দিদি! কি হলো! আমার মন যে কিছুতেই স্থির হচ্ছে না, আমার কি হবে দিদি! দিদি গো! আমার যে আর কেউ নেই।"

"এমন পাগলি তুই—ও কে' ও?"

মুক্ত দ্বারের পার্শ্বে প্রস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে একটা দীর্ঘ ছায়াকে সহসা অপসৃত হইতে দেখিয়া সন্দিগ্ধ কণ্ঠে মহাদেবী এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, উত্তর না পাইয়া দ্রুতপদে দ্বারসমীপস্থা হইয়া দেখিলেন, কেহ অতিশয় সন্তর্পণে অথচ দ্রুত পদক্ষেপে অন্ধকারের আশ্রয়ে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে। দেখিয়া মহাদেবীর চিন্তা-ম্লান মুখ সহসা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি সেই আত্মগোপন সচেষ্ট ছায়া-মূর্ত্তির পানে ফিরিয়া ডাকিলেন—"মহাকুমার!" উত্তর না পাইয়া পুনশ্চ ডাকিলেন—"রামপাল!"

দীর্ঘ ছায়াকারী এ আহ্বানের পর আর এক পদও নড়িতে সমর্থ হইল না, শুদ্ধ নিঝুম হইয়া সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল। তার পর ক্ষণকাল তেমনই থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল।

তখন বিস্মিত এবং সস্মিত দৃষ্টিতে মহাদেবী দেখিলেন, বাস্তবিকই এই নগ্নপদ, দীনবেশী পলাতক কুমার রামপালদেব ভিন্ন অপর কেহই নহেন।

পট্টমহাদেবী স্থির তীক্ষ্ণ নেত্রে তাঁর মৌন নত মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাঁর মনের মধ্যে তখন কি যে ঝড় বহিতেছিল,

বোধ করি, তাহা বুঝিতে তাঁর অর্দ্ধনিমেষেরও অধিক কালবিলম্ব ঘটে নাই। তিনি ধীরপদে নিকটস্থ হইয়া নিজের শান্ত শীতল দক্ষিণ হস্ত তাঁর সেই অশান্ত ঝটিকাক্ষুব্ধ বক্ষতলে অর্পণ করিয়া গম্ভীর মুখে স্থির স্বরে কহিলেন, "শান্ত হও, মহাকুমার! যদি আমি সতী হই, যদি ইষ্টদেবতার পদে আমার যথার্থই মতি থাকে, আমি তোমায় কায়মনো-বাক্যে আশীর্ব্বাদ করচি, এ দিন তোমার কখনই চিরস্থায়ী হবে না। এক দিন অবসানোন্মুখ পালসাম্রাজ্যের সৌভাগ্য-সূর্য্য তোমাকেই আশ্রয় ক'রে পুনরুদিত হবে। কিন্তু আজ যদি তুমি আবেগের বশে একটা কিছু অসঙ্গতাচরণ ক'রে ফেল, হয় ত সে ভুল আর এ জন্মে কোন দিনই শোধরাতে পারা যাবে না। বর্ত্তমানটাই আমাদের সব নয়; ভবিষ্যতের যবনিকার তলে আমাদের জন্য কত আশাতীত বস্তুও হয় ত লুকান থাকতে পারে, তা কি বলা যায়?"

রামপালের ইচ্ছা ছিল, গোপনে একবার মহাদেবীর রুদ্ধ দ্বারে প্রণত হইয়া একবার অন্তরাল হইতে সন্ধ্যাদেবীর সুখ-সুপ্ত মূর্ত্তিখানি দেখিয়া ইঁহাদের নিকট এ জন্মের মত তিনি মনে মনে বিদায় লইবেন। এত রাত্রে উভয়েরই জাগিয়া থাকা বা একত্রাবস্থান তিনি কল্পনাও করেন নাই। এখন ধরা পড়িয়া গিয়া, নতশিরে কপালের ঘর্ম্ম মুছিতে লাগিলেন, উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

তখন ব্যাকুল ক্ষোভে রামপালের হাত চাপিয়া ধরিয়া প্রগাঢ় কণ্ঠে মহাদেবী ডাকিলেন, "সন্ধ্যা!"

অত্যন্ত ভয়ের পর মুহূর্ত্তেই প্রত্যাশাহীন আনন্দের আত্যন্তিক আতিশয্যে ক্ষুদ্র সন্ধ্যা যেন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সঙ্গে আবার তার স্বভাবজাত লজ্জারও যেন সহসা আবির্ভাব হইয়া পড়িয়াছে। তাই সে প্রথমটায় মহাদেবীর আহ্বান পাইয়াও লজ্জার তাড়নায় তাঁর আজ্ঞা-

পালনে ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়াছিল, কিন্তু ঐ শান্ত শীতল মিষ্ট স্বরের মধ্যে বিজয়ী কর্ণাটেশ্বর-দুহিতার যে দৃঢ় আদেশ নিহিত আছে, তাহা যেন একান্তই দুর্লঙ্ঘ্য। তখন সলজ্জ সস্মিতভাবে মৃদু চরণে সন্ধ্যা আসিয়া মহাদেবীর কোলের ভিতর প্রায় ঢুকিয়া দাঁড়াইল, তার জলভরা চোখের উপর সুখস্মিত মৃদু হাস্যরেখা যেন বর্ষার সজল আকাশে ইন্দ্রধনুর বিচিত্র রূপের মতই মনোরম শোভায় ফুটিয়া উঠিতেছিল। একাধারে শোক, ভয় ও হর্ষ এই ত্রিবর্ণ যেন রক্ত, পীত ও নীলের মতই সমুজ্জ্বল প্রভা বিকীর্ণ করিতেছিল।

তখন স্মিত-কোমল হাস্য রঞ্জিত মুখ কুমারের দিকে ফিরাইয়া, সস্নেহে ক্ষুদ্র বালিকার মাথার উপর কল্যাণময় হাতখানি রক্ষা করিয়া স্নিগ্ধ-মধুর কণ্ঠে মহাদেবী কহিলেন,—"মহাকুমার! আমার ভুলের শাস্তি তুমি এই নিরপরাধীর মাথার উপর চাপিয়ে দিয়ে শোধ নিতে চেও না। এর এই মুখের দিকে একবারটি ভাল ক'রে চেয়ে দেখে তার পর যা তোমার সঙ্গত মনে হয়, তাই কর। আর আমার কিছুই তোমায় আজ বলবার নেই। বালক রামপাল যে এক দিন যুবক রামপাল হবে, এই অত্যন্ত সোজা কথাটা ভুলে গিয়ে আমিই তোমার সর্ব্বনাশ ক'রে রেখেছি। কিন্তু ভাই! শুধু এইটুকু আজ তোমায় আমি গৌড় মগধের পট্ট মহাদেবী,—আমি তোমায় স্মরণ করিয়ে দেব, যে, সহস্র প্রতিজ্ঞার কাছে নিজের হাত বেঁধে রাখলেও সে বন্ধন তোমায় তেমন ক'রে বেঁধে রাখতে পারবে না, যদি তুমি এই—এর প্রতি এতটুকু অবিচার ক'রে এর চোখের জলের বাঁধন দিয়ে নিজেকে আবদ্ধ ক'রে না ফেল! এই চিরপুরানো বাক্যটাকে শুধু বচন মাত্র মনে করো না, একে নিশ্চিত সত্য বলেই জেনো,—

'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে,—
রমন্তে তত্র দেবতাঃ'—

দেবতার আশীর্ব্বাদ যদি চাও, —এই নাও,—এর অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে একে প্রসন্ন ক'রে তোল।—যাও সন্ধ্যা! তোমার স্বামীর সঙ্গে ঘরে যাও—"

এই বলিয়া মহাদেবী আর কাহারও দিকে না চাহিয়া শান্ত দৃঢ়পদে আপন কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভিতর হইতে পুনশ্চ তাঁর পরিহাস-স্নিগ্ধ সহাস্য কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"চক্রবাক্‌মিথুন! রজনী-প্রভাতের আর বিলম্ব নাই।"

কুমার রামপালের আনত মুখের বিষাদ মেঘচ্ছায়া সহসা এ কথায় অপসৃত হইয়া গিয়া তাহা আজিকার শরচ্চন্দ্রের মতই বারেক উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইল। তিনি স্নেহ-কোমল স্পর্শে লজ্জা কুণ্ঠিতা অথচ হর্ষ-বিহ্বলা সন্ধ্যাকে নিজের বুকের কাছে টানিয়া লইয়া তার কানের কাছে নত হইয়া কহিলেন,—"আমায় ক্ষমা কর, সন্ধ্যা!"

ঘরে ফিরিয়া সন্ধ্যা বিস্মিত নেত্রে স্বামীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সন্দেহ ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার এ বেশ কেন?"

কুমার ঈষৎ লজ্জা পাইয়া লজ্জা-স্মিতমুখে উত্তর করিলেন,—"আমি প্রব্রজ্যা নে'বার কথা ভাবছিলেম।"

ইহা শুনিয়াই সন্ধ্যার সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দিত হইয়া উঠিল, চক্ষে নিমেষে তার চোখের কোল দুইটি পতনোন্মুখ অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু তথাপি তখনও সে প্রাণপণ বলে সে অশ্রু-নিরোধ-চেষ্টা ছাড়িল না। পাছে কান্না বাহির হইয়া যায়, এই ভয়ে স্তম্ভিত মেঘের মতই নীরব নিস্পন্দ হইয়া আনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

দিদি বলিয়াছেন,—তার চোখে জল পড়িলে তার স্বামীর মঙ্গল হইবে না—তাই সে এমন করিয়া নিজেকে সম্বরণ চেষ্টায় পীড়িত করিয়া তুলিল। কিন্তু এ যে কত বড় অসাধ্য চেষ্টা, এ বোধ করি, সে নিজে ভিন্ন আর কাহারও বোধগম্য হইবার নয়!

"প্রব্রজ্যা নে'বার কথা ভাবছিলাম।"—স্বামীরএই নির্ম্মম বাক্য— এ যে তার বুকের একবারে হৃৎপিণ্ডের ঠিক মাঝখানে ছুরির মতই করকর করিয়া কাটিয়া বসিয়া গিয়াছিল। তিনি তাহা হইলে তাহাকে ছাড়িয়া জন্মের মত চলিয়া যাইবার কথাও ভাবিতে পারিয়াছেন ?

সন্ধ্যার মুখখানা দেখিতে দেখিতে পাথরের মতই কঠোর ও শীতল হইয়া আসিল, তার হাতপা কাঁপিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সে টলিয়া পড়িয়াও যাইতেছিল, চক্ষুর পলকে রামপাল দুই বাহু বাড়াইয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়া নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন, তার উত্তাপহীন শীতল ওষ্ঠাধর উত্তপ্ত চুম্বনের স্রোতে প্লাবিত করিয়া দিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"দেখলেম, সেটা খুবই সহজ নয়, সন্ধ্যা! এতটুকু ছোট্ট মানুষটী তুমি, হ'লে কি হয়, আমার এই এত বড় বুকটার মধ্যের অনেকখানি যায়গাই তুমি জুড়ে নিয়েছ।"

তখন স্বামীর বুকের উপর পড়িয়া সন্ধ্যা মঙ্গলামঙ্গলের সমুদায় হিসাব-নিকাশ ভুলিয়া গিয়া একবারে হুহুশব্দে কাঁদিয়া উঠিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

'নর্ত্তকী-কুলেশ্বরী চন্দ্রকলা' বলিয়া সে দিন স্বয়ং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাধিপতি মহারাজাধিরাজ যাহার মর্য্যাদা বাড়াইয়াছিলেন, সেই চন্দ্রকলা আজ দুই দিন ধরিয়া বিষম শিরঃপীড়ায় প্রপীড়িতা শয্যাশ্রিতা হইয়া আছেন। প্রহরে প্রহরে রাজবাটী হইতে সংবাদিক তাঁর কুশল লইতে আসিয়া ...তিচিত্তে অকুশল লইয়াই ফিরিতেছে। দিবারাত্রে অন্ততঃ পাঁচ

সাত বার প্রধান রাজবৈদ্য সুদাস ভট্ট তাঁর খুঙ্গি-পুঁথি-পেটিকাদি সঙ্গে লইয়া রোগিণীর পার্শ্বে বসিয়া নিজের কর্কট-দংষ্ট্রাবৎ শীর্ণ ও শিরাসঙ্কুল হস্তাঙ্গুলী দ্বারা তার নবনীতসুকোমল এবং শ্বেতপদ্মপ্রভ হাতখানি ধরিয়া সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারে নাড়ী পরীক্ষা করিতেছেন। বহু গবেষণানন্তর পাঁচ সাতটা অনুপান পাঁচনের সহিত মিল করিয়া বড় বড় নামজাদা ঔষধের ব্যবস্থা ত অমন দিনের মধ্যে পাঁচ বারই বদলাইয়া দিতেছেন, কিন্তু কেমন যে ঐ কুগ্রহের ফেরে মাথা ধরিয়াছিল, সে পোড়া মাথা আর কিছুতেই নর্ত্তকীরাণীকে ছাড়িয়া যাইতে রাজী হইল না! অথচ এই রাজ্যেশ্বরের প্রিয়তমার বড় সাধের মাথা, এ মাথাধরা না ছাড়াইতে পারিলে মান-যশ ত দূরেই থাক্, ধনপ্রাণও যে খুবই নিরাপদ থাকিবে না, সে কথাও বৈদ্যকুল-শেখরের জানাই ছিল।

তাই হাতের নাড়ী রোগিণীর শরীরে রোগের অস্তিত্বকে যতই কেন না অস্বীকার করুক, বৈদ্য রাজ ইড়া পিঙ্গলা, সুষুম্নার সত্যবাদিতায় বিষম সন্দিহান হইয়া পড়িয়া ততই কঠিন শিরঃপীড়ার কঠোরতর ব্যবস্থা বিধান করিতে লাগিলেন। ষড় বিন্দু তৈলের নাস, মধ্যমনারায়ণ, হিমসাগর ত্রিশতী প্রভৃতি কিছুই মাথায় কপালে বাদ পড়িল না।

এ দিকে চন্দ্রকলার মাথার মধ্যে কোন কিছু একটা ঘটিয়াছিল, ইহাও সত্য! তা হউক সেটা শিরঃপীড়া, হউক্ সেটা চিত্তপীড়া,—মনের মধ্যে তার কি যেন কোথাকার কোন্ অশ্রুত গানের রেশ, কোন্ অজ্ঞাত বাঁশীর সুর কোন এক নূতন ছন্দে বাজিয়া উঠিয়াছিল, সে বাজনা—সে গানের যেন আর এ কয়দিনে শেষই হইল না। সে যে কি গান, কি যে তার মনভুলানো প্রাণমাতানো ছন্দ, সে তার কোনই হিসাব্ মিলাইতে পারে নাই। এর সঙ্গে আষাঢ় মেঘের গুরুগুরু ধ্বনি, এর সঙ্গে বিশ্বের সকল দিনের সকল ঋতুর সব উৎসবের হাসি, বাঁশীর তান

মেশানো, আবার তারই মধ্যে মধ্যে কোন্ যেন এক কূলহারা পথহারা নিরুদ্দেশের করুণ সঙ্গীত, বিশ্বের সমুদয় করুণা, বেদনা ও হতাশার সুর লইয়া ইহার সহিত সমানতালে তাল দিয়া চলিয়াছে। একসঙ্গে এই কান্না-হাসির যুগল স্রোতে নর্ত্তকীর লঘুচপল চিত্ত ভার যেন বাদল-মেঘের মত থম্‌থমে ও বসন্ত পবনের মত সুরভি স্নিগ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। তার হৃদয়নদীর কূলে কূলে যেন ঘুমন্ত তরঙ্গগুলি মৃদু কাকলীতে কার বন্দনা-গীতি গাহিয়া গাহিয়া উঠিতে চাহিতেছে, আবার যেন ভরসা না পাইয়া সঙ্কোচে নীরবই রহিয়া যাইতেছে। বুকের ভিতর তার আশা—তার দুরাশা যেন অতি সন্তর্পণে সঙ্গোপনে নিজেকে লুকাইয়া লইয়া উৎকণ্ঠাভরা চিত্ত উৎসুক চক্ষে, অথচ নৈরাশ্য ভীত-ম্লানমুখে কাহার প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া আছে। হঠাৎ যেন কোন্ গভীর বাণী তার হৃদয়-গুহার গোপন গহ্বরে সুগম্ভীর প্রতিধ্বনিতে জাগিয়া উঠিয়াছে, সেই বাণীর স্পর্শ পাইয়া যেন তার প্রাণের বীণা অজানা সুরে ও অশ্রুতপূর্ব্ব রাগিণীতে নূতন আলাপ সুরু করিয়াছে।

তার মনে হইতেছিল, যেন এই নূতন বাণীর নবীন সুর শুধু তারই মধ্যে নয়, সমস্ত ধরার বক্ষেই এক নবীনতার সমাবেশ করিয়াছে। সারা দিগ্‌দিগন্তর যেন সেই নূতনতর মোহন বাঁশীর মোহনীয় স্বরে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে। তার সেই প্রাণমাতানো সুরের খেলায় আকাশে যেন ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটার সমাবেশে নিখিল বিশ্ব রঙ্গীন হইয়া দেখা দিয়াছিল, তারই সেই মন হারানো বাঁশীর তানে নর্ত্তকীর শীতল ও স্থির শোণিত যেন শ্রাবণ-জলধারা-পুষ্ট কল্লোলিনীর মতই উন্মত্ত-পুলকে কল-কল্লোলে মাতিয়া উঠিয়াছে। তার মন প্রাণ যেন গুরুগুরু মেঘ-ডম্বরুরোলে উৎকণ্ঠিতা উর্দ্ধনেত্রা চাতকীর মত গভীর তৃষ্ণা-বিরামের উন্মত্ত আগ্রহে উৎপ্রেক্ষিত হইয়া উঠিল, তার গভীর আশা নিরাশার বিপুল সংঘাত

তাহারই বুকের মধ্যে চকিত বিজলীর সঘন স্ফুরণের মতই ক্ষণে ক্ষণে চ্ছুরিত হইতে লাগিল। এমন কি, চারিদিকে সকল বাধার বিরুদ্ধে ঝড়ের সময়ের মেঘের মধ্য হইতে যে প্রলয়ঙ্কর বজ্রের ডাক ধ্বনিত হইতে থাকে, তাহারই অনুকরণে তার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন গর্জ্জিয়া উঠিতে লাগিল। কোন বাধাকেই আর সে বাধা মনে করিতে পারিল না।

এমনই মানসিক দুর্য্যোগের মধ্যে একমাত্র রক্ষী সঙ্গে লইয়া সে সান্ধ্য-অন্ধকারে আত্মগোপন পূর্ব্বক কুমার রামপালের উদ্যান মধ্যস্থ বিশ্রাম গৃহে অভিসার করিল। ভাগ্যক্রমে কুমার সে সময় সে গৃহে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজের গভীর চিন্তাভারে ভারাক্রান্ত মন লইয়া ইদানীং বিজনতারই বিশেষ ভক্ত হইয়াছেন, তাই বড় একটা বাহিরে যাইতেনই না; আজও সেই মত বিষাদ ম্লানমুখে তাঁহারই মত বিষাদসমাচ্ছন্ন নিরালোকিত সন্ধ্যাচ্ছায়াভরা বাতায়নমধ্য হইতে অনির্দ্দেশ্য নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছেন। শরীরের মধ্যে কোনখানে খুব বড় একখানা ক্ষত জন্মিলে তাহারই ব্যথায় সমস্ত শরীরটা আড়ষ্ট হইয়া থাকে, রামপালের বুকের ভিতরকার আহত বেদনায় ঠিক তেমনই করিয়া তাঁহার সমস্ত শরীর-মনটাকেই আড়ষ্ট ও অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল। এই জটিল জীবনের নাগপাশ হইতে কোন দিক দিয়াই তাঁর আর যে মুক্তির আশামাত্র নাই, ইহাও ত সর্ব্বপ্রকারেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে!

বৈশাখমধ্যাহ্নের অগ্নিকণাবর্ষী গভীর তপ্ত শ্বাস মোচন পূর্ব্বক রামপাল আত্মগতই কহিয়া উঠিলেন, "দুর্ব্বহ! দুর্ব্বহ এ জীবন!—ওঃ—"

পাশের দিকে একটা অস্পষ্ট বিস্ময়ধ্বনি ধ্বনিত হইল। কে যেন আকস্মিক বেদনাহত হইয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কি একটা কথা বলিয়া উঠিল।

রামপাল বিস্ময়াহতভাবে মুখ ফিরাইলেন। অস্ফুট অন্ধকারে বস্ত্রাবৃত মনুষ্য মূর্ত্তি! মূর্ত্তি নিশ্চয়ই নারীর। কুমার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁর এত

কাছে কে' এ রহস্যমণ্ডিতা রমণী? পট্টমহাদেবীর মহল্লিকা নিশ্চয়ই নয়, তাহারা এ ভাবে তাঁর সম্মুখীন হইতে পারে না। কে তবে? তাঁর বিস্ময় সীমাতিক্রম করিতে উদ্যত হইল। তীক্ষ্ণ নেত্রে চাহিয়া এইটুকু মাত্র বুঝিলেন, রমণী সুন্দরী, সর্ব্বালঙ্কারমণ্ডিতা এবং বারাণসীজাত অতি সুদৃশ্য সূক্ষ্ম বস্ত্রধারিণী। তাহার অঙ্গ সুরভিতে সেই নারী সংসর্গ বিবর্জ্জিত নিরানন্দ কক্ষবায়ু যেন স্নিগ্ধ মধুর হইয়া উঠিল; নাগকেশরপরাগ ও অগুরুর গন্ধে উহা সংমিশ্রিত।

সহসা বারেকের জন্য একটা তীব্র সন্দেহে রামপালের বক্ষ সঘনে দুলিয়া উঠিল। সন্ধ্যাই কি এত বড় দুঃসাহসিকতা করিতে পারিয়াছে? আশ্চর্য্য নহে! মহাদেবীর সহায়তায় সকলই সম্ভব বটে! কিন্তু না, এমন অভিসারিকার বেশে' এই জন-সমাগম সম্ভাবনাযুক্ত স্থানে রাজকুল-বধূর আবির্ভাব অসম্ভব যে!

একটা মৃদু-মধুর অলঙ্কারশিঞ্জনধ্বনি এক নিমেষে মহাকুমারের অন্তরের দ্বৈধ ভাবটুকুকে বিলোপ করিয়া দিল; এ সন্ধ্যা নয়, সন্ধ্যার প্রতি অলঙ্কার ঝঙ্কার তাঁর বুকের রক্তের তালে তালে তাল দিয়া যে তাঁহাকে তাহার অস্তিত্ব বুঝাইয়া দেয়। এই শব্দটুকু ধ্বনিমাত্রই, ইহার সঙ্গে তাঁর অন্তরাত্মার ত কোথাও কোন যোগ নাই!

সন্দেহ বিরস কণ্ঠে মহাকুমার প্রশ্ন করিলেন, "কে' আপনি?"

জিজ্ঞাসিতা যেন এইটুকুরই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে সে তাঁর দুইপায়ের তলায়, পা দুইখানার অত্যন্ত নিকটেই নিজেকে,—সেই কুসুমস্তবক তুল্য সুকোমল ও তেমনই সজ্জা সুন্দর দেহলতাকে নামাইয়া দিয়া করযোড়ে সবিনয়ে উত্তর করিল—

"আপনার মহত্ত্বের দাসী—"

এ' কি প্রহেলিকা? কুমার রামপালের মহত্ত্ব! আর সেই মহত্ত্বেরই

দাসী এই অপরিচিতা নারী?—রহস্য বটে! ক্ষণকাল রামপালের মুখ দিয়া বাক্য নিঃসৃত হইল না। কে এ রমণী?—উন্মাদিনী না কি? সম্ভব বটে! নতুবা যে রামপালের কলঙ্কে আজ দেশ ভরিয়া উঠিল, সমুদায় বরেন্দ্রভূমি যার নামে আজ গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিতেছে, 'ধিক্ ধিক্ রামপাল দেব!' ঠিক সেই সময়ে এই একক নারীমূর্ত্তি একটা গভীর দুর্ভেদ্য রহস্যের মতই এই সান্ধ্য অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিয়া যেন কোন্ এক অমানুষী মূর্ত্তির মতই তাঁহাকে আজ যেন ব্যঙ্গচ্ছলে বলিতে আসিল, সে 'তাঁর মহত্ত্বের দাসী।' হায়রে! অপযশের—অবমাননার একটা সীমাও কি কোথাও নাই? অথবা ইহার মধ্যে কিছু ভ্রান্তি থাকাও ত সম্ভব!

চিত্ত ভারাক্রান্ত গভীরস্বরে তিনি তখন পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, "যার সঙ্গে কথা কইচেন, তাকে আপনি ভাল ক'রে জানেন কি? বোধ করি, আপনার ভ্রম হয়ে থাকবে।"

সেই রহস্যময়ী মূর্ত্তি তেমনই পদানতা অঞ্জলিবদ্ধা থাকিয়াই প্রসন্ন-স্মিতকণ্ঠে সাস্মিতমুখে প্রত্যুত্তর করিল, "পরম কুশলী ভট্টারক পাদীয় মহারাজ কুমার রামপাল দেবকেই আমার কায়মনোবাক্যের একমাত্র শ্রদ্ধা প্রদান করতে এসেছি, এ বিষয়ে আমি অভ্রান্ত।"

মহাকুমার একটা বিস্ময়সূচক ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, "তবু আপনি তার কাছে নিজেকে এতখানি নত করেছেন? আশ্চর্য্য! কোথায় খুঁজে পেলেন তার এই কল্পিত মহত্ত্ব, মহিমময়ি?"

ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিবার পর তখনও উহাকে বাক্য-বিমুখী দেখিয়া পুনশ্চ আবেগ উথলিত প্রগাঢ় স্বরে থামিয়া থামিয়া কহিতে লাগিলেন,—"সমুদয় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের লোক যে কথা জানে, আপনি একাই কি তার সম্বন্ধে কোনই সংবাদ রাখেন না? কোথায় থাকেন আপনি? নিশ্চয়ই এদেশী নন? আপনার উচ্চারণেও আমি তার প্রমাণ পেয়েছি। আপনি; আমায়

জানেন না, তাই এ কথা বলছেন। ভীরু, কাপুরুষ, আশ্রিতজন পরিত্যাগী রামপাল মহত্তম? সে একটা নগণ্য তর ক্লীব মাত্র—এই নিশ্চিতবার্ত্তা জেনে রাখবেন।”

রমণী এবার কথা কহিল। একটা গভীর সহানুভূতিভরা [illegible] দীর্ঘশ্বাস সে ধীরে ধীরে মোচন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত তার [illegible]ও সেই ভাবেই অঞ্জলিবদ্ধ রহিয়া ছিল, সদ্যোগৃহপ্রবিষ্ট স্বল্পমাত্র তরুণ চন্দ্রালোকে সে সমুজ্জ্বল নেত্রে চাহিয়া স্মিত মধুর কণ্ঠে কহিল, “কস্তূরীমৃগ নিজের গন্ধ নিজে পায় না, বনবাসীরাই গন্ধ পেয়ে তাকে অন্বেষণ করে। আপনি যে মহৎ, তা আমার মত অধমারও যখন একটি নিমেষের দেখায় জানতে বাকি থাকে না, তখন দু'চার জন নিতান্তই মূঢ় ব্যক্তি না জানলেও সমস্ত জগৎ জানে, অথবা এক দিন নিশ্চয়ই জানবে। যে সূর্য্যরশ্মি ইচ্ছামাত্রে সমস্ত জগৎকে ভস্ম করতে সমর্থ, তা না ক'রে সূর্য্য যে সেই তেজকে মানব হিতের জন্য মাত্র আংশিকভাবে প্রদান ক'রে [illegible] ঝটিকাকে সংবরণ ক'রে রাখেন, সেইখানেই কি তাঁর মহত্ত্ব নয়? [illegible]াকাল যদি সংহার-শক্তিকে কোন কারণে বা কারণান্তরের জন্য সংহরণ করেন, তাতে কি বুঝায় যে, তাঁতে শক্তির অভাব ঘটেছে? রুদ্রের মধ্যে ধ্বংসশক্তি আছে ব'লে কি সর্ব্বদাই তিনি তাকে ক্রীড়নক ক'রে তুলচেন?”

রামপাল পুনশ্চ গভীরতর বিস্ময় সাগরে ডুবিয়া বিমূঢ়প্রায় হইয়া গেলেন। এই নারী, এই বিদুষী ও প্রগল্‌ভা রমণী ত নিতান্তই সামান্যা নয়! আবার তাঁর বিস্ময় স্খলিত কণ্ঠমধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল, —“কে' আপনি?”

মৃদু মন্দ হাসির ছটায় মরকতমণিপ্রভ আরক্ত অধর সমধিক সুরঞ্জিত করিয়া তুলিয়া কোমল কণ্ঠে অভিসারিকা এবার সকৌতুকে উত্তর করিল, “কুমার! আমায় চিনতে পারলেন না? আমি কিন্তু সেই এক

দিনের কয়েক মুহূর্ত্তের সাক্ষাতেই আপনাকে বোধ করি, এমন কি, আমার পরজন্মেও আর বিস্মৃত হ'তে পারব না! এ হতভাগীর নাম চন্দ্রকলা।"

সুগভীর বিস্ময়ভরে রামপাল যেন আত্মগতই উচ্চারণ করিলেন, "চন্দ্রকলা!—মাগধ-নর্ত্তকী চন্দ্রকলা!"

নর্ত্তকী নীরব সম্মতিতে তাহার ক্ষুদ্র বদ্ধাঞ্জলি ললাটে স্পর্শ করিল।

"আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন?" রামপালের কণ্ঠে একটা বিরাগ-কাঠিন্য প্রকটিত হইল।

"বুদ্ধিমান্ প্রধান পৌণ্ড্রবর্দ্ধন যুবরাজ রামপালদেবকে কি সে কথা আরও স্পষ্ট ক'রে আমায় ব'লে দিতে হবে?"

কুমার কয়েক পদ সরিয়া দাঁড়াইয়া নীরস কণ্ঠে কহিলেন, "ভদ্রে! আপনাকে আমি এক দিন আমার জ্যেষ্ঠের পার্শ্বচারিণী রূপে দেখেছিলেম, আপনি যে বা যাই হোন, সে সম্বন্ধে আমার মাননীয়া—"

চন্দ্রকলা সহসা যেন সুগভীর লজ্জায় মগ্ন হইয়া পড়িল। প্রবল একটা আত্মগ্লানি ও ধিক্কার সে আপনার মধ্যে অনুভব করিল। সহসা আর সেই চিরব্যাপিকার মুখে বাঙ্নিষ্পত্তি হইল না। তার মনে হইল, রামপাল তাহাকে অকথ্য গালি দ্বারা লাঞ্ছনা করিলে, এমন কি, প্রহার করিলেও যেন তাহা তার পক্ষে এত বড় অকরুণ ও অসহ্য হইত না। বেদনায় ও হতাশায় তার শত আশায় বাঁধিয়া তোলা হৃদয় বীণা যেন ঐ একটিমাত্র কঠিন ইঙ্গিতের কঠোর ঘায়ে একেবারে খান্ খান্ হইয়া ছিঁড়িয়া পড়িল। স্তব্ধ ও অসাড় হইয়া গিয়া সে বেদনা পাণ্ডুর মুখে ততক্ষণে চন্দ্রালোকে-উদ্ভাসিত তার একান্ত ঈপ্সিতের অতুল্য সুন্দর গাম্ভীর্য্যময় মুখের দিকে আহতনেত্রে চাহিয়া রহিল। তার বুক চিরিয়া, কণ্ঠ ঠেলিয়া, একটা অব্যক্ত আর্ত্তরব মুহুর্মুহুঃ আপনাকে ফাটাইয়া দিবার জন্য বুকের ভিতরটাকে নির্দ্দয়ভাবে পীড়ন করিতে লাগিল।

কুমারও হয় ত তার সেই হতাশার্ত্ত চোখের দিকে নিমেষের মত চাহিয়াই তাহার অন্তরু যুদ্ধের কথঞ্চিন্মাত্র বার্ত্তা পাইয়াছিলেন; তাই ঈষন্মাত্র কোমলভাবে কথা কহিয়া বলিলেন, "যদি আমারই অনুমান সত্য হয়, তবে সে অসম্ভব! আপনি বৃথাই এ কষ্ট স্বীকার ক'রে এসেছেন, দয়া ক'রে ফিরে যান, ভদ্রে!"

এতক্ষণে চন্দ্রকলার অপহৃত বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসিল। উপর্য্যুপরি আঘাতের প্রবলতায় তার আহত চিত্ত যেন সহসাই সুগভীর অভিমানে উতপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে ও শুষ্ক কঠিন উপহাসের সহিত তীব্রকণ্ঠে কহিল, "কুমার রামপালদেব কি তৃতীয় পাণ্ডবের পুনরভিনয় করছেন না কি? দুর্ভাগ্যক্রমে আমি দেব-নর্ত্তকী উর্ব্বশী নই, আমার অভিশাপ দেবার সামর্থ্য নেই, কিন্তু—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সহসা সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সহসা সে অশ্রু আর্ত্ত বিবশা বিহ্বলা হইয়া একেবারে আছাড় খাইয়া রামপালের পায়ের তলায় মাটীতে পড়িয়া গেল। তার সমুদায় মহামূল্য সজ্জা প্রসাধন ও রত্নসম্ভারকে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ করিয়া দিয়া সে ভূলুণ্ঠিত হইতে হইতে দুই হস্তে মহাকুমারের চরণ চাপিয়া ধরিয়া রোদনরুদ্ধ আর্ত্তস্বরে কহিতে লাগিল, "দয়া করুন কুমার! নিষ্ঠুর নির্ম্মমের মত নারীহত্যা করবেন না। সেই এক নিমেষে আমার সমস্ত জীবনের স্বাদ পর্য্যন্ত বদলে গেছে! জীবন আমার ধিক্কারে ভ'রে উঠেছে।—আমি আমার অতীতকে নিঃশেষে মুছে ফেলে নূতন হ'ব। শুধু অন্ততঃ একটী দিনের জন্য, এতটুকু একটু স্নেহ, এক বিন্দু প্রেম,—একটুখানি—অন্ততঃ একটুখানি মুখেরও আদর যদি আপনার কাছে পাই, আমি তার বিনিময়ে আমার সর্ব্বস্ব,—এমন কি, এই জীবনটাকে শুদ্ধ হাসিমুখে প্রদান করতে প্রস্তুত আছি।"

"আমি একপত্নীব্রতী, অন্য নারী আমার অস্পৃশ্যা, আমার ক্ষমা

করুন।”—এই বলিয়া রামপাল অতি সাবধানে আপনার চরণ মুক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন।

“নিষ্ঠুর! শুধু একবারের জন্য ঐ উদার মহান্ মহত্তম বিশাল বক্ষে এই চিরতপ্ত ক্ষুদ্র বক্ষ সংবদ্ধ ক’রে একে জাহ্নবীধারায় অবগাহনের মত কলুষনাশ করতে দিন, একবার একটুখানি হাসিমুখে আমার এই তৃষিত চিত্তকে ধন্য করুন, জীবনের এই একটিমাত্র রাত্রি আমার সার্থক ক’রে নিতে দিন, তার পর আর কখনও না হয় আমি আপনার সাক্ষাতে আস্‌ব না। এতেও কি আপনার পবিত্র সংযমে বাধবে? এ স্থলে আমিই উপযাচিকা, আপনি নন, এতে আপনার পাপ কোথায়? বরং যাচকের যাচ্ঞাপূরণ ক্ষত্রিয়ের ও রাজার সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। দয়া করুন রাজপুত্র! বড় আশা করে এসেছি, একবারেই নিরাশ করবেন না, একবার মিথ্যা করেও বলুন, ‘চন্দ্রকলা! আমিও তোমায় ভালবাসি’!”

কুমার রামপাল অবিচলিত দৃঢ় পদে যথাপূর্ব্ব দাঁড়াইয়া থাকিয়া অনুত্তেজিত স্থির স্বরে কহিলেন, “বৃথা, ভদ্রে! বৃথাই আপনার এ অযোগ্য আবেদন! রামপাল ক্ষত্রিয় নয়, রাজা নয়, মহৎ নয়। সে যখন তার পিতৃ প্রজার আর্ত্তনাদে,—আত্ম-সমর্পণে,—অভিসম্পাতে বধির হয়ে আছে, তখন নারীর প্রেম-নিবেদন গ্রহণ না করার নিষ্ঠুরতা তার কাছে কতটুকু? তার পর শুনুন ভদ্রে! আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগৃহীতা—আমার সম্মানযোগ্যা, তাই আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার সঙ্গ সহ্য করলেম, কিন্তু আর নয়। জেনে রাখবেন, রামপাল নিজ পত্নী ব্যতীত অন্য নারীর সঙ্গে এ জীবনে এই প্রথমবার নির্জ্জনে বাক্যালাপ করতে বাধ্য হয়েছে। আশীর্ব্বাদ করুন, এই ঘটনা যেন তার জীবনে এই একবার এবং ইহাই শেষবার হয়। এখন দয়া করে বিদায় নিন, অথবা আমিই বরং চলে যাচ্ছি—”

এই বলিয়া কুমার রামপাল সেই অসামান্য রূপ যৌবনবতী এবং সর্ব্বজন সমাদৃতা সুপ্রসিদ্ধা নটীর পদলুণ্ঠিত একান্ত আর্ত্ত মূর্ত্তির প্রতি বারেক নেত্রপাত মাত্র না করিয়াই অবিচলিত পদে কক্ষ ত্যাগ করিলেন, তাঁর পরিত্যক্ত সেই কঠিন প্রস্তরময় কক্ষতলে শত রাজেন্দ্রের চির-বাঞ্ছিতা ও রাজধানীর সর্ব্ব সম্পদ্‌স্বরূপা মোহিনী নারী দলিত পুষ্পমাল্যের মতই লজ্জাহত পড়িয়া রহিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

নিশুতি নিঝুম রাত্রি। অল্পায়ু চন্দ্রের ক্ষণস্থায়ী কিরণলেখা দূর ঘনবনে মিলাইয়া গিয়াছে, পতিবিরহ বিধুরা তারকাবলী উদাস নয়নে পতির প্রয়াণ পথে অনিমেষ চক্ষে চাহিয়া আছে। ভীমের শয়ন ঘরের মেঝের উপর শেজ মাদুর বিছানো; ভীম কিন্তু আজ তাহাতে পড়িয়াই ঘুমায় নাই। উজ্জ্বলা আজ শাশুড়ীর আদেশ পাইয়া এক মালা তেল হাতে করিয়া ঢুকিতেই সে আগ বাড়াইয়া আসিয়া তাহাকে নিজের বুকের কাছে টানিয়া লইল, গভীর স্বরে কহিল,—"ভাল বলি, মন্দ বলি, জেনে রাখিস, সে আমার ঝলথল্লির মাথায় বলা কথা। মনের ভিতর তুই ছাড়া যে কেউ কখন ঢুকবে না, সেটা ভাল করেই জেনে রাখিস্, উজ্জ্বলা! ভীমের সে স্বভাব নয় যে, সে আগুন-দেবতা সাক্ষী ক'রে যাকে জন্ম মরণের সাথী করেছে, প্রাণ থাকৃতে তাকে ফেলে আর একটার হাত ধরবে।"

উজ্জ্বলা সে আদরে, সে অভিনন্দনে, সে সোহাগে একেবারেই গলিয়া পড়িল। সে তাহার বল্লরী-কোমল বাহুপাশে লতাভুজে শালবৃক্ষকে বন্দী করিয়া আদরে-গলা সুখালস কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল, "তোমার মত স্বোয়ামী যেন জন্ম জন্ম সকল মেয়েতেই পায়।"

ভীম প্রীত হইয়া স্ত্রীর মুখচুম্বন করিল, কিন্তু রঙ্গ করিবার লোভ সামলাইতে পারিল না, রহস্যভরে কহিল,—"ইস্! বড় আজ দরাজ যে! একা সুগলীর হিংসেয় ফেটে মরছিলেন; সব মেয়েতে তোর স্বোমায়ীকে যদি পেয়ে বসে, তা হ'লে তুই থাক্‌বি কোথায়?"

উজ্জ্বলাও কম যায় না, সেও তৎক্ষণাৎ বলিয়া বসিল, "পেলেই বা! মনের ভেতর তারা ত আর ঢুকতে পারবে না বলেছ! সেখানে ত আমারই রাজ্যি!"

ভীম এই উত্তরে অত্যন্ত প্রীত হইয়া উত্তরকারিণীকে যথোচিত পুরস্কৃত করিল।

উজ্জ্বলা রহিল। শুধু রহিল না—বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গেই সে রহিয়া গেল। কাজ কর্ম্ম সে পূর্ব্বের অপেক্ষা উৎসাহের সহিত বেশী করিয়াই করে, পরিজনগণের মধ্যে অনেকটাই বিনীতভাবে চলে, বড় একটা শাশুড়ীর মুখের উপর জবাব করে না, বুড়ীটাকে ত একপ্রকার ক্ষমাই দিয়াছে। যা-ননদদের সঙ্গেও তার চুলোচুলিটা একটু কম হয়। এ সব লক্ষণে সনকা মনে মনে একটু খুসী হইল এবং আন্দাজ করিল যে, এ সেই মহীপালদীঘির আলোচনার ফল। তাই সে একবারেই সেই খোঁটা দেওয়াটা বন্ধ করিল না এবং এইটুকুই উজ্জ্বলার পক্ষে সব চেয়ে অসহ্য হইয়া রহিল। এমন কি, স্বামীর মুখ চাহিয়া সব কিছু সহ্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিলেও এই কথাটার অঙ্কুশ তার মাথায় খোঁচা দিলেই বুকের মধ্যে তার সেই উন্মত্ত বিদ্রোহের আগুনটা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। অনেক কষ্টেই স্বামীর অজস্র স্নেহবাণী, সরল-রহস্যালাপ, অপরিমেয় আদর এ সকলকেই মনের মধ্যে টানিয়া আনিয়া জোর করিয়া নিজেকে সামলাইয়া রাখে। এমন সময় শাশুড়ীর সঙ্গে চটাচটি করিতে গেলেই হয় ত বা একটা কাটা ছেঁড়া হইয়া যাইবে, আর তার সুখের প্রদীপটুকু নিবিয়া গিয়া জীবনটা তার

অন্ধকারে ডুবিয়া পড়িবে। সে দেখিত, স্বামীর প্রতি এই ভালবাসার নিবিড় বন্ধন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গীর পক্ষচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে, উড়িবার সাধ্য আর তাহার নাই। বিশেষতঃ এখন বাড়ীর বাহির হইবার কথা মুখে আনিতে গেলেই তার নিজের মনেই সে যেন কেমন একটা দৌর্ব্বল্য অনুভব করিতে থাকে, হয় ত ইহার প্রত্যুত্তরে এমন একটা কথা শুনিতে হইতে পারে—যেটা শুনা তার পক্ষে একটুও প্রীতিকর নহে। সে যে সে দিনের সেই দুরন্ত স্মৃতিটাকে লইয়া নিজের লজ্জায় নিজেই নিজের কাছে মরিয়া রহিয়াছিল! সত্যিইতো, পৃথিবীতে এত লোক থাকিতে রাজাই বা শুধু শুধু তার উপর অতটা দয়া দেখাইতে আসিলেন কেন? কি জানি, হয়ত তাঁর উদ্দেশ্য ভাল ছিল না। বিশেষ শেষের দিনে সেই "সখী" সম্বোধন আর কি যেন "এস" বলিয়া আহ্বান! সে তো সত্য সত্যই ভাল নয়!

কিন্তু এই দুষ্টগ্রহের ফের তার সম্পূর্ণ কাটিল না। অদৃষ্টে হয়ত দুঃখ আছে। ভীমও সে ঘটনাটা ভুলিয়া যাইতে পারে নাই। মহীপালদীঘি হইতে জল আনা সে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। নিজেদের খিড়কীর ভরাট ডোবাটাকে মাসখানেকের মধ্যেই সে তার দলবল সঙ্গে লইয়া সংস্কার করিয়া দিল; উজ্জ্বলাকে সে কতকটা যেন চোখে চোখেই রাখিল, পড়া শুনার তার ঝোঁক ছিল, সেই সব লইয়া সে এখন বাড়ীর একখানা ঘর দখল করিয়া বসিল। গৃহস্বামী দিব্যোক তার মস্তবড় সহায়, কাজেই তার সাহায্যে কাজটা খুবই কঠিন হইল না। নিন্দা, গঞ্জনা, উপহাস, সব কিছুকেই উপেক্ষা করিয়া যতখানি পারে উজ্জ্বলার কাছাকাছিই সে ঘুরিত। দেখিয়া শুনিয়া হতাশ হইয়া সনকা তার মনোনীতা পাত্রী সুগলাকে নিজের চতুর্থ পুত্র লখার সঙ্গেই বিবাহ দিয়া ঘরে আনিল।

মনের ভিতর একটুখানি আশঙ্কার রেখা সে রাখিয়া রহিল ভীম

সেটুকুকে কিন্তু চেষ্টা করিয়াও কিছুতে যেন দূর করিতে পারিতেছিল না ; যতই সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে যায়, ততই যেন সেটা তাহাকে ঘাড়ে চাপা ভূতের মত জোর করিয়া পাইয়া বসে। এক দিন আর মনের ভাবটাকে চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া সে উজ্জ্বলাকে তাহারই খানিকটা আভাস দিয়া ফেলিল, বলিল,—"আচ্ছা, বল্ ত উজ্জ্বলা! সে দিন যদি আমি গিয়ে না পড়তুম, আর রাজা তোকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে চ'লে যেত, তা হ'লে এদ্দিনে তুই কি করতিস ? তোর কি আর আমার কথা নিমেষের জন্যেও মনে পড়তো ?"

উজ্জ্বলার বেদনা যেখানে ঠিক সেইখানে আসিয়াই আঘাতটা পড়িল। সে এই কথায় ক্ষোভ-বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলিয়া অর্দ্ধস্ফূট চন্দ্রালোকে স্বামীর রহস্যপূর্ণ মুখের দিকে চাহিল, কণ্ঠে যে তার ব্যঙ্গের সহিত ঈর্ষার তীক্ষ্ণ ফলা খোঁচা দিয়া উঠিতেছিল, তাহাও সে তার স্বর শুনিয়া না বুঝিল তা নয়, কিন্তু রাগ করিতে গিয়া একটা বেখাপ কথা মনে পড়িয়া গিয়া হঠাৎ তার অত্যন্ত হাসি পাইয়া গেল, তাই রাগ আর করা হইল না।

হাসিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া সে বলিতে লাগিল,—

"আইগো! অথদ্দে কথা শোন! ঘোড়ায় চাপাবে আমায় কেমন করে সে ? ঘোড়া থেকে পড়ে মরবনা ? আমি কি রাজার নাসির সেনা না কি ? অমন সব পাগলা কথা কও কেন বলতো ?"

উজ্জ্বলা হাসিয়া লুটাপুটি করিল, আর তার সেই সরল হাসির তরল স্রোতে ভীমের মনের কালি অনেকখানিই বুঝি ধুইয়া গেল, সে আনন্দ স্মিতমুখে চাহিয়া রহিল। নাঃ এ'যে নিতান্ত সরলা, এর মনে কোন অপবিত্রতারই স্থান নাই।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

রাজসভায় সে দিন কয়েকদিন পরে মহারাজাধিরাজের শুভাগমন ঘটিয়াছে। সংবাদ পাইয়া প্রায় পঞ্চবিংশতি সংখ্যক নাগরিক-প্রধান সমুদয় জনসঙ্ঘের প্রতিনিধিত্বে রাজ-সন্দর্শনে সমাগত হইয়াছেন,—রাজ্যের অপালন বা কু-সাশন সংক্রান্ত অভিযোগ জানাইবার জন্যই ইঁহাদের সমাগম হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট গৃহপতি-পুত্রগণ এবং শ্রেষ্ঠি-সম্প্রদায়ই অধিক সংখ্যক। কদাচিৎ রাজকর্ম্মচারী পুত্র দুই চারি জন মাত্র বর্ত্তমান ছিল।

অভিযোগ শুনিয়া মহারাজাধিরাজ অপ্রসন্নতা-বিরস মুখে ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, পরে মহাপ্রতীহার কুমার রুদ্রদমনকে লক্ষ্য করিয়া আদেশ দিলেন, "মহাকুমার রামপালকে ডেকে আনতে লোক পাঠাও।"

কুমার রুদ্রদমন একজন প্রতীহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "মহাকুমার রামপালদেবকে সত্বর পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরম সৌগত মহারাজাধিরাজের আহ্বান জানিয়ে এস।"

প্রতীহার প্রস্থান করিলে, মহারাজাধিরাজ নাগরিক-প্রধান সঙ্ঘের সঙ্ঘপতিগণের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইলেন,—

"বুঝেছি,—এ সমস্তই আমার কনিষ্ঠ রামপালদেবের চক্রান্ত! তিনিই আমার রাজভক্ত প্রজাবর্গের চিত্তে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বালিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং তারই জন্য নিত্য নিত্য আমায় এই সকল অশান্তি ভোগ করতে হচ্ছে। বস্তুতঃ, সাম্রাজ্য খুব ভালভাবেই পালিত এবং শাসিত হচ্ছে। দূত পাঠিয়ে দিলে মগধের মহাসামন্তের এ সম্বন্ধীয় মতামত জানতে

পারবে। আর আপাততঃ মহামাণ্ডলিক, মহাসেনাপতি, মহাপ্রতীহার, মহাকুমার-অমাত্যবর্গ, দণ্ডোপাসিক, চৌরোদ্ধরণিক, ক্ষেত্রপ, প্রান্তপাল, কোট্টপাল, হস্ত্যশ্বোষ্ট্র-নৌবল-ব্যাপৃতক, শৌল্কিক, গৌল্মিক, শৌনিক এস্থলে সমাগত সাম্রাজ্য-নায়কগণ বুদ্ধ ভট্টারকের নামে শপথ লয়ে, কে বলতে পারেন যে, তিনি তাঁর স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ আছেন? আর তাই যদি না থাকেন, তবে আর রাজ্যের অ-পালন বা কু-পালন কোন্‌খান দিয়ে হ'তে পারল? মহাসান্ধিবিগ্রহিক কুমার ভদ্রপাল! আমাদের প্রতিবেশী রাজবর্গ হ'তে অথবা সীমান্তবাসী বর্ব্বর জাতি হ'তে আপাততঃ আমাদের সাম্রাজ্যের কোন স্থান আক্রান্ত হওয়ার মত কোন অশান্তি দৃষ্ট হচ্চে কি?"

মহাসান্ধিবিগ্রহিক কুমার ভদ্রপাল আনতশিরে বুক্তকর স্পর্শ করিয়া সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন, "কোন অশান্তিই ত দৃষ্ট হয় না, মহারাজাধিরাজ! সকলেই এখন মহারাজাধিরাজের মিত্রতাবন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ। বিশেষ পাল-সাম্রাজ্যে এখন আর বর্ব্বর আক্রমণের কোন উপায়ই নেই। সে চিন্তা আমাদের নয়, সে এখন বরঞ্চ অপর পাল নামধারী রাজাদের পক্ষেই চিন্তনীয়।"

মহারাজাধিরাজ প্রসন্নমুখে দণ্ডোপাসিককে প্রশ্ন করিলেন, "আজ-কাল বরেন্দ্রীর শাসনতন্ত্র ত কোনক্রমেই শিথিলতা প্রাপ্ত হয় নি, ইন্দ্রসেন?"

ইন্দ্রসেন অঞ্জলিবদ্ধকরে প্রত্যুত্তর করিলেন, "এমন দিন যে দিন এ সাম্রাজ্যে দেখা দেবে, তারপূর্ব্বে ইন্দ্রসেনের অস্তিত্ব লোপ হয়ে যাবে জানবেন। সুশাসনই যে পাল-সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড, দাস এ জীবনের শেষ নিশ্বাস গ্রহণ করবার সময়েও সে কথা ভুলে যেতে অসমর্থ, রাজাধিরাজ! এ পদে প্রতিষ্ঠা আমাদের আজকের নয়, ভট্টারক-প্রধান পরমকুশলী মহারাজাধিরাজ

ধর্ম্মপালদেবই আমাদের পিতৃপুরুষের নির্ব্বাচক। সে নির্ব্বাচন ভ্রমযুক্ত হওয়া কি সম্ভব ?"

"কর্ণভদ্র! দেশ কি একেবারেই শস্যহীন ?"

ক্ষেত্রপ কর্ণভদ্র সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, "যদিও বৃষ্টির অপ্রাচুর্য্য হেতু পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি এবার সমুচিত শস্য প্রসব করতে সমর্থ হয়নি, কিন্তু কর্বট, কোটিবর্ষ, কৌশিক-কচ্ছ, সুহ্ম প্রভৃতি হ'তে বহুল পরিমাণে খাদ্য-শস্যাদির আমদানী করায় পৌণ্ড্রে এখন প্রকৃত খাদ্যাভাব আছে, এমন কথাও বলা যায় না।"

পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহীপালদেব জননায়কগণের প্রতি বিজয়োৎফুল্ল সগর্ব্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সাহঙ্কারে তাঁহাদের সম্বোধন করিলেন, "শুন্‌লেন ত? আমার সাম্রাজ্যে কোথাও কোন অভাব দেখা যায় না। বহিঃশত্রু বা প্রতিবেশী দ্বারা আক্রমণের ভয় নেই, অবিচার নেই, খাদ্যাভাব নেই। এর চেয়ে বেশী সুশাসন ধর্ম্মপাল, দেবপাল বা প্রথম বিগ্রহপালের সময়েও ছিল না। আবার এ'ও ঠিক যে, বৃথা লোকোত্তেজনা দ্বারা অনর্থক দেশের শান্তিভঙ্গ করা হ'লে রাজদ্রোহীদের বিচার ও শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা হ'তেও খুব বেশী কালবিলম্ব হবে না, অতএব এখন তোমরা বিদায় নিতে পার, আমার যা কিছু বলবার ছিল, বলা হয়ে গেছে।"

জন-নায়কগণের মধ্য হইতে একজন সাহস করিয়া প্রতিবাদ করিতে গেলেন, "কিন্তু মহারাজাধিরাজ!—"

মহারাজাধিরাজ মহাপ্রতীহার কুমার রুদ্রদমনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, "আমার কার্য্য সমাধা হয়েছে—এখন তোমার কার্য্য আরম্ভ করতে পার।"

সেই পঁচিশ জন সম্মানিত বিশিষ্ট জননায়ক হতাশাঙ্কিত ললাটে ও রোষরক্ত নেত্রে সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

দ্বারের বাহিরেই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল কুমার রামপালের। কুমার তাঁহাদিগকে দেখিয়াই উদ্দেশ্য বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখভাবে কার্য্যফলও বিঘোষিত হইতেছিল, তাহাও দেখিলেন। তাঁর বক্ষ দীর্ঘশ্বাসে স্ফীত হইয়া উঠিল মাত্র।

জননায়ক ইন্দ্রবর্ম্মা মহাকুমারকে অভিবাদন জানাইলেন। নিকটে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে মিনতি ভরা স্বরে কহিলেন, "এখনও বুঝে দেখুন, মহাকুমার! মহারাজাধিরাজের সম্পূর্ণ উৎসন্নকাল উপস্থিত, নতুবা তাঁর এত বড় কুবুদ্ধি ঘটতো না। যদি আপনাতে রাজ্যের ও পিতৃপুরুষের কিছুমাত্র মঙ্গল কামনা বর্ত্তমান থাকে, তবে এখনও আমাদের সঙ্গে যোগদান করুন, সমস্ত বরেন্দ্রী আপনাকে সাগ্রহে বরণ ক'রে নেবে, তারা কাতরকণ্ঠে আপনাকে সেই ভিক্ষাই জানাচ্চে। আপনি তাদের নির্ব্বাচিত-রাজা, শরণাগতদের অভয় দিন, বিখ্যাত পাল সম্রাট্‌দের পুণ্য নামকে পঙ্ক থেকে উদ্ধার করুন।"

কুমার রামপালদেবের চলনোদ্যত চরণদ্বয় কঠিন ও স্পর্শশক্তি রহিত হইয়া মাটীর উপর অচল হইয়া গেল, তাঁর দুই হস্ত কুঠারচ্ছিন্ন লতাবল্লীবৎ দুই পার্শ্বে অসহায়ভাবে ঝুলিয়া পড়িল, দৃষ্টি তাঁর যে লজ্জার নৃশংস তাড়নায় ধরণীগর্ভশায়ী হইয়া গেল, তাহা একবারেই অকথ্য!

"আবার সেই বৃথা সংশয়? সেই ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য! সেই অ-রাজ-নৈতিক ক্লৈব্য! না না, মহাকুমার! রাজনীতিতে ভ্রাতৃ স্নেহের কোন মূল্য নেই! জানেন কি, এই মুহূর্ত্তে মহারাজাধিরাজ কি উদ্দেশ্যে আপনাকে এখানে ডাকিয়ে এনেছেন? বুঝেছেন কি সে কথা? বিদ্রোহের—অশান্তির সৃষ্টিকর্ত্তা সন্দেহে আপনাকে হয় ত—খুবই অসম্ভব যে, তাও বলা যায় না;—হয় ত বন্দী করতে। যে কায আপনি করেন নি, সেই দোষেই যদি বৃথা দণ্ডিত হয়ে দুঃখ পান, তার চেয়ে কি এই শত সহস্রে গৌরবদন্ত

অধিকার নিয়ে তাকে সার্থকতা মণ্ডিত ক'রে তুলে পূর্ব্ব ও উত্তর পুরুষের মুখোজ্জ্বল করাই শ্রেয় নয়? ভাল ক'রে ভেবে দেখুন মহাকুমার! যে সুযোগ দু' পায়ে ক'রে আজ ঠেলে দিচ্চেন, হয় ত শত বর্ষের অক্লান্ত চেষ্টায়ও আর তাকে আপনার বংশীয় কেউ কখনও ফিরিয়ে আন্‌তে পারবে না। হয় ত এর জন্য এক্ দিন—চিরদিন গভীর—গভীরতর অনুতাপের আগুনে আপনার সারা জীবনটাই দগ্ধ হয়ে—ভস্ম হয়ে যাবে, কিন্তু অনায়াস লভ্য এ দিনকে আর তখন রক্তের ধারা ঢেলে দিয়েও ফেরাতে পারবেন না। অথচ যাঁর প্রতি অন্ধ স্নেহে এই করতলায়ত্ত মহারত্ন আজ মোহ যুক্ত হয়ে পায়ে ঠেলছেন—সেই অকৃতজ্ঞ ভাই আপনার জন্য রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা কুশলী ঘাতুকের হাতের কুঠার শাণিত করাচ্চেন! প্রতি মুহূর্ত্তেই তা' আপনার যে শিরে ভুবন বন্দিত পালরাজবংশের গৌরব-মুকুট সগর্ব্বে শোভা পেতে পারে, তাকে হীন অপরাধীর মত মশান ক্ষেত্রের ধূলি রুধির কর্দ্দমাক্ত ক'রে দিতে সমর্থ! মহাকুমার রামপালদেব! জীবন অবিনশ্বর নয়, কিন্তু যশ ও কীর্ত্তি চিরস্থায়ী, ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম-পালনেই যথার্থ পৌরুষ। শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত মহাবাণী একবার স্মরণ করুন—

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে॥"

"ক্ষান্ত হোন, ক্ষান্ত হোন ইন্দ্রবর্ম্মা! বন্ধু! সখা! দেখতে পাচ্চো না, পালরাজবংশ যে নির্ব্বংশ হয়ে গেছে, ভাই! হতভাগ্য প্রধান এই রামপাল যে আজ মৃত। এটা যে তার একটা ঘৃণ্য—ঘৃণ্যতম প্রেতাত্মা মাত্র! এর ক্লীবদেহে নরশোণিতের বিন্দুমাত্র ত অবশিষ্ট নেই! কার কাছে কি প্রত্যাশা করছেন? ওঃ, না না না, চ'লে যান, চ'লে যান, আর না, আর সহ্য হয়না।"

যন্ত্রণা মথিত তীব্র স্বরে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াই প্রাণ-ভয় ভীত ব্যাধ বিতাড়িত বন্য পশুর ন্যায় প্রাণপণে ছুটিয়া রামপাল

সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন, ঝড়ের ঝাপটার মতই তাঁর সেই উদ্দাম প্রমত্ত গতি, সে পথের মধ্যে যে কেহ আসিয়া পড়িল, তাঁর গতিবেগে সংঘর্ষিত হইয়া ভূমে পতিত হইল।

মহারাজাধিরাজ তখন তাঁর অমাত্যমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া দম্ভভরে বলিতেছিলেন, "দেখলে ত অরাতিমর্দ্দন! রুদ্রদমন! দেখলে ত তোমরা? স্বকর্ণেই ত সব শুনতে পেলে? বৈমাত্র ভাইয়ের আমার কত গুণ, তোমরাই এখন তার বিচার ক'রে দেখ! তার প্রশ্রয় না পেলে কখনই ক্ষুদ্র প্রজাবৃন্দের এত বড় ভরসা হ'তে পারে না যে, তারা রাজার কাছে রাজারই বিরুদ্ধে অভিযোগ আন্‌তে পারে! এখন এই রাজদ্রোহী রামপালের সম্বন্ধে কি করা উচিত, তোমরাই সকলে বিবেচনা ক'রে দেখ এবং যদি—"

"এতে আর যদি নেই। আমাদের মতে অবিলম্বে মহাকুমার রামপালদেবকে—"

"বন্দী ক'রে ঘাতুকের হস্তে সমর্পণ করাই কর্ত্তব্য? তাই হোক্, তাই হোক্ রাজাধিরাজ! রামপাল রাজদ্রোহী, রামপাল আপনার জাত-শত্রু, রামপাল আপনার সিংহাসনের কণ্টক, রামপাল জীবিত থাকতে আপনার জীবন প্রতি ক্ষণেই অনিশ্চিত!—বন্দী করুন, বন্দী করুন রাজা! নির্ব্বিচারে এই মুহূর্ত্তেই তাকে ঘাতুকের শাণিত কুঠারের তলায় সঁপে দিন, আপনার ধনপ্রাণ চিরদিনের জন্য নিরাপদ হোক্।" গভীর উত্তেজনায় রুদ্ধপ্রায় শ্বাসে এই কথা কয়টা উচ্চকণ্ঠে বলিতে বলিতে শ্বাস গ্রহণ জন্য রামপাল এক মুহূর্ত্তমাত্র নিস্তব্ধ হইলেন।

সভাস্থল স্তব্ধ! আকস্মিক উল্কাপাতের মতই রামপালের আগমন ও অভিব্যক্তি এ স্থলে উপস্থিত প্রত্যেক জনকেই বিস্ময় বিহ্বল করিয়া ফেলিয়াছিল, এমন কি, স্বয়ং রাজাধিরাজও বিস্ময়ের সহিত নির্নিমেষে

রামপালের প্রেতাত্মার মতই বিরূপ-দর্শন বিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইতেছিলেন যে, হয় ত এই সব ছদ্মবাক্যের অন্তরালে না জানি কি গূঢ় দুরভিসন্ধিই নিহিত হইয়া আছে, হয় ত বা এই মুহূর্ত্তেই তাহা একখানা চক্‌চকে কৃপাণের মূর্ত্তিতেই বা তাঁর বক্ষ লক্ষ্যে উত্থিত হইবে! দ্বারের বাহিরে হয় ত বা রামপালের দ্বারা উৎসাহপ্রাপ্ত সহস্র সহস্র বিদ্রোহী প্রজাও সশস্ত্র হইয়া তাঁর পলায়নের পথ রোধার্থ প্রস্তুত হইয়াই দাঁড়াইয়া আছে। তাঁর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, ললাট হইতে স্বেদবারি বহিয়া গণ্ডোপরি পতিত হইতে লাগিল।

রামপাল ঊর্দ্ধমুখে রুদ্ধশ্বাস সবেগে টানিয়া লইয়া পুনশ্চ কহিলেন, "কুমার রুদ্রদমন! কৈ, এখনও আপনি নিশ্চল কেন? এইরূপেই কি আজকাল আপনারা আপনাদের কর্ত্তব্যপালন ক'রে থাকেন নাকি? এই দেখুন, আমি আপনাকে নিরস্ত্র ক'রে দিচ্চি, এবার বোধ করি, আর আপনাদের মনে কোন সংশয় নেই? তবে আসুন, এই নিন, রাজদ্রোহীকে বন্দী করুন।"

যখন রামপাল সত্য সত্যই নিজেকে নিরস্ত্র ও উষ্ণীষ বিহীন করিয়া সর্ব্বজন সমীপে অপরাধীর ন্যায় নতমস্তকে দাঁড়াইলেন, তখন বজ্রাহত রাজসভায় যেন সকলেরই মৃত প্রায় দেহে জীবনীশক্তি ফিরিয়া আসিল।

মহারাজাধিরাজ মহীপালদেবের সংশয়-কম্পিত হৃদয়ের মধ্য দিয়া একটি উৎকট তীব্র আনন্দের উচ্ছ্বাস সবেগে প্রবাহিত হইয়া গেল। তিনি সাহঙ্কারে বিজয়োৎফুল্ল নেত্রে কনিষ্ঠের শব শুভ্র রক্তহীন মুখে তীব্র কটাক্ষ করিয়া মৃদুহাস্যের সহিত গর্ব্বিত বাক্যে কহিলেন, "জানই যখন আমার সঙ্গে পেরে উঠবে না, তখন কেনই বা অনর্থক এ সব অনর্থে জড়িত হ'তে গেলে? কুমার রুদ্রদমন! রাজার কায বড়ই কঠিন! আমাদের কর্ত্তব্য কঠোর! অথচ রাজনীতিতে স্নেহেরও স্থান নেই,

আত্মপর বিচারের উপায় নেই, অতএব আমার কর্ত্তব্য আমি এবং তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন করতে একান্তই বাধ্য। রাজদ্রোহীকে বন্দী ক'রে নির্জ্জন কারাগারে প্রেরণ কর। কিন্তু সাবধান, বিদ্রোহীরা যেন বন্দীকে কেড়ে নিতে না পারে, সহস্রাধিক সশস্ত্র সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত ক'রে লয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে, অথবা—"

কুমার রুদ্রদমন রাজাজ্ঞাপালনার্থ ঈষৎ কুণ্ঠিত মুখে উঠিয়া রামপালের অভিমুখে অগ্রসর হইতেই তাঁহাদের পশ্চাৎ হইতে সহসা সকলেরই পরিচিত একটি বিস্ময় স্তম্ভিতপ্রায় কণ্ঠ সাশ্চর্য্যে উচ্চারণ করিয়া উঠিল, "এ কি দেখি! মহাকুমার রামপালদেব তাঁর পিতৃ-সিংহাসনতলে কিসের জন্য আজ এই ঘৃণ্য অপরাধীর মূর্ত্তিতে নিগৃহীত?"

মহাপ্রতীহার ত্রস্তে দুই পদ পিছাইয়া গেলেন। সকলেরই মুখের উপর একটা ভীতির ছায়াপাত হইল। রাজাধিরাজ সক্ষোভ বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া আগন্তুকের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, তাঁর বিস্ময় স্খলিত জিহ্বা হইতে শিথিলভাবে উচ্চারিত হইল, "শূরপাল! তুমি হঠাৎ এখানে কেন?"

মহাকুমার ও মহাসামন্ত শূরপালদেব আরক্ত মুখে ভ্রূকুটিবদ্ধ নেত্রে অগ্রসর হইয়া আসিয়া নিজ ভ্রাতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জ্যেষ্ঠ মহারাজাধিরাজকে যথোচিতভাবে অভিবাদন জানাইলেন, পরে তাঁর প্রশ্নোত্তরে ঈষৎ রূঢ়কণ্ঠেই প্রত্যুত্তর করিলেন, "মাগধী প্রজার সম্বন্ধে আপনি যে নূতন কর ধার্য্য ক'রেছেন, তাতে তারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছে, সেই সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বক্তব্য আছে বলেই আমায় সহসা চ'লে আসতে হয়েছে, রাজাধিরাজ! কিন্তু এ কি! রামপাল,—মহাকুমার রামপালের এ অবস্থা কেন? সে কি আপনার ভাই নয়?"

রাজাধিরাজ সক্রোধ কটাক্ষ একে একে ভ্রাতৃদ্বয়ের পরেই নিক্ষেপ

করিয়া রোষগম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "রামপাল রাজদ্রোহী—রাজধর্ম্মে যে ভ্রাতৃত্ব নেই, এটা তোমারও জানা উচিত ছিল, মহাসামন্ত !"

শূরপাল এই উত্তর পাইয়া সক্ষোভে ঈষৎ হাসিলেন, কহিলেন, "বিশ্বাস করতে পারলেম না, রাজাধিরাজ ! রামপাল রাজদ্রোহী !"

মহীপাল যে দৃষ্টি দিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন, বজ্রানলেও ততখানি দাহিকা শক্তি আছে কি না সন্দেহ।

"তবে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ এই অমাত্যমণ্ডলীকে,—স্বয়ং তোমার সহোদর রামপালকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ, সেই বা এর কি উত্তর দেয়।"

শূরপাল কাহাকেও কোন প্রশ্ন করিলেন না, নতমুখ ও আনতমস্তক কনিষ্ঠের স্কন্ধোপরি সস্নেহে করার্পণ করিয়া তাঁহাকে শুধু নিজের নিকটে ঈষৎ টানিয়া লইলেন। পরে অপর হস্তে তাঁর শব শীতল দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া স্নিগ্ধ-স্মিত মুখে তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "এস, আমরা যাই।"

এই বলিয়াই তিনি অপরিসীম ক্রোধে বিবর্ণ ও রোষস্তব্ধ রাজাকে অভিবাদনমাত্র জানাইয়া যেমন অতর্কিতে আসিয়াছিলেন, তেমনই সহসা কনিষ্ঠের হাত ধরিয়া এক প্রকার তাঁহাকে টানিয়া লইয়াই সভা মণ্ডপ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। সভাসীন ও সভারক্ষকগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে কেহ কোন বাধা দিতে ভরসা মাত্র করিল না।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি হইতে মেঘ করিয়াছিল, আজিকার প্রভাত-প্রকৃতিকে তাই নিরাভরণা সদ্যবিধবার মতই নিরানন্দা ও অশ্রুভার-কাতরা দেখাইতেছে; তরুণ রাগরক্ত উজ্জ্বল সিন্দুর রেখা আজ তাঁর ললাটে ফুটিয়া উঠে নাই। মাঠ, ঘাট, আকাশ, নদীর জল, দিগন্তের কোলে ঘন অস্ফুট বনরাজি নিস্পন্দ নিস্তব্ধ।

দিব্যোক প্রভাতের এই আনন্দলেশ হীন বিরস মূর্ত্তি সন্দর্শনে ঈষৎ অপ্রসন্ন চিত্তে ইষ্টস্মরণ করিতে করিতে একাই জনহীন পথের উপর বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। মনের ভিতরটায়ও তাহার যেন এই রকমই অন্তর্গূঢ় স্তব্ধতা ও বিষণ্নতা ফুটিয়া রহিয়াছিল। পারিবারিক অশান্তি ও অভাবের অনাটন এই দুইদিক হইতেই মনটা তার বিশেষ ভাবেই উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। মুখরা উগ্রস্বভাবা ভ্রাতৃবধূর প্রতাপে ও সর্ব্বদা কোন্দল কোলাহলে গৃহবাস যেন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া দিব্যোকের সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহপাত্রী উজ্জ্বলার প্রতি শ্বশ্রুর অবিচার তার যেন সহ্য হইত না, অপুত্রক জ্যেষ্ঠতাত গুণবান ভীমকে তার পুত্রস্থানীয় করিয়াছিল, অনাথা উজ্জ্বলাকে সেই তার শৈশবে এ গৃহে আনিয়াছে, এদের প্রতি তার সমস্ত স্নেহের ভাণ্ডারই সে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিল।

মেঘাচ্ছন্ন অতি প্রত্যূষে রাজপথ প্রায় জনহীন। নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যে কতিপয় পথিক ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতেছিল, ইহাদের মধ্যে মৎস্যজীবী জালিক এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণগণই প্রধান। তাঁহারা কেহ স্নানার্থ নদীতীরে চলিয়াছেন, কেহ বা স্নান সমাপনান্তে সংস্কৃত ভাষায় দেবদেবী সম্বন্ধীয় শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে নিজগৃহস্থিত অথবা জন-

সাধারণের জন্য স্থাপিত দেবমন্দিরোদ্দেশ্যে পথ চলিতেছেন। ইঁহাদের সুমার্জ্জিত ও সুললিত স্তবাবৃত্তি এবং নির্জ্জন পাষাণপথে ইঁহাদের চরণস্থিত কাষ্ঠ পাদুকার সংঘর্ষ শব্দই আজিকার প্রভাত প্রকৃতির একমাত্র স্ফুটধ্বনি।

দিব্যোক অপ্রসন্নমনে পথ চলিতেছিল, সহসা তাহার পরিচিত এক ব্যক্তির কণ্ঠস্বরে ঈষৎ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল। সম্বোধনকারী দ্রুতপদে সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল।

"আরে, আরে, দিবাই যে! এত সকালে অমন গোমশাপানা মুখটা করে কোথায় চলেচ হে? বলি যাওয়াটা হচ্চে কোথায়?"

দিব্যোক তার প্রিয় সখার প্রশ্নে ঈষৎ সলজ্জ হইয়া উঠিল, ঠিক কোন একটা উদ্দেশ্য ধরিয়া সে বাড়ীর বাহির হয় নাই। একটু আমতা আমতা করিয়া উত্তর দিল, "না; এমন কোথাও না, এই একটু এ দিকে ঘুরে আসি।"

ধর্ম্মঠ দিব্যোকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"কোন কায আছে না কি? তা চল না, আমার এখন অবসব আছে একটু গপ্প করতে করতে যাওয়া যাগ।"

গল্প ইহাকে ঠিক বলা চলে না, পথ চলিতে চলিতে বৃদ্ধ ধর্ম্মঠই অনর্গল বকিতে বকিতে চলিতেছিল, দিব্যোক তার সে প্রগল্ভ বাক্যস্রোতের দিকে না কান দিয়াছিল, না সে তার একটা জবাব করিতেছিল। তার মনটা সে দিন নিজের সুদূর অতীতের বহুকাল হারানো গৌরবময় দিনগুলার স্মৃতিতে কেমন যেন আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছিল এবং সেই চির-অপহৃত সুদিনের শোকটা যেন আবার এই জীবন-সন্ধ্যায় তার কাছে নূতন হইয়া জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে একান্ত বিরহাকুল করিয়াছিল। সে কি আজিকার কথা! যখন বর্ত্তমান রাজাধিরাজের পিতামহ মহারাজাধিরাজ

পরমসৌগত পরমভট্টারক নয়পালদেব পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অশেষ মহিমান্বিত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এ সেই তত দিন আগের কথা।

চেদিরাজ কর্ণের ভীষণ আক্রমণে পাল-সাম্রাজ্য তখন টলমল করিয়া উঠিতেছে। পুণ্য বারাণসীধামে চেদিরাজের বিজয়কেতন উড্ডীন হইয়াছে। চেদি-সৈন্য নগরের পর নগরে, গ্রামের পর গ্রামে নিজেদের গৌরব-পতাকা উত্তোলিত করিতে করিতে অবশেষে পালরাজধানীর দ্বারদেশাবধি আক্রমণ করিয়াছে। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী শঙ্কায় লজ্জায় ম্রিয়মাণ ও অর্দ্ধমৃত। উঃ! সে কি ভীষণ উৎকণ্ঠা! কি অপরিমেয় উদ্বেগ ও উত্তেজনা! শেষ চেষ্টায় প্রাণপণ বলে চিত্ত স্থির করিয়া রাজা সামন্তচক্রের আহ্বান করিলেন। ক্ষুব্ধ সাগরোর্ম্মিমালার ন্যায় পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নাগরিকগণও রাজ্যাধিপতি কর্ত্তৃক আহূত না হইয়াও স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া রাজ-প্রাসাদের মুক্ত তোরণপথকে প্লাবিত করিতেছিল, সে দৃশ্য—সেদিনে কিশোর বয়স্ক হইলেও আজও দিব্যোকের এই ক্ষীণ দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে।

সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সে দিন সমবেত আবালবৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই আপনার যথাসর্ব্বস্ব প্রদানের ভীষণ শপথ করিয়া আসিল। ধন, প্রাণ, সন্তান কিছুর উপরেই কেহ বিন্দুমাত্র লোভ না রাখিয়া দেশের জন্য অকাতরে এই যুদ্ধানলে আহুতি দিতে প্রস্তুত হইল। ভীষণ সমরাগ্নিতে সহাস্যমুখে ঝাঁপ দিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গেই এই একাগ্রতা ও সমচিত্ততার ফল যাহা, তাহাই প্রাপ্ত হইল। মহাযুদ্ধে চেদিরাজ পরাস্ত ও পলায়নপর হইলেন; প্রায় অধিকাংশ ভাগ অপহৃত পালসাম্রাজ্য নয়পাল ফিরিয়া পাইলেন, কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁর লোকক্ষয় ও ধনক্ষয় এতই অপরিমিত হইয়াছিল, যে, সে ক্ষতি পূর্ণ তাঁর জীবনে ত হয়ই নাই, এমন কি, তাঁহার পুত্রের জীবিতকালেও তাহার পূরণ হইল না।

দিব্যোকের বক্ষঃস্থল আনন্দে ও গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিল। দেশের সেই মহা দুর্দ্দিনে দেশবৈরীর প্রচণ্ড প্রতিরোধে তাহারাও তাহাদের সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিল। এই দিব্যোকের পিতা পুণ্যক দেশের জন্য নিজের প্রাণ এবং তাঁর সমস্ত ধনজন, এমন কি, জীবনধারণের একমাত্র উপায়স্বরূপ শস্য ক্ষেত্রগুলি পর্য্যন্ত সমস্তই আনন্দের সহিত রাজার কার্য্যে সঁপিয়া দিয়া দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাই আজ সে সামান্য দরিদ্র দিব্যোক! স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া ভূমি চষিতেছে, তাহাতেও সংসারের অভাব ঘুচে না। নতুবা তাদের যে সম্পত্তি ছিল, তার অন্ন আজ খায় কে? তার ঘরের বধূরা কি তাহা হইলে দিন রাত পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়? না উজ্জ্বলার মত বধূ এত কষ্ট সহ্য করে!

ইহার পরের কথা স্মরণ করিতে গিয়া দিব্যোকের নাসাপথে এক কণ্ঠরোধকারী দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। যাহা দেশের কার্য্যে দান করিয়াছিল, আর তাহারা তাহা ফিরিয়া পায় নাই বটে, তথাপি নয়পালের সময়ে দরিদ্রীভূত পুণ্যক ও দিব্যোকের সম্মান কি কম ছিল? রাজরক্ষীদের মধ্যে সে দিনে কিশোর দিব্যোক প্রধানতম হইয়া উঠিয়াছিল! তারপর বিগ্রহপালের রাজ্যারোহণের পর পুনশ্চ চেদিযুদ্ধ বাধিল, সেই যুদ্ধে বর্ম্মারাজও চেদিপক্ষে যোগদান করিলেন, দিব্যোক তাঁহাকে যুদ্ধে বন্দী করিয়া রাজার হিতসাধন করে, কিন্তু ইহার পরেই সামান্য কারণে রাজা ও ভৃত্যে পরস্পর মনোমালিন্য ঘটিয়া দিব্যোককে রাজপ্রাসাদ হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। সেই অবধি দরিদ্র কৃষিজীবী তার স্বেচ্ছালব্ধ দারিদ্র্য লইয়াই এক প্রান্তে পড়িয়া আছে, আর যাঁহাদের জন্য তার আজ এ দারিদ্র্য, তাঁহারা স্বপ্নেও কথন তার কথা স্মরণও করেন কিনা কে জানে? তথাপি দিব্যোকের চিত্তে রাজভক্তির কিছুমাত্র অভাব ঘটে নাই।

ততক্ষণে তাহারা নদীতীরে আসিয়া পড়িয়াছিল, আঁকাবাঁকা জলের ধারাগুলিও ধূসর বালুকাময় সৈকতকে ডুবাইতে ডুবাইতে নব বর্ষার আগমনী গাহিয়া চলিয়াছিল। পরপারে তীর-বালুকার পরে মাঠ ও তার শেষে গাছের শ্রেণী। মাঠের মধ্যে মধ্যে নদীর তীরের কাছে কাছে সুবিস্তৃত উদ্যানের ভিতরে কোথাও কোথাও ধনীদিগের বিলাসগৃহ। ইহাদিগের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা নিভৃত প্রান্তে অবস্থিত সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত উদ্যান-প্রাসাদখানি বর্ত্তমান রাজাধিরাজের বিলাসগৃহ। এ গৃহের সম্বন্ধে অনেক কুৎসা-কাহিনীই দিব্যোকের কর্ণগোচর হইতে বাকী নাই। তাহার কঠিন ও গাঢ় রক্তরাগের মত আকৃতির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বৃদ্ধ রাজ-ভক্তের বক্ষঃস্থল আলোড়িত করিয়া একটা গভীর বেদনাভরা দীর্ঘশ্বাস স্বতঃই উঠিয়া আসিল। মনে মনে নিজের ইষ্ট ও গুরুকে স্মরণ এবং সম্বোধন করিয়া বলিল, "সব অমঙ্গল দূর ক'রে দিও,—সুমতি দিও হে ঠাকুর! বয়েসের গরমটা কাটিয়ে যেন আমার রাজা আবার রাজার মতই হয়ে ওঠেন। আবার যেন ওঁদের জন্যেও আমাদের ছেলেপিলেরা প্রাণ দিতে পারে।"

ধর্ম্মঠ সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, "এত কি ভাবচো?"

দিব্যোক সচকিতে মুখ ফিরাইল, "কতকগুলো পুরনো কথা।"

"ওঃ"—বলিয়া ধর্ম্মঠ ঈষৎ গম্ভীর মুখে কহিল, "পুরনো কথা ভেবে আর ফলটা কি? তার চেয়ে এখন নতুন কথাটাই ভাবা দরকার। রাজা যে আমাদের হালের উপর, লাঙ্গলের উপর কর বসাচ্চেন, ছেলেপিলে নিয়ে এ দিনে দশাটা হবে কি, একবারটী ভেবে দেখ ত? একে অজন্মায় আধপেটা দাঁড়িয়েছে, তার উপর এইবার শুকিয়ে মরার হুকুম হলো না? এমন ক'রে ভাতে না মেরে, এর চাইতে যে হাতে মারাই ভাল ছিল। সে তবু দশে ধর্ম্মে চোকে দেখতে পেত।"

দিব্যোক এই যথার্থ সত্য অনুযোগে ঈষন্মাত্র গভীর দুঃখের হাসি হাসিল, "সেই বা ভেবে ফলটা কি মিতে? রাজার আদেশ না মান্‌লেই বা চলবে কেন বল?"

ধর্ম্মঠ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, "রাজা যদি প্রাণে মারবার আদেশ দেন, তাও কি মুখ বুজে সহি ক'রে নিতে হবে, মিতে? এমন রাজ-ভক্তির আমি ত ধার ধারি নে! কি বলবো, আর আগের মতন তেমন জোয়ান শরীর নেই, নইলে যে .হতভাগা ভূতগুলো জুটে ছেলেমানুষ রাজাকে এই সব কুমন্ত্রণা দিয়ে দিনকের দিন অধঃপাতে দিয়েচ, একবার দেখে নিতুম তাদের কে'। নাক, কান কেটে, বোঁচা ক'রে, কুম্ভকন্ন ক'রে ছেড়ে দিতুম না!"

"চুপ, ঐ দেখ রাজাধিরাজের ঘোড়া নিয়ে কারা এই দিকেই এগিয়ে আসচে।"

"তাই ত! নদীতেও রাজাধিরাজেরই 'বাজপক্ষী' নৌকখানা তীরের মত ছুটে আসছে যে! বিলাস-বাড়ীতেই রাত্রে ছিলেন আর কি! দেখ্‌লে ত কি রকম অনাচার!"

দিব্যোক কণ্ঠোত্থিত দীর্ঘশ্বাসটাকে চাপিয়া লইয়া শুধু উত্তর করিল, "এখনও ছেলেমানুষ কি না! ওগুলো বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে শোধরাবে।"

"হুঁ, ও সব রোগ বুড়ো হ'লেই কি না যায়! যাকে ধরেছে, তাকে একেবারে খেয়ে তবে ছাড়ে—শাঁকচুন্নীর মতন!"

নৌকা প্রায় তীরসংলগ্ন হইয়াছিল, রাজ-শিবিকা তীরস্থ হইতেছিল। দিব্যোক শুধু কঠোর কটাক্ষে মিত্রকে এ আলোচনায় বিরত করিয়া দ্রুতপদে নদীর ঘাটে নামিয়া গেল। রাজাধিরাজ বিলাস-তরণী হইতে বাহির হইয়া শিবিকার সম্মুখীন হইবামাত্র চিররাজভক্ত দিব্যোক সসম্ভ্রমে তাঁহাকে ভক্তি প্রণতি জানাইল।

যতই অনাচারী হউন, রাজা যে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি বা মহী-দেবতা—অষ্টদিকপালের অংশসম্ভূত বা নর-নারায়ণ—রাজদর্শনে যে মহাপুণ্য!

শিবিকায় বসিতে বসিতে রাজাধিরাজ তাঁর শরীরসংরক্ষিগণের এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটা কে? ভিক্ষুক? ভিক্ষুক আমার সামনে আসতে পায় কেন?"

রক্ষী ঈষৎ সচকিত হইয়া উঠিল, দিব্যোক এই কথাটা শুনিতে পাইয়াছে কি না, কটাক্ষে তাহা দেখিয়া লইল, তার পর সসম্ভ্রমে উত্তর করিল,—"ইনি পূর্ব্বতন মহারাজাধিরাজের শরীররক্ষীদের মধ্যে কিছু দিন কাজ করেছিলেন, এঁর নাম দিব্যোক।"

মহারাজাধিরাজ কি যেন একটা কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রতিহার কুমার রুদ্রদমনকে ডাকাইয়া মহারাজাধিরাজ সে দিন এক সময় প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁ হে! 'দিব্যোক' লোকটা কে, বল ত? কি যেন একটা কথা মনে পড়ছে পড়ছে, পড়ছে না! কে যেন একটি রূপসীর সঙ্গে যেন ওদের কি একটা সম্বন্ধ আছে না কি, এক সময় যেন একটু সংবাদ নে'ওয়া গিয়েছিল!"

মহাপ্রতিহার নিজেই সেই সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, কাযেই তাঁর সেটা জানাই ছিল, তিনি উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ ঠিকই ত! এ সেই ভীমের জ্যেঠামশাই, এদিকের মধ্যে কৈবর্ত্তদলের কর্ত্তা গোছের।"

রাজাধিরাজ কহিলেন, "তবে যে বসুভূতি বল্লে, আগের রাজার এ এক জন দেহরক্ষী?"

কুমার কহিলেন, "সে কথাও ঠিক; শুধু তাই নয়, এর বাপ পুণ্যক তার অনেক জমী-যায়গা ধন-রত্ন মহারাজাধিরাজ নয়পালের সঙ্গে চেদিদের যুদ্ধের সময় রাজকার্য্যে উৎসর্গ করেছিল।"

"পরে আবার সে সমস্ত ফিরিয়ে পেয়েছিল না কি?"

"কিছু না, রাজকোষ তখন শূন্য, তা ছাড়া শুনেছি, আরও দু'চার জনের সঙ্গে ঐ পুণ্যকও বলেছিল যে, ও সব দেশের কাযে দিয়েছে, দিয়ে ফেরত নোবো না। জীবনধারণের মত সামান্য কিছু পেলেই হবে। ভাগ্যে থাকে, ছেলেরা তৈরী ক'রে নেবে। সেই জন্যেই তার বড় ছেলেকে রাজরক্ষীদের মধ্যে খুব ছোট থেকেই রাখা হয়। তবে খুব বেশী দিন ছিল না, দ্বিতীয় চেদি যুদ্ধের পর কি জন্য তা জান্‌তে পারিনি, ছেড়ে দেয়।"

মহীপাল ক্ষণকাল নীরবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন, ক্রমে তাঁর অধর প্রান্তে এক প্রকার গূঢ়হাস্যের মৃদুরেখা অতিশয় সন্তর্পণে ফুটিয়া উঠিল। তিনি রুদ্রদমনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পরম-ভট্টারক নয়পালদেব যা ফিরিয়ে দিতে সমর্থ হন নি, আমি তা ওকে ফিরিয়ে দেব। কোন্ ভুক্তির, কোন্ মণ্ডলের, কোন্ বিষয়ের অন্তর্গত, কোন্ গ্রাম বা শস্যক্ষেত্র, গো-পথ, গোচারণভূমি, জঙ্গল কি অথবা ওদের ছিল, এ সব অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির সন্ধান বিষয়পতির দ্বারা করিয়ে যথাযথ সুব্যবস্থা করাও দেখি। ঐ বিষয় যারই অধিকারে থাকুক না কেন, তার কাছ থেকে নিয়ে ওদের প্রত্যর্পণ করবার ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া চাই। ভূমিদান পত্র, শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হ'তে লিখিত হবে, তাতে যথাযথ সকল উৎপাত দূর ক'রে ভূমি-চ্ছিদ্র ন্যায়ানুসারে যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর পৃথিবীর অবস্থানকালাবধি প্রতিষ্ঠা করা হোক্। শুভস্য শীঘ্রং, এই বাক্যটি স্মরণ রেখ বন্ধু! এ শুধু আমারই না, পুরানো কালের শাস্ত্রবাক্য। এটা পালন করতে আমরা বাধ্য।"

কুমার রুদ্রদমন উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তা নাহয় রাখবো, রাজাধিরাজ! কিন্তু ঐ ভূমিদান-তাম্রপট্টে ভূমিহরণ-কারীর অনন্ত দুর্গতির কথাগুলোও কি লেখানো হবে? কি জানি, হয় ত

বা আবার কোন্ দিন আমাদেরই ওটা ফিরিয়ে পাবার দরকার হ'লেও ত হ'তে পারে !"

এই বলিয়া রাজসখা রুদ্রদমন রাজার প্রতি চক্ষুর ইঙ্গিত করিলেন ও পুনশ্চ নিজ বাক্য সমর্থনের উদ্দেশ্যে হাসিয়া উঠিলেন, রাজাধিরাজ কিন্তু হাসিলেন না। তিনি গাম্ভীর্য্যস্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর করিলেন. "না না, যথারীতি পিতামহদের রীত্যনুসারেই এই তাম্রপট্ট লেখানো চাই। এ আর আমি ফিরিয়ে নেবো না। এ'কি বলছো ? অর্দ্ধেক সাম্রাজ্য লুটিয়ে দিলেও যদি—আচ্ছা এখন যাও, যা বলা গেল, ক'রে এস। হ্যাঁ, আর দেখ, কোষাধ্যক্ষ সাহীলকে বলে যেও আমার লক্ষ স্বুবর্ণ নিষ্কের প্রয়োজন, রাজকোষে অত নেই ? না থাক, তার নিজের ভাণ্ডারে ওর চেয়ে অনেক বেশী আছে। বলো, যেন কোন আপত্তি তোলা না হয়। আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

কয়েক দিন মাত্র পরেই সমস্ত কৈবর্ত্ত পরিবার সবিস্ময়ে শুনিল যে, বহু বর্ষ পূর্ব্বে যে বিষয় পুণ্যক রাজকার্য্যে প্রদান করিয়া সম্মানিত হইয়াছিল, এত কাল পরে তাহার সমস্তই বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক পরম-সৌগত পরমকুশলী মহীপালদেব স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই তাহার পুত্রকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

গভীর কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে বৃদ্ধ নায়কের দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল।

"রাজা আমার ! তুমি কি অন্তর্য্যামী ! কে বলে মহীপালদেব অত্যাচারী ? এ সমস্ত যৌবনের উষ্ণতায় সামান্য অনাচার মাত্র ! এ কখনও স্থায়ী হবে না। ক্ষুদ্র প্রজার উপরে এত যাঁর অনুগ্রহ, তাঁকে যারা অবিচারক প্রতিপন্ন করতে চায়, অত্যাচারী ত তারাই !"

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

সে দিন রাজসভায় জনসভার নেতৃবৃন্দের প্রস্থানের পরক্ষণেই রাম-পালের আকস্মিক আগমন ও নিজেকে মুক্তকণ্ঠে রাজদ্রোহী বলিয়া প্রচার এবং রাজা তাঁহাকে রাজদ্রোহ অপরাধে বন্দী করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই মগধ হইতে সদ্যঃ সমাগত মহাসামন্তোপাধিক দ্বিতীয় মহাকুমার শূরপাল কর্তৃক তাঁহাকে রাজসভা হইতে যথেচ্ছভাবে সরাইয়া লইয়া যাওয়া, এই সকল ঘটনাপরম্পরার দ্বারা মহারাজাধিরাজকে একান্তই বিচলিত চিত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই দুই বৈমাত্র ভ্রাতার দ্বারা যে এক দিন তাঁহাকে রাজ্য-চ্যুত ও পর্য্যুদস্ত করা সম্ভব, এ আশঙ্কা তাঁহার চিত্তে আজিকার আশ্রিত নহে; তাঁহার সেই সুদূর শৈশবেই তাঁহার জননী ও তাঁহার পারিপার্শ্বিক-বৃন্দ সকলেই এ আশঙ্কার আভাস তাঁহার শিশুচিত্তকে প্রদান করিয়া আসিয়াছে, তরুণ বয়সের সকল সুখ সম্ভোগের মাঝখানেও এই দুশ্চিন্তা-রাহু তাঁহার সুখের সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া যথন তথন আত্মপ্রকাশ করিতে বাধা পায় নাই। আজ এই যৌবনসীমার মধ্যভাগে প্রতিদিনই সে আশঙ্কা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছিল। আজ তাহা আর সংশয়ের সীমার মধ্যে আবৃত রহিল না; তার যথার্থ মুক্ত স্বরূপে সে আত্মপ্রকাশ করিয়াই দেখা দিল।

এই দুই ভাইএর মধ্যে শূরপাল ততদূর জনপ্রিয় নহেন, এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই জন্য মহীপালদেবের নিকট তাঁর রামপালের অপেক্ষা কিছু আদর ছিল। শূরপালকে মহাসামন্ত রূপে মগধের শাসনভার দিয়া পূর্ব্বেই তিনি দেশ ছাড়া করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু রামপালকে নিজের চোখের বাহির

করিয়া রাখিতেও তাঁর ভরসা হয় নাই। আজ বিশেষ রাজকার্য্যের প্রয়োজনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে পদার্পণ করিয়াই শূরপাল যখন নিজ ভ্রাতার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজ অনুমতির অপেক্ষামাত্র না রাখিয়াই সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন, তখন রাজাধিরাজের মনে আর অণুমাত্রও সংশয় রহিল না যে, তাঁহার বৈমাত্রেয় দ্বয় উভয়েই ভিতরে ভিতরে এক এবং তাঁহার উচ্ছেদকামনায় কেহই কম নহেন।

সভা কোন্ সময় আপনা হইতেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সভাসদ্, পাত্রমিত্র, অমাত্য সকলেই আজিকার দিনটাতে ঘোর অশুভের সূচনা দর্শনে যে যাহার ইষ্টস্মরণে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থিত হইয়াছে। যে সময় মহাসামন্তোপাধিক মহাকুমার শূরপালদেব অতর্কিতে সভা প্রবিষ্ট হইয়াই তাঁহার অনুজের হস্ত ধারণ করিয়া রাজাজ্ঞার বিরোধিতাচরণ পূর্ব্বক সভাগৃহ হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া লইয়া গেলেন, সেই মহাসমস্যার কালেই সভাসদ্গণও তাঁহাদিগের পশ্চাতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন।

ভীষণ ক্রোধে ও অক্ষমতায় মহারাজাধিরাজকে পাশবদ্ধ ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতই ভয়াবহ বোধ হইতেছিল। তাঁর মুখখানা শুধু লাল নয়, তামার মত লাল হইয়া যেন তাহা হইতে অনেকখানি রক্ত ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। রাজদেহরক্ষী সৈন্যগণ ও ছত্র পতাকা চামরধারিণী বন্দিনীগণমাত্র সিংহাসনের মর্য্যাদা রক্ষা ও শোভাসম্পাদন পূর্ব্বক যথাস্থানে চিত্রার্পিতবৎ অবস্থিত রহিয়াছে।

আর পাল-সিংহাসনের সুবর্ণপাদপীঠতলে সুবর্ণ-মণিসমালঙ্কৃত মুক্তকোষ দীর্ঘ কৃপাণ সুগভীর অভিমানভরে আপনার অনাবৃত, লাঞ্ছিত ও নির্জ্জিত বক্ষ পাতিয়া পড়িয়া রহিয়াছিল। বীরের মর্য্যাদায় পদাঘাত করিয়া যে ক্ষত্রিয়াধম আজ সর্ব্বত্র ক্লৈব্যকে বরণ করিয়া লইয়া লক্ষের ধিকৃত হইয়াছে, তাহার পরিচ্ছদশোভার সংবর্দ্ধনাপেক্ষা এই সহস্রের পদধূলি লাঞ্ছিত ধরণী-

শয্যাও যেন ইহার পক্ষে শ্রেয়: হইয়াছিল। সে যেন তার অকলঙ্ক ঔজ্জ্বল্য সূর্য্যপ্রভায় বিকীর্ণ করিয়া বিদ্রোহ বিরূপ তীক্ষ্ণতার সহিত বলিতেছিল—"বীরধর্ম্ম হারাইয়া বীরের সজ্জা বহন—তাহাকে অবমাননা, তুমি তার যোগ্য নও রামপাল!"

মহারাজাধিরাজ বারেক রক্তনেত্রে ঐ মুক্তবক্ষ উলঙ্গ তরবারি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, কে যেন তাঁর কানে কানে কথা কহিয়া বলিল, 'ঐ তলোয়ার যে তোমার বুকে সে বসিয়ে দেয়নি, এই তোমার পরম ভাগ্য!'

তার পর সহসা আবার কে যেন কোথা হইতে বলিয়া উঠিল—'আচ্ছা, কেন দেয় নাই? দিলেই ত অনায়াসে দিতে পারিত? বাধা দিবার অবসর কেহই ত পাইত না।'

মনের মধ্যে যেন একটা বিস্ময়ের রেখা ফুটিয়া উঠিল। রামপাল সত্যই যেন বিচিত্র! কিন্তু না না, সে ত নিজেই নিজেকে রাজদ্রোহী বলে স্বীকার করছে।

ধীর মৃদু চরণে প্রবেশ করিলেন বোধিদেব। ভূতপূর্ব্ব মহামাত্য যোধদেবের পুত্র, অধুনা ক্ষুদ্র রাজামাত্য বোধিদেব মহারাজাধিরাজের বি[illegible] প্রিয়পাত্র নহেন, তবে বাহু বিক্রমে সুবিখ্যাত ও পুরাতন মন্ত্রি বংশীয় [illegible]লয়া মহারাজাধিরাজ ইঁহাকে মনে মনে সামান্য কিছু ভয় করিয়া চলিতেন। আজ অন্য কাহাকেও কাছে না পাইয়া অগত্যা এই সময়ে আগত বোধিদেবকেই মনের কথা বলিয়া ফেলিলেন;—"কোথায় ছিলে বোধিদেব? রামপাল যে রাজদ্রোহ স্বীকার করেও সাহঙ্কারে ঘরে ফিরে গেল, এতে রাজ্যশাসন কখন সুশৃঙ্খল থাকতে পারে?"

বোধিদেব সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিলেন, "রামপাল—মহাকুমার রামপাল রাজদ্রোহী!—রামপাল!"—

মহীপাল দন্তে দন্ত ঘর্ষণ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "অমাত্য

বোধিদেব! সকলেই সাধু, শুধু, তোমাদের মহারাজাধিরাজ মহীপালদেবই মিথ্যাবাদী, না?”

বোধিদেব আত্মসংবরণ পূর্ব্বক নম্রকণ্ঠে কহিলেন, “তা নয় রাজাধিরাজ! কিন্তু রামপাল যে রাজদ্রোহী, এ কথা আপনাকে যে বলেছে, সে নিজেই মিথ্যাবাদী। রামপালকে আমি যেমন জানি, সে নিজেও আপনাকে তেমন ক’রে জানে না। রাজদ্রোহ তার ধাতুর সঙ্গে একেবারেই বিরোধী জান্‌বেন। এ তার কোন মহাশক্রর চক্রান্ত।”

মহীপালদেব কহিলেন, “রামপাল যে রাজদ্রোহী, সে কথা অপর কেহই নয়, সে নিজেই ঐ এইখানে দাঁড়িয়ে এই কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র পূর্ব্বে নিজের মুখেই স্বীকার ক’রে গেছে। এই দেখ, তার কোষমুক্ত কৃপাণ,—সে ধরা পড়বেই জেনে এই অস্ত্র ও শিরস্ত্রাণ ত্যাগ ক’রে নিজ হতেই ধরা দিতে এসেছিল; এমন সময় শূরপাল এসে তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল। আমারই অন্নপুষ্ট—আমারই দ্বারা মগধের মত বিশাল প্রদেশের রাজসম্মানে প্রতিষ্ঠিত কৃতঘ্নাধম শূরপাল! এতবড় স্পর্দ্ধা তার!”

বোধিদেব সবিস্ময়ে দেখিলেন, উষ্ণীষ ও কৃপাণ বাস্তবিক রামপালেরই বটে।

তাঁহাকে বাক্যবিমুখ ও স্তম্ভিত দেখিয়া মহারাজাধিরাজ পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন, “এখন আমার কর্ত্তব্য—অবিলম্বে শূরপাল ও রামপালকে বন্দী ক’রে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া, তারা বাইরে থাকতে প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার রাজ্য ও জীবন বিপন্ন হয়ে উঠছে। বোধিদেব! তোমরা পাল-বংশের পুরাতন ভৃত্য, তোমার দ্বারা আমার এই বিশেষ কার্য্যটি আমি প্রত্যাশা করি। কোন জনপ্রাণী না জান্‌তে পারে, এমনই ক’রে নিঃশব্দে তুমি রামপালকে বন্দী ক’রে কারাগারে রেখে আসতে পার না কি!”

বোধিদেব উত্তেজিতভাবে কি বলিতে গিয়া সহসা আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, ইহা দেখিয়া রাজাধিরাজ কহিলেন, "তবে যদি সখা ব'লে রামপালকে বন্দী করায় তোমার অসম্মতি থাকে, আমি তোমায় সে জন্য বলপ্রকাশ করতে চাইনে। তুমি গিয়ে এই মুহূর্ত্তে মহাপ্রতীহার রুদ্রদমনকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাওগে, রুদ্রদমন প্রকাশ্যেই তাকে বন্দী ক'রে আনুক। ব'লে দিও, অন্ততঃ হাজার দুই সৈন্য সঙ্গে নিয়ে সে যেন এখনই উপস্থিত হয়।"

বোধিদেব স্থির গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "আমায় যে আদেশ করেছেন, তা প্রত্যাহার ক'রে অন্যকে দেবার কোন বিশিষ্ট কারণ আছে কি, রাজাধিরাজ ?"

মহীপালদেব ঈষৎ বিস্ময় বোধ করিলেন ; কহিলেন, "রামপাল তোমার বাল্যসখা নয় ?"

বোধিদেব কহিলেন, "হোক্ সখা। রাজকার্য্যে যখন ভ্রাতৃত্বেরই স্থান নেই, তখন বন্ধুত্ব কি এতই বড় ?"

সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া রাজাধিরাজ কহিলেন, "তা হ'লে রামপালকে বন্দী করায় তোমার আপত্তি নেই ?"

বোধিদেব কহিলেন, "না,—যদি রাজাধিরাজের এই রকমই যথার্থ আদেশ হয়।"

সন্তুষ্ট চিত্তে রাজা কহিলেন, "হ্যাঁ, আমার এই আদেশ, তবে যাও, আর বিলম্ব করো না। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আমায় তার বন্দীত্বের সংবাদ এনে দেওয়া চাই। আর যদি সে পালিয়ে থাকে, তা হ'লে মহাপ্রতীহারের সাহায্য নিয়ে সসৈন্যে তার অনুসরণ ক'রে যেখান হ'তে পাও, তাকে ধ'রে আনবে। একসঙ্গে দু'ভাইকে পেলে খুবই ভাল হয় ; তাদের কারুকেই আর আমি বাইরে রাখতে ভরসা করি না। আচ্ছা, এখন যাও।"

"রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য !" এই বলিয়া রাজাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বোধিদেব প্রস্থান করিলেন।

ঈষৎ ভারমুক্ত চিত্তে রাজাধিরাজ মনে মনে বলিলেন—"দেখছি, বোধিদেবের উপর আমি অবিচার করেছি। মানুষ চেনা যায় না। আচ্ছা, আজ যদি সে রামপালকে বন্দী করতে পারে, নিশ্চয়ই সমুচিত পুরস্কার পাবে। মহীপাল অকৃতজ্ঞ নয়। তার পর, অকৃতজ্ঞ শূরপাল ! তোমাকেও আমি আর এ জীবনে বিশ্বাস বা ক্ষমা করবো না। তোমায় এত বড় মর্য্যাদা দিয়ে, তার বিনিময়ে আমি তোমার কাছে এই পুরস্কার লাভ করলেম ? বিশ্বাসঘাতক ! তবে তোমারও কার্য্যের উপযুক্ত ফল পেতে আর খুব বেশী দেরি হবে না। স্নেহের ভাইটী আমার ! উভয় ভ্রাতাই এবার একত্র থেকে জগৎকে সৌভ্রাত্রের উত্তম দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবে।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

রামপাল রাজসভা হইতে ভগ্নহৃদয়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া কোনমতে স্খলিতপদে নিজের বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু বিশ্রামলাভ তাঁহার আদৌ তখন উদ্দেশ্য ছিল না, অথবা জীবনের কোন প্রকার উদ্দেশ্যই বোধ করি আর তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান ছিল না।—কি যে এ সুগভীর শূন্যতা !

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই দ্বার ঠেলিয়া প্রবেশ করিলেন বোধিদেব। রামপাল তাঁহাকে দেখিয়াই সাগ্রহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"আমায় কি বলতে এসেছ বোধি ! রাজাধিরাজের কাছ থেকেই তুমি আসছ কি ? কিছু বলবার আছে কি আমায় তাঁর হয়ে ?"

বোধিদেব ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন, "তাঁর হয়ে ?"

রামপাল যেন ঈষৎ আশ্বস্ত চিত্তে মৃদু হাসিলেন ; বলিলেন, "অকারণেই যে তোমার মুখের অবস্থা অমন ভীম গম্ভীর হয়ে ওঠেনি, তা আমি বুঝতে পেরেছি। রাজার আদেশটা কি শুনি ?"

রাজাধিরাজ তোমাদের দু'ভাইয়ের উপরেই খুব রেগে আছেন, বোধ করি, তোমায় তা বলাই বাহুল্য এবং—"

রামপাল এবার আগ্রহভরে এক পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত স্মিতমুখে কহিলেন,—"এবং শীঘ্রই আমাদের বন্দী করা হবে ? কেমন,—এই কথা না ?"

বোধিদেব রুদ্ধশ্বাস মৃদুভাবে পরিত্যাগ করিয়া সবিষাদে কহিলেন, "তোমার অনুমান মিথ্যা নয়, বন্ধু! রাজ-চরিত্র তুমি ঠিকই বুঝে নিয়েছ !"

রামপাল মুক্তস্বরে হাসিয়া কহিলেন, "আমিও মনে মনে এই আশাই করেছিলেম। রাজসভায় প্রকাশ্যে যেটা সব সময় জোর ক'রে করা যায় না, সেটা গোপনে করাই সহজ। তা চল, আমি ত প্রস্তুতই আছি। কোথায় যেতে হবে, বল।"—এই বলিয়া তিনি আর এক পদ অগ্রসর হইলেন।

বোধিদেব যথাস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নীরস কণ্ঠে কহিলেন, "এত ব্যস্ত হয়ো না, রামপাল! একটু ধৈর্য্য ধ'রে থাক, যেতেই যদি হয় ত তার জন্য আর অতই বা তাড়াতাড়ি কিসের ?"

রামপাল তখন ঈষৎ অপ্রতিভভাবে আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "তোমার সময় নষ্ট না ক'রে ফেলি, তাই ভীত হচ্চি।"

বোধিদেব বলিলেন, "না, সে জন্য তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমার সময় এমন কিছু অমূল্য নয়। যা হোক, মহাপ্রতীহারের বদলে আমি কেন তোমায়

বন্দী কর্‌তে এসেছি, এ সম্বন্ধে কি তোমার মনে কোনই কৌতূহল জাগলো না?"

রামপাল ভূতপূর্ব্ব মহামন্ত্রিপুত্র—বর্ত্তমান ক্ষুদ্র রাজামাত্য বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া শান্ত স্নিগ্ধ হাস্যের সহিত উত্তর করিলেন, "মহাপ্রতীহারের চেয়ে আমার পক্ষে তোমার হস্তই যে প্রেয় বোধি! এর আর জানবার কি আছে ভাই?—এইটুকু জানা গেল যে, বরেন্দ্রীর রাজকর্ম্মচারিগণ এখনও রাজভক্ত।"

বোধিদেব এ কথায় কান না দিয়াই বলিলেন, "সে যা হোক রামপাল! আমি এখানে তোমার অপেক্ষা করব, তুমি একবার সন্ধ্যাদেবীর কাছে, আর মহাদেবীর কাছে গিয়ে তাঁদের নিকট বিদায় নিয়ে এস, তার পর যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও। এমন কিছু বেশী ব্যস্ত হবার কারণ নেই, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা যাত্রারম্ভ কর'তে পারবো।"

রামপালের চিত্ত বন্ধুর এই সস্নেহ সহৃদয় বাক্যে বারেক বিমথিত হইয়া উঠিতে গেল, একটা গভীর আবেগ তাঁহার সবল চিত্তকে ঈষৎ আলোড়িত করিতে উদ্যত হইয়া তাঁর লৌহ-কঠিন আত্মসংযমে বাধা পাইয়া যথাস্থানে লুক্কায়িত হইল, শান্ত উদাস কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "দেখা সাক্ষাতের আর ত কোনই প্রয়োজন নেই, ভাই! আর প্রস্তুত হওয়া, তা এ পৃথিবীতে আমার পাওনা দেনা এত বেশী ছড়ানো নেই, যে, এক নিমেষের চাইতেও আমার তার মাঝখান থেকে বেরিয়ে যেতে বেশী দেরি হবে। আমি যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই রয়েছি।"

বোধিদেব এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া লইয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, "এস তবে যাই।"

"কৈ, তুমি ত আমায় বন্দী কর্‌লে না? আচ্ছা, তা হ'লে আমি তোমার আগে আগে যাব, না পিছনে পিছনে?"

বোধিদেব কুমার রামপালের হাত ধরিয়া কহিলেন, "এস, আমরা দু'জনে একত্রই যাই, তা হ'লে আর আগে পরের সমস্যাটা উঠ্‌তেই পারবে না।"

এই বলিয়া উভয়ে গৃহের বাহিরে আসিলেন। অপরাহ্লের স্বর্ণ-লোহিত আভা গাছের মাথায় পড়িয়া ঝক্‌মক্ করিতেছিল। বেলা শেষের মৃদুল বাতাস লতায় পাতায় ঝির্ ঝির্ করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। দোয়েল পাপিয়ার মধুর স্বর চারিদিকে আনন্দ কলরব জাগাইয়া তুলিতেছিল। পথে আসিয়া বোধিদেবের জন্য প্রতীক্ষিত রথে উভয়েই আরোহণ করিলে, যানচালক ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রীর গৃহোদ্দেশ্যেই যান চালনা করিল। ক্ষণকাল পথচারী নর-নারীগণের প্রতি দৃষ্টি সন্নিবেশিত রাখিয়া তার পর রামপাল একটী গভীর তপ্তশ্বাস মোচন পূর্ব্বক দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। বাহিরের কোন জনপ্রাণীই জানিল না যে, তাহাদের এক অভাগা রাজপুত্র তাদের মধ্য হইতে জন্মের মতই নিঃশব্দে সরিয়া যাইতেছে। সংসার-সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্‌মাত্র জলশায়ী হইল, ইহাতে সংসারের ক্ষতিই বা কি ?

"এ কি! তুমি কোন্ পথে যাচ্ছ, বোধি ? কারাগারের পথে ত তোমার রথ চলছে না ?—আমায় নিশ্চয়ই কষ্টাগারে নিয়ে যাবার আদেশ আছে ?"

বোধিদেব সস্নেহে উত্তর করিলেন, "তুমি যেখানে যেতে চাইবে, আমি সেইখানেই তোমায় নিয়ে যেতে প্রস্তুত আছি, রামপাল! বল, কোথায় যেতে চাও ?"

বন্ধুর মুখের এই অদ্ভুত উত্তরে মহাকুমার অত্যন্তই বিস্মিত হইলেন, সাশ্চর্য্যে তিনি কহিয়া উঠিলেন, "এ কথার অর্থ কি, বোধি ?"

বোধিদেব ঈষৎ হাস্য স্মিত মুখে কহিলেন, "তা হ'লে কি তুমি মনে

করেছ যে, বাস্তবিকই মহাকুমার রামপালদেবকে তার চিরসখা সত্য সত্যই কষ্টাগারের অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষেপ করবার জন্তই স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে এই কাষ হাতে নিয়েছে? তা যদি হতো, রামপাল, তা হ'লে মহাপ্রতীহারই এ কাযটার গৌরব অর্জ্জন করতে পারতেন। এখন যা বলি, শোন; নদীর তীর পর্য্যন্ত আমরা একত্র গিয়ে তোমায় নদী পার ক'রে দিয়ে আমি ফিরে আস্‌বো, আর তুমি,—তোমার জন্যে রক্ষিত তেজস্বী ঘোড়া—যা আমি 'চৈত্ররথ' বাগানের প্রাচীরের পাশে রাখিয়ে এসেছি, তাইতে চ'ড়ে তোমার যে দিকে ইচ্ছে পালাবে।—তার পর কি করতে হবে, তাও কি আমায় রামপালকে উপদেশ দিতে হবে? সমতটের জ্যোতিষিক গণনা স্মরণ করো, মহারাজাধিরাজ রামপালদেবের প্রতীক্ষায় সমস্ত বরেন্দ্রী আজ উন্মুখ অধীর হয়ে উঠেছে;—আর বিলম্ব অবিধেয়।"

আবার একটা পরস্পর-বিরোধী প্রবল দ্বন্দ্বে রামপালের দৃঢ় চিত্তকে ক্ষণকালের জন্য গভীর আন্দোলিত করিয়া রাখিল। অবশেষে তাহাদের সমস্ত শক্তিকে পরাভূত করিয়া দিয়া অবসাদক্ষীণ কণ্ঠে তিনি কোনমতে প্রত্যুত্তর করিলেন, "তুমি আমায় কারাগারেই নিয়ে চল।"

"ভাল ক'রে আবার ভেবে দেখ, রামপাল! তুমি বালক নও, মূর্খ নও, এখনও সময় আছে। এ কায আমি না করলে এখনই অন্য লোক সাগ্রহে সম্পন্ন করবে, তাই এত বড় ভয়ানক কাযের ভার স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হয়ে নিয়ে এসেছি। এ সুযোগ ত্যাগ করো না। তোমার কাছে জীবন-মরণে কোন প্রভেদ নেই, তা আমি জানি, কিন্তু এই অত্যাচারিত দেশের লোকের মুখ চাও, এদের ঐ রাজবেশী শোষকের হাত থেকে বাঁচাও। তোমার ঐ অর্থহীন রাজভক্তির—ভ্রাতৃভক্তির ভ্রান্ত অভিনয় আমারও আজ অসহ্য হয়েছে! দয়া করো ভাই! নিজের জন্য দরকার না থাকে, না থাক্‌, আমায় এই ভিক্ষা দাও, দেশকে রক্ষা কর। রামপাল!

প্রিয়সখা! তোমার আশৈশবের বন্ধুকে এই ভিক্ষা দাও! যোড় হাতে ভিক্ষা চাইচি,—ব্রাহ্মণ আমি, নিজের জাতীয় সম্মান গৌরব পরিত্যাগ ক'রে তোমার কাছে নতজানু হচ্চি, ভিক্ষা দাও!"

রামপালের বুকে যেন আর সহিবার সামর্থ্য ছিল না, তিনি একটা অব্যক্ত ধ্বনি করিয়াই স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, ক্ষণ পরে দুঃখ পরিবাদ শূন্য ভাবলেশহীন মুখে সহজ স্বরে কহিলেন, "আমার যা পরিণাম, আমায় তা পেতে দাও। তুমি নিয়ে যেতে না পার, আমি নিজেই যাচ্চি,—আমার আর উপায়ান্তর নেই—"

"আর একবার ভেবে দেখ, মহাকুমার! সেখানকার অসহ্য যন্ত্রণা, সে কি সইতে পারবে, মনে করচো? হয় ত—হ্যাঁ হয়ত সে যন্ত্রণায় মৃত্যু ঘটতেও বেশী বিলম্ব হবে না। অন্ততঃ এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজেকে নিরাপদ তো কর।"

রামপাল কহিলেন,—প্রাণহীন পুতুলের মুখ দিয়া যেন সে ভাষা বাহির হইয়া আসিল, এমনই নীরস সে স্বর—"তা হয় না, বোধি! আমায় উদ্ধার করতে গিয়ে তুমি মাত্র বিপন্ন হবে, এতে আর কোনই লাভ হবে না। যে জীবন এ জন্মে ব্যর্থই হয়ে গেছে, তার মিথ্যা ভার বহন করবার জন্যে আমার আর বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই, আমি আর তা বইতেই পারছিনে; ঘাতুকের ছুরির চেয়ে এখন আমার বেশী বন্ধু—এমন কি, তুমিও নও।"

বোধিদেব সন্তপ্ত কণ্ঠের এই নিদারুণ হতাশ বাক্যে একান্ত ব্যথিত হইলেন। সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক সবিষাদে তিনি কহিলেন, "কোন্‌খানে কিসের যেন একটা কি ভুল হয়ে গ্যাছে, সেটা আমি বরাবরই লক্ষ্য করে দেখছি; কিন্তু এতই কি তা' দুর্ল্লঙ্ঘ্য?—অবশ্য যা জানি না, তার সম্বন্ধে কেমন ক'রে বিচার করবো? তবে সত্যই কি তুমি কারা-

গারকেই শেষকালে বরণ ক'রে নেওয়া স্থির করলে? আর সেটা আমারই দ্বারা সম্পন্ন করাবে?—রামপাল!—কি নিষ্ঠুর তুমি!"

"ক্ষতি কি সখা! তোমার রাজাজ্ঞা ত তাই?"

"তুমি পাগল!"—এই বলিয়া ক্রুদ্ধ ও বিষণ্ণ বোধিদেব যাত্রাপথের অপর দিকে রথ চালনার আদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্তব্ধ ও শোকাচ্ছন্ন হইয়া অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

"বোধিদেব! আমার পৃথিবীর শেষ বন্ধু! তুমিও আমার উপর রাগ করলে?"

"রামপাল!"—বলিয়া বোধিদেব মহাকুমারকে দুই হস্তে দৃঢ়কঠিন আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন,—"ভগবান্ তোমার এই অতুল্য ত্যাগের মূল্য প্রদান করুন! আর তাঁরই মহাসাম্রাজ্যের এক দীনাতিদীনও এর জন্য তার যথাসাধ্য চেষ্টায় সচেষ্ট থাকলো। না পারে, অন্ততঃ প্রাণ দিতেও পারবে।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

অপরাহ্নে মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব তাঁর মর্য্যাদানুরূপ বেশ-ভূষায় বিভূষিত হইয়া সাংবাদিকের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, চন্দ্রকলার আরোগ্য-সংবাদ আসিলেই নর্ত্তকীকুলরাজ্ঞীকে অভিনন্দিত করিতে স্বয়ং রাজ-রাজ্যেশ্বরই আজ তাহার গৃহে অভিসারযাত্রা করিবেন স্থির হইয়াছে। ইতিমধ্যে শূরপালের বন্দিত্ব সংবাদ মহাপ্রতীহার প্রমুখাৎ জানা গিয়াছে, এখন মাত্র বাকী রামপালরূপ মহাশত্রুর বন্ধন সংবাদটি পাওয়া, তাহা হইলেই সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া প্রেমাভিনয়ে আনন্দ-শর্ব্বরী যাপন করা যায়। এইবারই যথার্থরূপে অপ্রতিদ্বন্দ্ব সাম্রাজ্য সুখ সম্ভোগ ঘটিল!

দ্বারের প্রহরিণী কাহাকে সসম্ভ্রমে দ্বার ছাড়িয়া দিল। সাংবাদিক নিশ্চয়ই নহে, রাজাধিরাজ ত্রস্তে ফিরিয়া বসিলেন। দ্বার প্রান্তে দাঁড়াইয়া বোধিদেব।

"অমাত্য বোধিদেব! সংবাদ কি? কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে ত?"

বোধিদেব শান্ত গম্ভীর স্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন, "হয়েছে বইকি, রাজাধিরাজ!"

রাজাধিরাজ ক্ষণকালের জন্য আর একটি কথাও কহিতে পারিলেন না, তাঁহার রাজোচিত অহঙ্কার তাঁহাকে কিছুক্ষণের জন্য বাক্য বিমুখ রাখিল। রাজারা যখন নিজের মতে কার্য্য করেন এবং সে কাজ যদি বিশেষ করিয়া অন্যায় কার্য্য হয়, তাহা হইলে সেটাকে সঙ্গত ও ন্যায্য প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁদের ও তাঁদের সামান্য একজন কর্ম্মচারীর কাছেও একটা ঐকান্তিক প্রচেষ্টা জাগিয়া উঠে। এ ক্ষেত্রেও মহীপালের চিত্তে,—রামপালের প্রতি যে বিন্দুমাত্রও অবিচার ঘটে নাই, এই কথাটাকে জোর করিয়া প্রমাণ করিবার জন্য একটা উৎকট লোভ আসিয়া তাঁহাকে আলোড়িত করিতে থাকিলেও, একটা অযথা দ্বিধাও যেন কোথা হইতে জাগিয়া উঠিতেছিল। অবশেষে সবলে অন্তরস্থ কুণ্ঠাটুকুকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া সচেষ্টায় কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট অনাগ্রহের সুর টানিয়া আনিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি কিছু বলেছে?"

"কিছুই বলে নি, রাজাধিরাজ! সে কি তাই বল্‌বার ছেলে?"

"নিশ্চয়ই কিছু আর নিঃশব্দেই নিজেকে সে তোমায় বন্দী করতে দেয় নি?"

"তিনি বরং বল্লেন যে, তিনি বন্দী হবার জন্যই প্রতীক্ষা করছিলেন।"

"ওঃ, সে তা হ'লে তার রাজদ্রোহিতার জন্য ক্ষমা চায় নি? এখনও সেই বিদ্রোহের সুরই ধ'রে রয়েছে!"

"বিদ্রোহী আপনি কা'কে বল্‌ছেন, মহারাজাধিরাজ?"—শান্তস্বরে বোধিদেব এই কথা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "রাজদ্রোহী কি রাজাজ্ঞায় অবলীলাক্রমে নিজেকে ভীষণ যন্ত্রণাপূর্ণ 'কষ্টাগার' নাম দেওয়া কারাগারে বন্দী ক'রে নিয়ে যেতে দেয়? এমন কি, যে তাকে বাধ্য হয়ে নিয়ে গেল, তার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরোধ ক'রে,—তার ইচ্ছার ও চেষ্টার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে! কেউ এমন করে কি, রাজাধিরাজ? আর সেই তাকেই বলেন আপনি বিদ্রোহী?"

"কার ইচ্ছার ও চেষ্টার বিরুদ্ধে, বোধিদেব? তুমি কি পাগল হয়েচ?"

বোধিদেব মৃদু হাসিলেন, "না রাজাধিরাজ! হঠাৎ পাগল কেন হব?"

"তবে এ সব কি তুমি বল্‌চো? 'যে তাকে নিয়ে গেল, তার সঙ্গে বিরোধ ক'রে',—ইত্যাদি এ সবের মানে কি? কে' তাকে 'বাধ্য হয়ে নিয়ে গেল?' সে লোকটা কে শুনি?"

"মহারাজাধিরাজ যাকে এ কাযের ভার দিয়েছিলেন, আমি তারই কথা বল্‌ছি, রাজাধিরাজ!"

রাজা ক্রুদ্ধ এবং বিমূঢ়বৎ প্রশ্ন করিলেন, "আমি ত তোমার 'পরেই এ কাযের একমাত্র ভার দিয়েছিলেম, বোধিদেব! আরতো কারুকেই দিইনি।"

"হ্যাঁ, রাজাধিরাজ! তাই সেই আমার কথাই ত আমি উল্লেখ করেছি,—আর কারও কথা বলিনি ত।"

"তুমি কি তা' হ'লে আমায় বল্‌তে চাও যে, আমার আদেশের পরও তুমি তাকে বন্দী করতে ইচ্ছুক ছিলে না? সেই রাজদ্রোহীকে? রাজ্যের সেই পরম শত্রুকে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজাধিরাজ! আমার যথার্থই তা' ইচ্ছা ছিল না।

এমন কি, আমি তাকে করতোয়া পার হয়ে অশ্বারোহণে এ রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যাবার জন্য বিস্তর অনুনয়ও করেছিলেম, পূর্ব্ব হ'তে এর জন্য নৌকা ও অশ্বাদিও প্রস্তুত রেখেছিলেম ; কিন্তু এমনই কঠিন তার পণ, কিছুতে তাকে সম্মত করতে পারলাম না !"

"রামপালের পলায়নের জন্যে ? বিশ্বাসঘাতক ! কৃতঘ্ন !"—মহীপাল গর্জ্জিয়া উঠিলেন।

বোধিদেব যথাপূর্ব্ব স্থির কণ্ঠেই কহিলেন, "হ্যাঁ, তার পলায়নের জন্যই ত এত চেষ্টা করেছিলেম, সে কিন্তু কিছুতেই সম্মত হ'ল না।—সবই আমার বৃথা হ'ল !"

ক্রোধে ও অপমানে মহীপালদেবের সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, তথাপি ইঁহার ধীর স্থির গাম্ভীর্য্য ও অকুতোভয়তা তাঁহার সেই ক্রুদ্ধ চিত্তেও যেন একটা বিস্ময়ের প্রলেপ লেপিয়া দিতে ছাড়িতেছিল না। তিনি ক্ষণকাল ক্রোধাতিশয্যে নির্ব্বাক্ থাকিয়া পরে ক্রোধ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তোমার এ রকম চাতুর্য্য করার অর্থ কি বোধিদেব ? আমি ত জোর ক'রে তোমায় তোমার বাল্যসখাকে বন্দী করবার ভার দিই নি, তুমি নিজেই বরঞ্চ এ ভার আমার কাছ থেকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলে।"

বোধিদেব নত নেত্রে উত্তর করিলেন, "তা করেছিলেম, রাজাধিরাজ ! আপনি ত সেই সময়েই আমার পরিবর্ত্তে মহাপ্রতীহারকে এই ভার দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, আমি এ ভার না নিলেও আমার বাল্যসখা আপনার হস্ত হ'তে নিষ্কৃতি পেতেন কি ? তাই আমি তাঁকে আপনার অকরুণ হাত থেকে উদ্ধার করবার লোভেই এই মহা ভার স্বেচ্ছায় নিজেই চেয়ে নিয়েছিলেম,—তার জন্য চেষ্টাও যথেষ্ট করেছিলেম, কিন্তু অভিমানী যুবক আমার কোন কথায়ই কর্ণপাত করলে না, মনের জ্বালায় জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে

ঝাঁপিয়ে পড়ল! সত্যই কি আপনি তার এই মহত্তম ত্যাগ স্বীকারকে বুঝতেও পারেন নি বলতে চান! না তত নির্ব্বোধ তো কই আপনাকে বোধ হয় না? উঃ, সাধ ক'রে কি জীবনই বরণ ক'রে নিলে! কি দুর্ব্বহ জীবন!"

"বোধিদেব!"

"রাজাধিরাজ!"

"এই তুমি রাজভক্ত? এই তুমি বীর? রাজ্যশাসনের কাছে হৃদয় বৃত্তির যে কোনই মূল্য নেই, এই কথাটা কি আমাদের ভুলে গেলে চলে?"

"বিশেষতঃ যেখানে স্বার্থ সংঘর্ষ হ'তে পারে? বিশেষতঃ যেখানে চরিত্রগত প্রভেদ হিমগিরির পার্শ্বে বল্মীকের মতই সর্ব্বজনগোচরীভূত? বিশেষতঃ যে মহচ্চরিত্রের পার্শ্বে হীনতার—"

ক্রোধে পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়া রাজাধিরাজ উচ্চকণ্ঠে বাধা দিলেন,—"বোধিদেব! তুমি কি আজ তোমার রাজার ধৈর্য্য পরীক্ষা করতে এসেছ? আর নয়, শোন—"

বোধিদেব কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়াই শান্ত সংযতভাবে সোজা হইয়া সস্মিত মুখে রাজাধিরাজকে বাধা দিলেন, বলিলেন—"আপনিই আগে শুনে নিন, রাজাধিরাজ! আমার বক্তব্য বেশী কিছু নয়,—শুধু এই প্রসাদ ভিক্ষা চাইছি যে, আমাকেও আমার সখার সঙ্গে একত্র কষ্টাগারে বাস করবার অনুমতি দান ক'রে কৃতার্থ করুন। আমায় বন্দী করবার জন্য কা'কেও কষ্ট ক'রে ডাকতে হবে না, আপনার লিখিত আদেশ পত্রটী পেলে আমি নিজেই কারারক্ষীদের কাছে চ'লে যাব, পথঘাট সবই তো আমার চেনা আছে, আর আপাততঃ সেইখান থেকেই তো আস্‌চি।"

রাজাধিরাজ ক্রোধে অধর দংশন করিয়া সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন,

গৃহ প্রান্তে সুবর্ণময় লেখ্যাধার সজ্জিত ছিল; ক্ষণেক সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর ঈষৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—

"সাবধান বোধিদেব! হয় ত এ আদেশপত্রে চির-কারাবাসের কথাও লেখা থাকা অসম্ভব নয়!"

বোধিদেব উত্তর করিলেন, "সেইটেই বেশী সম্ভব! কারণ এর পর আর কি কখন আপনি আমার মুখের দিকে চাইতে পারবেন? না আমায় বাইরে আসতে দিতে ভরসা করবেন?"

রাজাধিরাজ ভূমিতলে প্রচণ্ড পদাঘাত পূর্ব্বক চীৎকার স্বরে কহিয়া উঠিলেন—"চ'লে যাও, বোধিদেব! আজ হ'তে মন্ত্রিমণ্ডলীতে তোমার স্থান নেই।"

বোধিদেব চলিয়া গেলেন না, এমন কি, এক পদ মাত্র নড়িয়া দাঁড়াইলেন না, ধীর স্থির শান্তভাবে দাঁড়াইয়া ক্রোধোন্মত্ত ক্ষিপ্ত সিংহবৎ হিংস্রমূর্ত্তি রাজার প্রতি নির্ভীক নেত্রে চাহিয়া উত্তর করিলেন,— "মন্ত্রিমণ্ডলীতে স্থান থাকতেই বা আমার কতটুকু স্থান সেখানে আছে. রাজাধিরাজ! তা যদি থাকৃত, তবে আজ পাল-সাম্রাজ্যের এ অধঃপতন অ[illegible] আমায় দাঁড়িয়ে দেখতে হতো না। আমি মহামান্য পাল-সম্রাট ধর্ম্মপাল-মন্ত্রী গর্গদেবাদির বংশধর, আজ আমার মহা মন্ত্রিত্বের পরিবর্ত্তে সামান্য অমাত্য-পদে নামমাত্র প্রতিষ্ঠা, আসলে আমি যোধদেবাত্মজ বোধিদেব সামান্য এক জন রাজপাদসেবী সেবক মাত্র!—"

রাজাধিরাজ কোনমতে বাক্ সংগ্রহ পূর্ব্বক উচ্চারণ করিলেন "এই হীনপদ ত্যাগ করতে কোন নিষেধ নেই, বোধিদেব! তা' এখনই তুমি করতে পার।"

বোধিদেব কহিলেন, "তা' আমি জানি, রাজাধিরাজ! যাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব আজও বর্ত্তমান আছে, আপনার সিংহাসনের পার্শ্বে

তাদের যে কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা নেই, সে কথা আর আপনি কষ্ট স্বীকার ক'রে বলছেন কেন? এই হেয় সত্য আজ সমুদয় আর্য্যাবর্ত্তবিদিত। রাজাধিরাজ! দয়া ক'রে আমায় আমার বন্ধুর পাশে একটুখানি স্থান ক'রে দিন, আমি আপনার সঙ্গে আর বৃথা বাদানুবাদ করতে ইচ্ছা করি না, তার চেয়ে আমার হতভাগ্য বাল্যসখার নিদারুণ দুঃখের সামান্য একটুও যদি লাঘব করতে পারি, তাতেই আমি ধন্য হব। নিন, লেখনী তুলে নিন, আদেশ পত্র লিখিত হোক—"

"বোধিদেব! কিসের স্পর্দ্ধায় তুমি তোমার রাজার উপর আদেশের পর আদেশ চালিত করছ? তোমার ব্যবহারে আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, আমাদের মধ্যে রাজা কে?—তুমি, না আমি?"

"দুর্ভাগ্যক্রমে আপনিই রাজা, রাজাধিরাজ!"

"দুর্ভাগ্যক্রমে?—"

"তাতে আর সন্দেহ কি রাজাধিরাজ! আপনার পরিবর্ত্তে আমি রাজা হ'লে—"

"তুমি বোধ হয় তোমার একটা ক্ষুদ্র অমাত্যের এই রকম ঘোরতর ধৃষ্টতা সহ্য ক'রে তাকে পুরস্কৃত করতে?"

"পুরস্কৃত না করলেও, আমি রাজা হ'লে, রাজাধিরাজ! আমি আমার বংশানুগত মহামাত্যের পুত্রকে এই রকম অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি দিয়ে দগ্ধ করতে চেষ্টা না ক'রে, তাকে মানুষের মতন সহজ দৃষ্টিতে দেখে, নম্রকণ্ঠেই বলতেম, 'বোধিদেব! আমি রাজা, তা' ভুলে গেছলেম! রাজকর্ত্তব্য অবহেলা ক'রে আমি মহাপাপ করেছি, তার উপর এখন আবার ভদ্র-সন্তানের কর্ত্তব্যও লঙ্ঘন ক'রে তোমায় অপমান করাটা আমার সঙ্গত হয় নি। আমায় ক্ষমা কর'।"

বোধিদেবের এই উত্তরে রুষ্ট রাজাধিরাজ অধিকতর রুষ্ট হইতে গিয়া

ব্যগ্র মিনতিতে কণ্ঠে ঠেলিয়া উঠিল—"বোধিদেব! চিরমিত্র! তোমার উপদেশই মান্য করলেম—"

বোধিদেব তড়িৎস্পৃষ্টের মতই চমকিয়া একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসিলেন—"রাজাধিরাজ!"

রাজাধিরাজ নীরবে স্বর্ণলেখনী ধারণ করিয়া আদেশপত্র লিখিলেন, তাহা নিঃশব্দে বোধিদেবের দিকে প্রসারিত করিতে বোধিদেব উহা গ্রহণ-পূর্ব্বক মস্তকে স্পর্শ করিলেন, "কিসের আদেশপত্র রাজাধিরাজ?"

"রামপাল ও শূরপালের মুক্তির।"

"মহারাজাধিরাজ!"—বোধিদেব আনন্দ-বিস্ময়ে বাক্যহারা হইয়া গিয়া ক্ষণকাল শুধু নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন, তার পর বহু কষ্টে গভীরান্দোলিত মানসোদ্বেগ কথঞ্চিন্মাত্র নিরোধ করিয়া লইয়া রুদ্ধকণ্ঠে—"জয়!—জয় হোক্ রাজাধিরাজ!"—এই কথাটি মাত্র উচ্চারণ করিয়াই দ্রুত চঞ্চলপদে কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ম্রিয়মাণ ও উত্তেজিত জন-সাধারণকে এই অপ্রত্যাশিত সুসংবাদে উৎফুল্ল করিয়া তুলিতে, তদপেক্ষাও প্রিয়তম বাল্যসখাকে নিদারুণ দুঃখ ও অবমানজনক কষ্টভার হইতে অবিলম্বে মুক্তি প্রদান করিতে তাঁর সারা চিত্ত তখন বায়ুর সঙ্গে সমান বেগেই ছুটিতে চাহিতেছিল।

বিজয়ীর গৌরববিভা ললাটে অঙ্কিত করিয়া লইয়া আনন্দ-স্বপ্নে··· বিভোরচিত্ত বোধিদেব প্রাণপণে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিতেছেন, তাঁর উৎসাহদীপ্ত নেত্রের সম্মুখে সমস্ত বিশ্বজগৎ যেন আজ একখানি আনন্দ-নাট্য অভিনয়ে নিযুক্ত হইয়া আছে। ধূলিসমাকীর্ণ রাজপথ, তৎপার্শ্বস্থ উচ্চাবচ প্রাসাদশ্রেণী, ফুল ভারাবনত পান্থ-পাদপরাজি, তৎপরে হরিৎ-শোভায় সুশোভিত বিচিত্র জনহীন শস্যক্ষেত্র—সকলই যেন আজ ভবিষ্যতের মঙ্গলচ্ছবিবৎ প্রতিভাত হইতেছিল। বোধিদেবের যৌবন-

বলদৃপ্ত, অথচ সুসংযত উদারচিত্তে আগত দিনের সহস্র কর্ত্তব্য ক্ষণে ক্ষণে স্ফুরিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে আশায়, আনন্দে ও উৎসাহে উৎফুল্লতর করিয়া তুলিতেছিল। যে দিনে এই অস্তমিত প্রায় পাল সৌভাগ্য রবি তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া পাল সাম্রাজ্য গগনে পুনরুদিত হইবেন!—ওঃ, সে কি আনন্দ!—কি গৌরব!

"পরমভট্টারক, পরমসৌগত মহারাজাধিরাজের আদেশ,—অমাত্য বোধিদেব!—দাঁড়ান।"—পশ্চাতের এই উচ্চ আহ্বানে সবিস্ময়ে বোধিদেব অশ্ববল্গা সংযত করিয়া পিছনে মুখ ফিরাইলেন।

অশ্বারোহী চারি জন সশস্ত্র অশ্বপৃষ্ঠে রাজ-সৈনিকের সহিত মহাপ্রতীহার কুমার রুদ্রদমন স্বয়ং আসিয়া বোধিদেবের সম্মুখীন হইলেন।

"রাজাজ্ঞায় আপনি আমার বন্দী।"

"রাজাজ্ঞায় বন্দী?—আমি?—না, না, আপনার ভুল হয়েছে, মহাপ্রতীহার!"

কুমার রুদ্রদমন সস্মিতমুখে উত্তর করিলেন, "ক্ষমা করবেন, অমাত্য বোধিদেব! এই দেখুন, রাজহস্তের লিখিত আদেশপত্র।—"

এই বলিয়া মহাপ্রতীহার রুদ্রদমন বাস্তবিকই রাজার স্বহস্ত লিখিত একখানা আদেশপত্র বোধিদেবের বিস্ময় বিহ্বল নেত্রদৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। কষ্টাগারে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ধৃত করার আদেশ।

সৈনিক চারি জন আসিয়া তাঁহার বাহন অশ্বের চারি পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল।

নবোদিত অরুণের তরুণ দীপ্তরাগ আকস্মিকোদিত অশনি-সম্পাতশীল ঘনঘটা আচ্ছাদিত করিলে আকাশের যেমন অবস্থা দেখায়, তেমনই মুখে

হতাশা স্খলিতকণ্ঠে অমাত্য বোধিদেব কহিলেন, "চলুন, কোথায় যেতে হবে যাই ?"

মাত্র কয়েক দণ্ড পূর্ব্বেই তাঁহাকেও তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট আর এক জন বন্দীও ঠিক এই একই কথা বলিয়াছিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নর্ত্তকী চন্দ্রকলার প্রমোদ-ভবনে বিলাস-উপাদানের কোনখানেই কোন অপ্রতুলতা ছিল না, সুন্দর হর্ম্যমালা, উদ্যানবাটিকা, লতাকুঞ্জ, কৃত্রিম স্ফটিকনির্ঝর এবং আর্য্যাবর্ত্তসারভূত ঐশ্বর্য্যসম্ভারে ভারাক্রান্ত প্রমোদ-গৃহ। রাত্রি প্রায় প্রহরাধিক কাল অতীত হইয়াছিল, এমন সময় ত্রস্তগতি মহল্লিকা আসিয়া গৃহাধিকারিণীর নিকট বিস্ময় উল্লাসে মহারাজাধিরাজের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিল। গৃহস্বামিনী চন্দ্রকলা চন্দ্রকলারই ম[illegible] মলিনশ্রী মৃদুভাবে বিকীর্ণ করিয়া এলাইত শিথিল শরীরে শয্যা[illegible]তা রহিয়াছিল। তাহার সুকোমল পর্য্যঙ্ক-শয্যাপার্শ্বে দুই জন সেবাপরায়ণা মহল্লিকা এবং বৈদ্যরাজপ্রদত্ত ঔষধপাত্রাদি সংরক্ষিত।

রাজাধিরাজ দুঃখিতচিত্তে বিষণ্নমুখে গৃহপ্রবেশ করিলেন ;—"কেমন আছ, নাগরি ?"

রাজাধিরাজের জন্য প্রদত্ত সুবর্ণখচিত আসন গ্রহণ না করিয়া রাজাধিরাজ চন্দ্রকলার রোগশয্যার একপার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন।

"বড়ই অসুস্থ, রাজাধিরাজ !"

"কতদিনে আমার কলকণ্ঠী পাপিয়ার কলরবে সর্ব্বদা অসন্তোষপূর্ণ প্রজাদের অভিযোগের জ্বালায় উত্তপ্ত কর্ণকুহর যুগল জুড়াতে পারবো,

মোহিনি? আমার যে আর বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না প্রেয়সি! একবার উঠে ব'সে, মধুর হেসে আমার তাপিত প্রাণ শীতল ক'রে দাও।"

চন্দ্রকলাকে আজ বাস্তবিকই বড় অসুস্থ, বড়ই ক্লান্ত দেখাইতেছিল। তার ভ্রমরলাঞ্ছিত কৃষ্ণ কেশপাশ রুক্ষ ও অযত্নশিথিল, তার সযত্ন-প্রসাধিত শিরিষ পুষ্প সুকোমল চারু দেহ ভূষণমাত্র-বিহীন, তার সূক্ষ্ম অধরের স্বাভাবিক রক্তরাগটুকু পর্য্যন্ত পাটলপুষ্পের ন্যায় বিবর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কষ্টে মাথা তুলিয়া সেই বিরাগ-শুষ্ক অধরে ঈষৎ ক্ষীণ হাস্যরেখা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বারেকমাত্র চেষ্টা করিয়া পুনশ্চ ফিরিয়া শয্যাগ্রহণপূর্ব্বক রাজ-নর্ত্তকী কহিল, "শিরঃপীড়ায় প্রাণ যায়, মহারাজ! হাস্‌বার আজ সাধ্য কোথায়?"

মহারাজাধিরাজ তাঁর এই নবীনা প্রেয়সীকে হয় ত বা সত্যসত্যই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহার রূপ, গুণ, বিদ্যা, বিনয় এবং অন্তরের কোমলতা তাঁর চির স্বার্থপর মদান্ধ স্বভাবের উপর ঈষৎ যেন প্রভাব বিস্তৃত করিতেছিল। নারীকে তিনি নরের কামনা পরিতৃপ্তির উপাদান ভিন্ন অন্য দৃষ্টিতে কোন দিনই দেখিতে পারেন নাই; তাহা পারেন নাই বলিয়াই তাঁর বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী পট্টমহাদেবী লজ্জাদেবীর সঙ্গ তিনি সহ্য করিতেও পারেন না। লঘুচরিত্রা বারনারী অথবা রূপসী নবযৌবনা বন্দিনী, এই সকল নারীসঙ্গই তাঁর ঈপ্সিত ও পরিচিত। এই নারীসম্ভোগ প্রবৃত্তির জন্য কতই না পাপানুষ্ঠান তাঁহার দ্বারা ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে! সুন্দরী দরিদ্রবধূ ও কন্যাগণ কোথাও প্রলোভনে, কোথাও বা বলপ্রকাশে তাঁর পাদোপজীবিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই অপহৃতা হইয়া তাঁহাকে দিনে দিনে সর্ব্বসাধারণের ঘৃণা ও বিরাগভাজন করিয়া তুলিতেছিল। আর সেই সব হতভাগিনী নারী? ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজানুগ্রহে রাজ-বিলাসভবনের শোভা সম্পাদন করিতেছে, আবার

অনেকেই ভয় ক্রীড়নকের মত রাজানুগ্রহে বঞ্চিতা হইয়া নিরুপায়ে তাঁর দাসাদির অনুগ্রহ-জীবিনী হইতেছে। ইহাই মহীপালদেবের নারীজাতির প্রতি ব্যবহার! এ অবস্থায় তাঁর প্রেমলাভ, সে যে কত বড় দুর্ল্লভ বস্তু লাভ, তাহা অতি সহজেই অনুমেয়।

চন্দ্রকলার কাতরোক্তিতে মহারাজাধিরাজ দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। ক্ষণকাল বিরস মুখে নীরব থাকিয়া পরে বিষণ্ণ স্বরে কহিলেন—"তুমি আমায় আর পূর্ব্বের মত ভালবাস না, চন্দ্রা! তা যদি বাসতে, তা হ'লে আমায় দেখেই তোমার শিরঃপীড়া প্রশমিত হ'তে পারতো!"

বিলাসিনী রাজ-অভিমান হৃদয়ঙ্গম করিল। বুঝিল, এইবার বাঁধন একটু ঢিলা না দিলে হয় ত একবারেই ছিঁড়িয়া পড়িবে। তাই নিতান্ত অনিচ্ছায় ও অনাগ্রহের সহিতই সে তার শিথিলিত মৃণালভুজে নৃপতির স্বেচ্ছানুত কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া মধুর হাসি হাসিল। হাস্যস্মিতমুখে কহিল, "কে বল্লে যে, আপনার উপস্থিতিতে আমার শিরঃপীড়ার উপশম ঘটেনি? আজ তিন দিন কি আমি কারও সঙ্গে কথা কইতে পেরেছি? এই আপনাকে স্পর্শ ক'রে বলছি, রাজেন্দ্র! আজ সারাদিন আমি জলবিন্দুও গ্রহণ করতে পারিনি।"

রাজাধিরাজ মুহূর্ত্তেই গলিয়া পড়িলেন। চন্দ্রকলার উপবাস শুষ্ক মুখ সাগ্রহে সপ্রেমে তুলিয়া ধরিয়া তাহা অজস্র চুম্বনধারায় অভিষিক্ত করিয়া দিতে দিতে কাতর স্বরে উত্তর করিলেন, "বড় দুঃখিত হলেম, নাগরি! বড়ই কষ্ট বোধ করলেম! কি ভয়ানক অবিচার এই শিরঃপীড়ার? এত বৃদ্ধা, কুৎসিতা, গৃহপতি-বধূবর্গ জীবিতা থাকতে সে নির্দ্দয়ভাবে আমার সুকুমারী চারুশীলার 'পরে এত বড় অত্যাচার করতে এলো কেন বল দেখি? কি বলবো, এ যদি আজ আমার শাসনাধীন হতো তাহলে তাকে শূলে চড়িয়ে জীবন্ত দগ্ধ ক'রে এর প্রতিফল দিতেম—যা হোক, তুমি

যখন এত অসুস্থ, তখন তোমায় আর বিব্রত করবো না, আজ বিদায় নিই, কিন্তু আগামী কল্য তোমায় আমি আমার কাছে পেতেই চাই। শূরপাল ও রামপালের ব্যাপারে মনটা আমার একেই উত্যক্ত হয়ে আছে, এ সময়ে অন্য কা'কেও আমার ভাল লাগছে না। তুমি ত জানো নাগরী, আমি তোমায় কত ভালবাসি।"

এই বলিয়া রাজাধিরাজ পুনশ্চ সুগভীর আগ্রহভরে চন্দ্রকলার মুখ-চুম্বন করিলেন ও শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন। মহল্লিকা তাঁর পদদ্বয়ে রত্ন খচিত উপানহ পরাইয়া দিল।

"রাজাধিরাজ!"

পশ্চাৎ হইতে এই সুস্পষ্ট ও সাগ্রহ আহ্বানে মহীপাল দেব পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, এতক্ষণকার শয্যালীনা রোগিণী অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গীতে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়াছে এবং তার ইতঃপূর্ব্বের সেই ক্ষাণ অস্পষ্ট স্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আগ্রহভরে তাঁহাকে উচ্চকণ্ঠেই আহ্বান করিতেছে,—"রাজাধিরাজ!"

বিজয়পূর্ণ আনন্দের একটা উৎকট হর্ষচ্ছটায় মহারাজাধিরাজের আশাহত মলিন মুখ সুখোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। চন্দ্রকলা—আর্য্যাবর্ত্ত-প্রসিদ্ধ রূপসী বিদুষী চন্দ্রকলা, তাঁর প্রেমে বাঁধা পড়িয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ! নতুবা নিজের রোগযন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া সে তাঁর বিরহ-চিন্তায় ব্যাকুলা হইত কি? উৎফুল্ল স্মিতহাস্যে আশা প্রমোদিত চিত্ত নৃপতি ফিরিয়া আসিয়া ব্যগ্র আলিঙ্গনের জন্য উভয় বাহু বিস্তৃত করিয়া ডাকিলেন,—"প্রেয়সি!"

কিন্তু তাঁর সেই প্রেমোৎফুল্ল চিত্তের সাগ্রহ অভিনন্দনে দৃক্‌পাত পর্য্যন্ত না করিয়াই নর্ত্তকী রুদ্ধশ্বাসে কহিল, "রাজাধিরাজ যে মহাসামন্ত ও মহাকুমারদ্বয়ের সম্বন্ধে চিত্তোদ্বেগের উল্লেখ করলেন, এ কথার অর্থ

কি ?—কি ঘটেছে তাঁদের ?"—চন্দ্রকলার স্বরে গভীর আবেগ ও আশঙ্কা ধ্বনিত হইল।

রাজাধিরাজ তাঁর উন্মুখ আলিঙ্গন লাভেচ্ছুক ভুজদ্বয়কে প্রত্যবর্ত্তিত করিয়া বিরক্তিতে অধর দংশন করিলেন।

"শূরপাল ও রামপাল যে আমার জাত-শত্রু, এতো কোন নূতন তত্ত্ব নয়, চন্দ্রকলা !"

"মহাকুমার রামপাল আপনার সঙ্গে কবে কি শত্রুতা প্রকাশ করেছেন, রাজাধিরাজ ?"

রূপজীবিনীর স্বর অনুজ্জ্বাদৃঢ়।

রাজাধিরাজ এই প্রশ্নে ঈষৎ যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া কিন্তু তখনই আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "সুন্দরি! শত্রুতা প্রকাশ না করলেও যে শত্রুতা পোষণ করা যায়, এ কথা কি কোন মতে অস্বীকার করতে পার ? তা' ভিন্ন শত্রুতা প্রকাশেরই বা আর বাকি কি আছে, চন্দ্রকলা ? তুমি জানো কি, আজ সমুদয় পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনীয় প্রজাদের তাদের রাজার বিরুদ্ধে কে উত্তেজিত ক'রে তুলছে ? তুমি খবর রাখ কি, যে, রামপালের অধিনায়কত্বে যে বিদ্রোহী দলের সৃষ্টি হয়েছে, তারা প্রকাশ্য সভায় এসে আমার মুখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আমারই বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ উপস্থিত ক'রে আমারই কাছে বিচার চাইতেও কুণ্ঠাবোধ করে নি ? এ সব কথা তুমি শুনেছ কিছু ?"

চন্দ্রকলা নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া পর্য্যঙ্ক হইতে নামিয়া রাজাধিরাজের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তার অযত্নরক্ষিত অসম্বদ্ধ শিথিল কেশপাশ বন্ধনমুক্ত হইয়া বর্ষার ঘন মেঘজালের মতই তার পশ্চাদ্‌ভাগকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছিল। উহারই কয়েকটি ক্ষুদ্র গুচ্ছ শিথিলীভূতভাবে তাহার পূর্ণ বিকসিত শতদল

পদ্মের ন্যায় অপরূপ সুন্দর মুখের আশে পাশে গুঞ্জনরত লুব্ধ ভ্রমরের মতই ঘুরিয়া ফিরিতেছিল ও তেমনই সুশোভন দেখাইতেছিল। তার আয়ত বিশাল নেত্রে বিস্ময় ও ঈষৎ আশঙ্কার ছায়া মধ্যাহ্ন সূর্য্যে মেঘচ্ছায়াবৎ ক্ষণে ক্ষণে প্রস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল, উত্তেজনায় উন্নত বক্ষোবাস মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছিল। উদ্বেগাকুল কণ্ঠে সে উত্তর করিল, "এ সব সংবাদ নাগরিক ও নাগরিকা মাত্রেই শুনেছে, কিন্তু এর জন্য কেউই ত কই মহাকুমারদের দায়ী করচে না, রাজাধিরাজ? বরং এমনও শুনা গেছে যে, বিদ্রোহী দলের অধিনায়কত্ব নে'বার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ ও এমন কি, না নে'ওয়ার জন্য ধিক্কৃত হয়েও মহাকুমার রামপাল দেব একান্ত সুযোগ সত্ত্বেও আপনার বিরুদ্ধে তা' নিতে সম্মত হন নি। তাঁকে আপনার সমক্ষে অনর্থক শত্রুতার বশে এ রকম মসিবর্ণে চিত্রিত যে করেছে, সে ব্যক্তি— ক্ষমা করবেন রাজাধিরাজ!—সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী এবং ভণ্ড।"

চন্দ্রকলার দুই চক্ষু যাহা এত দিন কেবলমাত্র পুষ্পধন্বার ফুলশরের অধীনতায় পরিচালিত হইয়া দ্রষ্টার শরীরে প্রাণে পুলক শিহরণ দিয়াই বিঁধিয়া আসিয়াছে, তাহা আজ সহসা জ্বলন্ত অগ্নিবর্ষণ করিল, তার অসম্বদ্ধ বেশবাস উত্তেজনার দ্রুতশ্বাসে সমধিক স্খলিত হইয়া পড়িল, তার শারদ জ্যোৎস্নার মত সুগৌরমুখকান্তি অগ্নিতাপতপ্ত লোহিতাভা ধারণ করিল, গভীর উত্তেজনার বশে আত্মবিস্মৃতা ব্যাপিকা পুনশ্চ তীব্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "রামপাল দেবের সম্বন্ধে যে পামর এ সকল হেয় কুৎসা রচনা করেছে, আমার সাধ্য হ'লে তাকে শূলে দিই।"

"তবে এই দণ্ড তার নিজেরই প্রাপ্য! প্রকাশ্য রাজসভায় সহস্রের মাঝখানে সে নিজেই স্বীকার করেছে যে, সে রাজদ্রোহী।"

চন্দ্রকলার কণ্ঠ চিরিয়া একটা বিস্ময়ার্ত্ত রব নির্গত হইল, "মহাকুমার নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি রাজদ্রোহী?"

চন্দ্রকলার আহত পাণ্ডুর মুখের দিকে সাশ্চর্য্যে চাহিয়া রাজাধিরাজ গভীর বিস্ময়ে ডুবিয়া গিয়াছিলেন, এই সংবাদে তার এতটাই বিচলিত হওয়ার কারণ না পাইয়া ঈষৎ বিরক্ত স্বরে তিনি আশ্চর্য্যস্মিত মুখে সবিদ্রূপে উত্তর করিলেন, "এ কথা সভাসদ্‌মাত্রেই জ্ঞাত আছে, ইচ্ছা হয় সংবাদ নিতে পার,—তাদের ক'জনকে তোমার গৃহে পাঠিয়ে দেবো ?"

চন্দ্রকলা এ বিদ্রূপে কর্ণপাতও করে নাই, সে এই সংবাদের তীব্রতায় সহসা যেন কেমন অভিভূতাবৎ হইয়া গিয়াছিল। তার পর ধীরে ধীরে নিজের ছড়াইয়া পড়া চিত্তবৃত্তিকে কোনমতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল,—"*হয় ত আপনারই অবিচারের নিদারুণ অভিমানে এমন কথা তিনি* হঠাৎ রাগ ক'রেই ব'লে ফেলেছেন। রাজাধিরাজ! রাজাধিরাজ! যদি চন্দ্র সূর্য্য সত্য হয়, তবে মহাকুমার রামপালদেব রাজদ্রোহী নন। বিশ্বাস করতে পারবেন কি এ কথা ? কিন্তু এর চেয়ে সত্য কথা আমি আমার এই সমস্ত জীবন ধ'রে আর কখন বলিনি।"

রাজাধিরাজ এবার একান্তই সাশ্চর্য্য দৃষ্টিতে দুর্জ্জ্য রহস্যময়ী নারীর আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত স্থির গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রকৃতই বিস্ময়াপ্লুত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি ?—তুমি রামপালের সম্বন্ধে কি জানো যে, তাকে এত বড় জোরের সঙ্গে সমর্থন করচো ?"

চন্দ্রকলা এই প্রশ্নে সহসা বারেকের জন্য মাথা নত করিল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখে ঈষৎ লজ্জার একটা উত্তপ্ত আরক্ত আভা ক্ষণকালের জন্য ক্ষীণ আভায় বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সে ঈষৎ গুঞ্জন স্বরে মৃদু মৃদু উচ্চারণ করিল,—

"আমি জানি—আমি তাঁকে, তাঁর অন্তরের কথা—অন্তরের মধ্য থেকেই ভাল ক'রে জানি। তিনি মহৎ!—শুধু তাই নয়—তিনি মহত্তম!"

নৃপতির দুই চক্ষু একই মুহূর্ত্তে রুদ্রতেজে বিদ্যুতের শিখার ন্যায় জ্বলিয়া

উঠিল। কঠোর ঈর্ষার ঘন কালো ছায়া তাঁর গৌর মুখকে মেঘ-মেদুর বর্ষার আকাশের সহিতই সম তুলিত করিয়া তুলিল, সন্দেহকঠিন কণ্ঠে তিনি সবেগে বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি তাকে জানো? তাকে জানো? তার অন্তরের অন্তস্তলের সংবাদ জানো? এ কথার অর্থ কি চন্দ্রকলা? আমার সঙ্গে তুমি কি আজ রহস্য করচো?"

চন্দ্রকলা ক্ষণকাল বাঙ্‌ নিষ্পত্তি করিতে পারিল না, কর্ত্তব্য বিমূঢ়া হইয়া জড়পিণ্ডবৎ সে স্তব্ধ রহিল। তাহাকে বাক্য বিমুখী দেখিয়া রাজাধিরাজ যেন মনের মধ্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন, এবং সংযত ও স্বচ্ছন্দ স্বরে কথা কহিয়া বলিলেন,—"রামপাল আমার মহাশত্রু, একথা সর্ব্বজনবিদিত সত্য! সেই মহাশত্রুকে হাতে পেয়ে আমি যদি না ছাড়তে পেরে থাকি, কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিই আমায় তার জন্য দোষী করবে না। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা চাণক্য তাঁর নীতিশাস্ত্রে স্পষ্টই ব'লে গেছেন, শত্রুকে ছলে বলে বা কৌশলে ধ্বংস করবে!—এ নীতি আমার সৃষ্টি করা নয়,—কৌটিল্যের সর্ব্বজন বিদিত শাস্ত্রীয় রাজনীতি। রাজা আমি, তা' পালন করতে বাধ্য এবং তা' করবোও।"

চন্দ্রকলার সর্ব্বশরীর প্রবল কম্পনে কাঁপিয়া উঠিল। সে সহসা আত্ম-সংযম হারাইয়া ফেলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিল, "রাজাধিরাজ!"

"কেন প্রিয়ে? রামপালের সম্বন্ধে তোমায় আজ এতই অধীরা দেখছি কেন? যে আমার শত্রু—সে কি তোমারও পরম শত্রু নয়?"

চন্দ্রকলার শুষ্ক কণ্ঠ নীরব রহিয়া গেল।

রাজাধিরাজ বোধ করি তার মানসোদ্বেগ তাহারই মুখের উপর হইতে তীক্ষ্ণ নেত্রে পাঠ করিলেন, আবার তাঁর ঈষৎ প্রসন্ন মুখমণ্ডল মেঘাচ্ছন্নবৎ মসিময় দেখাইল। কথার উপরে উপরে ঈষৎ জোর দিয়া বলিলেন,

"আমার পরম শত্রু যে আজ আমার কর-কবলিত হয়েছে, এই আমার পক্ষে পরম লাভ। শূরপাল রামপালকে কষ্টাগারে রেখে এতদিনে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছি।"

চন্দ্রকলার মনে হইল, যেন সহসা তার পায়ের তলা হইতে কক্ষভূমি সরিয়া চলিয়া গিয়াছে, একটা প্রকাণ্ড গহ্বরের মধ্যে সে যেন পতনোন্মুখ! সত্য সত্যই সে বোধ করি পড়িয়া যাইতেছিল, রাজাই তাহাকে হাত বাড়াইয়া ধরিয়া ফেলিলেন।

"রাজাধিরাজ! এ কি সত্য? কুমার রামপাল আজ কারাগারে? দোহাই রাজাধিরাজ! এত বড় অধর্ম্ম, এত বড় অবিচার, এত বড় ভুল কর্ব্বেন না। আমি জানি, রামপাল আপনার শত্রু নন, আপনার পরেও তাঁর বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা নেই, বরং জ্যেষ্ঠত্ব হিসাবে তিনি আপনাকে যথেষ্ট সম্মানই করেন।"

"চন্দ্রকলা! তুমি আমার বিপক্ষের সপক্ষ হয়েই কি আজ আমায় সর্ব্বক্ষণ উপদেশ দেবে ব'লে স্থির করেছ? কুমার রামপাল তোমায় এর জন্য কোন্ বিশিষ্ট পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন শুনি?"

এই নির্ম্মম রাজ-পরিহাসে দৃক্‌পাত না করিয়াই অশ্রু আবিল নেত্রে নর্ত্তকী সকাতরে কহিল, "রাজাধিরাজ! আমি তাঁর জন্য যত না হোক্, আপনারই জন্য আপনাকে এই মহাপাপ থেকে নিবৃত্ত করতে চাইচি! নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ পুরুষশ্রেষ্ঠকে দণ্ডিত ক'রে ধর্ম্মে পতিত হবেন না। রামপালের মত হিতৈষী ও ভক্ত আপনার আর এক জনও কেউ কোথাও নেই, এর চেয়ে সত্য আর হয় না।"

"এ নূতন তত্ত্ব সহসা আজ কোথায় ব'সে শিক্ষা কর্‌লে রসিকা?"

"কোথায় শিখলেম? কোথায়?—তাঁরই পদপ্রান্তে তাঁর আপন মুখে শুনে! তাঁর পায়ের তলায় ব'সে এই মহাতত্ত্ব আবিষ্কার করেছি, রাজন্!

যে, কুমার রামপাল, নরদেহে দেবতা!—আর নিশ্চিন্ত জান্‌বেন, দেবতা কারও ক্ষতি করেন না।"

"চন্দ্রকলা!"

রাজাধিরাজের গূঢ় ব্যঙ্গভরা উজ্জ্বল মুখ সহসা শবশুভ্র হইয়া গেল, অত্যন্ত ক্রোধে তাঁহার বিবর্ণ অধর-ওষ্ঠ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বিলম্বে ও কষ্টে বাক্য সংগ্রহপূর্ব্বক তিনি সবেগে কহিলেন, "এতদূর স্পর্দ্ধা সেই নরাধমের যে, সে তোমার কাছেও অগ্রসর হয়ে আসতে ভরসা করে? আমার মনে আর তার জন্য এক বিন্দুও অনুতাপের লেশ বাকি রৈলো না।"

এ কথা শুনিয়া চন্দ্রকলা ত্রস্তে জিভ কাটিল।

"ছি ছি ছি রাজাধিরাজ! এ কি অসঙ্গত অন্যায় কল্পনা করেছেন! আপনি কি আমায় এতই সৌভাগ্যবতী মনে করেন যে, আমার এই পাপ গৃহে তাঁর মত দেবতার পদধূলিদানও সম্ভব বোধ করচেন?—"

রাজা ক্রোধারক্তনেত্রে কঠোর হৃদয়ভেদী দৃষ্টিতে চন্দ্রকলার সলজ্জ রক্তিম মুখের দিকে বারেক মাত্র চাহিয়া দেখিলেন। চন্দ্রকলা তখন আপন মনের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ রহিয়াই বলিতে লাগিল, "তা নয় রাজাধিরাজ! তা নয়! ততদূর সৌভাগ্য এই নটী জন্মে ঘটবার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না,—তাঁর গুণমুগ্ধা আমিই দুঃসাহসে নির্ভর ক'রে তাঁর কৃপাকণা লাভের আশায় তাঁরই গৃহে সে দিন রাত্রে অভিসারযাত্রা করেছিলেম; কিন্তু—"

রাজাধিরাজ প্রলয় বিষাণের ভীমনাদে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "বিশ্বাসঘাতিনী!"

চন্দ্রকলার কর্ণরন্ধ্রে বোধ করি বা সে গর্জ্জনধ্বনি প্রবিষ্টও হইল না। সে তখন যেন সকল সঙ্কোচমুক্ত হইয়া স্মৃতিসুখবিহ্বলতায় আত্মহারা হইয়া গিয়া হর্ষগদগদকণ্ঠে কহিতেছিল, "কিন্তু গিয়ে কি পেলেম?—কি পেলেম?

যা' চেয়েছিলেম, তার কণামাত্রও পেলেম না। পুরুষের কাছে যা' আমাদের চিরদিনের প্রাপ্য, তাই পেতেই ত লুব্ধ হয়ে—মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে ছুটেছিলেম। কিন্তু তার বদলে পেলেম, এ জীবনে যা চিরদিন স্বপ্নের অতীত ছিল,—সেই প্রত্যাখ্যান! শুদ্ধ সংযত ভাষায় সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যান! জানেন, রাজেন্দ্র!—এই রাজ-রাজেন্দ্র-বাঞ্ছিতা রূপসী-প্রধানা চন্দ্রকলা, নির্ল্লজ্জ, উপযাচিকা হয়ে তাঁর পায়ের তলায় তার সর্ব্বস্ব উজাড় ক'রে দিয়েও তার বদলে এতটুকু একটি সোহাগের বাণী শুনতে পেলে না! এ'কি আপনার বিশ্বাস হয়? শুধু শুনে এলো,—'ভদ্রে!'—নাগরী নয়,—প্রেয়সী নয়,—রূপসী নয় শুধু—মাত্র—নিরস, শুষ্ক—'ভদ্রে!' —'ভদ্রে! জ্যেষ্ঠের উপভোগ্যতায় তুমি আমার মাননীয়া'—শুনে এল,—'তুমি যেই হও, যাই হও, আমার সম্মানযোগ্যা'! আর—আর এক অদ্ভুত কথা শুনে এলো,—শুনে এলো যে 'একপত্নীব্রতী রামপালদেবের সে অস্পৃশ্যা!' কিন্তু এইতেই তার জীবন ধন্য হ'ল, পূর্ণ হ'ল রাজাধিরাজ! মানুষ, বিশেষতঃ পুরুষ মানুষ শুধুই,—মাপ কর্ব্বেন, আপনার মতই হয় না,—আপনার ভাইয়ের মতও হয়, এই দেখে মানুষের 'পরে, পুরুষের 'পরে আজ এই প্রথমবারই আমার মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়েছে। আর এই মানুষকেই এই মহাপুরুষকেই আপনি কিনা আপনার মহাশত্রু ব'লে ভয় পাচ্চেন? আশ্চর্য্য আপনার ভয় পাওয়াকে!—এ মানুষ কি কখন কারুর কোন ক্ষতি করতে পারে?—কখন না।"

তার কণ্ঠ সঘনে স্পন্দিত হইতেছিল, তার সমস্ত শরীর মন যেন একটা অননুভূত ভাবের বশে মুহুর্মুহু কদম্ব-কেশরের মত শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল, তাহার নটী-জীবনে এমন অপূর্ব্ব অনুভূতি সে যে আর কখন কোন দিনই লাভ করিতে পারে নাই! কিন্তু তার বর্ণিত এই অভিসার-কাহিনী যে রাজাধিরাজকে কি প্রকার উত্তেজিত ও ক্রোধ-ক্ষিপ্ত করিয়া

তুলিয়াছিল, আত্মবিস্মৃতিবশে সে তার কোন ধারণাও করিতে পারে নাই। অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বক্ষণেও লোকে যেমন কল্পনা করতে পারে না যে, সেই প্রচণ্ড অগ্নিশিখা এতক্ষণ বাহ্য-শুদ্ধ শ্যামায়মান গিরি-কোটরেই নিবদ্ধ ছিল, তেমনই অগ্নিগর্ভ গিরিশৃঙ্গের মতই বাহ্যস্থৈর্য্যের সহিত নৃপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামপালের গৃহে তোমার অভিসারযাত্রা কবে কার কথা, নায়িকা ?"

চন্দ্রকলা অকপটেই উত্তর করিল, "গত রাত্রে সেই তীর্থযাত্রা করেছিলেম রাজাধিরাজ।"

রাজা ইতঃপূর্ব্বেই ফিরিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন সেখান হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বজ্রপাতরবের মতই নির্ম্মম কঠোর হাস্যের সহিত উত্তর করিলেন,

"এই তবে তোমার শিরঃপীড়ার প্রকৃত নিদান ? উত্তম ! চন্দ্রকলা ! তোমার প্রেমপাত্র তীর্থ-দেবতা রামপালের ছিন্নশিরই এ রোগের একমাত্র প্রতিষেধক এবং শীঘ্রই তা' তুমি তোমার এই প্রত্যাখ্যাত রাজবন্ধুর নিকট হ'তে উপহার স্বরূপে লাভ করবে। আমিই এবার তোমার চিকিৎসা ভার গ্রহণ ক'রে রাজবৈদ্যকে তাঁর পণ্ডশ্রম হ'তে মুক্তি দিলেম। এখন তবে —বিদায় হচ্ছি, সখি !—আবার আমাদের একদিন দেখা হবে।"

চন্দ্রকলা গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া দ্বারাভিমুখে উল্কার মতই বেগে ছুটিয়া আসিল,—"রক্ষা কর ! রক্ষা কর ! রাজাধিরাজ ! রাজাধিরাজ !— আমার অপরাধে নির্দ্দোষীর প্রতি এ কি ভয়ঙ্কর দণ্ডবিধান ! উঃ, দয়া কর,—দয়া কর,—দয়া কর,—দয়া কর !" ——

একটা মায়া দয়া ক্ষমাহীন কঠোর উপহাসের বিকৃত উচ্চ হাসি মাত্র এই মর্ম্মাহত যন্ত্রণাপীড়িত আর্ত্তনাদের প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। রাজাধিরাজ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জন-সাধারণের যে সমিতি রাজ-অত্যাচারের প্রতিবিধানার্থ নায়ক খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল—ইহাদের মধ্যে প্রধান কয়জনকে রাজাজ্ঞায় মহা-প্রতিহার ধরিয়া লইয়া গিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন—তাহার অধিকাংশ তরুণ সদস্যই এ ঘটনায় ভীত হইয়া সঙ্ঘ হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল, কেহ কেহ বা রাজদণ্ড ভয়ে ভীত হইয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইল। তাহাদের মধ্যে আবার কাহারও কাহারও উদ্দেশ্যে রাজদণ্ডনায়ক গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন, ফলে দুই এক জন ধৃত হইয়া ফিরিয়া আসিল, দুই এক জন সুচতুর যুবক চরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নিরুদ্দিষ্ট হইয়াই রহিয়া গেল।

মহাসামন্তোপাধিক ভট্টারক সুরপাল দেবের ও মহাকুমার রামপাল দেবের কারাগৃহবাস সংবাদ রাজধানীতে গোপন ছিল না, মহামাত্যপুত্র বোধিদেবকেও যে রাজবন্দী হইতে হইয়াছে, ইহাও প্রকাশ্যে না হউক যত্র তত্র গোপনে আলোচিত হইতেছিল। মগধ ও তীরভুক্তি হইতে যে শীঘ্রই নূতন সৈন্যদল আসিতেছে এবং নগরের প্রতি তোরণে, রাজপ্রাসাদের দ্বারে দ্বারে, এবং রাজরক্ষী সৈন্যদলের মধ্যে যে বহুল পরিমাণে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিতেছে, তাহাও দেখিতে পাওয়া গেল। অতঃপর এই হইল যে, রাজ-অত্যাচার যেমন ছিল, তাহা ত রহিলই, উপরন্তু জন-সাধারণের সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতার যেটুকু বা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ঘুচিয়া গেল। এই রাজদ্রোহের অছিলায় এখন যে কোন গৃহে যে কোন সময়েই দণ্ডনায়ক বা মহাপ্রতিহারের প্রেরিত লোক সদলবলে আসিয়া গৃহ অনুসন্ধান ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে অনায়াসেই ধরিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হইল। এই উপলক্ষে কত গৃহ লুণ্ঠিত, কত তরুণ যুবক অবিচারে কারানিক্ষিপ্ত, এমন কি কত সুন্দরী কুলবধূ পর্য্যন্ত অপহৃতা হইয়া গেল। রাজদ্বারে বিচার প্রার্থনা করিতে

গেলে রাজদ্রোহী বলিয়া কারানিক্ষেপমাত্রই লাভ ঘটে, অথবা দেশ হইতে বিতাড়িত হইতে হয়। দেখিয়া শুনিয়া দেশবাসী নিরাশায় ও শঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিল এবং নিরুপায়ের যিনি উপায়—তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া দুঃখ নিবেদন করিতে লাগিল, প্রকাশ্যে কাহারও আর কোন প্রতীকার-চেষ্টার ভরসামাত্র রহিল না।

তথাপি সেই তরুণের দল একবারেই হাল ছাড়িয়া দিতে পারে নাই। তাহারা অতিশয় গোপনে কোন নির্জ্জন ভগ্ন দেউলে মধ্যরাত্রে একটা সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। সেখানে তাহারা নানাপ্রকার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ এবং আলোচনাদি করিত, গোপনে গোপনে অস্ত্র সংগ্রহও করা হইত। দিনের বেলা পরস্পরে অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করাই তাহাদের মধ্যে নিয়ম ছিল, অথবা এমন কি, সময় সময় কোন তুচ্ছ কারণ ধরিয়া তাহাদের মধ্যে রাজপথে বা প্রকাশ্য স্থলে বিবাদ বাধিতেও দেখা যাইত, এইরূপেই তাহারা নিজেদের অস্তিত্বকে গুপ্তচরদের, চৌরদ্ধরনিকদিগের তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ নেত্র হইতে গোপন রাখিত।

হরি-কৈবর্ত্ত এই দলে ঢুকিয়াছিল, তাই ইদানীং গভীর রাত্রে সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়, কোন দিন সন্ধ্যা হইতেই বাড়ী থাকে না, এই রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটিতে থাকায়, হরির স্ত্রী গৌরবী একদিন উজ্জ্বলার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। গৌরবী বলিল, "ভাসুর ঠাকুর বেঁচে থাকতে আমাদের মিন্‌সে যে এমন ক'রে অধঃপেতে হয়ে যাচ্ছে, তা' তেনা কি একবার চোক মেলে দেখবেও না? নিজের পড়াপাট আর তোকে নিয়েই মত্ত হয়ে রইলো, স্যাঙ্গাৎ স্যাঙ্গাৎ ক'রে যে অত টান ছিল; সে কি সবই একেবারে জলাঞ্জলি দিয়ে দিলে!"

হরি গ্রাম সম্পর্কে ভীমের ভাই হইলেও, দুজনে আজীবন ধরিয়া প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।

উজ্জ্বলা সেই রাত্রেই ভীমকে ধরিয়া বসিল, বলিল, "দেখ সেঙ্গাৎনী আজ আমায় নাহোক খুব লজ্জা দিয়েছে। তোমার স্যাঙ্গাৎ যে হরদিন রাত্তির বেলায় ঘর থেকে বার হয়ে যায়, তা হ্যাঁ গা! তুমি তার কেমন স্যাঙ্গাৎ যে একটু খোঁজও নাও না? ছুঁড়ী হাপুসুটি কাঁদতে লাগলো, কত দুঃক্ষু ক'রে বল্লে।"

ভীম বিস্মিত হইয়া বলিল, "কে' রাত্রে বাড়ী থাকে না? হরি?"

উজ্জ্বলা রাগ করিয়া উঠিল, "তা না তো কি তুমি? ওনার কথাই তো বলচি।"

ভীম ঈষৎ হাসিয়া উজ্জ্বলার উজ্জ্বল গণ্ড যুগলে আঙুল দিয়া একটা টোকা মারিল, উজ্জ্বলাও তাহাতে, "উঃ লাগে না বুঝি?"—বলিয়া উহার প্রতিশোধ লইল। ভীম তখন হাসিয়া তার আহত স্থান প্রগাঢ় স্নেহে চুম্বন করিয়া হাসিয়া কহিল, "বলি. এবারও আমার ধারটা রাখবে কেন? দাও বলচি, শীগগির শোধ ক'রে কিছু সুদও দিও।"

তার পর তাদের পরস্পরের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়া গেলে অবশেষে আবার সেই পূর্ব্বের আলোচ্য বিষয়টাই উঠিয়া পড়িল। উজ্জ্বলার দীপ্ত সুন্দর মুখখানির পানে পূর্ণনেত্রে চাহিয়া স্নেহকোমলকণ্ঠে তাহার স্বামী জিজ্ঞাসা করিল, "এইবার বল ত, বড় বৌর হরি কি করেচে? এইবার মন লাগিয়ে শুন্‌চি।"

উজ্জ্বলা গৌরবীর কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছিল, হরির বিরুদ্ধে সে সকলই জানাইল এবং বলা হইয়া গেলে পরিশেষে মন্তব্য প্রকাশ করিল, "এর আগে ত স্যাঙ্গাতের রাত-চরিত্তির এ ধরণের ছিল না! হঠাৎ এ রকমটা কেন হলো? আহা, স্যাঙ্গাৎনী আবাগী কেঁদে কেঁদে মরতে নেগেছে।"

তার পর ব্যগ্র হইয়া স্বামীর মুখের দিকে মিনতিভরাদৃষ্টি তুলিয়া ধরিল,

"তোমায় সে বড্ড মানে, তুমি ওকে এই রাত বেড়ান রোগ থেকে উদ্ধার কর গো, নৈলে বউটা আর প্রাণে বাঁচবে না।"

ভীম মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্পই হইয়াছিল, কিন্তু তা'ই বা সে হঠাৎ ফাঁস করিতে যাইবে কেন? কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে মুখ ভারী করিয়া সে গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "তুমি ত ব'লে চুকলে যে, 'রোগ থেকে উদ্ধার কর,' করা কি না খুব সোজা! যদি সে ব'লে বসে যে, ঘরে তার মন টেঁকে না, তোমার স্যাঙ্গাৎনীকে তার মনে ধরে না; কিসের টানে থাকবো? তা হ'লে কি জবাব দোব ব'লে দাও?"

উজ্জ্বলা এ কথায় বড়ই বিপন্ন বোধ করিল। হরির স্ত্রী দেখিতে তত সুশ্রী নহে, যদিও ইতঃপূর্ব্বে ইহাকেই হরি আর্ত্তি যত্ন করিয়া চলিত এবং তাহার চরিত্রগত কোন দোষের কথাও এ পর্য্যন্ত কথন শোনা যায় নাই; তবে মানুষের মন না মতি, তা বদলাইতে আর কতক্ষণ? তাই উজ্জ্বলা স্বামীর প্রশ্নে ও তাহার গাম্ভীর্য্যে ঈষৎ বিব্রত হইয়া পড়িল, কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন উপায় ঠাহর করিতে না পারায় উহারই শরণাগত হইয়া অবশেষে মিনতি করিয়া বলিল,—"হেঁই গো! তোমার পায়ে ধরি, তুমিই ভেবে চিন্তে এর কোন বিহিত ক'রে দাও, আমরা মেয়েমানুষ, তোমার মত কি পুঁথি পড়েছি, না বুদ্ধিই আছে কিছু? যা বল্লে ভাল হয়, তাই ব'লে দিও, এ কায তুমি ছাড়া আর কারু দ্বারায় হবে না। সে তোমার কথায় বাঁচে মরে।"

ভীম কহিল, "তাই জন্তেই ত ভাবছি বড় বৌ! সে যদি বলে যে, গৌরবীকে আমার মনে ধরে না, তাই বাড়ী থাকি নে, তা হ'লে আমায় ত একটা জবাব দিতে হবে। তা তুমি যথন অনুমতি দিচ্ছো যে, যা হোক ব'লে দিতে, তা হ'লে তাই না হয় বলা যাবে! সেও তা হ'লে খুসী হয়েই ঘরবাসী হবে।"

উজ্জলাও অন্তরে বাহিরে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিয়া সোৎসাহে কহিয়া উঠিল, "কি বলবে বল ত ?"

ভীম একটুখানি হাসি চাপিয়া ফেলিয়া চিন্তিত মুখে উত্তর করিল, "আমারটিকে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে আর কি ! তোমার যখন আদেশ হয়েছে যে, তার রাত বেড়ানো রোগ সারাতেই হবে, তখন তার আব্দারটাও শুনতে হবে ত। তা' আমার আর কি আছে ? এক এই সাত রাজার ধন মাণিকটুকু আছে, তাই সেইটি দিয়েই ওকে ভুলুতে হবে আর কি ! তা' হ'লে আর পাঁচ দরজায় ভিখ মাঙ্গতেই বা যাবে কেন ?"

উজ্জলা এইবার স্বামীর দুষ্টমীর কথা ধরিতে পারিল। সেও তখন হাস্য স্মিত নেত্রে অথচ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যযুক্ত মুখে স্বামীকে জবাব দিল, "গৌরবীর সঙ্গে যে পেরথমে তোমারই বিয়ের কথা হয়, সে দুঃখুটা যখন এখনও মন থেকে যায় নি, তখন না হয় দিন কতক বদল করেই দেখ। আমি তো এখন তোমার আর দরকারে লাগছিনে, পচা পুরানো ন্যেক্‌ড়া-কেলে হয়ে গেছি। যাকে তাকে বিলুতে পারলেই তুমি বেঁচে যাও।"

কথাটা যদিও রহস্যের মধ্য দিয়াই আরম্ভ হইয়াছিল, অথচ ইহার শেষের দিকটাতে হঠাৎ অকারণেই উজ্জলার বুকটা যেন কেমন একটু ভারী হইয়া উঠিল এবং তাহার কণ্ঠ দিয়া ঈষৎ একটা নিশ্বাস একটু দীর্ঘ হইয়া উত্থিত হইল। এর পর দেখিতে দেখিতে তার বড় কালো চোখ দুইটি বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া ভীম দারুণ অপ্রতিভ হইয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গে সে নিজেও যেন ঐ অভিমান বাক্য কয়টিতে তাহার অন্তরের মধ্যে একটা ব্যথা বোধ করিল। সেই যে জীবনের মধ্যে একটি দিন —সে তার দুর্ম্মুখী মাতার বাক্যে আহত হইয়া তাহার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারই লজ্জাকর দুষ্ট স্মৃতি তার চিত্তকে সময়ে অসময়ে যথেষ্ট পীড়িত করিয়া তুলিতে ছাড়ে না। আবার তাহারই সহিত

সংযুক্ত আরও একটা ঘটনার স্মৃতি তার সবল চিত্তকে যখন তখনই ঈর্ষা-দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। সে দিন যদি সে ঠিক সেই সময়ে সেখানে না গিয়া পৌঁছিত, তবে তাহার ভাগ্যে না জানি সে দিনে কি ঘটনাই ঘটিয়া যাইত! গভীর উচ্ছ্বাসে সে উজ্জ্বলাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহাকে দৃঢ়বলে চাপিয়া ধরিল, উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "উজ্জ্বলা! মাপ কর আমায়। ঠাট্টা করেও এমন কথা আমার মুখ থেকে কি ক'রে বেরুলো? না না, তুই আমার জীবন মরণের সাথী, আমার সর্ব্বস্ব, আমার বল বুদ্ধি ভরসা। তোকে আমি যমকেও দিতে পারবো না, তা মানুষকে!"

উজ্জ্বলা বড় সুখে বড় গৌরবেই তার একনিষ্ঠ পত্নী-প্রেমিক স্বামীর বিশাল বক্ষে তার সুখ-শিথিল মস্তক এলাইয়া দিয়া আবেশ মুদিতনেত্রে মনে মনে পুনঃ পুনঃই বলিল, "ওগো, তোমার বুকে মাথা রেখে এখনই যদি আমার মরণ আসে, তাতেও আমার দুক্ষু নেই, শুধু তোমায় যেন আমি রেখে মরি।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নিন্দুকের রসনা ও আগুনের শিখা কখনই এক স্থানে স্থির থাকে না, বায়ুবেগে সে চারিদিকে প্রসৃত হয় ও যাহা কিছু পায়, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া ধ্বংস করে। অনতিক্রান্ত যৌবন সুস্থকায় যুবক হরি যখন প্রতি সন্ধ্যায় ও বিশেষ করিয়া রাত্রেও অনুপস্থিত থাকিতে আরম্ভ করিল, তখন প্রথমে কানাঘুষা ও পরে প্রবলভাবেই তাহার সম্বন্ধে কুৎসাজাল রটিয়া উঠিতে লাগিল। কেহ কেহ এমন কথাও শুনাইল যে, তাহারা কোন এক বারবনিতার দ্বারদেশে পৈষ্টী পানে বিহ্বলপ্রায় হরিকে পড়িয়া

থাকিতে দেখিয়াছে, কেহ বা বলিল, ইহা সে দেখে নাই বটে, তবে গণিকা মহাসেনার একটা পরিচারিকার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া সে সে দিন বিপণীর পথে চলিতেছিল, উহাকে দেখিয়াই ছুটিয়া পলাইয়া গেল। ধর্ম্মঠ আসিয়া দিব্যোকের সাক্ষাতেই ভীমের কাছে কাঁদিয়া পড়িল বলিল, "বাপা! তুই থাকৃতে তোর স্যাঙ্গাতের এমন কুরীতটা ঘটলো, আর তুই তার কিচ্ছুটি করলি নে'? ছোঁড়াটাকে অধঃপাতে যেতে দিলি?"

ভীম যদিও চারিদিক্ হইতেই তাহার প্রিয় সখার এই সব কুৎসাকাহিনী শুনিতেছিল, কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও সে যেন ইহা অন্তরের মধ্য হইতে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। হরিকে সে যে তাহার জন্ম-মুহূর্ত্ত হইতেই ভাল করিয়া জানে, লোকে উপহাস করিয়া বলিত, 'ও তো ভীমের ছায়া!'—তাদের মধ্যে কোন দিনই তো কোন কথা গোপন ছিল না,—সেই হরি আজ তাহাকে এতখানি দূরে সরাইয়া দিয়াছে!

একদিন এই কথা সে উত্থাপন করিল। তার অভিমান-গূঢ় অভিযোগে হরি প্রথমটা শুদ্ধ হইয়া রহিল। তার পর যখন ভীম পুনঃ ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, "আমি জানূতুম, আমাদের মধ্যে কারু কাছে কারু কোন কিছু লুকোবার নেই, কিন্তু এদ্দিনে সে বিশ্বাসটা যা হোক ঘুচলো!"

তখন সেই নিগূঢ় অভিমানাহত চিত্তের গভীর বেদনা অনুভব করিয়া হরি আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে ম্লানহাস্যের সহিত উত্তর দিল, "তোর কি মনে হয়, আমি একেবারেই অধঃপাতে গিয়েছি, ভীম?"

ভীমও সেইরূপ ভাবে হাসিয়া কহিল, "কি জানি ভাই! প্রমাণ তো তাই পাওয়া যাচ্চে!"

হরি এ উত্তরে ঈষৎ আহত হইল, "আমায় কি তুই চিনিস্ নে?"

ভীম কহিল, "কই আর চিনি? অধঃই হোক, আর উর্দ্ধই হোক,

একটা নূতন পথ যে তুমি নিয়েছ, এটা তো ঠিক? আর সেটা আমার অচেনা।"

হরি এবার লজ্জা পাইল। ক্ষণকাল নীরবে কি চিন্তা করিয়া পরিশেষে কহিল, "বেশ, তবে তাই হবে! এ পথের সঙ্গে তুমিও তাহলে আজ থেকে পরিচিত হও।"

রাত্রিকালে হরি আসিয়া চুপিচুপি ভীমকে ডাকিল। "এস বন্ধু! আমার নূতন পথের পথিক হবে ত এস।"

ভীম তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া বাহির হইল। রাজমার্গ তখন প্রায় জনহীন, বিশাল নগরী তন্দ্রাচ্ছন্ন ও প্রায় নিস্তব্ধ। তবে তাহার ইতস্তত: কোথাও কোন গৃহে উৎসবের হাসি বাঁশী নীরব হয় নাই, অন্যত্র শোকের বিলাপ শ্রুত হইতেছে। কোন দেবায়তন মধ্য হইতে সাধ্যায় নিরত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর কণ্ঠনিঃসৃত শাস্ত্রপাঠ ধ্বনি শুনা যাইতেছিল, মহাবিহারে প্রজ্ঞা পারমিতার প্রচার তখনও বন্ধ হয় নাই, আবার এদিকে বারনারীদের পান-প্রমত্ত সঙ্গীত ধ্বনিও ক্বচিৎ শ্রুত হইতেছে। কিছুদূর আসিয়া ভীম মৃদুস্বরে হরিকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্চো?"

হরি কহিল, "নিশ্চয়ই কোন মন্দ জায়গায় নয়।"

ভীম হাসিয়া কহিল "তা' আমি জানি, তবু?"

"এত অধৈর্য্য কেন?" বলিয়া হরি ভীমের কাঁধ ধরিয়া একটা নাড়া দিল।

সমিতির সভ্যসংখ্যা এ দিন প্রায় দ্বিশতাধিক হইয়াছিল। হরি পূর্ব্বেই ভীমের কথা ইহাদের বলিয়া রাখায় তাহাকে দেখিয়া কেহই বিস্মিত হইল না, বরং সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভীমের পরিচিত, তাহারা অনেকেই বলিল যে, "আমরা তোমায় আমাদের মধ্যে পাবার জন্যে কি কম উৎসুক ছিলেম! শুধু ঐ হরিটাই ক্রমাগত

বাধা দিয়েছে! আমরা বরাবরই জান্‌তেম, ভীমের শরীরে বলের মতন মনের বলেরও অভাব নেই।"

এক জন বলিল, "যখন কুমার রামপাল আমাদের প্রত্যাখ্যান কর্‌লেন, তখন আমরা যদি আভিজাত্যের পূজা ছেড়ে দিয়ে ভীমের কথা মনে করতে পারতেম, তা হ'লে হয় ত বা আমাদের অত বড় সঙ্ঘটাই নষ্ট হয়ে যেত না।"

কেহ বলিল, "তা' যা হয়ে গেছে, সে তো এখন আর ফিরবে না, এখন আমাদের মধ্যে ওঁকে পেয়ে আমরা অনেকটাই সবল হ'তে পারলেম, তাতে সন্দেহ নেই।"

ফিরিবার পথে দুজনেই বহুক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করিতেছিল, কিন্তু তাহাদের সেই বাহ্য নীরবতার অভ্যন্তরে গভীরতর চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা যদি কেহ সে সময়ে তাহাদের মুখের দিকে চাহিত, তবে তাহার বুঝিতে বাকি থাকিত না। দুইজনেরই চিত্ত খুবই সম্ভব একই বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছিল।

কিছুদূর আসিবার পর এতক্ষণকার সেই গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ভীমই প্রথম কথা কহিল; সে বলিল, "হরি! এ সব কথা এতদিন আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিলে কেন?"

এ প্রশ্ন যে উঠিবে, হরিও তাহা জানিত এবং সেইজন্যই ইহার উত্তরও সে প্রস্তুত রাখিয়াছিল, সে তাই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল, "দিব্য-জ্যেঠা রাজার দয়ায় নূতন ক'রে জমাজমি ফেরৎ পেয়েচে, রাজা তোমাদের 'পরে অনুগ্রহ করছে, তোমরা যদি তার ক্ষতি করতে না চাও, তাই ভরসা হয় নি।"

হরির এই সরল ও স্পষ্ট বাক্যে ভীম মনের মধ্যে আহত এবং বোধ করি কিছু লজ্জিতও হইয়াছিল, তার আশৈশব সখার এই সামান্য ইঙ্গিতটুকু তার আত্মমর্য্যাদাকে একটুখানি নির্দ্দয়তার সঙ্গেই আহত

করিল। একটু শুষ্কভাবে সে উত্তর করিল, "জ্যেঠার মধ্যে বরাবরই রাজভক্তির একটা প্রাবল্য আছে স্বীকার করি, কিন্তু আমায় কবে রাজার এতটাই ভক্ত দেখলে যে, এত বড় অবিচার ক'রে বস্‌লে ?"

হরি এবার ফিরিয়া লজ্জা পাইল। সে অপ্রতিভ হইয়া মৃদুভাবে কহিল, "মাপ করিস্ ভাই! অত্যাচারী রাজার উচ্ছেদ আমরা চাই, পাছে তুই বাধা দিস্, এই মিথ্যে সন্দেহে আমি তোকে বলতে পারি নি। ভুল করেছিলুম স্বীকার করচি।"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভীম কহিল, "তবে কথা এই যে, রাজার উচ্ছেদই যে ঠিক আমার কাম্য তাও নয়। অত্যাচারেরই উচ্ছেদ আমি কামনা করি।"

হরি বলিল, "কিন্তু সেটা কি সম্ভব, ভীম ? জড় না মারলে কি গাছ মরে ?"

ভীম কহিল, "ডাল করে ছেঁটে কেটে রাখতে পারলে, গাছ না মারিয়েও ফল হওয়া বন্ধ করা যায় ত ?"

হরি হাসিয়া ফেলিল, "ঐ দেখ! রাজভক্তি তোদের হাড়ের মধ্যে বাসা ক'রে আছে! ও যাবার নয়।"

ভীমও হাসিল, যুক্তিপূর্ণ মৃদু গম্ভীর হাসি হাসিয়া কহিল, "ভক্তি যে খুবই আছে, তা' নয় হরি! তবে কথাটা কি জানো,—পালবংশ একটা মস্ত বংশ, এর অনেক রাজাই খুব বড় ও ভাল ছিল, একটা কুলাঙ্গার জন্মেছে বলেই যে চিরদিনের সব কৃতজ্ঞতা সব্বাইকার ফুরিয়ে দিতে হবে, তার মানে কি ? দেখা যাক্, যদি অত্যাচার বন্ধ করতে পারা যায়, তা হ'লেই অত্যাচারী ত আর সে থাকলো না ? অবশ্য যদি মহাকুমার রামপাল অমন ভীরু না হতো, তা হ'লে সে স্বতন্ত্র কথা ছিল। অরাজকতাও ত ভাল নয়। রাজবংশে আর উপযুক্ত লোক কই ?"

হরি কহিল, "কেন শূরপাল ?"

ভীম অবজ্ঞার সহিত উত্তর করিল, "ওই ভাবেরই ভাই ত! তাঁরও যদি ভরসায় না কুলায়? যদি ওরা যথার্থ শক্তিমান্ হতো, তা হ'লে কি আর রাজাজ্ঞা পাওয়া মাত্র অমন ভাল ছেলের মতন সুড় সুড় ক'রে কষ্টাগারে গিয়ে ঢুকে পড়ে? আত্মরক্ষার চেষ্টাটিও কি করে না? আরে ছ্যাঃ! 'এক ভস্ম, আর ছার, দোষগুণ ক'ব কার'!"

উজ্জ্বলা জাগিয়া ছিল, স্বামীকে দেখিয়াই উঠিয়া বসিল, কিন্তু কেন এত রাত হইল, সে সম্বন্ধে প্রশ্নমাত্র তুলিল না। ভীম এতক্ষণ আশা করিতেছিল যে, হয় ত উজ্জ্বলা এই লইয়া ঘোর অভিমান করিয়া আছে এবং তাহাকে হয় ত তার জন্য অনেকটাই বিপন্ন হইতে হইবে, এখনও সে উহার নীরবতাকে মৌন অভিমানই আন্দাজ করিয়া আর একটু জ্বালাইয়া লইবার লোভে সকৌতুকে কহিল, "তুমি বুঝি এখনও জেগে আছ? আমি কোথায় ভাবলাম যে, চুপি চুপি এসে শুয়ে পড়বো, নাঃ তোমার চোখে ধূলোটি দেবার যো নেই।"

উজ্জ্বলা হাসিমুখে উঠিয়া আসিল,—"ধূলো দিলেই কি সবার চোখে ধূলো লাগে গো?"

"বড়বৌ! এত রাত অবধি কোথায় ছিলাম, কই জান্তে চাইলে না ত?"

স্বামীর প্রশ্নে স্ত্রী তার কাঁধের উপর মাথাটা এলাইয়া দিয়া প্রেম প্রসন্ন দৃষ্টিতে মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল, "কেন চাইবো? আমার কি তেমনই সোয়ামী যে, একদণ্ড চোখ ছাড়া হ'লেই মনের মধ্যে ধুক্ ধুক্ করতে থাকবে যে, ঐ বুঝি কোন্ ডাইনী মাগী তাকে কেড়ে নিলে?"

"তোর ত বুকের পাটাখানা খুব শক্ত রে! তবে তোদের ঐ গৌরবী চুঁড়ী অমন ক'রে কেঁদে কেটে মরে কেন?"

"ওঃ, কিসে আর কিসে! তোমার সাথে, আর তার সাথে?"—বলিয়া স্বামী-গৌরবে-গৌরবিনী উজ্জ্বলা সুখোজ্জ্বল হাসিমুখে মুখ তুলিয়া স্বামীর উৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিল।

ভীম গভীর প্রেমে তাহাকে প্রগাঢ় চুম্বন করিল, "ঈস্, ওঁর স্বামীটিই যেন রাজ্যিশুদ্ধু সব্বার চাইতে ভাল!"

তাহার পর ঈষৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, "উজ্জ্বলা! গৌরবীকে বলিস্ হরিকে সে চেনে না, তাই এ নিয়ে হাঙ্গামা করছে। বলিস্ আমি বলেছি, সে যা ভাবছে, সে সব কিছু নয়। কোন কাযের দরকারে তাকে রাতের বেলায় বাইরে যেতে আসতে হয়, আরও বলিস্, আমিও আজ তার সঙ্গে ছিলুম, যদি আমায় ভরসা থাকে, তবে সে কুকথাগুলোকে যেন মন থেকে বিদায় করে দেয়।"

উজ্জ্বলা দ্বিধাহীন আনন্দে সাগ্রহে সম্মতি জানাইল, বলিল,—"তুমি যখন বল্চ, তখন নিশ্চয়ই সে প্রত্যয় যাবে, তোমায় ওরা ঠাকুর ব'লে মনে করে যে গো!"

ভীম, পুনশ্চ কণ্ঠলগ্না, বক্ষলীনা পত্নীকে আদর করিয়া হাসিয়া কহিল, "ওরা না তুই? তবু যদি তোর স্বামী একটা চাষাভূষো না হয়ে রাজা মহারাজা হতো, তা হ'লে তুই বোধ করি আমাকে মাটীর গায়ে আর পা ফেল্‌তিস্ নে! না?"

উজ্জ্বলা তার ছোট্ট নথটাকে ভীষণভাবে মুখশুদ্ধ ঘুরাইয়া একটা কিল দেখাইয়া মুখ ভেঙচাইয়া জবাব দিল,—

"নাঃ, মাটীর গায়ে পা ফেল্‌তো না! আকাশে উড়ে যেত! কেন, আমার স্বোয়ামীর উপরে তোমার অত হিংসে কেন বল তো শুনি? আমার এই রাজা, এই মহারাজা, এই আমার সব গো সব! আমার মতন ভাগ্যি ক'জনার হয়!"—এই বলিয়াই সে শ্রদ্ধায়, প্রেমে পরিপূর্ণ

হইয়া স্বামীর পায়ের ধূলি লইয়া সীমন্তে রাখিল। আবার বলিল, "এই পায়ে যেন জন্ম জন্ম মতি রেখে আমি মরতে পারি, এই টুকুন্ আশীর্ব্বাদ করো গো, আর কিচ্ছুই আমি চাই নি গো, আর কিচ্ছু না।"—

আবেগে রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া ভীম গাঢ় স্বরে উত্তর করিল, "তাই হোক, উজ্জ্বলা! আমরা যেন দু'জনেই দু'জনের উপর এমনই ভালবাসা নিয়ে মরতে পারি, শিব-ভবানী এই করুন! আর দু'জনে যেন একসঙ্গে মরতে পারি, কারুকে ছেড়ে যেন কারুকে বেঁচে থাকতে না হয়।"

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যে নদীতে জল বেশী, সেই নদীতেই নৌকা চলে, তার [illegible]রের গভীরতাই তাকে পার হইবার সাহায্য করে, কিন্তু পারের তরণী না হইলে আবার সেই গভীরতাই তার পক্ষে দুস্তর হইয়া দাঁড়ায়।

চন্দ্রকলার অন্তরে অন্তরে যে ভীষণ পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়া গিয়াছিল, তাহার উদ্দাম প্রভাবে তাহাকে একবারেই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া আবার নূতন করিয়া গঠিত করিয়াছে। রূপ-জীবিনী নর্ত্তকী হইলেও অন্তরের গভীরতা তার সামান্তার মতই হয় ত ছিল না, তাই সে দিনের শুভলগ্নে তার শুভগ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তার চিরতৃষিত অন্তরে অকস্মাৎ স্বর্গীয় পীযুষধারাবৎ পবিত্র প্রেমের প্রবাহ বন্যাধারার মতই প্রবাহিত করিয়া দিয়া তার সকল পঙ্কিল আবিলতাকে কোন্ সুদূর মহা পারাবারে ভাসাইয়া লইয়া গেল, তার অন্তরের প্রবলতাই তাকে মুক্তি-পথের নিশানা দেখাইয়া দিল, মানব প্রেমের ক্ষুদ্রাভিলাষকে সে দেবতার প্রেমের মত করিয়াই

নির্ব্বিচারে নিজের মাথায় তুলিয়া ধরিল, সে প্রেমে আর বাসনা কামনার মোহ-গন্ধ কোথাও বাকি রাখিল না, শুধু পূজা, শুধু ধ্যান, শুধু ধারণা।

কিন্তু ভাগ্য তার সহসা এ সুখেও তাহাকে বাধার দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত পাঠাইয়া দিল। এতটাই যে ঘটিতে পারে, এ যেন তার কল্পনার মধ্যেও ছিল না! তার প্রতি রাজাধিরাজের অতি-প্রণয়ের অনেক নিদর্শনই সে পাইয়াছে বটে, তবে সে যে এতটাই, এ কথা সে কোন দিনই হিসাব ধরিয়া গণিয়া দেখে নাই। এতটা যদি তার জানা থাকিত, তবে রামপাল সম্বন্ধীয় নিজের মনোভাবকে সে হয় ত তাঁর কাছে গোপন চেষ্টাই করিত, কিন্তু এখন?—বৃথাই এ অনুশোচনা! নিজের হাতে,—হউক—তাহা সে নিজেরও অজ্ঞাতে—যে আগুন একবার ঘরের চালের উপরে খেলাচ্ছলেও দিয়া ফেলিয়াছে, তাহাকে আর ফিরাইয়া লইবার উপায় তার হাতের মধ্যে নাই; সেই স্বহস্ত প্রদত্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তার সর্ব্বস্ব গ্রাস না করিয়া আর ত ছাড়িবে না। বড় বেশী দয়া করে ত, না হয় তাহাকেও তার ক্ষুধিত জঠরমধ্যে একটুখানি স্থান কৃপা করিয়া দিলেও দিতে পারে, এই পর্য্যন্তই!

চন্দ্রকলার সর্ব্বশরীর সহসা শীতল কঠিন ভারাক্রান্ত হিম শিলায় জমিয়া উঠিল। উঃ, কি রাক্ষসী সে! তার লোলুপ, লুব্ধ দৃষ্টির শিকার হইয়াই,—নগণ্য ক্ষুদ্র মৃগ নহে, পরন্তু যে মত্ত যূথপতি গজরাজ আজ সামান্য শশরূপেই আততায়ির শরাঘাতে জর্জ্জরীভূত হইয়া আছে, তাকে তুচ্ছতম ভাবে তার এই অত বড় মহৎ জীবনকে সমাধা করিতে হইবে, আর এ শুধু তাহারই জন্য? এ শুধু তাহারই লোভের ফল,—তাহারই উদ্দাম মোহের প্রায়শ্চিত্ত, হা সুগত! হা সর্ব্বোত্তম! এই কি তোমার অহিংসা-নীতির চরম ফল? পশুবধ যাদের নিষিদ্ধ, তাদের ক্ষুদ্র ঈর্ষার জ্বালায় মানুষকেই সামান্য পতঙ্গের মত ভস্ম হইতে হয়? হা সুগত! কোথায় তুমি? কোথায়

তোমার সেই অহিংসার মহাবাণী ? একবার এ সময়ে এই চণ্ড-নীতি পরায়ণ দুর্দ্দান্ত রাজ-রাক্ষসের কঠোরচিত্তে উহা বিবেক-বাণীরূপে প্রের করিয়া ইহাকে এত বড় একটা ভয়াবহ কাণ্ড হইতে নিবৃত্ত করিয়া দাও দাও প্রভু !—দাও—দাও !

ধরালিঙ্গনে পতিত থাকিয়া চন্দ্রকলার মনে হইতে লাগিল—তা চারিপাশ ঘিরিয়া সারা পৃথিবী জুড়িয়া যেন একটা যন্ত্রণার্ত্ত হাহার উঠিয়াছে। সেই অতীন্দ্রিয় মর্ম্মজ্বালাভরা ভীষণ আর্ত্তনাদে তার সমং শরীরের রক্ত মাংস ভেদ করিয়া তার অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত যেন কাঁপিয় উঠিল। অনুতাপের তীব্র তিরস্কার যেন কাঁটার চাবুকের মতই তাহাবে কাটিয়া, বিঁধিয়া, ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। সেই অসহ যন্ত্রণায় তার বুকের পাঁজরাগুলা এক একখানা করিয়া খসিয়া পড়িবা মত হইল, তার মনে হইল, পৃথিবীতে আর যেন কোনখানে কিছু নাই ;— সুখ নাই, শান্তি নাই, মুখ লুকাইয়া থাকিবার মত এতটুকু একটু রন্ধ্র পর্য্যন্ত নাই,—আছে শুধু প্রায়শ্চিত্ত ! আছে শুধু প্রতিশোধ ! ওজনের তুলাদণ্ডে মাপ করিয়া একবারে মাপে মাপ করা অমোঘ প্রতিশোধ,—আর কিছু নাই, আর কিছু নাই—

উঃ ! কি ভীষণ স্থান এই পৃথিবীটা ! এখানের এতটুকু পাপ কি কোনমতেই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পায় না ? আর সে ফলও কি এতই শীঘ্র ফলিয়া উঠে ?

অসহ্য ব্যথা যেন গুরুভার মন্দারপর্ব্বতের মতই নর্ত্তকীর আনন্দ চপল চিত্তের উপর এমনই করিয়া যখন চাপিয়া বসিয়া তার শ্বাসরোধ করিয়া দিবার উপক্রম করিতেছিল, তখন কোথা হইতে একটা অসংবরণীয় অশ্রুর প্রবাহ উদ্দামবেগে ছুটিয়া আসিয়া, সেই অনিশ্বসিত আর্ত্ততা হইতে তাহাকে যেন কথঞ্চিৎ রক্ষা করিল। ধরালিঙ্গনে লুণ্ঠিতা হইয়া চিরবিলাসিনী

চন্দ্রকলা অসহায় তপ্ত অশ্রুর নির্ঝর ধারা কঠিন বসুধা বক্ষে সৃষ্টি করিয়া দিল, কিন্তু তথাপি নিজেকে সে শান্ত করিতে পারিল না। তবে এই অজস্র অশ্রুধারা তাহাকে জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাওয়া হইতে কতকটা রক্ষা করিল, তাই চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে গলবস্ত্রে দীন ও আর্ত্তনেত্রে উর্দ্ধে চাহিয়া সে বারংবার—বারে বারে এই বলিয়া তার অসীম অব্যক্ত ব্যথাকে ব্যক্ত করিতে লাগিল,—"হে সুগত! হে আর্ত্তজনত্রাতা! হে শাস্তা! হে দীনবন্ধু!—তোমার দয়া হ'লে কি না ঘটে! অন্ধ চক্ষুষ্মান্ হয়, পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করে, মূক বাচাল হয়,—সেই কৃপাকণা বর্ষণে তুমিই মহাকুমারকে বিপন্মুক্ত করে দাও।—আমার যাবতীয় ধন রত্ন সুবর্ণ দিয়ে আমি তোমার সুবর্ণময় মূর্ত্তির সহিত বিহার প্রতিষ্ঠা করে দেবো।—আজন্মের মত সকল আশা বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার দ্বারে শ্রাবিকা ব্রত অবলম্বন করবো, আমার ধন প্রাণ সবই তোমার চরণে উৎসর্গ করলেম!"

এমন করিয়া দিনের পর দিন চলিয়া গেল, অনাহারে অনিদ্রায় ঘোরতর দুশ্চিন্তায় দেখিতে দেখিতে অপরূপ লাবণ্যময়ী তরুণী চন্দ্রকলা তার এই পরিপূর্ণ নব-যৌবনেই যেন জরা-জর্জ্জরিতা বৃদ্ধার মতই হতশ্রী হইয়া পড়িল, অথচ দিন রাত্রি ভাবিয়া ভাবিয়াও সে কোন উপায় বা উপায়ান্তরের সন্ধান করিতে পারিল না। একদিন সাহসে বুক বাঁধিয়া রাজাধিরাজের বিলাস-গৃহে সে ব্যাপিকা অভিসার করিয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাজাধিরাজ গৃহে ছিলেন না; তিনি নদী-পরপারের নববিরচিত কানন-গৃহে বিলাস-রাত্রি যাপন করিতে গিয়াছিলেন, পরদিন গিয়াও সে রাজদর্শন লাভ করিতে পারিল না, রাজা অনুপস্থিত। পত্র লিখিয়া উত্তর পাইল,—

"যাহার প্রেমে আত্মবিস্মৃতা হইয়া আমার প্রেমের অবমাননা করিয়াছ,

আমার সেই চিরশত্রুর সম্পূর্ণ উচ্ছেদের পর আমাদের পুনঃ সাক্ষাৎ ঘটিবে। ইতিমধ্যে নহে। এক্ষণে ধৈর্য্য ধরিয়া সে শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিও।"

এই নিষ্ঠুর পত্র পাইবার পর শেষ আশা সূত্রটুকুকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া এইবারে সম্পূর্ণ আশাহীনা হইয়া চন্দ্রকলা নিজেকে একেবারে দৃঢ়সঙ্কল্পে কঠিন করিয়া লইল। এইবার সে মুমূর্ষুর শেষ চেষ্টার ন্যায় তার প্রচণ্ড দুঃসাহসকে একমাত্র সহায় করিয়া লইয়া, নিঃশঙ্ক স্থিরচিত্তে একটা মেঘান্ধকার গভীর রাত্রে একা অরক্ষিতভাবে গৃহত্যাগ করিল। অভিসারিকার সজ্জিত সুন্দর বেশকে সে পূর্ব্বেই ছাড়িয়াছিল, এক্ষণে এক খণ্ড চীরবাসমাত্র ধারণ করিল, কিন্তু সঙ্গে লইল, তার ঐশ্বর্য্যের সারভূত অমূল্য মণিমাণিক্যখচিত, পেটিকাবদ্ধ অলঙ্কারের রাশি। রাজাধিরাজ প্রদত্ত এই সেদিনকার পাওয়া লক্ষ সুবর্ণ নিষ্ক মূল্যে ক্রীত ভারত-রত্নের সারভূত গজমতিহারটিকেও সে ফেলিয়া গেল না।

নগর তোরণের দক্ষিণ-পূর্ব্বে নির্জ্জন নিভৃত এক ক্ষুদ্র কৃত্রিম শৈল-সানুদেশে কষ্টাগার নামধেয় নির্জ্জন কারাগৃহে গগনস্পর্শী প্রাচীরের দিকে চাহিয়াই চন্দ্রকলার সকল আশা তার ভয়ার্ত্ত অন্তরের মধ্যেই বিলীন হইয়া আসিল। এই দুর্ল্লঙ্ঘ্য ও অভেদ্য পাষাণ প্রাকারের অভ্যন্তরে কোথায় কোন্ নিভৃত গহ্বরে সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজবন্দী জনশূন্য—হয় ত শব্দশূন্য পাতালগর্ভের আর্দ্র কঠিন অন্ধকারের মধ্যে মৃত্যুরও অধিকতর যন্ত্রণা সহ্য করিয়া পলে পলে মরণেরই নির্ম্মম স্পর্শ অনুভব ও তাহারই অতর্কিত আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, কেমন করিয়া এই মুগ্ধা অসহায়া নারী সেখানে গিয়া তাঁহার উদ্ধারসাধন করিবে? হায়, এ ও কি কখন সম্ভব? সে নিশ্চয়ই ভাবাবেশে ও আত্মকর্ম্মানুশোচনায় উন্মাদগ্রস্তা হইয়াছিল! নতুবা এত বড় অসম্ভাব্য বিষয়েরও সম্ভব চেষ্টা কোন-স্থির মস্তিষ্ক ব্যক্তি করিতে পারে কি?

সে কি তবে ফিরিয়া যাইবে? যাহা আকাশমার্গে দুর্গ রচনার মতই অসম্ভব, তেমন বৃথা কল্পনায় ঘুরিয়া মরায় ফল কি?

কিন্তু, না, না—না, না,—পিশাচী চন্দ্রকলা! এখনও তোর ঘরে ফেরার সাধ? পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের শ্রেষ্ঠ রত্ন তোর লালসার দৃষ্টিতে ক্ষয়প্রাপ্ত—বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, তোর বুকের রক্তধারা ঢালিয়া দিয়া তার উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়াই তুই ঘরে ফিরিয়া যাইবি? ওরে কোথা আজ তোর ঘর? সে ঘর যে আগুনের জ্বালায় ভরা, ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড মাত্র! ঘর যে তোর আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে! আজ এই দৃঢ়, রূঢ় অচ্ছেদ্য, অভেদ্য পাষাণকারার পাষাণ প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া মরিলেও তোর বরং শান্তি আছে, তবু সেই অগ্নিদাহভরা নির্ম্মম, কঠোর গৃহের পুষ্পশয্যাও এর চেয়ে তোকে আরাম দিতে পারিবে না।

অন্ধকারে স্থির জ্বালাময় দৃষ্টি মেলিয়া পদে পদে স্খলিতপদ হইয়াও মন্ত্রমুগ্ধা সাবধানে শৈলারোহণ করিতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র শৈলটি স্বভাবতঃই বালুকা ও নোড়া নুড়ির তৈরি, তাহাতে কোথাও পথ নাই। সেই বন্ধুর ও কর্ক্কশ পথে সুখলালিত দেহলতা শ্রান্ত ও কোমল পদযুগল রক্তাক্ত হইয়া গেল, কত বার পড়িতে পড়িতে কোন-মতে আত্মরক্ষা করিল; এই ভাবে এক প্রহরকাল ধরিয়া সেই ক্ষুদ্র অথচ সঙ্কটময় ছোট পাহাড়টিতে উঠিয়া অতি কষ্টে এবং প্রায় অবসন্ন শরীরে সে দুর্গপাদমূলে পৌঁছিল।

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর ঘোর অন্ধকার রাত্রি, তার উপর অন্ধকার, বাতাসও বেশ জোরে বহিতেছে, মধ্যে দুচার ফোঁটা জলও একবার চন্দ্রকলার মাথার উপর দিয়া ঝরিয়া পড়িল। তার চোখ দিয়াও তখন নিঃশব্দে তেমনই দুটি জলের ধারা ঝরিতেছিল, ইহা অতি কষ্টে ও অত্যন্ত উল্লাসে, ভয়ে ও আশায় মিশ্রিত।

সেই নৈশ অন্ধকাররাশির মধ্যে এই নির্জ্জন কৃত্রিম শৈল-শিখরে

অসহায়া নারী ভয়ে ভীত দৃষ্টি তুলিয়া চারিদিকে চাহিল, চাহিতেই আবার একটা সুগভীর হতাশার আঘাতে তার এতক্ষণকার সমস্ত উদ্যম ও আশাকে কোথায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ছড়াইয়া ফেলিল। তার দুই পায়ের পাতা যেন মুচড়াইয়া পড়িল, তার দুই জানু যেন ভাঙ্গিয়া গেল, হতাশ ও ব্যাকুল হইয়া সে সহসা সেই স্থানের কর্কশ কঠিন পাথরের স্তূপের উপর লুটাইয়া পড়িয়া উর্দ্ধস্বরে একটা যন্ত্রণার্ত্ত উচ্চ ধ্বনি করিয়া উঠিল—"হায় শাস্তা!—এ কি শাস্তি দিলে!"—

"কে' ওখানে?"—সঙ্গে সঙ্গেই অতি গম্ভীর স্বরে এই প্রশ্ন শ্রুত হইল এবং কাহার গুরু পদধ্বনি ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। চন্দ্রকলার নৈরাশ্য-পীড়িত অবসাদগ্রস্ত দেহে প্রথমে একটা আশঙ্কার তাড়িৎ বহিয়া গিয়াই পরক্ষণেই আর একটা ঈষৎ আশার প্রদীপ ও ক্ষীণ শিখায় জ্বলিয়া উঠিল। এই বলিয়া সে ভয়টাকে মনের মধ্যে দমন করিয়া লইল যে, "মরার বাড়া তো আর গাল নেই?—আমি যখন সেই মরিতেই বসেছি, তখন আমার আবার ধরা পড়বার ভয় কেন? বরং এই নিরুপায় অসহায় অবস্থায় যদিই বা এই মানুষটার দ্বারা কোন এক বিন্দু উপকার পাওয়া যায় দেখাই যাক না।"—তাই নূতন আশায় নর্ত্তকীর ছড়াইয়া পড়া শিথিল দেহ মন যেন আবার একবার কেন্দ্রবর্ত্তী হইয়া আসিল।

"কে এখানে কাঁদে রে?"—বলিয়া একটা বজ্র কঠিন হুঙ্কার ছাড়িয়া সেই নিকষকালো অন্ধকারকে অধিকতর জমাট করিয়া তুলিয়া এক ভীমকান্ত মূর্ত্তি প্রহরী আসিয়া চন্দ্রকলার সম্মুখে দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই অন্ধকারের জমাট ফাটিয়া কঠোর শব্দ উঠিল—

বল্ "শীঘ্র কে তুই? কেন এখানে মরতে এসেছিস্?—বল, নাহলে এখনই মশাল নিয়ে আস্‌তে আদেশ দোব—"

এই কথায় চন্দ্রকলার সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া একটা প্রবল কম্পন

স্রোত বহিয়া গেল। যে অবস্থাকে সে সুযোগ বোধ করিয়াছিল, তাহাই যে এখনই ঘোরতর দুর্য্যোগে পরিবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে, ইহা বুঝিয়া সে সভয়ে সহসাই উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আমি নর্ত্তকী চন্দ্রকলা।"

প্রহরী—এই ভীমদর্শন কষ্টাগারের প্রহরা-নিযুক্ত প্রহরী, কঠোর জীবনযাপনে বাধ্য হইলে কি হয়? স্বভাবে সে এক জন সৌখীন পুরুষ। সুযোগ এবং অবসর পাইলেই মধ্যে মধ্যে নগরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্ভবপর হইলে একটুখানি আমোদ-প্রমোদে কাটাইয়া আইসে। রাজ-নর্ত্তকী চন্দ্রকলা ও বিদ্যুৎমালার নাম, শুধু নামই নয়, উভয়েরই রূপের সহিত তাহার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল। অভিনয়স্থলে চন্দ্রকলাকে দেখিয়া আসিয়া পাঁচ রাত্রি সে ঘুমাইতে পারে নাই, অহোরাত্র তাহারই রূপ সে ধ্যান করিয়াছে। বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গিয়া সে সচমকে উত্তর করিল, "অসম্ভব! রাজ-নর্ত্তকী চন্দ্রকলা এই অন্ধকার দুর্য্যোগ-রাত্রে কষ্টাগারের দরজায় কি জন্য আসবে? সে এখন রাজার বিলাস-শয্যার সঙ্গিনী।—কে তুই ঠিক ক'রে বল, না হ'লে—"

চন্দ্রকলা এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কি ভাবিয়া লইয়া কথা কহিল, মধুর স্বরে কহিল,—"জগতে সবই সম্ভব ভাই! রাজপুত্র তথাগত কিসের দুঃখে সুখসম্পদ ছেড়ে বনবাসী হয়েছিলেন বল ত? আচ্ছা প্রহরী! তুমি চন্দ্রকলাকে কখন দেখেছ কি?"

প্রহরী কহিল, "নিশ্চয়! আমি এই জঘন্য জায়গাটায় থাকি বটে, তবে দেখাশোনা আমার কিছুই কম নেই। আমি মহাস্থবির সর্ব্বজ্ঞশান্তি থেকে নর্ত্তকী বিদ্যুন্মালা, চন্দ্রকলা, সবাইকেই দেখেছি, শুধু তাই নয়,—ওদের নাচগানও আমার কিছু কিছু দেখা, শোনা আছে।"

চন্দ্রকলা কহিল, "তবে শোন দেখি, এ গানটা চন্দ্রকলার গলায় কি না?"—এই বলিয়া সে মৃদু মৃদু গাহিল।—

"দুল্লর্ভ জন অনুরায়ো, লজ্জাগুরুই পরবস অপ্পা—
পিয়সহি ! বিসমং পেম্মং, মরণং শরণং ণবরিঅ মেক্কং ।"

আশঙ্কায় ও উত্তেজনায় তার গলা কাঁপিতেছিল, ভাষা অস্ফুট হইয়া স্বর বিকৃত হইয়া বাহির হইল, তথাপি তাহা অতি মধুর !

প্রহরী মুগ্ধ হইল, কিন্তু ক্ষণকাল মনে মনে বিচার করিয়া লইয়া বলিল, "আমায় ঠকাতে পার্ব্বে না। তোমার গান মন্দ নয় বটে, কিন্তু চন্দ্রকলার গলার সঙ্গে এর তুলনা তেম্‌নি হয়, যেমন আমার সঙ্গে রাজার ! আহা ! সেই গান যদি আর একবারও ভাল ক'রে শুনে ; তার পর আমি ম'রেও যাই !"

চন্দ্রকলা অন্ধকারে সরিয়া আসিয়া প্রহরীর অঙ্গ স্পর্শ করিল, "আমি তোমায় আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই গানই শোনাবো। বিশ্বাস করো ভাই, আমিই সেই ! যদি বিশ্বাস না হয়, কোথায় তোমার মশাল আছে, জেলে নিয়ে এস। না হয় আমায় সেইখানে সঙ্গে ক'রে নিয়ে চলো, দেখবে আমিই সেই রূপসী শ্রেষ্ঠা গায়িকাকুল শিরোমণি সুবিখ্যাত নর্ত্তকী চন্দ্রকলা।"

প্রহরীর সন্দিগ্ধচিত্ত তখনও সে দিনের আকাশের মতই ক্ষণে ক্ষণে সংশয়ের মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছিল, সে এই প্রস্তাবে সাগ্রহে সম্মত হইয়া বলিল, "এত হাওয়ায় ত মশাল জ্বালা থাকবে না, তার চেয়ে তুমি আমার ঘরেই এস না কেন ?"

চন্দ্রকলার রূপ-গর্ব্বিত চিত্ত এই একটা সামান্য হীন নাগরিকের আমন্ত্রণে বারেকের জন্য সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াই পুনশ্চ তাহার সর্ব্বত্যাগী একাগ্র হৃদয়কে একটা নূতন আশার প্রেরণায়, আনন্দে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। সে গভীর আগ্রহভরেই অগ্রসর হইয়া কহিল, "চল তবে, কোথায় নিয়ে যেতে চাও, আমি আর বেশীক্ষণ বিলম্ব করতে পারবো না।"

তমসাচ্ছন্ন মধ্যরাত্রি; সমস্ত চরাচর তন্দ্রাচ্ছন্ন। উর্দ্ধে আকাশপথে চলন্ত মেঘের ক্ষণ ক্ষণ গতায়াতে অসংখ্য তারা লোকলোচন হইতে ক্রমাগতই অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে, বাতাস কখনও মেঘগুলাকে উড়াইয়া দিয়া আনন্দ উপহাসে অট্টহাস্য করিয়া উঠিতেছে; কখনও বা কিছু সংযত ভদ্রভাবে অবলোকন করিতেছে। নগরীর বাহিরের এই নির্জ্জন প্রদেশে কোথাও কোন জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। কেবল এই কৃত্রিম শৈলের পদপ্রান্তে বেত ও কসাড় বনের মধ্যে উচ্চ রবে শৃগাল ডাকিতেছিল।

কারা-দুর্গের বিশাল লৌহ দ্বার যথাপূর্ব্ব রুদ্ধই রহিল, তাহারই মধ্যস্থ একটি ছোট দরজা দিয়া প্রহরী চন্দ্রকলাকে ভিতরে লইয়া আসিল। এই তুচ্ছ নাগরিকের পিছনে পিছনে তাহারই অপরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিতে রাজ-সেবিতা, সম্মানিতা বারনারীর বিলাসী হৃদয় ঘৃণায় ঈষৎ কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেও সে জোর করিয়া অন্তরের সে ভাবটাকে রোধ করিয়া রাখিল, মনে মনে বলিল, "আমার আর লজ্জা মান ভয় কিসের? আমার সেই প্রাণ প্রিয়তমের জন্যে সবই ত আমি বিসর্জ্জন দিয়ে দিয়েছি।"

মশালের উজ্জ্বল আলোকে যখন চন্দ্রকলার মুখ সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইল, তখন সহসা সেই দরিদ্র প্রহরীর মনে হইল, সে যেন ঘুমন্ত স্বপ্ন দেখিতেছে! এই রাজ-রাজেন্দ্র-বাঞ্ছিতা আশ্চর্য্য রূপসী ও অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী নারী বাস্তবিকই যে তার মত দরিদ্রের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন, এ অবিশ্বাস্য সত্যকে কেমন করিয়াই বা সে প্রত্যয় করিবে? একটা অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ে আনন্দে ও ইহাদের সহিত মিশ্রিত ঈষৎ একটা আশঙ্কায় প্রহরীর ক্ষুদ্র প্রাণ যেন সবেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল। সে নিস্পন্দ-নেত্রে তার সম্মুখীন সুন্দর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া রহিল, কিন্তু একটি কথাও তার মুখ ফুটিয়া বাহির হইল না।

চন্দ্রকলা উহার অবস্থা দেখিয়া নিজের ভুবন-ভুলানো মিষ্ট হাসি হাসিয়া মধুর কণ্ঠে কহিল, "এবার বিশ্বাস হলো ত, ভাই ? আচ্ছা, এখন একটু বসা যাক্ এস, ভয় কি ? আমি ত আর প্রেতিনী নই ? আমায় দেখে তুমি অমন শুকিয়ে উঠলে কেন ?"

বাস্তবিকই প্রহরীর অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল বটে ! ভূত দেখিলেও সে হয় ত এতটা আড়ষ্ট হইয়া উঠিত না। এতক্ষণে ঐ মধুর হাসি ও অভয় বাক্য ইহাকে যেন কতকটা সম্বিৎ প্রদান করিল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচনপূর্ব্বক সে তখন তার সেই মলিন শয্যাটার দিকে বারেক চাহিয়া দেখিয়া দুঃখিতকণ্ঠে বলিল, "আপনাকে আমি কোথায় বসাবো ? আমার ত কিছুই নেই !"

"তাতে কি, আমি এইখানেই বস্‌চি। তুমি বড় গরীব আচ্ছা, কত বেতন পাও, ভাই ?"

প্রহরী কহিল, "বেতন আর পাই কই ? প্রায় সাত একটি কপর্দ্দকও পাই নি। কি কষ্টে যে—"

চন্দ্রকলার মুখ সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, "এত কষ্ট অনর্থক পড়ে পড়ে সইছো কেন, ভাই ? এ অবৈতনিক চাকরী ছেড়ে দিয়ে চাষ ক'রে খেলেও ত যথেষ্ট লাভ হ'তে পারে ? কোন ব্যবসা করলেও ত হয় ? এমন ক'রে জীবনপাত করা কেন শুধু শুধু ?—"

প্রহরী একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল, "চাষের জমী, ব্যবসার টাকা সবই তো চাই, আমি যে বড় গরীব, দেখতেই তো পাচ্ছেন।"

চন্দ্রকলার চোখ দুইটি আনন্দের জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল, মধুর স্বরে সে কহিল, "আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমায় পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নাগরিকদের মধ্যে ধনিশ্রেষ্ঠ ক'রে দিতে পারি, যদি তুমি আমার একটুখানি সহায় হও। ভেবে দেখ, এই বিনা বেতনের প্রহরী হয়ে থাকতে চাও, অথবা এই

মহামূল্য রত্ন-পেটিকার অধিকারী হয়ে কোন অজ্ঞাত দেশে গিয়ে রাজৈশ্বর্য্য সম্ভোগ করতে চাও ?

চন্দ্রকলা তাহার বস্ত্রমধ্য হইতে সুবর্ণ পেটিকা বাহির করিয়া উহার আবরণ মুক্ত করিয়া ধরিতেই মশালের উগ্র আলোকে ইহার মধ্যস্থিত মহামূল্য হীরকাদি হইতে একটা অনৈসর্গিক অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইয়া মুগ্ধ প্রহরীর স্তম্ভিত দৃষ্টিকে ধাঁধিয়া দিল। তার কণ্ঠ উগ্র বিস্ময়ে একটা অর্দ্ধস্ফুট শব্দমাত্র উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইল।

তাহাকে বাক্যাহত ও বিমূঢ় দেখিয়া পুনশ্চ নূতন আশায় উৎফুল্ল হইয়া চন্দ্রকলা কহিল, "এই সবই তোমায় দিব। এর মূল্যে একটা মস্ত বড় রাজ্য স্থাপন করা যায়, এ নিয়ে এই রাত্রেই তুমি এ দেশ থেকে পালিয়ে গেলে কে জানতে পারবে? দেখ, জগতে এখন কোন জন-প্রাণীটিও জেগে নেই, এই অবসর, এ নষ্ট হ'লে তোমার সারা-জীবনে আর কি কখন এ সুযোগ তুমি পেতে পারবে? তাই বলি, আমার প্রস্তাব যেন অগ্রাহ্য ক'রে নিজের সর্ব্বনাশ ক'রে বসো না!"

প্রহরীর বিস্ময় বিহ্বলতার স্থান ক্রমশঃই দুরন্ত লোভ আসিয়া অধিকৃত করিয়া লইতেছিল, একটা উদ্দাম আশার দুরন্ত ক্ষুধায় তার চোখ দুইটা যেন বাঘের চোকের মতই জ্বলিয়া উঠিল, সে কহিল, "বলুন আমায় কিকরতে হবে?"

চন্দ্রকলা ঈষৎ নিকটস্থ হইয়া নিম্ন স্বরে কহিল, "মহাকুমার রামপাল-দেবের মুক্তি চাই। তারই বিনিময়ে এই লক্ষ লক্ষ সুবর্ণ মূল্যের অলঙ্কার-রাশি তোমারই প্রাপ্য হবে। বল? সম্মত?"

প্রহরী আকস্মিক আঘাতপ্রাপ্তের ন্যায় সর্ব্বশরীরে সুস্পষ্ট চমকে চমকিয়া উঠিল, তার মুখে ভূতাহতের মত আতঙ্কের চিহ্ন সুস্পষ্ট দেখা দিল। সে ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিল,—"মহাকুমার রামপাল দেবের মুক্তি!—সে যে অসম্ভব!"

"অসম্ভব! কেন অসম্ভব? রাজভয়ের ত কোন পথই থাকছে না, তুমি এই অলঙ্কাররাশি নিয়ে তাঁরই সঙ্গে গোপনে পলায়ন ক'রে কোন সুদূর দেশে, যেখানে পালসাম্রাজ্য নয়, তেমন স্থানে গিয়ে স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করতে পার। গৌড়ে যখন থাক্‌ছই না, তখন তোমার আর অত ভাবনা কিসের?"

প্রহরীর কম্পিত ওষ্ঠাধর কোন মতে উচ্চারণ করিল, "পালাতে পারলে ত নিরাপদ হব। কিন্তু যদি তার পূর্ব্বে ধরা প'ড়ে যাই, সেই মুহূর্ত্তে শূলে চ'ড়ে প্রাণ হারাবো। তাছাড়া এ দেশে আমার অনেক আত্মীয় বান্ধব স্ত্রীপুত্র সবই আছে,—তাদের কি হবে? আমার দোষে তারাই কি কেউ রক্ষা পাবে ভেবেচেন? কেউ না। ভট্টারিকা চন্দ্রকলা! দয়া ক'রে আমায় আর লোভ দেখাবেন না। প্রাণ, ধনের চেয়ে অনেক বেশী বড় হলেও, এ লোভ দমন করাও আমার মত লোকের পক্ষে হয় ত বা সম্ভব নয়।"

চন্দ্রকলার আশানন্দে প্রফুল্ল স্মিতমুখ দারুণ নৈরাশ্যের মেঘে অন্ধকার হইয়া গেল, যেন পূর্ণিমার চন্দ্রের উপর একখানা চলন্ত কালো মেঘ আসিয়া আড়াল করিল।

অনেক অনুনয়ে ও প্রলোভনেও যখন সেই ভীত প্রহরীকে সম্মত করিতে পারা গেল না, তখন অবশেষে সে গভীর নৈরাশ্যে একটা অগ্নিগর্ভ তপ্তশ্বাস মোচন পূর্ব্বক অগত্যাই উঠিয়া দাঁড়াইল। পেটিকা হইতে একটি মূল্যবান্ অলঙ্কার উঠাইয়া তাহা ঐ কুণ্ঠিত প্রহরীর হাতে দিয়া সে শেষ আশায় কাতর অনুনয়ে কহিল "একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দাও, এইটুকু দয়াও ত করতে পারো। যদি দেখা করাতে পারো, এই মুক্তাহার তোমায় দান ক'রে যাব।"

"আসুন"—বলিয়া লোভ-কম্পিতপদে রক্ষী অগ্রসর হইয়া চলিল,

চন্দ্রকলাও নীরবে তাহার অনুসরণ করিল। তাহার চিত্তে ক্ষীণ আশার সহিত লজ্জা, ভয় ও নৈরাশ্যের প্রবল তরঙ্গ সঘনে আবর্ত্তিত হইতেছিল।

অন্ধকার ও নিঃসাড় একটা রুদ্ধ গৃহের অর্গল মোচন করিয়া কারারক্ষী চন্দ্রকলাকে ভিতরে আসিতে ইঙ্গিত করিল। অতিক্ষীণ দীপালোকে চন্দ্রকলা সভয়ে দেখিল, সেটি একটি বায়ু সম্বন্ধ শূন্য তমসাবৃত ক্ষুদ্র কক্ষ। এইখানে তাহাকে দাঁড়াইতে বলিয়া প্রহরী একটি পাতাল-গৃহের গুপ্তদ্বার টানিয়া তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কথা কহিয়া বলিল, "খুব সম্ভব এর মধ্যেই মহাকুমার আছেন। কিন্তু সাবধান! বেশীক্ষণ যেন বিলম্ব না হয়, অন্য প্রহরীরা জেগে উঠলে এখনই দু'জনেরই মাথা কাটা যাবে। তা'রা মেয়েমানুষ ব'লে ও রাজ-প্রেয়সী ব'লেও হয় ত তাদের কর্ত্তব্য করতে কুন্ঠিত হবে না। একমাত্র আমি ভিন্ন নাচ গানের দাম এদের মধ্যে আর কেউই বোঝে না। আর তার কারণ, আমি ভিন্ন তা'রা সকলেই বাগ্দী ও ডোম। চারুশিল্প-সম্বন্ধে জ্ঞান ও শিক্ষা কখন পায় নি।

সেই পাতালপুরীর সঙ্কীর্ণ সোপান অতি কষ্টে অতিক্রম করিতে করিতে চন্দ্রকলার ধৈর্য্য যেন সীমাহারা হইয়া আসিল, দুঃখে ও ব্যথায় তার বুক যেন ফাটিয়া পড়ার মত হইল। মহারাজাধিরাজ পুত্র হইয়া আজ যাঁহাকে এই পার্ব্বত্য মুষিকেরও অপেক্ষা অধম জীবনযাপনে বাধ্য হইতে হইয়াছে, এ কি বিধাতার বিধান? এ কি কখনও সহা যায়? অথচ দুজনকার একই পিতৃ-রক্তে জন্ম! ভাই হইয়া এই অমানুষিক অত্যাচার অনায়াসেই তিনি ভাইয়ের পরে করিতে পারিলেন? এই নরদেহধারী পিশাচেরই অঙ্ক-শয্যায় কত রাত্রির পর রাত্রি তাহাকে অতিবাহিত করিতে হইয়াছে, উহাকেই প্রমোদিত করিতে চাহিয়া তার জীবনের সমুদয়ই সে তাঁহাকে উৎসৃষ্ট করিয়া দিয়াছে; নিজের এই ধিক্কৃত হীন-জীবনের হেয়তা এই অন্ধ তামসে ভরা গভীর নির্জ্জন গহ্বরতলে দাঁড়াইয়া আজ যেন তার

যথার্থরূপেই উপলব্ধি হইল। মনুষ্যত্বহীন নরাধমের অন্নে পুষ্ট, উহারই উপভুক্ত দেহখানাকে সেই মুহূর্ত্তে যেন নখ দিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিল। ক্ষোভে, ক্রোধে, অভিমানে দাঁত দিয়া চাপিয়া শুধু সে নিজের অতি সূক্ষ্ম অধরকেই ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিল, আর কিছুই তার করিবার নাই!

মনে মনে বলিল, "কতই ত সুযোগ এসেছিল, কেন এর আগে সেই নর-রাক্ষসটাকে হত্যা করার কথা আমার একবারও মনে পড়ে নি?"

উপরন্তু কত দিনের কত হাস্য-পরিহাস, লাস্য-লীলা মনে পড়িয়া নিষ্ফল লজ্জার জ্বালায় তার বুকের মধ্যে আগুন লাগার মত ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। এক একটা স্মৃতি যেন আজ বজ্র-কণ্টকে মনটাকে তার বিঁধিয়া তুলিল।

কষ্টে ঈষৎ আত্মদমন করিয়া লইয়া অন্ধকার গুহামুখে মুখ করিয়া অনতি উচ্চকণ্ঠে সসঙ্কোচে ডাকিল, "মহাকুমার রামপালদেব! মহাকুমার! জাগ্রত কি?"

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ চিরিয়া একটা উচ্চ ক্রন্দন যেন ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। "জাগ্রত কি?" না বলিয়া "জীবিত কি?" এই প্রশ্ন করাই হয় ত বা সঙ্গত ছিল! ইহার মধ্যে যে নিদ্রা, সে এক মহানিদ্রা হওয়াই সম্ভব! আতঙ্কে তার বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল। হয় ত— হয় ত বা সত্যই তাই! এত কষ্ট কি সেই সুখপালিত দেহ এত দিন সহিতে পারিয়াছে?

কিন্তু সহসাই হর্ষ ও বিস্ময়ে তাহাকে রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিয়া সেই অন্ধকারে অদৃশ্য পাতাল গৃহ হইতে একটি গম্ভীর রব শোনা গেল, "মহাকুমার রামপালদেবের কে নাম করে? তুমি কে? মানবী না প্রেতিনী?"

প্রবল হর্ষোচ্ছ্বাসে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া গিয়াও কোন মতে বাক্-সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রগল্ভা কহিল, "আমি চন্দ্রকলা।"

"মাগধী!" স্বরে ঈষৎ বিস্ময়।

"নর্ত্তকী।" বলিয়াই গদ্‌গদ্ কণ্ঠে চন্দ্রকলা কহিতে লাগিল, "আজ আর দাসীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করো না, প্রভু! দীনের পূজা আজ দীননাথ হ'য়ে এই শেষবারের জন্য গ্রহণ কর। এস, তুমি কোথা আছ, আমি যে তোমায় দেখতে পাচ্ছি না। এস, আমার এই নারী বেশ পরে তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাও। প্রহরী তোমার কোন বাধা দেবে না, যদি দেয়, দেখ, এই নাও তীক্ষ্ণধার কৃপাণ, পথ মুক্ত ক'রে নিও।"

অন্ধকারে পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই অতি নিকটে অপরিচিত কণ্ঠে কেহ বলিয়া উঠিল, "তোমার এ চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, শুচীস্মিতে! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ত রামপাল নই।"

"তুমি রামপাল নও? ওঃ তথাগত! আমার সব শ্রমই তবে পণ্ড হলো!"

আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিয়া উঠিয়া চন্দ্রকলা সবেগে সেই পাতালগৃহের আর্দ্র মৃত্তিকার উপর বসিয়া পড়িল। তাহার অঙ্গ গৃহাধীকারীর চরণস্পৃষ্ট হইল।

অপরিচিত মৃদু হাসিলেন, হাসির শব্দ শুনা গেল।

"হয় ত কিছুই পণ্ড হয় নি, চন্দ্রকলা! কিন্তু তুমি কি রামপালের মুক্তি চাইছিলে না? এই রকমই যেন শুনলেম না? অথচ আমরা সকলেই জানি, তুমি রাজ-রক্ষিতা!"

চন্দ্রকলা একটা কাতর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, বিদ্ধকণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল, "ওগো, তারই যে এ প্রায়শ্চিত্ত! কিন্তু কে তুমি? তুমি কেন আমায় এমন ক'রে বঞ্চনা করলে? কেন আমি তাঁর দেখা পেলুম না? আর ত আমার কোনই আশা নেই।"

আবার একটুখানি হাসির শব্দ পাওয়া গেল। অপরিজ্ঞাত পুরুষ কহিলেন,—"বাঃ, আমি যেন ইচ্ছা করেই তোমায় ঠক[illegible]ম! বেশ মেয়ে ত তুমি! আচ্ছা, একটা কায করো না? তুমি আ[illegible]হাতের বাঁধনটা —কেন কেটে দাও না? তা দিলে রামপালকে হয় ত[illegible]মিই উদ্ধার করতে পারবো। আমি বোধিদেব।"

"আঃ! আপনি মহাকুমারের প্রিয়সখা বোধিদেব [illegible] ব্রহ্মবিদ্! আপনাকে প্রণাম কচ্চি, আসুন, এই যে সিঁড়ি। দ্বার মু[illegible] আছে। প্রহরী একজন মাত্র জাগ্রত। সে আমার কাছে অনেক পুরস্কার পেয়েছে, কিন্তু মহাকুমারকে মুক্তি দিতে সে ভরসা করে না, আমার সমস্ত ধনরত্ন বিনিময়েও না। বলুন,—এখন কি উপায়?"

বোধিদেব কহিলেন, "সে উপায় সৌভাগ্যক্রমে আমার হাতেই আছে। আপাততঃ ওই প্রহরীটাকে হয় হত্যা না হয় বন্দী ক'রে এদিকের [illegible]কে মুক্ত ক'রে নিতে হবে মাত্র। এস, তুমি আমার সঙ্গে এস। কি[illegible]া,— আমি রাজবন্দী, আমার তো যাবার উপায় নেই। এই নাও, তুমি এই রাজার আদেশপত্র নিয়ে যাও, এর বলে শূরপাল, রামপালকে তুমিই মুক্তি দিতে পারবে। এখানের প্রত্যেক ব্যক্তি এই আদেশপত্রকে মান্য করতে বাধ্য।"

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রামপালের জীবন-নদী একঘেয়ে ভাঁটার মুখেই বহিতেছিল, অতি সহসা সেখানে একটা প্রবল বেগের বন্যাধারা নামিয়া আসিল। রাজ-প্রাসাদের সুপাচ্য সুখাদ্য ও সুকোমল পর্য্যঙ্ক শয্যা,—এমন কি, সন্ধ্যাদেবীর প্রেম ঢলঢল বিহ্বল করা মধুর মুখ; এ সবই যেন একঘেয়েত্বের দরুণ তাঁর

কাছে একরকম অসহ্ হইয়া উঠিয়াছিল। চিরপরিচিত চিরভোগ্য স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর অন্তরের বিষদিগ্ধ ক্ষতজ্বালার সঙ্গে যেন কোন মতেই আর নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া চালাইতে পারিতেছিল না, তাই বোধ করি, আজ তাঁর ভাগ্যের ঈশ্বর তাঁহাকে উহারই ঠিক আর একটা দিককে আবরণমুক্ত করিয়া দেখাইতে বসিয়াছেন! অন্ধকারময় মৃত্তিকাতলস্থ নিরালোক গহ্বর-কোটরে উপাধান আস্তরণ হীন ভূমি শয্যা এবং দিনান্তে বারেকমাত্র সাধারণ অপরাধীদের জন্য প্রস্তুত কদন্ন, তাহাও ঠিক প্রাণ-ধারণের উপযোগী মাত্র—ইহাই আজ সমগ্র,মগধ ও বরেন্দ্রী মণ্ডলের এবং প্রবলপরাক্রান্ত পাল সম্রাটগণের বংশধর মহাকুমার রামপালদেবের অবলম্বন। আর এই ভয়াবহ, শোচনীয় বন্দী-জীবনে তাঁহার প্রধান অবলম্ব হইয়া উঠিয়াছিল গভীর চিন্তারাশি। কর চরণ শৃঙ্খলিত, হিংস্র জন্তুরও অধম অবস্থায় কঠিন আর্দ্র দুর্গন্ধময় গৃহতলে পতিত থাকিয়া অহোরাত্রি নিজের দুর্ভাগ্যরাশির ও সুদূরাপসৃত বিস্মৃতি-গর্ভে বিলীয়মান-প্রায় সুখ-শৈশবের, স্মৃতিটুকুর ধ্যান, এই দারুণ দুঃখের দিনে রামপালের একমাত্র সুখ! মহাদেবীর স্নেহমাখা মুখ, তাঁর মাতৃ-হৃদয়ের সহস্র ছোট বড় অভিব্যক্তি আজ ভিখারী রাজপুত্রের একমাত্র দুঃস্বপ্ন!

কিন্তু মহাকুমার চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত সন্ধ্যার কথা একবারও তাঁর মনের মধ্যে উঠিতে দিতে পারেন নাই। ভাঙ্গা বাড়ীতে পুঁতিয়া রাখা যক্ষের ধনের মতই তাঁর অন্তরের সেই সঞ্চিত রত্নভাণ্ডার তিনি নিজেও বুঝি একবার নাড়িয়া দেখিতে ভরসা করেন না। সেই সরলা কোমলা অনন্যসহায়া পতিগতপ্রাণা কিশোরীর আজ যে কি অবস্থাই না ঘটিয়াছে, ইহা কল্পনা করিতে যাওয়াও তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য! হয় ত এই নিদারুণ বজ্রপাতে তাহাকে একবারেই ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে, অথবা যদি ততটা সুখও তার ভাগ্যে না লেখা থাকে, তবে সে অবস্থা যে কি,

তাহার পরিমাপ কাহারও না করাই ভাল। বালক যেমন অপবাদগ্রস্ত ঘরের দিকে চাহিতে ভরসা করে না, রামপালও তাঁর সব প্রিয়তম স্মৃতিটিকেও তেমনই সভয়ে পরিহার করিয়া চলিতেছিলেন। সন্ধ্যা মরিয়াছে, এ চিন্তাও তাঁর পক্ষে অসহনীয়, আবার তাঁর এই অবস্থার সংবাদ পাওয়ার পর এ অবস্থায় সন্ধ্যার বাঁচিয়া থাকা সম্ভব, সেও যে মনে করিতে পারা যায় না। এর চেয়ে বুঝি তার মৃত্যুও ভাল!

একটা ক্ষুদ্রজাতীয় মূষিক রামপালের পৃষ্ঠে দংশন করিয়া পুনশ্চ তাঁর গায়ের উপর উঠিতে লাগিল। গা নাড়া দিয়া সেটাকে ফেলিয়া দিলেও, পৃষ্ঠের দংশনজ্বালা তাঁহাকে নিরুপায়ভাবেই সহিতে হইল। শোণিত ক্ষরিত হইতেছে জানিয়াও উহা মুছিবার শক্তি নাই, হাত লোহার শিকল দিয়া বাঁধা। একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বিমনা হইয়া রহিলেন। ক্ষণপরে তাঁর শীর্ণ, ক্লান্ত অধরপ্রান্তে এক ফোঁটা তীব্র দুঃখের হাসি ফুটিয়া উঠিল।—"এর জন্য দুঃখ কিসের রামপাল? এই ত তো[illegible] ঠিক উপযুক্ত! সহস্রের আহ্বানকে উপেক্ষা ক'রে যে গর্তের মা[illegible] লুকিয়ে বেঁচে থাকতে চায়, গর্তের মুষিকেরও সে অধম নয় ত কি? এই ভাল, এই ভাল। রামপাল!—এই ভাল হয়েছে।"

উপর হইতে এই জনহীন শব্দশূন্য আলোকের সম্পর্ক-বিবর্জিত কষ্টাগারের রুদ্ধদ্বার টানিয়া তোলার কর্কশ ধ্বনি অতি কঠোর শুনাইল। এ অন্ধকারে যদিও দিবারাত্রি একাকার হইয়া গিয়াছিল, তথাপি অন্নদাতা প্রহরীর যে আসিবার সময় হয় নাই, তাহা সহজেই রামপালের বোধগম্য হইয়াছিল। কোন নূতন ব্যাপারের প্রতীক্ষা করিয়া তিনি নিজেকে সেই মুহূর্তেই প্রস্তুত করিয়া লইলেন। হয় ত এত দিনে তাঁর পলে পলে প্রতীক্ষিত মৃত্যুরই তাঁহাকে আলিঙ্গন দিবার অবসর হইল। চকিতের মধ্যে বারেকমাত্র সন্ধ্যার মুখখানা চোখের সামনে বিদ্যুতের মতই ফুটিয়া

উঠিল, রামপাল জোর করিয়াই সে দিক্ হইতে চোখ ফিরাইয়া লইলেন, মনে মনে বলিলেন, "এইবার,—এত দিনে আমার শাপমুক্তি ঘটলো।" আঃ, আমি বাঁচি, আমি বাঁচি! তা' হ'লেই যে আমি বাঁচি! তাই তো আমি চাইচি।"

সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের নিবিড়তাকে একখানা তীক্ষ্ণধার ছুরিকার মতই সবেগে বিভক্ত করিয়া দিল, একটি আলোকের রশ্মি। কিন্তু এই গাঢ় তিমিররাশিকে বিধ্বস্ত করিতে তাহার সাধ্য হইল না।

পরে গৃহসোপানে পদ শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল এবং সহসা একটা মশালের আলো হইতে খানিকটা তীব্র আলোক রামপালের এই মাসাধিককালের আলোক সহনে অনভ্যস্ত চোখের উপর আসিয়া চ্ছুরিত হইয়া পড়িয়া তাঁহাকে বারেকের জন্য চক্ষু মুদিতে বাধ্য করিল।

প্রহরী আসিয়া নীরবে তাঁহার শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া দিয়া বিনীত অভিবাদন পূর্ব্বক করযোড়ে কহিল, "আমরা রাজাজ্ঞার অধীন, ঘোরতর অপরাধে অপরাধী হলেও কৃপা ক'রে ক্ষমা করবেন।

এই বলিয়াই সে পথ প্রদর্শিত করিয়া পুনশ্চ সসম্ভ্রমে কহিল, "আসুন মহাকুমার!"

রামপাল নীরব নতমুখে তাঁহার পিতৃরাজ্যের সেই ক্ষুদ্রতম প্রহরীর অনুজ্ঞা পালন করিয়া ভীষণ গহ্বর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

আঃ, কি আনন্দ! জননী ধরিত্রীর ওই নিরালোক, নিরানন্দ বায়ুহীন অন্ধকারমগ্ন জঠরের মধ্যে বাঁচিয়া থাকার চেয়ে, এই স্নেহ-শীতল সহানুভূতি-ভরা বায়ুস্পর্শের মধ্যে, এই অসীম উদার উন্মুক্ত অনন্ত আকাশের তলায়, তাহার সহস্র সুখ, দুঃখ, বাসনা, কামনাময় স্নেহ অঙ্কে একটুখানি স্থান লইয়া মৃত্যুও কত ভাল। শুধু ভাল নয়, সহস্র গুণেই ভাল! চিরজীবী হও রাজাধিরাজ! খাঁচায় ধরা মুষিকের মত সেই পাতালগর্ভেই খোঁচাইয়া

না মারিয়া যে আবার এই পৃথ্বী মায়ের চিরপরিচিত বুকের মধ্যে শেষ শয্যা বিছাইয়া দিয়াছ, তোমার এই অযাচিত করুণার জন্য তোমায় আজ এই যাত্রাপথের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া সর্ব্বান্তঃকরণেই প্রণাম করি।

অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত সেই জ্বলন্ত উল্কালোকে রামপাল দেখিলেন, তাঁর পদতলে পতিত হইয়া এক দীনবেশিনী নারী তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে। বিস্ময়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। নারী! এই ভয়াবহ, দুষ্প্রবেশ্য কারাগারের মধ্যে, এই অন্ধকার মেঘ মেদুর মধ্যরাত্রে কে এই দীনা মলিনা, অথচ রূপ-যৌবনের পূর্ণভারে অলৌকিক শ্রীসম্পন্না তরুণী তাঁহাকে অকৃত্রিম ভক্তি নিবেদন করিতে আসিয়াছে? কে এই রহস্যময়ী নায়িকা? তাঁহার বুক ঠেলিয়া একটা সাতঙ্ক সম্ভাবনার সংশয় অতি সহজেই তাঁর চিত্তকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।—তবে কি, তবে কি, এ তাঁর সন্ধ্যা? নির্ম্মম রাজা কি তাঁর শাস্তি বাড়াইতে তাঁহারই নিজ কুলের কুলবধূকে এই অমানুষিক দণ্ড প্রদান করিয়া এই ভীষণ কষ্টাগারে ঠেলিয়া পাঠাইয়াছেন? হয় ত এও সম্ভব! হয় ত, কিছুই তাঁর পক্ষে আর অসম্ভব নাই। কিন্তু মহাদেবী জীবিতা থাকিতে,—হয় ত—তা' হয়ত, মহাদেবীও জীবিতা নাই!—আশ্চর্য্য কি? তাঁর সমস্ত দেহ মন যেন এই ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার আতঙ্কে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই উন্মত্ত, উদ্দাম, অসহায় কোপে সমস্ত শিরা উপশিরার মধ্য দিয়া যেন আগুনের শিখা বিদ্যুতের বেগে মাথার দিকে দ্রুত ছুটিয়া উঠিল, তিনি তীব্র জ্বালাময় তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকিলেন, "সন্ধ্যা!"

প্রণতা নারী ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; মশালধারীর হাতের আলোটা তার অতি সুন্দর, অথচ একেবারে পাণ্ডুবর্ণ মুখের উপর সেই মুহূর্ত্তেই স্ফুরিত হইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গেই মহাকুমার সবিস্ময়ে দুই পদ পিছাইয়া গিয়া বিস্ময় স্খলিত কণ্ঠে মৃদু মৃদু কহিলেন, "চন্দ্রকলা!"

"মহাকুমার! রাজাজ্ঞায় আপনি এখন বন্ধনমুক্ত। যথেচ্ছ গমন করতে পারেন।"

রাজপুত্র চমকিয়া উঠিলেন, নিজ শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না, ত্বরিতে বক্তা কারাধ্যক্ষের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, "কি বল্লে? আমি রাজাজ্ঞায় বন্ধনমুক্ত? আমায় বলচো?"

ভদ্রদত্ত নতমস্তকে অভিবাদন জানাইল।

রামপাল তখন সবিস্ময়ে নর্ত্তকীর মুখে অনুসন্ধিৎসু নেত্রে চাহিলেন, "রাজা আমায় মুক্তি দিয়েছেন? এ কথার অর্থ কি, চন্দ্রকলা?"

উহাকে নীরব দেখিয়া ক্ষণকালমাত্র পরেই পুনশ্চ সোৎকণ্ঠিতভাবে কহিয়া উঠিলেন, "বুঝেছি, এ তোমারই দান! খুব সম্ভব তুমিই রাজার এই অনুজ্ঞা লাভ ক'রে আমায় মুক্তি দিতে এসেছ! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেন এত করলে? আমার কাছে কিছুই ত তুমি পাওনি, তবে কিসের জন্য এত বড় দান আমায় দিলে? তুমি ত জানো, তোমায় ফিরিয়ে দেবার মত কিছুই আমার সম্বল নেই। এ'কি কেবল অনর্থক ঋণজালে আমায় চিরদিনের জন্য আবদ্ধ ক'রে রেখে দিলে? এ ধার শোধবার যে আমার কোনই উপায় দেখিনে!"

মহাকুমারকে একান্ত বিমনা ও সন্তপ্ত বোধ হইল। এতক্ষণে নিজের সুগভীর মানসিক বিপ্লবকে কথঞ্চিৎমাত্র প্রতিহত করিয়া লইয়া চন্দ্রকলা অবনত মুখ তুলিল। বক্ষে তার সমুদ্রমন্থন চলিতেছিল, হৃদ্‌যন্ত্রের সঘন আলোড়নে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, গভীর উচ্ছ্বাসে ও হর্ষে দৃষ্টি বাষ্পজলে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি প্রাণপণে কোনমতে বাক্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া গদ্‌গদ্ স্বরে সে বলিয়া ফেলিল,—

"ওইটুকু, ওইটুকু শুধু রেখে দিন কুমার! আর ত কিছুই দিতে পারবেন না, শুধু আপনার এই ঋণ স্বীকারটুকুই যে আমার পক্ষে যথেষ্ট!

এ আর শোধ করতে চাইবেন না, এইটুকু দয়া করবেন!"—বলিতে বলিতে তার অশ্রু পরিপ্লুত দুই নেত্র আভ্যন্তরিক কি একটা ভাবে যেন সমুজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, অস্ফুট সজল কণ্ঠ সতেজ ও সহজ অবস্থায় ফিরিয়া আসিল।

"আমার জন্য এই অত টুকুই রেখে, বাকী সবটাই যাকে তাকেই দিতে পারেন, যাকে দিলে যথার্থ আপনি সুখী হ'তে পারবেন, তারই জন্য আজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট থাকবেন, এইটুকুই আমার আপনার কাছে শেষ ও একমাত্র অনুরোধ! মনে রাখবেন, এ পৃথিবীতে তার আপনি ভিন্ন কেউ নেই, অসহায়া অনাথা সে শত্রুপুরে।"

রামপাল নতমুখে ক্ষণকাল নীরবে চিন্তিত থাকিয়া ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন, বলিলেন; "জানি না, কি উপায়ে তুমি আমায় এই মৃত্যু হ'তেও সহস্র গুণে ভয়াবহ কষ্টাগারের ঘৃণিত জীবন হ'তে রক্ষা করলে! আমার অহঙ্কার এবার চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে।—নাঃ—জীবিত দেহে এ যন্ত্রণা সহনাতীত! আমি তোমার এ অযাচিত দয়ার দান অবহেলা করতে পারলেম না, আমার পক্ষে এতে যতই হীনতা প্রকাশ হয় হোক, আমি এ মুক্তি সাগ্রহে গ্রহণ করতেম, কিন্তু আমারই জন্য বিপন্ন, আমার মধ্যম শূরপালকে এম্‌নি যন্ত্রণাকর অবস্থায় ফেলে রেখে, আমি কি নিজেকে স্বাধীনতা ভোগ করাতে পারি? ভদ্রে! ক্ষমা করবেন, আমি—"

চন্দ্রকলা সাগ্রহে বাধা দিয়া কহিল, "মহাসামন্ত কারামুক্ত হয়েছেন, হয় ত এখনই তিনি এইখানে এসে উপস্থিত হবেন। এখন আমার এই বিনীত নিবেদন যে, আপনারা এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে প্রস্থান ক'রে, এই রাত্রেই ছদ্মবেশে দেশত্যাগী হন। পালসাম্রাজ্যে আপনাদের আর এতটুকুও স্থান নেই জানবেন। যত শীঘ্র পালাতে পারেন; ততই মঙ্গল।"

মহাকুমার বিস্মিত হইলেন। তাঁহার সন্দেহ হইল, হয় ত এ রাজাদেশ মিথ্যা! আবার ভাবিলেন, মিথ্যা হইলে এই বায়ুর দুষ্প্রবেশ্য ভয়াবহ

কষ্টাগারের মধ্যে তাহার মত এক জন নারীর এ প্রভাব কোথা হইতে আসিল ? তথাপি এই উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্রা নারীর তাঁর প্রতি এই অহেতুকী শ্রদ্ধাভরা প্রেমের অসামান্য পরিচয়ে তিনি যেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। বারেকের জন্য তাঁর মনে হইল, কি দিয়া এই অপরিশোধ্য ঋণ তিনি শোধ করিবেন ? ঈষৎ চিন্তিত থাকিয়া পরে ইহার কোন সমাধান করিতে না পারিয়া শেষে দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক কহিলেন, "বুদ্ধ ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, কিন্তু আমার জন্য তোমায় বিপন্ন হ'তে হবে না ত ?"

চন্দ্রকলা হেঁট মুখে নীরবে মাথা নাড়িল। তার পর মুখ তুলিয়া সেই গাঢ় অভেদ্য নৈশ অন্ধকারের মধ্যে মাত্র অদূরবর্ত্তী মশালের আলোকে ক্ষীণভাবে দৃষ্ট রামপালের চিরসুন্দর মুখের কষ্ট-বিবর্ণতা, গভীর বেদনাভরা নেত্রে ক্ষণকাল নীরবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মৃদু সমবেদনাপূর্ণ শান্ত স্বরে কহিল, "আমি রাজানুগৃহীতা, আমার আবার অমঙ্গল কিসের, মহাকুমার ? আমার জন্য আপনি একটুও চিন্তিত হবেন না, এখন নিজেদের রক্ষা করবার উপায় চিন্তা করুন ; আর বিলম্ব অবিধেয়।"

প্রহরী প্রদর্শিত পথে কারাধ্যক্ষের সমভিব্যাহারে মহাকুমার শূরপাল ও রামপাল সেই গর্জ্জমান অশনির ধ্বনিতে মুখর, ঝঞ্চা বায়ুসন্তাড়িত, গভীর দুর্যোগময়ী নিশীথে তাঁহাদের মাসাধিক কালের আশ্রয় প্রেত ভূমি বা মৃত্যুপুরী সদৃশ কষ্টাগার হইতে বহির্গত হইয়া আসিলেন। মাথার উপর মুক্ত আকাশ নিকষ কালো মেঘের প্রলেপে ঘন প্রলিপ্ত। ইহার কোনখান দিয়া এতটুকু একটু রন্ধ্র পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বজ্র গম্ভীর রোলে হুহুঙ্কার করিয়া উঠিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের করাল জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া লেলিহান হইয়া উঠিতেছে ; বায়ু ভীষণ বেগে বড় বড় গাছ পালা ছিঁড়িয়া উপড়াইয়া রাশি রাশি ধূলা দিগ্বিদিকে উড়াইয়া ছড়াইয়া দিয়া আশ্রয়হীন, সদ্য বন্ধনমুক্ত, শ্রান্তক্লান্ত রাজপুত্রদের তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারই

অনুকল্পে যেন তেমনই নির্দ্দয়ভাবে আক্রমণ করিল। তাঁহাদের চির-প্রিয়তম, চিরদিনের আশ্রয় জনকভূমি হইতে হয়ত বা চিরবিদায়ের অভিনন্দনের জন্য এই অতুল আয়োজন প্রকৃতি দেবী আজ সযত্নেই সজ্জিত করিয়া দুর্ভাগাদের দুর্ভাগ্যের দশাকে পরিপূর্ণতা দান করিলেন। অথবা এই নিরপরাধে অযথা অত্যাচারিত মহাপ্রাণ যুবকদের এই ভাবে একটা ঘৃণিত মহাপাপীর মতই গোপন পলায়নের শোকাবহ দৃশ্যে তাঁদের অভাগিনী জন্মভূমি নিজের অদূর ভবিষ্যতের অবস্থা কল্পনায় এই গভীর শোকাভিনয়ে হাহাকার করিতেছিলেন, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

কড় কড় শব্দে বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিল, সেই উজ্জ্বল বজ্রালোকে কুমার রামপাল দেখিলেন, তাঁর সম্মুখে সেই উদ্ভাসিত রক্তালোকে কি বিবর্ণ একখানি মুখ! বিশ্বের বেদনা যেন আজ তাহারই মধ্যে একত্র হইয়া রহিয়াছে। সেই একান্ত ব্যগ্র-ব্যাকুল দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া কুমার শিহরিয়া দৃষ্টি নত করিলেন, সৌভাগ্যক্রমে সঙ্গে সঙ্গেই সেই অত্যুজ্জ্বল লোহিতালোক মুহূর্ত্তমধ্যে ঘন জমাট অন্ধকারের রাশির মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তথাপি সতীর সুপবিত্র লজ্জাভরা ভালবাসায় চিরাভ্যস্ত রামপাল এই গর্জ্জমান বজ্রাগ্নি-শিখাদগ্ধ বিক্ষুব্ধ উগ্র প্রেমের পূর্ণ পরিচয় লাভ করিতেই পারিলেন না। প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার মত, প্রলয়াগ্নির মত যে ক্ষুধিত ক্ষুব্ধ বাসনার অনির্ব্বাণ বহ্নিজ্বালা চন্দ্রকলার স্তব্ধ নিঃশব্দ বুকের ভিতরটাকে ভস্ম করিয়া দিয়া জ্বলিতেছিল, তার প্রতি নিমেষ মাত্র না চাহিতেই রামপালের মানস-দর্পণে তখনই বিভাসিত হইয়া উঠিল, বিচ্ছেদ-রাত্রির ব্যর্থ প্রতীক্ষায় একান্ত শোকোদ্বিগ্না অশ্রুপ্লুতা সন্ধ্যা-কমলতুল্যা সন্ধ্যার অসহায় ম্লান মুখচ্ছবি!

"বিদায় ভদ্রে! এ জীবনে আপনার এ ঋণ অপরিশোধ্য! হতভাগ্য রামপালের চিত্তে আপনার এই মহত্বের চিত্রখানি চিরসমুজ্জ্বল থাকবে।"

"মহারাজকুমার! আমি ধন্য হলেম।"

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সারারাত্রির সেই ভীষণ দুর্য্যোগের পর মেঘমুক্ত সমুজ্জলতর প্রশান্ত দিবস প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রগাঢ় নীলবর্ণের আকাশে শুক্তি-শুভ্র পুঞ্জ-মেঘ সূর্য্যালোকে তুষার পর্ব্বতের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, আবার তাহা সচল থাকিয়া সেই নগরস্থিত দর্শকবর্গের বিস্মিত চিত্তে সস্মিতভাবে সেদিনের কথা জাগ্রত করাইয়া দিতেছিল, যে দিনে অচলনামধারিগণ সচল হইয়া উঠিয়া, সূর্য্যের গতি-পথ রোধেরও স্পর্দ্ধা ধারণ করিতেন, আবার নরদেহধারী উগ্রতপা মহর্ষির শাসনে চিরদিনের মতই সেই উচ্চাভিলাষে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক নিঃশব্দে তাঁহারই চরণোদ্দেশে প্রণত হইয়া রহিতেও হীনতা বোধ করিতেন না, হয়ত তাঁহারা বুঝিতেন, মহতের বিনয়ে হীনতা প্রকাশ পায় না ; পরন্তু তাহাতে মহত্বই প্রকটিত হয়।

গত রাত্রির ঝটিকা ও বজ্রপাত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর ইতস্তত: কতকগুলি আক্রমণচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল। নগরীর মধ্যবর্ত্তী ও প্রান্ত-বর্ত্তী রাজমার্গের দুই পার্শ্বে ছায়া তরুগুলির মধ্যে অনেকগুলি পথশায়ী হইয়াছে, সুন্দর সুসজ্জিত উপবনের বিলাসকুঞ্জগুলির লতাজাল ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বিশালকায় অশ্বত্থ, বট সমূলোৎপাটিত হইয়া তাড়কা রাক্ষসী বা তারকাসুরের বিকট মূর্ত্তি ধরিয়া পড়িয়া আছে। এমন কি কোন কোন স্থানের বৃক্ষমূলে বাঁধান বেদিটি শুদ্ধ শিকড়ের টানে উঠিয়া আসিয়াছে, নারিকেল ও তালের মাথায় বাজ পড়িয়া তাহার দগ্ধাবশেষ রাখিয়া গিয়াছে মাত্র।

সকালে উঠিয়া প্রায়-বিনিদ্র পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নাগরিকগণ স্নানের ঘাটে,

পথে ও প্রতিবেশীর বৈঠকে জমা হইয়া গত রাত্রির ঝড়ের আলোচনা করিতেছিল। অনেকেই বলিল, তাহাদের জীবনে এমন ভীষণ ঝড় তাহারা দেখে নাই। বৃদ্ধগণ বলিলেন, কুড়ি বৎসর কাল অন্ততঃ এরূপ ঝড় দেখা যায় নাই।

কারাধ্যক্ষ ভদ্রদত্ত প্রীত-চিত্তে প্রাতঃকৃত্য সমাধান্তে গুন্ গুন্ করিয়া একটি গীত গাহিতে গাহিতে অঙ্গন মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তোরণ-প্রহরী আসিয়া মহাপ্রতীহারের আগমনসংবাদ জানাইল।

"মহাপ্রতীহার রুদ্রদমন! গত রাত্রির মত দুর্যোগের পর অত ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়া এতখানি পথ এসেছেন? বিশ্বাস হচ্ছে না! [illegible] কেউ নয় ত? তোমরা হঠাৎ একটা বড়লোকের নাম শুনেই যেন যাকে তাকে তোরণদ্বার ছেড়ে দিয়ে বসো না।"—ইহার পর ভদ্রদত্ত আপন মনেই বলিল, "তবে এখন আর সন্দেহের তেমন কোন কারণ দেখছিনে, যার জন্য এ সব সাবধানতার প্রয়োজন ছিল, সে ত চলেই গেছে।"

প্রহরী জানাইল, আগন্তুক মহাপ্রতীহারই বটে, তাঁর সঙ্গে এক দল সশস্ত্র সৈন্য, তিনি অবিলম্বে কারাধ্যক্ষের দর্শন চাহেন।

ভদ্রদত্ত ব্যস্ত হইয়া ছুটিল, মনে মনে বলিল, "আঃ, কালকের মত দুর্যোগ রাত্রেও কি রাজার আত্মহিতের পরিবর্ত্তে পরের অনিষ্ট চিন্তাটাই প্রবল রয়েছিল? সকাল হ'তেও অবসর হয়নি? কি বিপদ্! এক দল সৈন্য নিয়ে কাকে বন্দী করে আনলে? শুনেছি, রাজ্যে একটা বিদ্রোহী দলের সৃষ্টি হয়েছে, তাদেরই না কি?"

ভদ্রদত্ত চিনিল, মহাপ্রতীহারই বটে! সবিনয়ে অভিবাদন জানাইয়া ভিতরে লইয়া আসিল,—"মহাপ্রতীহার! এ অধীনের উপর কি আদেশ করছেন?"

রুদ্রদমন কারাধ্যক্ষকে একান্তে আনিয়া রাজহস্তের লিখিত আদেশপত্র

দেখাইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "আদেশ আমার নয়, ভদ্রদত্ত! স্বয়ং ভট্টারক প্রধানের—এই দেখ, কনিষ্ঠ মহাকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ তিনি স্বহস্তে লিখে দিয়েছেন, তুমি আমি তাঁর আজ্ঞাবহ দাস মাত্র।"

ভদ্রদত্ত বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সর্ব্বশরীরে কম্পিত হইয়া কহিয়া উঠিল, "এ কি! না না, এ আমায় পরীক্ষা করচেন! নিশ্চয়ই এ আদেশপত্র মহারাজাধিরাজের লেখা নয়, অথবা—কিন্তু এ ও কি সম্ভব যে, তিনি স্বয়ং তাঁর এক জন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভৃত্যের সঙ্গে এত বড় পরিহাস করবেন?"

রুদ্রদমন অসন্তুষ্ট বিদ্রূপের সহিত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিলেন,—

"ভদ্রদত্ত! কাব্যকথা বা মানসিক বিশ্লেষণ শোনবার অবসর মহাপ্রতীহারের থাকে না, কষ্টাগারের অধ্যক্ষের অবকাশ যথেষ্ট, তা জানি, ও সব ভাবের ব্যঞ্জনা পরিত্যাগ ক'রে সোজাসুজি মহাকুমারকে তাঁর পাতালগৃহ হ'তে মুক্ত ক'রে লয়ে এস এবং এই কষ্টাগারের মশানক্ষেত্রে জল্লাদের কুঠারে তাঁকে—"

ভদ্রদত্তের কম্পিত অধরমধ্য হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল,—" 'মহারাজকুমার রামপালকে পাতালগৃহ হ'তে মুক্ত ক'রে অবিলম্বে কষ্টাগারের গোপন মশানক্ষেত্রে জল্লাদের হস্তে অর্পণ করিবে',—এ কি পরস্পর বিরোধী রাজাদেশ! মহাকুমার রামপালকে মশানে?—কেমন ক'রে আমি পাঠাব?"

মহাপ্রতীহারের গম্ভীর মুখ গম্ভীরতর হইল।

"ভদ্রদত্ত! কর্ত্তব্য কঠিন!—সম্পন্ন করবার সামর্থ্য না থাকে, পদত্যাগ করতে পার, আমায় মহাকুমারের গহ্বরপথ দেখাও, আমিই রাজাদেশ পালন করতে প্রস্তুত আছি। যখন আমরা যে পদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করি, তার সকল দায়িত্ব নির্ব্বিচারে পালন করবো, শপথ করেই তা গ্রহণ ক'রে থাকি না কি? রাজার আদেশ দেবতার আদেশ মনে করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। এতে মায়াদয়া করতে যাওয়া চলে না!"

"হা বুদ্ধ ভগবান্! এ কি করলে!"

"ভদ্রদত্ত! তুমি তোমার সীমা লঙ্ঘন ক'রে যাচ্চো! স্মরণ রেখ, মানুষের ধৈর্য্যের একটা শেষ আছে! শীঘ্র আমায় মহাকুমারের বন্দিগৃহে নিয়ে চল।"

ভদ্রদত্ত শ্বেতমূর্ত্তিতে মাথা ঘুরিয়া সবেগে মাটীর উপর বসিয়া পড়িল, রুদ্ধশ্বাসে কোনমতে কহিল,—"মহাপ্রতীহার! আপনি আমার যে কি অবস্থা করচেন, তা জানেন না! আমি যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছি! মনে হচ্চে, আর একবার আপনি আমায় ঐ কথা বল্লেই আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বো।"

ক্রোধে রুদ্রদমনের দুই চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি রোষে গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "তোমার মত কাপুরুষের নারীর মত মূর্চ্ছিত হওয়াই সঙ্গত! তবে এ মূর্চ্ছা তোমার সহজেই ভাঙ্গবে, যখন একসঙ্গে পাঁচ শত রাজসৈন্যের মুক্ত কৃপাণ তোমার মাথার উপর উদ্যত হয়ে উঠবে! ভদ্রদত্ত! এই শেষ বার তোমায় জানাচ্চি, মহাকুমার রামপালদেবের গৃহ আমায় প্রদর্শন কর।"

"তাঁর শূন্য গৃহ আমি আপনাকে এখনই দেখাতে পারি, কিন্তু তাঁকে আমি কোথায় পাব যে, আপনাকে দেখাব? আপনি অনর্থক আমার উপর এ অত্যাচার করচেন,—এ—অসঙ্গত!"

"তাঁকে কোথায় পাবে? কেন, তিনি কি মৃত? কৈ, এ সংবাদ ত আমাদের জানানো হয়নি? আঃ, তা হ'লে ত ভালই হয়েছে!—কৈ, কৈ তাঁর মৃতদেহ কোথায়? আমি স্বচক্ষে দেখতে চাই।"

কারাধ্যক্ষকে যেন বিস্ময়ের প্রাবল্যে ভূতাহতবৎ বিহ্বল দেখাইল,—সাশ্চর্য্যে ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া পরে স্খলিত কণ্ঠে উত্তর করিল,—"তাঁর মৃতদেহ? কি বলছেন আপনি? ক্ষুদ্রের সঙ্গে মহতের এত ছলনা সাজে

না। গত রাত্রে পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজের আদেশপত্র পেয়েই আমি তাঁদের দুজনকে মুক্ত ক'রে দিয়েছি কি না, তারই পরীক্ষার্থ নিশ্চয়ই তিনি এই ছলনাবলম্বন করেছেন! তিনি কি জানেন না, তাঁর আদেশকে আমরা কত বড় মনে করি যে. তা পালন করতে যত বড় দুর্যোগই ঘটুক, মাথার উপর আকাশ যদি ভেঙ্গেই পড়তো, তবু কি বিলম্ব করতে পারতেম? তাঁকে জানাবেন, গত রাত্রেই তাঁর ভ্রাতৃদ্বয় বন্দিত্ব হ'তে মুক্ত হয়ে কষ্টাগার ত্যাগ ক'রে গেছেন, সম্ভবতঃ রাজপ্রাসাদেই তাঁদের দেখা পাওয়া যাবে। তবে মহাসামন্ত যদি সোজাসুজি মগধ যাত্রা ক'রে থাকেন ত সে কথা আমি বলতে পারিনে। খুব সম্ভব, রাজদর্শন না ক'রে তিনি যাবেন না।"

এবার বিস্ময়ের সেই গভীর বিহ্বলতা কারাধ্যক্ষের নিকট হইতে ফিরিয়া মহাপ্রতীহারের উপর আসিয়া পড়িল। রুদ্রদমন সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিলেন, "এ কি অর্থহীন প্রলাপ, না সত্য কথা, ভদ্রদত্ত? রাজার আদেশপত্র পেয়ে মহাকুমারদ্বয়কে গত রাত্রে তুমি মুক্ত ক'রে দিয়েছ? সাবধান, ভদ্রদত্ত! যা বলচো, ভেবে চিন্তে কথা বলো। তোমার জানা উচিত, এ সম্বন্ধে তামাসা করেও এত বড় কথা তোমার উচ্চারণ করা সঙ্গত নয়! রাজবন্দীদের সম্বন্ধে তোমায় বিশেষভাবেই উপদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, স্বয়ং মহারাজাধিরাজের স্বহস্ত-লিপি ব্যতীত কোনক্রমেই তাঁদের সম্বন্ধে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটবে না, স্বয়ং রাজগুরুর বাক্যেও নয়।"

ভদ্রদত্ত এইবার ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইল, তীব্রকণ্ঠে কহিল "কেন আপনি অনর্থক আমায় ভয় দেখাচ্ছেন মহাপ্রতীহার? আমার কর্ত্তব্যে আমি কোনই ত্রুটি ঘটতে দিইনি। পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজের স্বহস্তলিখিত, স্বয়ং স্বাক্ষরিত আদেশপত্রের লিখন পেয়ে তাঁর আদেশমতই আমি রাজবন্দীদের তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছি।"

"কোথায় সেই আদেশপত্র ?" মহাপ্রতীহার কোনমতে এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিলেন।

"এই দেখুন"—বলিয়া ভদ্রদত্ত বুক ফুলাইয়া গম্ভীরপদক্ষেপে চলিয়া গিয়া ক্ষণমাত্র পরেই রাজার লিখিত ও স্বাক্ষরিত তাহার নামীয় আদেশপত্র মহাপ্রতীহারের হস্তে আনিয়া দিল।

রুদ্রদমন মনে মনে একবার—দুইবার—বার বার করিয়াই তাহা পাঠ করিলেন। এ পত্র বাস্তবিক রাজাধিরাজেরই লিখিত বটে। পত্রবাহকের নিকট হইতে পত্রপ্রাপ্তিমাত্র অবিলম্বে রাজ-ভ্রাতৃদ্বয়ের বন্ধন...নপূর্ব্বক তাঁহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিবার জন্য সুস্পষ্টই আজ্ঞা র...ছে। না, কোন সংশয়ই নাই, নিশ্চয়ই ইহা রাজার আদেশ!

তবে আজ রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে ডাকাইয়া আনি... এই রূঢ় আদেশ প্রচারের অর্থ কি ছিল ? এ ছলনা চিরানুগত তা...ঙ্গে কেন ?—ওঃ, বুঝা গিয়াছে!

বিদ্যুদালোকে যেমন মুহূর্ত্তমধ্যে অন্ধকারের মধ্যবর্ত্তী অদৃশ্য ব...হসাই দৃশ্য হইয়া উঠে, তেমনই তীব্র আলোকপাতে মহাপ্রতীহারের ...ংশয়াকুল চিত্ত সহসাই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। হয় ত আমার বিশ্বস্ততার—আনুগত্যের এ একটা কঠোর পরীক্ষা! ঠিক—হয় ত তাই!—

মনে মনে মহাপ্রতীহার সগর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিলেন। যাই হোক, এত বড় মহা পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়াছি, সেই যথেষ্ট! মগধের মহাসামন্তর পদ কি আমি চাইলে পাবো না ? আচ্ছা শূরপালটাকে অনর্থক মুক্ত করা হলো কেন ? মগধীরা আবার গোলযোগ না করে!

এই নূতন চিন্তায় ঈষন্মাত্র চঞ্চল থাকিয়া অথচ পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়ার গৌরবে প্রফুল্লচিত্ত মহাপ্রতীহার তখনই কষ্টাগার হইতে বিদায় লইয়া ত্বরিতে রাজদর্শনে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এই সংবাদ যখন রাজার কাছে পৌঁছিল, বসুধাবক্ষোবিদারী গৈরিক-নিস্রাব যে নিজের চোখে দেখিয়াছে, সেই লোক তাঁর অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা ভিন্ন অন্যের পক্ষে সম্ভবই নয়।

রামপাল বন্ধনমুক্ত! রামপাল পলায়িত! তাঁর চিরজীবনের মহাশত্রু, তাঁর সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁর সম্মানের—রাজগৌরবের—এমন কি, তাঁর অপ্রতিহত প্রেমরাজ্যেরও প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী এই ভ্রাতৃ-শত্রু তাঁর করতলায়ত্ত হইয়াও আজ পলাইয়া গেল! কি অসম্ভবই সম্ভব হইল!

কষ্টাগারের মত সুদৃঢ় দুর্গমধ্যস্থ পাতালগর্ভ-গহ্বরে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় রক্ষা করিয়াও সেই অজেয় রামপালকে তিনি জয় করিতে পারিলেন না! ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ঘটনা আর কি ঘটিবার আছে?

ভীষণ জ্বালাময় ক্রোধের অসহিষ্ণুতা রাজাধিরাজকে অতিষ্ঠ করিয়া যেন তাঁহাকে রত্ন-পর্য্যঙ্ক হইতে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল। আহত সিংহের ক্ষিপ্ত রোষের মত ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ ক্রোধের জ্বালায় নীরবে গুমরিয়া ফিরিয় ক্ষণপরে ঈষন্মাত্রায় আপনাকে সম্বরণপূর্ব্বক নৃপতি ঘোর বিস্ময়াভিহত এ রকমই বাক্যহারা অপব ব্যক্তির সম্মুখীন হইয়া পদচারণা বন্ধ করি দাঁড়াইলেন, "সে আদেশপত্র যে কৃত্রিম নয়, কেমন ক'রে তা জান্‌লে?"

"আমি ভাল করেই সে লিপি পরীক্ষা ক'রে দেখেছি, রাজাধিরাজ লিপি সত্য বলেই মনে হয়, কিন্তু যদি আপনি তা' না লিখে থাকেন, ত হ'লে নিশ্চয়ই তাহা আপনার লেখা নয়।"

রাজাধিরাজ পুনশ্চ অস্থিরপদে কক্ষমধ্যে পরিক্রমণ করিয়া আসি-লেন,—"রুদ্রদমন! তাতে পত্রবাহকের নাম লেখা আছে?"

"আজ্ঞে না, মহারাজাধিরাজ! পত্রবাহকের নাম লেখা নেই। আমারও এটা অসঙ্গত ঠেকেছিল।"

"তবে নিশ্চয়ই সে পত্র মিথ্যা!" রাজাধিরাজের আরক্ত নেত্রদ্বয় অগ্নিবর্ষণ করিল।

"রুদ্রদমন!"

"রাজাধিরাজ!"

"সৈন্যদল সজ্জিত করতে আদেশ দাও, তাদের নিয়ে শীঘ্র শূরপাল ও রামপালকে ধৃত করতে চ'লে যাও, যেখানে পাও, জীবিত কি মৃত তাদের আমার কাছে এনে দেবে। তারা মগধে পৌঁছাবার পূর্ব্বেই তাদের বন্দী করা চাই। দণ্ডমাধবকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, তুমি নিজে যাও, সমর্থ হ'লে মগধের মহাসামন্তপদ তোমারই।—কিসের বিলম্ব? কি বলবার আছে? অনর্থক কেন দেরী করছ? অথবা শূরপাল ও রাম-পালকে ক্ষমা করবার কথা তোমার মুখ থেকেও আমায় শুনতে হবে না কি? আমার পৃথিবীর প্রধান শত্রুকে যে ক্ষমা করতে বলবে, তাকেও আমার শত্রু বলে জেনে রেখ।"

রুদ্রদমন ঈষৎ আহত স্বরে কহিলেন, "আমি আপনার আদেশ সম্বন্ধে কোন দিনই ত কোন প্রতিবাদ করি নি, মহারাজাধিরাজ! নির্ব্বিচারে সকল আদেশ চিরদিন ধ'রেই ত পালন ক'রে আসচি। আমি এইটুকু শুধু বলতে চাচ্ছিলেম, ভেবে দেখুন দেখি,—কোন স্ত্রীলোক কি মহা-কুমারের মুক্তিপত্র আপনার কাছে কোন দিন লিখিয়ে নিতে পারেন না? সে পত্র কৃত্রিম ব'লে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারচিনে, রাজাধিরাজ!"

রাজার ললাট কুঞ্চিত হইল, "পট্টমহাদেবী! কৈ না! রামপালের

বন্দিত্বের পর আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎও করি নি, তিনিও এ সম্বন্ধে আমায় কোন অনুরোধ জানান নি।—না না, তুমি বিলম্ব ক'রে ফেলো না, মহাপ্রতীহার! পাঁচ হাজার, দশ হাজার, যত ইচ্ছা সৈন্য নিয়ে তাদের অনুসরণ কর,—শোন রুদ্রদমন!—শুনে যাও—"

কুমার রুদ্রদমন দ্বার সমীপস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

"এক দিন এক জনের কুহকে ভুলে গিয়ে সেই এক জনকে আমি একখানা ঐ রকমই আদেশপত্র লিখে দিয়েছিলেম বটে! এখন আমার মনে পড়ছে, হ্যাঁ, আমিই লিখেছিলেম,—কিন্তু পরমুহূর্ত্তে তার প্রভাব কাটিয়ে ফেলে তোমায় তাকে বন্দী করতে পাঠাই, তুমি তাকে কষ্টাগারেই রেখেছিলে ব'লে সংবাদও দিয়েছিলে। সেই বোধিদেব,—সেই বোধিদেব এই ষড়যন্ত্রের নায়ক নয় ত?"

রুদ্রদমন সবিস্ময়ে চিন্তিত হইলেন।

"কিন্তু কষ্টাগারের ভূগর্ভে বাস ক'রে সে কেমন ক'রে ষড়যন্ত্রলিপ্ত হবে? নিশ্চয়ই বাহিরের লোকের সাহায্য আছে।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আদেশপত্র কি তুমি তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নাও নি মহাপ্রতীহার?"

লজ্জিত হইয়া কুমার রুদ্রদমন মাথা নত করিলেন, "আমার এ কথা মনে পড়েনি, রাজাধিরাজ! কষ্টাগারের বন্দীকে আমরা জীবিতের বাইরেই হিসাব ক'রে থাকি, সেই জন্যই এত বড় ভুল হয়ে গ্যাছে।"

রাজা তীক্ষ্ণ, গম্ভীর স্বরে কহিয়া উঠিলেন, "সেই ভুলেরই এই পরিণাম! রুদ্রদমন! দণ্ডমাধবকে সৈন্য নিয়ে পাঠাও, তুমি দরকার বোধ করলে কষ্টাগারের প্রত্যেকটি ইট খসিয়ে, তার মধ্যের সমস্ত লোকের শির স্কন্ধচ্যুত ক'রে এই ষড়যন্ত্রের কর্ম্মকর্ত্তাদের আবিষ্কার ক'রে দাও, তাদের মধ্যের একটি ক্ষুদ্রতর প্রাণীকেও আমি পৃথিবীর সব চেয়ে কঠোর শাস্তি

দিতে বাকী রাখবো না।—যাও, দেখ বোধিদেব কারাগারে আছে কি না, যদি থাকে, প্রথম আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।"

ক্ষুধিত সিংহকে পিঞ্জরাবদ্ধ রাখিয়া তাহাকে খোঁচা দিলে তাহার যে রকম অবস্থা হয়, রাজারও আজ সেই অবস্থা! রামপাল! রামপাল! আজীবন ঘরে বাইরে তাঁর সকল সুখেরই সে চির-হন্তারক! পিতা তার পক্ষপাতী, প্রজাবৃন্দ ও আত্মীয়স্বজন তার অনুরক্ত, বিবাহিতা স্ত্রী তারই পক্ষ, আবার যাহাকে অন্তরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আদরে স্থান দিয়াছেন, সেও তাহারই প্রেমার্থিনী! তার জন্য তাঁকে তুচ্ছ করে সে! রামপাল তাঁর ভীষণ শত্রু, এত বড় শত্রু পৃথিবীর মধ্যে আর দ্বিতীয় কেহ নাই,—সেই রামপাল তাঁর কঠোর শাসন পাশ হইতে অবলীলায় মুক্ত হইয়া গেল! আর এই অপমান তাঁহাকে নীরবে সহ্য করিতে হইবে? অসম্ভব! ইহার জন্য সমস্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগুন জ্বালিতে হয়, তা ও জ্বালিতে হইবে।

মহাপ্রতীহারের পশ্চাতে ম্লান ও দীনবেশী, বিশীর্ণমূর্ত্তি বোধিদেব রাজকীয় সুসজ্জিত কক্ষের মধ্যে প্রকৃতির পরিহাসের মতই অসদৃশ রূপে প্রবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইলেন। রাজাকে তিনি কোন প্রকার অভিবাদন জানাইলেন না, তার উপায়ও ছিল না, হস্ত তাঁর শৃঙ্খলাবদ্ধ।

রাজা বারেক মাত্র আরক্তনেত্রের দগ্ধকারী দৃষ্টি দিয়া তাঁহার ভূতপূর্ব্ব সচিবের শুষ্ক অথচ প্রশান্ত নির্ভীক মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তার পর সেই দৃষ্টি বাহিরের দিকে মেলিয়া ধরিয়া চেষ্টা সংযত গম্ভীর স্বরে কথা কহিলেন; কহিলেন, "গত রাত্রে রামপাল ও শূরপাল কষ্টাগার হ'তে পলায়ন করেছে, এ সংবাদ নিশ্চয়ই তুমি বিদিত আছ? কিন্তু তুমি নিজে যে পালিয়ে যাওনি?"

রাজবাক্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক আগ্রহ-মথিত কণ্ঠে বোধিদেব

রাজাকে বাধা দিলেন, "জয় হোক মহারাজাধিরাজ! গত রাত্রে যেমন অনিদ্রায় ক্লেশভোগ করেছি, এমন ঐ কষ্টাগারে ঢুকে পর্য্যন্ত আর এক দিনও নয়।—যা হোক, তা হ'লে মহাকুমাররা নিরাপদে কষ্টাগার ত্যাগ করতে পেরেছেন? জয় ভগবান্! জয় জনার্দ্দন!"

রাজার সমস্ত মুখখানা অকথ্য ক্রোধে সকালবেলার সূর্য্যের মতই অরুণাভ হইয়া গেল, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া তিনি চীৎকার শব্দে কহিয়া উঠিলেন, "নির্ল্লজ্জ ব্রাহ্মণ! তুমি কি জীবনের আশা রাখ না?"

বোধিদেব ঈষৎ হাসিলেন; কহিলেন, "মড়াকে খাঁড়ার ভয় দেখাচ্ছেন? কষ্টাগারের বন্দীর কাছে জীবন মৃত্যুর প্রভেদটা কি, মহারাজাধিরাজ?"

"আমি যদি তোমায় শূলে দিই?"

"পালসম্রাজ্যের তা হ'লে শেষ দিন উপস্থিত হয়েছে জেনে যাব। ব্রাহ্মণের শূলদণ্ড দণ্ডনীতির একেবারেই বহির্ভূত!—তবে আমার পক্ষে?—তা'তেই বা ক্ষতি কি? মৃত্যু এক জন্মে কারও দু'বার হয় না, একবারই হয় এবং তা অনিবার্য্যই।

'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃর্ত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ,
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।'

ভগবানই বলে গেছেন।—আর মরণ? তা সে শালে হোক, শূলে হোক, রোগে হোক, যুদ্ধে হোক, যে ভাবেই হোক, মৃত্যুযন্ত্রণাভোগ একবার করতেই হবে, তার জন্যে কাতর হলেই বা চলবে কেন?"

বিস্ময়াতিশয্যে রাজার সেই অসীম কোপাগ্নি যেন ঈষৎ শীতল হইয়া আসিল, তিনি নিজেকে ঈষৎ সংযত করিয়া লইয়া কহিলেন, "পুরুষানুক্রমে তোমার পিতৃ-পুরুষদের বরেন্দ্রীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদে প্রতিষ্ঠিত রাখার এই পুরস্কার বটে? রাজার ও রাজ্যের মহাশত্রুকে তুমি মুক্তি দিলে! জানো, এর ফলে রাষ্ট্রবিপ্লব অনিবার্য্য!"

একটা সকৌতুক ও সকরুণ হাস্যচ্ছটায় তরুণ ব্রাহ্মণের অস্থিময় অথচ তেজোদীপ্ত সৌম্য মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—"সেই পিতৃগণের ঋণ-মোচনার্থ-ই আমার এই প্রচেষ্টা রাজাধিরাজ! রাষ্ট্রবিপ্লব এ রাজ্যে অনিবার্য্য, সে ধারণা আপনার ভুল নয়, কিন্তু রামপাল সে জন্য দায়ী হতে পারেন না। জানি না, কি কারণে তিনি আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না ব'লে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! তাই এই লাঞ্ছনা ভোগ করেও নীরব আছেন। সহস্রের আহ্বানকেও উপেক্ষা করে বিশ্বের নিন্দিত হয়েছেন, যদিও আমি তাঁকে বলেছি যে, ক্ষত্রিয়ের এত বড় ক্লীব-প্রতিজ্ঞার কোন মূল্য নাই, বড় একগুঁয়েমীতে কিন্তু সে ও ত কম নয়! সে বলে, প্রতিজ্ঞারক্ষাই প্রকৃত ক্ষাত্রধর্ম্ম, কোন লাভ লোকসানে তাকে বিসর্জ্জন দিতে পারি না। আর একেই আপনি ভয় করেন? বলেন, রাজদ্রোহী! হরি! হরি! সে রাজদ্রোহী হলে যে আমি বাঁচতুম!"

রাজা ক্ষণকাল নীরব রহিলেন, বোধিদেবের এই কথাগুলিকে অবিশ্বাস করিতে গিয়া তাঁর মন যেন সহসা কতকটা বিশ্বাস করিতে চাহিল, রামপালের সমস্ত ব্যবহার যেন এই কথারই সাক্ষ্য দিতে উদ্যত হইয়া উঠিতে থাকে। কিন্তু না, বিবেকবাণীতে কর্ণপাত করা মহীপালের ধর্ম্ম নয়। তা সে না নিজের, না পরের। সবিদ্রূপ রুষ্ট হাস্যের সহিত তিনি উত্তর করিলেন, "ও সব আষাঢ়ে উপাখ্যান দিয়ে পুঁথি রচনা করো, মূর্খ প্রজারা মুগ্ধ হ'বে, আমার ও সব কল্পনা-কথা শোনবার অবসর নেই। এখন তোমায় জিজ্ঞাস্য এই যে, তুমি যখন কারাগারে রয়ে গেলে, তখন এক জন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই সাহায্যকারী নেওয়া হয়েছিল, তিনি কে?"

বোধিদেব কহিলেন, "আমার নিজের কথাই আমি বলতে পারি, অন্যের কথা বলবার অধিকার আমার নেই; এবং আমি তা' কোনমতেই বলব না। এর জন্য আপনার যা ইচ্ছা হয়, আপনি করতে পারেন।"

হুতাশনদীপ্তির মতই প্রজ্বলিত ক্রোধে রাজাধিরাজ সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া রক্তপিপাসু বাঘের দৃষ্টিতে মন্ত্রিপুত্রের অকুতোভয় মুখের দিকে চাহিলেন। একটা ভয়ানক কিছু ঘটনার জন্য সকলেই—এমন কি, তিনি নিজে শুদ্ধ প্রস্তুত থাকিলেও সেটা কিন্তু তখনই ঘটিল না। গভীর বলে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া তিনি পুনশ্চ আসন গ্রহণ করিলেন।

"তুমি না বল্লেও এ সংবাদ আমি যেমন করেই হোক, বাহির করবো।— মহাপ্রতীহার!"

মহাপ্রতীহার এতক্ষণ প্রশস্ত কক্ষের অপর প্রান্তে রাজাদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সসম্ভ্রমে সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন জানাইলেন।

"তোমার অনুসন্ধানের ফল বল। ভালকথা!—বোধিদেব! আমার লিখিত আদেশপত্র তুমি ব্যবহার করলে কেন? কি অধিকারে এ কাজ করতে ভরসা করলে বল? এ'কি মিথ্যাচার নয় ব্রাহ্মণ?"

বোধিদেব কহিলেন, "সম্পূর্ণ বিধি-সঙ্গত ন্যায্য অধিকারেই মহারাজাধিরাজ! আপনিই ত' তা' আমায় ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। মধ্যে কিছু দিন নিজের বন্দীত্বের বাধায় আমার কাছে সেটা অব্যবহারে পড়েছিল মাত্র! আপনি কি সে পত্র আমায় স্বহস্তেই দেন নি?"

"কিন্তু তার পরই আমি তোমায় বন্দী করতে আদেশ পাঠাই কি না?"

"নিশ্চয়! কিন্তু সেই সঙ্গে প্রথম আদেশ প্রত্যাহার করেননি ত! করেছিলেন কি? তা যদি করতেন, তা হ'লে সে আদেশপত্র আমার কাছে থাকতেই পারতো না। আমি যদি কিছু ক'রে থাকি, সে আপনারই আদেশ পালন। তবে কিছু দেরী হয়ে গেছে এই যা।—তা' সেটা অবশ্য আমার অপরাধ নয়?"

ভূমিতে একটা প্রচণ্ড পদাঘাত করিয়া মহীপাল মহাপ্রতীহারের দিকে ফিরিলেন, "কিছু সংবাদ পেলে কি?"

রুদ্রদমন কহিলেন, "পেয়েছি মহারাজাধিরাজ !"

"আঃ, পেয়েছ ! তাদের সবাইকে শূলে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে ? নিশ্চয়ই কারারক্ষীরা এর মধ্যে আছে, আর কোন লোক—আর কেহ—"

"হ্যাঁ,—এক জন স্ত্রীলোক মাত্র।"

"'স্ত্রীলোক!' রাজা চমকিয়া উঠিলেন, তাঁর সমস্ত শরীরের রক্ত তর্‌তর্‌ বেগে তাঁর মাথায় ও মুখে ছুটিয়া উঠিতে লাগিল, তীব্র কণ্ঠে মৃদু গর্জ্জনে উচ্চারণ করিলেন—"পট্টমহাদেবী ! ওঃ রাক্ষসী !"—

রুদ্রদমন মাথা নাড়িলেন, "না, তিনি নন।"

তার পর ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত একটি অলঙ্কার-পেটিকা এবং তার উপর ভোরের শিশিরবিন্দুর মতই নির্ম্মল সুগোল একটি মুক্তাহার স্থাপন করিয়া কহিলেন—"সে রাত্রির তোরণ-রক্ষী প্রহরীর নিকট এইগুলি পাওয়া গেছে। কারাধ্যক্ষ বলেন, রক্ষী তাঁকে রাজাধিরাজের লিখিত আদেশপত্র প্রদর্শন করায়, সেই পত্রের লিখিত মত সে নির্বিচারেই বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে, তোরণ-প্রহরী এই অলঙ্কারের উৎকোচ নিয়ে উৎকোচ-দাত্রীকে খুবই সম্ভব অমাত্য বোধিদেবের গহ্বরে কনিষ্ঠ কুমারের গহ্বরের পরিবর্ত্তে প্রবেশ করতে দিয়েছিল, সেখান থেকে এসে তিনি ঐ আদেশপত্রটি প্রদর্শন করেন, অনুসন্ধানে এই সংবাদগুলি জানতে পারা গ্যাছে।"

দেখিতে দেখিতে রাজাধিরাজের সেই গাঢ় রক্তে সুলোহিত ক্রোধ-রঞ্জিত মুখ শব শুভ্র হইয়া গেল। তিনি কোনমতে শুধু উচ্চারণ করিলেন—"ওঃ ! বুঝতে পেরেছি !"

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শাখানিবিড় বটের তলাটি বাঁধানো—পাশেই প্রকাণ্ড দীঘিটি কূলে কূলে ভরা, জল যেন তার কাকচক্ষু, চারি পাশের ঢালু পাড় কচি ঘাসে শ্যামল হইয়া উঠিয়াছে, মাঝখান দিয়া বাঁধনো সোপান। সোপান-শ্রেণীর ঠিক উপরেই একটা সুনিবিড় ছায়াভরা আমগাছ। কোথাও কোন জনপ্রাণীটি পর্য্যন্ত ছিল না। আম্রমঞ্জরীর গন্ধে শুধু চারিটি দিক ভরপুর হইয়া আছে। কোথাও বসিয়া একটা বিরহী ঘুঘু ডাকিতেছিল।

চন্দ্রকলা একা সেই আমগাছের ছায়ার মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গিয়াছিল। চিন্তা তার নিজের সমস্ত অতীত ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে এবং সেই সব স্মৃতির সবখানিকেই ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল, কুমার রামপালের কথা! সেই নির্য্যাতিত, লাঞ্ছিত, পলাতক ভিখারী রাজপুত্রের অচ্ছেদ্য স্মৃতির কঠিন পাশে তার সমুদয় মনটা যেন দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছিল, কিছুতেই ইহা হইতে সে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইতে পারিতেছিল না। সেই তরুণ-কন্দর্পের মতই সুন্দর—তরুণ রাজকুমারকে গত রাত্রে কি শীর্ণ বিবর্ণ প্রৌঢ়ের মূর্ত্তিতেই সে দেখিয়া আসিয়াছে, সেই অকরুণ দৃশ্যই ঘুরিয়া ফিরিয়া তার মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছিল।—তার কানে বাজিতেছিল ক্ষীণ পরিক্লিষ্ট ক্লান্ত—করুণ সেই স্বর!—ওঃ, চন্দ্রকলা পাষাণীর মতই সে দৃশ্য দেখিয়াছে শুনিয়াছে,—তার অটুট ধৈর্য্য তাহাকে তথাপি আত্মবিস্মৃতা হইতে দেয় নাই!

গভীর দীর্ঘশ্বাসে তার ব্যথিত বক্ষ ফুলিয়া উঠিল। রূপ-জীবিনীর গর্ভজাতা, সেই শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিতা রূপ-জীবিনী সে, এ কি তার অন্তরের অবিশ্বাস্য পরিণতি? এত সুখ, এ ঐশ্বর্য্য, এ যে তার শ্রেণীর নারীদলের সাধনার সিদ্ধি! এই ভোগৈশ্বর্য্যের সমস্ত আনন্দ ও গৌরব বিষ-তিক্ত করিয়া ঐ তার প্রতি একান্ত বিমুখতায় উদাসীন, ভিখারীরও অধম, দণ্ডিত, পলায়িত, লাঞ্ছিত লোকটাই তার সমস্ত মন প্রাণ অন্তর বাহিরটাকে অধিকার করিয়া লইল, এ যে কেমন করিয়া, এ যেন বিশ্বাস করিতেও পারা যায় না! অথচ এর হাত হইতে আর উদ্ধারেরও তো উপায় নাই! ভোগ যেন বিছার কামড়ের মতই অসহ্য মনে হইতেছে; এর চেয়ে যেন সে ও সহা যায়,—যা' সেই অভাগা রাজপুত্র এত দিন সহিতেছিলেন, সেই ভয়াবহ কষ্টাগারের পাতালপুরীর দুর্ব্বহ জীবন!

চন্দ্রকলা সেই ভীষণ গহ্বর স্মরণে শিহরিয়া উঠিল। মনে মনে বলিল,—বোধিদেব তবু শৃঙ্খলাবদ্ধ নহেন,—কিন্তু কি উচ্চ উন্নত চরিত্র ঐ বোধিদেবের!—মানুষ জগতে এত ভালও ত থাকে? বেশী আছে কি? হয় ত আছে। আমরা এদের পরিচয় কোথা হ'তে পাবো? আমরা যাদের দেখি, তারা যে স্বতন্ত্র জগতের জীব। এদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি? আমরা এদের কাছে নরকের দ্বার, আমাদের প্রসঙ্গমাত্র এঁদের কাছে ত্যাজ্য-সুখ!—হায় মহারাজকুমার! যদি আমায় একটিবারও ভালবাসতে!—না, না, ভালই করেছ! ভাল যে বাস নাই, সে ভালই করেছ। নাহলে আমায় এমন করে আকর্ষণ ত করতে পারতে না! আমায় ভাল ত অনেকেই বেসেছে, আজও বাসে, আমি ত কোন দিনই তাদের ভালবাসি নি? তবে তোমার কাছে ভালবাসা পেলেও হয় ত আমার এ গভীর শ্রদ্ধা আঘাত পেত। ভালবাসাই যে ভালবাসাকে

আকর্ষণ করে আনে, তাও ত নয়! কিন্তু কি আশ্চর্য্য বিচিত্র এই মানুষের মন! সেই আমাদের সর্ব্ব প্রথম দিনের প্রথম দেখা, সে আমি আজও ভুলতে পারিনি। সেদিনকার তোমার চোখের সেই অকথ্য ঘৃণার লেখা, উঃ সে কি কঠোর? কি মর্ম্মন্তুদ? অথচ সেই-ই আমার সর্ব্ব প্রথম তোমার প্রতি এই গভীর আসক্তি এনে দিলে! সেই প্রথমবার আমি মানুষের চোখে বিলাসের আকাঙ্ক্ষার, দুরন্ত ক্ষুধার পরিবর্ত্তে তপস্বীর সংযমপূত অনাসক্তির দেখা পেলেম। আমার জীবন যৌবন যেন বদ্‌লে গেল।

কিন্তু দুর্ল্লভকে ভালবাসতে গেলে কান্না ভিন্ন আর কিছুরই যে আশা নেই, এটা বোধ করি বা জগতের একটা সনাতন বিধিই? কিন্তু সেই ভাল, সেই ভাল। হীনের অঙ্কাশ্রিতা থাকার চেয়ে মহৎকে ভালবেসে মরণও শ্রেয়ঃ!

একটা অগ্নিতপ্ত দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক চন্দ্রকলা তার বাসন্তী কোকিলের সমতুলিত মধুর কণ্ঠে মৃদু মৃদু গাহিয়া উঠিল,—

> "দুর্ল্লভ জন অনুরায়ো লজ্জা গুরুই পরবশো অপ্পা
> পিয়সহি বিসমং পেম্মং মরণং শরণং—"

"হ্যাঁ প্রিয়সখি! এইবার মরণ শরণেরই কাল তোমার এসে পৌঁছে গ্যাছে! এই মানুষটাকে কি চিন্‌তেও পার্‌চো না, আর আজ প্রিয়-সখি চন্দ্রকলা? ফিরে একবার চেয়েও যে দেখলে না? বলি, এক দিন সুলভ ছিলেম বলে কি মনের মধ্যে এতটাই বিরাগ ধরে রাখতে হয়? অথবা দুর্ল্লভ-জনের অনুরাগে মন এতই ভ'রে আছে যে, এ হতভাগ্য ভূত-পূর্ব্ব—সুলভের উপস্থিতিটা শকুন্তলার মত জানতেও পারচো না?"

শুধু ফিরিয়া চাওয়াই নয়, সঙ্গে সঙ্গে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া করযোড়ে

চন্দ্রকলা রাজাধিরাজকে তার পুষ্প স্তবক কোমল দেহলতা আনত করিয়া বিনম্র অভিবাদন জানাইল, কহিল, "ভিতরে চলুন, এখানে রাজযোগ্য সম্মানাসন নেই।"

কঠোর ব্যঙ্গমিশ্রিত কুটিল হাস্যে নৃপতির সুগৌর সুন্দর মুখ অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল, সবিদ্রূপে উত্তর করিলেন, "ধন্যবাদ সুরসিকা! কিন্তু তোমার বহু প্রার্থিত প্রিয়সঙ্গসুখে আনন্দ উপভোগ করবার সুযোগ আপাততঃ আমার হবে না, মাত্র বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি প্রশ্ন করবার আছে, —সে এখানেও হ'তে পারবে।—চেয়ে দেখ দেখি, এই মুক্তামালা গাছা তোমার পরিচিত ব'লে মনে হচ্চে কি না? এটা এক দিন আমার কাছে তুমি অনেক মান অভিমান জানিয়ে অনেক চেষ্টায় চেয়ে নিয়েছিলে—সে কথা কি আজ তোমার মনে পড়ে, চন্দ্রা?"

চন্দ্রকলা তার নত দৃষ্টি বারেক মাত্রও না তুলিয়া শুধু মৃদু কণ্ঠে উত্তর করিল, "পড়ে"।

"এর দাম যে লক্ষ সুবর্ণ-নিষ্ক, এ কথাটাও তুমি জান্‌তে না কি?"

নর্ত্তকী মস্তক হেলাইয়া ইহারও প্রত্যুত্তর সমাধা করিল।

"এক দিন যেটা তোমার পরম ঈপ্সিততম বস্তু ছিল, আজ প্রেমোন্মাদনার উদ্দাম স্রোতে ভেসে গিয়ে সর্ব্বত্যাগিনী হয়েছ বলে তার আর কোন রকম মূল্য নির্দ্দেশ করতেও পারনি? বানরের গলাতেও সেটা ঝুলিয়ে দিতে এতটুকু মমতা পর্য্যন্ত হয় নি? কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হতভাগ্য আমারই কণ্ঠে তোমার অনাদৃত সেই মুক্তা হারটা ফিরে এসে পৌঁছে গ্যাছে, তা' দেখতে পাচ্চো ত? তোমায় আমায় এমনই দুর্ল্লঙ্ঘ্য সম্বন্ধটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে বটে! এই হার ভূতপূর্ব্ব পট্টমহাদেবীর একথা তুমি শুনেছ কি?" চন্দ্রা মৃদু কণ্ঠে উত্তর করিল, "শুনেছি।"

"তাই তার এত বড় মর্য্যাদা দিয়েছিলে?"

চন্দ্রকলা নীরব রহিল। বলিবার তার ছিলই বা কি যে বলিবে? এই হাস্য-প্রচ্ছাদিত রাজ রহস্যের নিম্নভাগে যে জিনিষটার অস্তিত্ব প্রকাশ পাইতেছিল, সেটা শুধু শ্যামতৃণপত্রাচ্ছাদিত আগ্নেয়গিরির সঙ্গেই তুলনীয়।

রাজাধিরাজ নিকটস্থ বৃক্ষ হইতে একটি মুকুলিত ক্ষুদ্র আম্রশাখা ছিঁড়িয়া লইয়া তাহারই পত্র ছিন্ন করিতে করিতে ডাকিলেন, "চন্দ্রকলা!"

চন্দ্রকলার কানে সে ডাক পৌছিল না, সে ইহারই মধ্যে বিমনা হইয়া ভাবিতেছিল, এত শীঘ্র এ সংবাদ প্রচার হইয়া গেল! রামপাল হয় ত ধরা পড়িবেন! এর মধ্যে কত দূরই বা আর যাইতে পারিয়াছেন!

"চন্দ্রকলা! অনেক দিন আমরা একসঙ্গে একত্র বাস করেছি, আমার অন্নে তোমার এই বর দেহ অনেকখানি পুষ্টি লাভও করেছে, আজ তোমার প্রয়োজন নাই থাক, এক দিন জগতে দুর্ল্ভ মণি-রত্ন যথেষ্ট পরিমাণেই আমি তোমায় পরিয়েছি, তার জন্য একটু খানি কৃতজ্ঞতাও কি নেই আর? আজ দু'একটা সত্য কথা আমার সঙ্গে কইবে কি?"

এবার চন্দ্রকলা রাজার কথা শুনিতে পাইল, কিন্তু এই ভয়াবহ সত্য উত্তর দিতে সে কিছুমাত্র ভীত হইল না, সে মনে মনে বলিল, 'আমার আর ভয় কি?' প্রকাশ্যে কহিল, "বলুন কি শুনতে চান।"

"যাকে তুমি এই অলঙ্কারের প্রলোভন দিয়ে এই দুঃসাধ্য কায করতে পাঠিয়েছিলে, কেমন সাহসিকা সে যে, গত রাত্রির সেই দুর্য্যোগে অত রূঢ় দুর্গম দুর্গের মধ্যে প্রবেশ ক'রে এত বড় অসাধ্যসাধন ক'রে এলো?"

"সে? সে, আমি।"—অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে চন্দ্রকলা এইটুকু

বলিলেও রাজাধিরাজ সেই সামান্ত শব্দটুকুতেও যেন চমকিত হইয়া উঠিলেন।

"তুমি! ওই নধর নবনী-নিন্দিত কোমল দেহ তোমার, তুমি এত কষ্ট সহ ক'রে এমন দুঃসাহসের কার্য্য করতে পেরেছিলে, চন্দ্রকলা? কত বড় প্রেমে মানুষকে এত বড় অসাধ্যসাধনের বল এনে দেয়?—এত সাহসী তুমি ত নও? তবে কি সত্যই তুমি তাকে এত ভালবাস? আর আমি? আমি এত ক'রে, এত ভালবেসে তোমার কাছ থেকে কি ফিরিয়ে পেলেম? কি, বলত? শুধু নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা! অবিশ্বাসিনী নারী! এই আমার এত প্রেমের পুরস্কার? এই আমার প্রতিদান? এই—এই—এই—"

তীব্র ঈর্ষ্যা ও অকথ্য জ্বালাভরা কোপে ক্ষণকাল বাক্যহীন জ্বলন্ত চোখে নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখাবৎ নির্ব্বাক্ রমণী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া পুনশ্চ [illegible]তর কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "এই জন্যই নারীচরিত্রকে শাস্ত্রকারেরা [illegible] তারও বোধের অতীত বলেছেন। ঠিক তাই! আচ্ছা, বল দেখি, সে তোমায় কি দিয়েছে যে, তারই লোভে তুমি তার জন্য আমার এত বড় সর্ব্বনাশ করলে? হ্যাঁ, আমার সব চেয়ে বড় ক্ষতি। তুমি কি জান না, যে, যে রামপালকে তুমি কাল চাতুরী ও আমারই দত্ত ধনবল দ্বারা মুক্ত ক'রে দিয়েছ, অদূর ভবিষ্যতে সেই আমায় ধ্বংস করবে? তুমি কি জান না, এর পর রামপাল শূরপাল আমায় কোনমতেই আর ক্ষমা করতে পারে না? তবে জেনে শুনে ইচ্ছা করেই আমায় মৃত্যুর ও ধ্বংসের মুখেই তুমি তুলে দিতে চেয়েছিলে? জিজ্ঞাসা করি, সত্য ক'রে বল দেখি, আমি কি কখন তোমার কোন ক্ষতি করেছিলেম—যার প্রতিশোধে তুমি আমার সমস্ত আশাকে তার ঠিক পূর্ণ হওয়ার শুভ মুহূর্ত্তে নষ্ট ক'রে দিলে? আমার চির শত্রুকে তার শত্রুতা

সাধনের প্রশস্ত অবসর প্রদান ক'রে আমার মৃত্যুকে নিকটবর্ত্তী ক'রে আনলে ?"

বলিতে বলিতে সহসা নৃপতির গৌর মুখ আভ্যন্তরিক প্রচণ্ড উত্তাপে জ্বলিয়া উঠিয়া অগ্নিদীপ্ত দেখাইল।—"আমি তোমায় যেমন ভালবেসেছিলেম এ জীবনে আর কা'কেও তেমন করে বাসিনি। তোমার পায়ে আমি যে স্নেহ, প্রেম, ধন, মান অকাতরে ঢেলে দিয়েছি, তার এক ক্ষুদ্রতর অংশ লাভ করতে পেলে আমার বিবাহিতা স্ত্রী—কল্যাণের রাজকন্যা পট্টমহাদেবী নিজের জীবনকে ধন্য বোধ করতে পারতো, কিন্তু তুমি ত আর সতী স্ত্রী নও, বারনারীর চপলচিত্তে সে সবের স্থান কোথায় ? তারা মানুষের মনের খবর রাখে না, শুধু সংখ্যার হিসাব দেখে!—যাক্, তোমার কর্ত্তব্য তুমি ত পালনই ক'রেছ ?—এখন আমারটাই বাকী আছে। এস চন্দ্রকলা! আমার বড় আদরের প্রিয়া! তোমায় আমি অন্যের হাতে দিতে পারবো না, নিজের হাতেই আজ তোমার সব দণ্ড পুরস্কারের শেষ ক'রে চুকিয়ে দিয়ে যাই এস—"

'কুমার! মহাকুমার! রামপাল!"—একটা মাত্র মৃদু আর্ত্তনাদ অতি অস্পষ্ট, অথচ তাহারই মধ্যে বিশ্বের সমুদয় রাশীকৃত ব্যথা ভরা আনন্দ যেন উহাতে নিহিত, এমনই করুণা সে ধ্বনি একবারমাত্র,—বারেকেরই জন্য, শুধু সেই স্নিগ্ধ আলোকোজ্জ্বল, আম্রমুকুলের গন্ধে ভরা, বিজন প্রকৃতির অব্যাহত শান্তি সুখের ব্যাঘাত করিল ; তার পর সব শান্ত, সব স্থির হইয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত স্থির নেত্রে সেই স্থির সৌদামিনী তুল্য প্রাণহীন দেহ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ঈর্ষ্যা কলুষিত বিকৃত কণ্ঠে মহীপাল কহিলেন, "শেষ মুহূর্ত্তেও সেই রামপাল! যাক্ এইবার তাকে ভুলতে পারবে।"

আমগাছের মুকুল ভূষিত ডালে বসিয়া শ্যামা দোয়েল তেমনই

আনন্দ কলরব করিতে লাগিল, "বউ কথা কও" তেমনই করুণা কাতর কণ্ঠে নীরব বধূকে সাধ্যসাধনা করিতে লাগিল, দীঘির জলে স্নিগ্ধ শিহরণ তুলিয়া মাতাল বাতাস তেমনই পদ্মদলে আনাগোনা করিতে লাগিল, মৌমাছিরা কখনও পদ্মবনে, কখনও আম্র-মুকুলে তাদের বিরাট ভোজের সভায় পানে ও গানে প্রমত্ত হইয়া রহিল।

প্রথম অংশ সমাপ্ত

দ্বিতীয় অংশ

ভীম

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিছু দিন হইতে রাজধানীতে নানাবিধ বিপ্লবাদির সংঘাতে আমোদ-প্রমোদের একান্ত অভাব ঘটিয়াছিল, বোধ করি, তাহারই প্রতিষেধক-ভাবেই মহারাজাধিরাজ পরমসৌগত মহীপালদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে এবার রাজধানী একটু বিশেষভাবেই উৎসব সমারোহের আয়োজন করিয়াছিল। নাগরিকগণের প্রতি সেই বিশেষ দিনে প্রতি সৌধ সুসজ্জিত, মাল্যদামে ও ধ্বজ-পতাকায় সুশোভিত করিতে আদেশ প্রদান করা হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বতন বিধিই; তবে এবার ইহার উপর রাজ প্রাসাদ-সমূহের নব-সংস্কার ও সাজ সজ্জার আড়ম্বরেরও যেন সীমা ছিল না।

যদিও করভার প্রপীড়িত অসন্তুষ্ট জনসাধারণ যাহারা অন্তরে অন্তরে সম্পূর্ণ এবং কতকটা বাহিরেও,—বর্ত্তমান রাজার পতন কামনা করিতেছিল, তাহারা রাজ-আয়ুর্ব্বর্দ্ধনকারী এই জন্মোৎসব ব্যাপারে নিজেদের অর্থ সামর্থ্য ব্যয় করাকে অপব্যয় বোধ করিয়া একটু বিশেষভাবেই অসন্তুষ্ট বা রুষ্টও হইয়াছিল; তথাপি রাজাজ্ঞা পালন না করিয়াও তো উপায় নাই, অগত্যা ভিতরে দারুণ অসন্তোষের অগ্নিশিখা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে গালি এবং দীর্ঘজীবনের পরিবর্ত্তে ধ্বংসকামনা করিতে করিতে নাগরিকগণ রাজ-সম্মানার্থ তাহাদের ছাদ, অলিন্দ, তোরণাদি সজ্জিত করিতে বসিল। কিন্তু অভাব গ্রস্ত প্রজাকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনর্থক এই অর্থব্যয় করানোয় শ্রদ্ধা ত কোন দিন ছিলই না, বিদ্বেষ আরও বর্দ্ধিত করিল।

মহাপ্রতীহার কুমার রুদ্রদমন বিশেষ যত্নের সহিত এই উপলক্ষে একটি

মেলা বসাইয়াছিলেন। ইহার সমস্ত ব্যয়ভার পতিত হইয়াছিল কোষাধ্যক্ষ সাহীলের উপর, রাজকোষ অর্থশূন্য, মগধ হইতে নূতন মহাসামন্ত রাজস্ব পাঠান নাই, সাহীল নিরুপায়ে নিজের সঞ্চিত ধন ও নিজ পরিবারবর্গের অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া রাজার আজ্ঞা মত অর্থ যোগাইয়া দিয়াছেন, নতুবা রাজরোষে প্রাণ মান সবই যাইবে। এই মেলা স্থানে আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য প্রদেশ হইতে নানাবিধ বস্তুজাত আনীত হইয়া প্রদর্শিত হইতেছিল। বারাণসী নগরী হইতে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সংযুক্ত বিচিত্র বস্ত্র, সমতট হইতে জগন্নাথী থান, গৌড়ের পাটের পাছড়া, মগধের কে[illegible]র, গান্ধারের অতি সূক্ষ্মতম বিচিত্র শিল্পজাত। মণি-রত্ন-কাঞ্চনাদি বিনি[illegible] অলঙ্কার সকল দুর্ল্লভ কাঞ্চন ও কাচপাত্র বলয়াদি, পাটনের গজদন্তের [illegible] শিল্প; অগুরুচন্দন, চুয়া প্রভৃতি নানারূপ গন্ধদ্রব্য, এমনই সর্ব্বদেশজ বি[illegible] সুদৃশ্য বস্তুজাত আহৃত হইয়াছিল। এমন কি, সুদূর চীনদেশ ও [illegible]বনিক দেশজ শিল্পাদিরও অপ্রতুলতা ছিল না। শুধু তাই নয়, এই [illegible]তলায় স্থানে স্থানে কাব্য-নাটকাদি অভিনয়োদ্দেশ্যে নাট্যমঞ্চ সকল [illegible]স্থাপিত হইয়াছে, কোথাও যবনিকা অন্তরালে নট ও নটীগণ নাট্যো[illegible] সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হইতেছিল, কোন রঙ্গভূমে উত্তোলিত যবনিকার সম্মুখে নাট্যসূচনায় নট ও নটী তখন শ্লোকচ্ছন্দে প্রস্তাবনারম্ভ করিয়াছে। এক স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা জনসমাগম অধিকতর, সেখানে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সাগ্রহ সমাবেদনপূর্ব্বক নিমন্ত্রিত কলা-কুশলিনী নর্ত্তকীবৃন্দমধ্যে অধুনা সর্ব্বময়ী রাজনর্ত্তকী বিদ্যুন্মালা নানাবিধ ভঙ্গীসহকারে নৃত্য করিতেছিল। মহাপাত্র দণ্ডোপাসিক, মহাপ্রতীহার, মহামাণ্ডলিক মহাসান্ধিবিগ্রহিক প্রভৃতি সম্রান্তবর্গ এই স্থানেই রাজাধিরাজকে বেষ্টন করিয়া অমরকুল পরিবেষ্টিত ইন্দ্রসভায় শোভা প্রদর্শন করাইতে ছিলেন। আসব ও অপ্সরা দুইয়েরই সেখানে কিছুমাত্রও অপ্রতুলতা ছিল না।

এ দিকে এক ভাগে সুদৃশ্য পর্ণকুটীর সকল নির্ম্মিত ও তাহার মধ্যে অতি বিচক্ষণ শিল্পী দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়া বুদ্ধদেবের বহুবিধ জাতক-লীলা মৃন্ময় প্রতিমায় প্রদর্শিত হইতেছিল। অন্যত্র ঐ ভাবে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতির অসুরশক্তির সহিত অক্লান্ত সমর চিত্র মৃন্ময়-প্রতিমায় প্রকটিত। এতদ্ভিন্ন কোথাও কৃষিক্ষেত্রে কৃষক হল প্রদান করিতেছে, শিব-ঠাকুর ভবানী-দেবীর সহিত ষাঁড়ে চড়িয়া চলিয়াছেন, কোথাও হারীতী দেবী ভীষণ রোগশান্তি করিতেছেন, তারাদেবী এবং রক্ষাদেবতা অবলোকিতেশ্বর গান্ধার শিল্পির নির্ম্মাণ করা অপূর্ব্ব স্বর্ণ আসনে উপবিষ্ট। এখানকার অধিকাংশ দর্শক বৌদ্ধ ও বৈদিক শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, সাধু ভক্ত পণ্ডিত মণ্ডলী এবং সাধারণ নাগরিক ও কৃষকসম্প্রদায়।

এই মেলাস্থানের মধ্যভাগে এবার আরও একটা উৎসাহশীল আনন্দের আয়োজন বিশেষভাবেই করা হইয়াছিল—তাহা মল্ল ক্রীড়া প্রদর্শনী। রাজপক্ষ হইতে প্রচার করা হইয়াছিল যে, দেশবিদেশের যত যত মল্ল আছে, সকলেই এই স্থানে নিজ নিজ শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিতে পাইবে, ইহার মধ্যে যাহারা মল্লক্রীড়াতে যোগ্যতম বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাদিগকে যথোচিত পুরস্কৃত করা হইবে, তাহারা ইচ্ছা করিলেই রাজসৈন্যদলভুক্ত হইতে পারিবে, শান্তিরক্ষা কার্য্যে নিয়োগ প্রার্থনা করিলে তাহাও অপূর্ণ থাকিবে না। এ বৎসরের অজন্মা ও তাহার উপর রাজকর যোগাইতে সর্ব্বস্বান্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনীয় রাজকার্য্যের জন্য লালায়িত হইয়া ফিরিতেছিল, দলে দলে পালোয়ানরা নিজ নিজ শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শনে পুরস্কৃত হইবার আশা লইয়া ছুটিয়া আসিল। অবশ্য অনেকেই আবার কেবলমাত্র শক্তিপ্রদর্শনের জন্যই আসিয়াছিল, রাজকার্য্যে নিয়োগ তাহাদের আদৌ প্রার্থনীয় নহে।

ভীমও মল্লক্রীড়ায় আত্মশক্তি প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিল। লোকে

বলিত, ভীমের দেহ পৌরাণিক কালের ভীমের মতই না কি সবল, মল্লক্রীড়ায় ভীমের মত কৌশলী এ অঞ্চলে কেহ নাই বলিলেও চলে, লাঠি খেলিতে তীর দিয়া উড়ন্ত পাখী মারিতে—এ সকল কার্য্যেও ভীম প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্ব। বীরত্ব প্রদর্শনীতে ভীম বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন করিতে সে তার সঙ্গী সহচরদের সঙ্গে রাজপক্ষ হইতে আমন্ত্রিত হইয়া সাগ্রহে অগ্রসর হইল। রাজাধিরাজ ঘোষণা করিয়াছিলেন, মল্লক্রীড়ায় প্রথম ব্যক্তিকে তাঁর দেহরক্ষীদলের অগ্রণীর পদ ও সহস্র স্বর্ণ নিষ্ক দ্বারা পুরস্কৃত করা হইবে, [illegible]ব্যাকের ইচ্ছা এই পদ ভীম লাভ করে; তাই ভীম নিজের ইচ্ছায় যত না হোক, তার জ্যেষ্ঠতাতের আগ্রহে এই কার্য্যে অগ্রসর হইল।

দিব্যোক, রুদ্যোক, ঝড়ো, লখা প্রভৃতি সবাই, বিধু এমন কি, ছোট্ট বিশেটা পর্য্যন্ত তামাসা দেখিতে দাদাদের ঘাড়ে চড়িয়া উপস্থিত। সনকা দেখিয়া শুনিয়া ঝি, বউ, নাতনী নাতিগুলাকে মাথায় মুখে তেল-হলুদ মাখাইয়া, কানে রূপার মদনকড়ি,হাতে রূপার খাড়ু, ক্ষার খোল দিয়া কাচা ঠেঁটী গুলাকে লটকান ফল, কুসুম্ভ এবং সিউলিফুলের রঙ্গে রাঙ্গাইয়া পরাইয়া সাজসজ্জা করাইল। নিজেও কাঁচা পাকায় মিলানো চুলকে তেলে চুবাইয়া তাহাতে লোটন খোঁপা বাঁধিয়া কাঁকালে ঘণ্টি, পায়ে মল্লতাড়ল, হাতে রূপার খাড়ু, কানে সোনার মদনকড়ি ও পাটের পাছড়া পরিয়া সাজিয়া গুজিয়া তৈরী হইল। উজ্জ্বলাও সবার সঙ্গে তার জ্যেঠশ্বশুরের কিনিয়া দেওয়া শাড়ী ও নূতন চকচকে রূপার অলঙ্কারে সাজিয়াছিল, শাশুড়ী তাহাকে দেখিয়া বলিল,—"তুই গেলে বুড়ো মা'টারে কে আগলাবে লো? তোর আজ আর যেয়ে কায নেই, ঢুদিন ত থাক্‌বেই এখন, তুই আরেক দিন তখন যাস্।"

উজ্জ্বলার সে ইচ্ছা নয়, আজ বড় বড় নামজাদা পালোয়ানদের মল্লক্রীড়া হইবে, ভীমও তাহাদের মধ্যে এক জন, উজ্জ্বলার ইচ্ছা, অন্তরালে দাঁড়াইয়া

সে তার স্বামীর গৌরবটা স্বয়ং দেখিয়া আসে। তার বিশ্বাস ছিল যে ভীমই প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার লাভ করিবে। সে তাই ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকাইয়া ঘোর আপত্তির সুরে বলিল, "আজকের মতন কোন দিন এমন হবে না, ওদের মধ্যের কেউ তখন আর এক দিন যেয়ে দেখুক না কেন!"

"কে বাপু আজ থাকবে? ওরা সব বাচ্ছা, তুই ধাড়িমাগী হয়েই যখন সামাল দিতে পারছিসনে, তখন কা'কে বল্‌ব বল্‌ত থাক্‌তে?"

এই অবিচারেই ত উজ্জ্বলাকে আগুন করিয়া তোলে, সেজুনী এরা কি না বয়সে তার চাইতে কিছু ছোট? দেখিতে ক্ষয়া ঘসা হইলেই বয়স বুঝি তাদের কখন বাড়ে না? এক যায়গায় দাঁড়াইয়া এক রকমই থাকে?

রাগে দু চোখ পাকল করিয়া সে উত্তর করিল, "এতেই ত রেগে মরি! তোমাদের ত চিরকালই ঐ একচোকোপানা করা রোগ! কেন, মেজুনী আজ থাক না? ও না হয় কালকেই যাবে,—আমি আজ যাবই যাব।"

শাশুড়ীর দাঁত কিড়মিড় করিয়া উঠিল, "বউড়ীমেয়ের এত ছ্যামাক! আমি বলেছি যখন তোকে থাকতে হবে, তখন তুই ছাড়া আর কেউ থাকবে না। তোকেই থাকতে হবে।"

উজ্জ্বলা আর কিছু না বলিয়া সশব্দে পা ফেলিয়া ক্রোধভরে বাগানে চলিয়া গেল। সেখানে ছায়া দেখিয়া একটা যায়গায় গিয়া বসিয়া পড়িয়া শাশুড়ীকে জানাইতে চাহিল যে, তাহাকে রাখিয়া গেল বটে, সে কিন্তু তোমার কোন কাযেই লাগিবে না।

শাশুড়ী তাহা বুঝিল, মেজ বউকে বলিল, "তুই তা' হ'লে নয় আজ থাক না বেটা!"

আঁদুরে বউ তার মস্ত বড় সোনার ফাঁদি নথটাকে চাকার মত বেগে ঘুরাইয়া দিয়া মুখখানাকে ভীমরুলের চাকের মত ভারী করিয়া চ্যাটাং

করিয়া জবাব দিল, "তা আর নয়! বুড় বয়েসে উনি মজা ক'রে মজা দেখতে চল্লেন, আর আমরা ঘরে বসে বসে ওঁর মা আগুল্‌বো! বল্‌তে একটু লাজও লাগে নি ?"

উপযুক্ত উত্তরে প্রশ্নকর্ত্রী নীরবে রহিল ও ইহার পর আর কোন কথাটি পর্য্যন্ত না বলিয়াই আগে আগে পা বাড়াইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। যাত্রাকালে আপনার মনেই গজ গজ করিতে করিতে বলিল, "আগোগে মা ও বুড়ীঠাকৃরেণ! তোকে খাসা ক'রে পূজো দোব, আজঙ্গরের ডালা দোব, ভাল করে ভোগা দোব, আমার ঘরের ঐ হতচ্ছাড়ীটারে তুই তোর কাছকে ক'রে নিয়ে নে'মা। মোর হাড়টা জুড়ুক। আমি ভেমার আবার বিয়া দিই।"

বৃদ্ধা ঠাকুরাণী বা মনসাদেবী স্থানে থাকিয়া স্নেহময়ী শ্বশ্রূমাতার এই পুণ্য নিবেদনটুকু হয় ত বা ভাল করিয়াই শুনিয়া রাখিলেন!

উজ্জ্বলা বড় বেশী রাগিয়াছিল। মানুষের অবিচারেরও ত একটা সীমানা থাকা উচিত ? এ কি এদের অসঙ্গত সৃষ্টিছাড়া অন্যায় অবিচার! এ কি তার জন্য সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদাই উদ্যত হইয়া থাকিবে ? কোন দিনই কি ইহা হইতে সে এতটুকুও মুক্তি পাইতে পারিবে না ? তারও সারা চিত্ত গভীরভাবে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। না, এমন করিয়া আর সে সহিত পারিবে না,—পারিবে না কি, সহিবে না। যতই সহিবে ততই যখন তাহার উপর অবিচারের বাণ বর্ষণও চলিতে থাকিবে, তখন না সহাই ত ভাল।

দিব্যোকের বাড়ীর পিছনদিকে অনেকটা জায়গা জুড়িয়া বাগান বেড় ও সুবিস্তৃত ক্ষেত্রগুলি নূতন শস্যে আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। এ দিকে অপর্য্যাপ্ত সরিষাফুলের হরিদ্র কান্তি, ও দিকে মূলাফুলের শ্বেত শান্ত তপঃশুদ্ধ মূর্ত্তি; অড়হরের ও কলাইশুঁটির ফুলেরও যথেষ্ট রূপ খুলিয়া

গিয়াছিল এবং বেগুনের ছোট ছোট গাছে বড় বড় বেগুনগুলা যেন বালিকা জননীর কোলে দাম্বাল শিশুর মত মাটীর দিকে লম্বাভাবে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। নূতন উৎসাহে দিব্যোক ও রুদ্যোক বুড়া দুই জন এবার তাদের ক্ষেত-খামার ও বাগান বেড়গুলিতে যেন সোনা ফলাইয়া তুলিয়াছে। আর ইহার জন্য পরিশ্রমই বা কি অক্লান্ত!

উজ্জ্বলার মনটা আগুন হইয়া জ্বলিতেছিল। ভীম গত রাত্রে তাহাকে বলিয়াছিল, সেও যেন তার মায়ের সঙ্গে আজ মেলাতলায় যায়, সেখানে দেখিবার শুনিবার অনেক আছে, তা ছাড়া ভীমেদের যে মল্লক্রীড়া হইবে, ভীমের ইচ্ছা, উজ্জ্বলা সেটাও স্বচক্ষে দেখিয়া আইসে, যখন এত বড় একটা সুযোগ ঘটিয়া গিয়াছে, মা যাইতেছেন, তখন সে এমন একটা জিনিষ না দেখিবেই বা কেন? তাই উজ্জ্বলার মনটা আজ তিক্ত হইয়া গিয়াছিল। একে ত তার এই তরুণ বয়স, দেখিবার শুনিবার কত সাধ আশাই না তার মনের ভিতরে ভরিয়া আছে, তার উপর আবার স্বামীর অনুরোধ! এ দুইয়ে মিলিয়া মনটাকে তার যেন প্রবলবেগে ধাক্কা মারিতেছিল, এবং নৈরাশ্যে ক্ষোভে তাহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিতেছিল, দুঃখে ও রাগে গুম হইয়া থাকিয়া সে মনে মনে বলিল, "একবার ম'রে গিয়েও আমার দেখতে ইচ্ছে করছে' আমি না থাকলে এদের কাযে কে সামাল দেয়? আগে না হয় দারিদ্দির ছিল, এখন ত আগের চাইতে ধন হয়েছে, তবু যে কেমন ক্ষুদ্দুর দৃষ্টি! শাশুড়ীর আমার বউএর মাংস সেদ্ধ ক'রে খেতে বড় মিষ্টি লাগবে!"

চুপ করিয়া সে একটা আমগাছের গুঁড়ির উপর পিঠ রাখিয়া বেড়ার পাশে বসিয়া রহিল। আমের মুকুলের গন্ধে ভরা উদাস অবশ বাতাস মাতালের মত টলিয়া টলিয়া বহিয়া যাইতেছে, সামনেই রাজপথ, পথের ধারে গাছের সারি, ছায়াগুলা তার বাঁকা হইয়া পড়িয়া আছে, তাদের

মধ্যে কেহ কেহ পথের উপর পথিকদের পায়ের তলায় ঝুরো ফুলের রাশি বিছাইয়া দিয়াছিল। উজ্জ্বল রৌদ্রে রাস্তা-পারের ক্ষেত্রের মধ্যে সরিষাফুলে সোনার তরঙ্গ উঠিতেছিল, মৌমাছিদের গুঞ্জনও সেই দিক হইতেই আধভাসা হইয়া আসিতেছিল, পথের উপর দিয়া এখনও কত লোক আনাগোনা করিতেছে, তাহাদের সকলেরই গায়ে উৎসবের সাজ, মুখে চোখে উথলিত আগ্রহ ও আনন্দ এবং চরণে ত্রস্তগতি। উজ্জ্বলা তাহাদের দেখিতে দেখিতে আবার যেন মনের মধ্যে অশান্ত হইয়া উঠিল। এই যে এত লোক, তাদের মধ্যে এত মেয়েও যে এতদিক হইতে আসিতেছে, তবু হয় ত এদের মধ্যে কাহারও স্বামী তার স্বামীর মত বীরপুরুষ নয়, রাজার কাছে নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁর সাক্ষাতে ক্রীড়া দেখাইতে যায় নাই! উজ্জ্বলা একটা গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

"হ্যাঁ গা বউ! এইটেই কি দিব্যোক-কৈবর্ত্তের ঘর গা!"

সহসা এই সম্বোধনে উজ্জ্বলা সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, এক জন তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিতা অর্দ্ধবয়সী স্ত্রীলোক তাদের বাগানের বেড়ার ধার হইতে তাহাকেই এই বলিয়া সম্বোধন করিতেছে।

উজ্জ্বলা বিস্ময়স্মিত নেত্রে তাহাকে দেখিতে দেখিতে মাথার উপর একটুখানি কাপড় টানিয়া দিয়া খাটো গলায় উত্তর দিল—"কেন গো?"

আগন্তুকা উজ্জ্বলার কাছের দিকে খানিকটা সরিয়া আসিয়া বেড়ার মধ্যে ঝুঁকিয়া পড়িল ও কণ্ঠস্বরটাকে কিছু ছোট করিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—"তুমিই কি ভীম-কৈবর্ত্তর বউ? তা মা, খাসা রূপ তোমার! দেখলে চোখ জুড়োয় বটে! রূপের যেন গড়ামূর্ত্তি! তা হ্যাঁ গা, তুমি কি আমার সঙ্গে একবার মেলাতলায় আসতে পারবে? ভীম আমায় অনেক ক'রে ব'লে কয়ে পাঠিয়ে দিলে, যে, 'মাসী! সব্বাই এলো, শুধু বউ আসতে পেলে না, তুমি যদি তাকে একটিবার সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস ত

ভালমানুষের মেয়েটা তবু একবার দিষ্টি সার্থক ক'রে যায়।'—তা ভীম আমার বড় অনুগত মা, বাছা আমার মাসী মাসী ক'রে অস্থির হয়। তোমার কাছে সে কি কোন দিন তার কায়েত-মাসীর নাম করে নি? হ্যাঁ গো বাছা, আমিই সেই গো?"

উজ্জ্বলা এই সংবাদে একবারে লাফাইয়া উঠিল। তাহার স্বামী তাহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছে! তাহার কৃতিত্ব, ক্রীড়াকৌশল দেখাইবার জন্য উজ্জ্বলাকে সে আনিতে লোক পাঠাইয়াছে, আর কি সে না গিয়া থাকিতে পারে? শিশুর মত ত্রস্ত লঘুপদে সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। একবারে অপরিচিতার পায়ে পড়িয়া পায়ের ধুলা তুলিয়া লইয়া তাহার হাত ধরিল, "হ্যাঁ গো মাসী! আমি যাবোই যাবো গো! চল, আমরা যাই।"—এই বলিয়াই সে হাস্যস্মিতমুখে প্রবীণাকে একপ্রকার টানিয়া লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

ভীমের মাসী এই তরুণী নারীর এরূপ উদগ্র আগ্রহের প্রবলতায় যেন একটু কেমন দিশা হারা হইয়া পড়িয়াছিল, ত্বরিতে সেটুকুকে সম্বরণ করিয়া লইয়া সে সদ্য নীড়ছাড়া পাখীটির মত হাস্যমুখী চপলা তরুণীটিকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল, "আহা হা! কি সুবোধ মেয়ে তুমি মা! ভীমকে বড্ড ভালবাসিস্ বুঝি? হ্যাঁ গা বাছা? তা সে-ও বাসে বাপু! খুব ভালবাসে! ঐ দেখ না, তোমার অতটা দূরে হেঁটে যেতে দেরী হবে বলেই না সেই ভেবেই বাছা আমার সঙ্গে ডুলীবাহক দিয়ে দিলে, এস মা, ঐ দিকটা পানে তারা রয়েছে, ঐখানে গিয়েই তুমি ঐতে চড়ে বসো, আমি সঙ্গে সঙ্গেই হেঁটে যাব'খন।"

বিস্ময়ে ও আনন্দে উজ্জ্বলা যেন চমৎকৃত হইয়াছিল। বাস্তবিক তাহার স্বামী তাঁকে কত ভালবাসেন! এতখানি ভাবিয়া এত ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে লইতে পাঠাইয়াছেন? গভীর কৃতজ্ঞতায় তার চোখ দুটী ছলছল

করিতে লাগিল। এরূপভাবে গৃহত্যাগ করিয়া গেলে, ফিরিয়া যে অনেক লাঞ্ছনাই তাহাকে সহিতে হইবে, সেই কথাটা মনের কাছাকাছি ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকিলেও সে এ গৌরব ও আনন্দের মুহূর্ত্তে তাহা মনের মধ্যে আমল দিল না, ভবিষ্যতে যা ঘটে ঘটুক, বর্ত্তমানটাকে সে শুধু এখন একবারটি প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিয়া লইতে চাহে।

উচ্ছ্বসিত চিত্তে স্বপ্নাভিভূতের মতই সে ডুলী চাপিয়া বসিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই বাহক কয় জন তাহাদের সঙ্গিনীর ইঙ্গিতানুসারে ডুলীর উপর স্থূল বিচিত্র আচ্ছাদনীখানা ক্ষিপ্রকরে টানিয়া দিয়া দ্রুতপদে ডুলী লইয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল।

গোধূলি বেলার রক্তালোকধারা তখন দিব্যোকের গৃহে, উদ্যানে, পথের পরে এবং উজ্জ্বলার শিবিকায় আচ্ছাদনবস্ত্রে সর্ব্বত্রই যেন [illegible] লালের আভায় উত্তপ্ত হৃদয়শোণিতের বর্ণ সমাবেশ করিয়া দিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে পশ্চিমদিগন্তের অবসানোন্মুখ সূর্য্য নিষ্প্রভ ম্লানমুখে যেন মুমূর্ষুর মতই ঢলিয়া পড়িলেন।

গৃহের মধ্যে ভীমের দিদিমা অসহায় রুষ্ট কণ্ঠে ডাকিতেছিলেন, "ওলো ও বড়কী! বলি, গেলি কোথায় লো? আ মর, মর ছারকপালী! যেন পাটরাণী হয়েছেন, গলাটা ফেড়ে ফ্যালালেও সাড়ারত্তি দেয় না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বনের ধারে গাছের ছায়াগুলি জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছিল, ম্লান আলো তীর বালুকার উপর অবসন্ন দেহভার ঢালিয়া দিয়াছিল, বাতাস নদীর জলে ঢেউ তুলিতেছিল, কূলে বাঁধা নৌকাগুলি দুলিয়া উঠিতেছিল।

এপারে ওপারে ঘন ঝোঁপঝাড়ের মধ্য হইতে ঝিল্লীরা গভীরস্বরে গুঞ্জন করিয়া উঠিতেছিল, অন্তরের শত স্মৃতি যেন তাহারই সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বুকের মধ্য হইতে উহারই সমতালে গুঞ্জরিত হইতেছে, তীরতরুদলের ছায়া-শীতল সন্ধ্যা বায়ু যেন তাহারই কোমল করস্পর্শের স্মৃতি-শিহরণ অঙ্গে আনিয়া দিতেছিল, পাখীরা গাছের উপর ফিরিয়া আসিতেছিল, নৌকাগুলি যাত্রীদের ফিরাইয়া আনিতেছিল, পথিকেরা অদূর পথ দিয়া নিশ্চয়ই তাহাদের ঘরে ফিরিতেছে, শুধু সেই যে চলিয়া গিয়াছে, সেই শুধু আর ফিরিয়া আসিবে না, একি মনে আনিতে কি পারা যায়?

সন্ধ্যা ক্রমে তিমিরে ভরা রাত্রিতে পরিণত হইয়া গেল, সকল তৃষ্ণা মনের মধ্যেই ভরা রহিল, দেখিতে দেখিতে দুই চোখ জলের আভাসে ভরিয়া উঠিল, আবার তাহা শুকাইয়াও গেল।

নিদ্রাহীন দীর্ঘ রাত্রি বৃথা অনির্দ্দেশ্য পর্য্যটনে কাটাইয়া দিয়া অলস অবশ দেহে ভীম এই জন মানব বিবর্জ্জিত সুদূর-প্রসারী শস্যক্ষেত্রের প্রান্ত সীমায় নদীচরের উপর নদীর কিনারায় আসিয়া বসিয়া পড়িল।

উজ্জ্বলার নিরুদ্দেশের পর তিনটি দীর্ঘ দিন ও ততোধিক সুদীর্ঘ চারিটি রাত্রি আসিয়া আসিয়া আবার চলিয়া গিয়াছে, ক্রীড়নশীল কাল তার চির নিয়মিত তালে ছন্দে নিয়তই নাচিয়া চলিতেছে। তার চারিদিকের

যে কোন কিছু বিপর্য্যয়েই তার তাল কাটে না, ছন্দ বদলায় না, নিয়তির মতই সে একই প্রকার নির্ব্বাক এবং নির্ব্বিকার।

ভীম এই একই ভাবে এ কয়টা দিন ধরিয়া নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তাবধি আবার জনপদ ছাড়িয়া জন-বিরল প্রান্তরে, শ্বাপদ সমাবেশিত অরণ্যে সর্ব্বত্রই তার হারামণি খুঁজিয়া ফিরিয়াছে, কিন্তু কোথাও তার চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত সে খুঁজিয়া পায় নাই। প্রথম দিকে তার মনে হইয়াছিল, হয় ত শাশুড়ীর উপর রাগ করিয়া সে অনেক দিন আগে যেমন একবার বাড়ীছাড়া হইয়াছিল, তেমনই কোথাও গিয়া বসিয়া আছে, আবার আসিবে, এই ভাবিয়া অনুসন্ধানকার্য্যে নিরত হইয়াছিল; কিন্তু যতই দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, ততই তার মনে অপর সন্দেহটাই বদ্ধমূল হইয়া উঠিতে লাগিল যে, হয় ত;—না হয় ত আর নয়,—নিশ্চয়ই উজ্জ্বলা তার মা'র মুখে এমন কোন কঠিন কথা সে দিন শুনিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, তার পর আর তার বাঁচিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি থাকে নাই। এইবার বাড়ীর পুষ্করিণীতে জাল ফেলিয়া এবং অনর্থক নদীর শীতার্ত্ত স্বচ্ছ বক্ষে উদাস দৃষ্টি মেলিয়া সে যেন একটা জড়পিণ্ডের মত হইয়াই বসিয়া পড়িল। উজ্জ্বলা যে বাঁচিয়া নাই, এ সম্বন্ধে মনে তার বিন্দুমাত্রও সংশয় রহিল না। বাঁচিয়া থাকিলে সে যে এত দিন ধরিয়া তার কাছছাড়া হইয়া থাকিতেই পারিত না, তাহা ভীম ভাল করিয়াই জানে। সে মরিয়াছে। আর যে যা মনে করিতে হয় করুক, ভীমের মনে এ বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নাই।

সনকার অবস্থাটাও খুব সুবিধার ছিল না। একদিকে ভাসুর ও স্বামীর কাছে দিনরাত তিরস্কার, আর দিক দিয়া ছেলের নীরব অভিমান এই দুইয়ে মিলিয়া তার সেই দুর্দ্দান্ত মূর্ত্তিকে অনেকখানি নম্র করিয়া তুলিয়াছিল। উজ্জ্বলার এই আকস্মিক তিরোধানে তার

তিরস্কারকেই যখন সকলে মূল কারণ ধরিয়া লইয়া তাহাকেই দোষী সাব্যস্ত করিল, তখন সনকা অবশ্য আত্মপক্ষ সমর্থনে নিশ্চেষ্ট ছিল না, কিন্তু তথাপি নিজেরই মধ্যে সে যেন একটা দারুণ দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া কতকটা স্তম্ভিত হইয়াও গিয়াছিল। বালিকা বধূকে ঘরে আনিয়া অবধিই স্বভাববশে ও কতকটা দেশাচার মতেও বটে, বধূকে শাসন পীড়ন প্রচুরতরই সে করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ যখন তার মৃত্যু বিষয়ে সবারই মনে সংশয় জাগিল এবং নিজেকেই ইহার নিমিত্ত বলিয়া পরের কাছে ত বটেই, নিজেরও বিবেকের কাছে স্থির নিশ্চয় হইয়া গেল, তখন সনকা তার সেই পাষাণ কঠিন মনের মধ্যেও যেন বড় তীব্রভাবেই একটা আঘাত বেদনা অনুভব করিয়া বিস্মিত হইল। সেই মুখরা অবাধ্য মেয়েটা—যাকে সে ভুলিয়াও হয় ত কখন একটা ভাল কথা বলিয়া উঠিতে পারে নাই, মনে মনে সে যে তার এতখানিই জুড়িয়া বসিয়াছিল, তাহা কি সে ঘুণাক্ষরেও একবার ইহার আগে জানিতে পারিয়াছিল? বাহিরে মুখে কোন সহানুভূতি না দেখাইলেও মনটা তার যেন কেমন এক রকম সন্তপ্ত ও অনুতপ্ত হইয়া রহিল। লোকের সাম্‌নে নাই হউক, তবু আড়ালে গিয়া চোখের জল তাহাকে দিনে রাতে বারে বারেই মুছিতে হইল, কিন্তু প্রকাশ্যে এ সব লোক ভাঙ্গিলেও মচকায় না, সে স্বামী ভাসুর সকলেরই সহিত এই বলিয়া তীব্রস্বরে কোন্দল করিল যে, এমন কোন কথাই সে তাহাকে বলে নাই— যার জন্য সে মরিয়া যাইবে। মরিতে তার বহিয়া গিয়াছে, মরিবার মত মেয়েই সে নয়। ও সব রঙ্গিণী মেয়েদের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, সে এইবার তাহাই করিয়াছে, সনকার কোন ত্রুটি হয় নাই। সে ইহারই আভাস তার বাড়ীর লোকেদের কাছে বারেবারেই দিয়া আসিয়াছে, তখন যে কেহই উহার কথায় কান দেয় নাই, কেমন? এখন তাহাই ফলিতে বসিল কি না? ইত্যাদি।

ভীম মায়ের মুখে এই কথা শুনিয়া সেই যে বাড়ীর বাহির হইয়াছিল, তার পর আর সে ঘরে ফিরে নাই। আজ তিন দিনের পর হরি উহাকে নদীর সেই নির্জ্জন ঘাটে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল।

নদীর সেটা স্নানের ঘাট নয়, আঘাটা—ধূ ধূ মাঠের প্রান্তে ভাঙ্গা পাড়ের খোপে খাপে কতকগুলি শালিকপাখী রাত্রিবাস করিয়াছিল। তাহারা সকালবেলার রৌদ্রে এখন ঘাসের বীচি খুঁটিয়া খাইতেছিল, দুই একটা ছাগল মাঠের ইতস্ততঃ চরিয়া বেড়াইতেছিল, একটা কুলগাছ জলের ধারে বাঁকিয়া পড়িয়াছিল, তাহারই উপর হইতে একটা মাছরাঙ্গা থাকিয়া থাকিয়া মাছের উপর লাফাইয়া পড়িতেছিল; দূরে অশ্বত্থতলায় দুই একটা গরু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পুচ্ছ নাড়িতেছিল ও তাহাদের গলঘণ্টার রব সেই নির্জ্জন স্থানের বাতাসে মধুর হইয়া বাজিতেছিল, ভীম জলের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। বাহিরটা তাহার ঐ নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষের মতই স্থির দেখাইতেছিল বটে, কিন্তু বুকের মধ্যে একটানা একটা শোকের হাহাকার যেন হায় হায় রবে তার হৃদ্‌যন্ত্রের পতন-উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই এই বলিয়া অরুন্তুদ যন্ত্রণার তালে তালে বাজিতেছিল,—উজ্জ্বলা! উজ্জ্বলা! উজ্জ্বলা! কোথা তুমি? কোথায় তুমি? ফিরে এস, ফিরে এস, ফিরে এস! একবার এসে ব'লে যাও, আমার কি অপরাধে আমায় তুমি এত বড় শাস্তি দিয়ে গেলে? এই কি আমার উপরে তোমার ভালবাসা?

হরি আসিয়া পাশে বসিল, বলিল—"এম্‌নি ক'রে কি প্রাণটা শেষ করবে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল, ভীম? বউয়ের জন্যে তুমি পৃথিবীর সকল কর্ত্তব্যই বিসর্জ্জন দিয়ে দিলে?"

ভীম বিরক্তি-কঠোর নেত্রে বন্ধুর উৎকণ্ঠা ম্লান মুখের দিকে চাহিল—তার ঠোঁটের উপর ঈষৎ একটু ক্ষীণ হাস্য ক্রীড়া করিয়া গেল, "প্রাণ বড় কঠিন হরি! নইলে সে আমায় ছেড়ে যাবার পরেও আমি বেঁচে আছি!"

ভীমের এই অভিব্যক্তিতে হরি অপ্রসন্ন ভ্রূকুটি করিল, "এতটা বিদ্যে প'ড়ে এত মাতব্বর হয়েও তোমার মনটা এখনও মাগীগুলোর মত প্যান-পেনেই থেকে গেচে ভীম! তুমি যার জন্যে প্রাণ বা'র করতে চাচ্চো, সে হয় ত তোমায় ছেড়ে দিব্যি আমোদেই দিন কাটাচ্চে! পুরুষমানুষের এতটা বউ বশ হওয়া তাই জন্যেই ভাল না বলে।"

ভীমের এতক্ষণকার উদাস দৃষ্টি হরির এই তীব্র অভিব্যক্তিতে সহসা বিস্ময় চকিত হইয়া উঠিল, তার নির্ভীক চিত্ত কি একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে সহসা স্পন্দিত হইল, বন্ধুর মুখের দিকে ভূতাবিষ্টের মত চাহিয়া থাকিয়া সে সচমকে প্রশ্ন করিল, "এ কথাটার মানে কি, হরি?"

কথাটা আচমকা বলিয়া ফেলিয়াই হরি মনে মনে লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছিল। ভীমকে এমন করিয়া এ বিষয়ে সত্য জ্ঞাপন করা সঙ্গত হইবে কি না, এই কথাটা সে কয়দিন হইতে ভাবিয়া ভাবিয়া কোন ঠিকানাই করিয়া উঠিতে পারে নাই, একবার মনে করে, বলাই উচিত, আবার উজ্জ্বলার প্রতি গভীর ভালবাসার কথা স্মরণ করিলে এ সংবাদটা ভীমের পক্ষে যে রকম অসহনীয় কষ্টের কারণ হইবে, সেই কথা মনে হইতেই, সে সঙ্কোচে পিছাইয়া যাইতেছিল। উজ্জ্বলা মরিয়া গিয়াছে, এই চিন্তার মধ্যে যত বড়ই শোকের কারণ থাক, সে শোক ক্ষত হয় ত বা কালের প্রলেপে কোন দিন শুষ্ক হইতেও পারে; কিন্তু উজ্জ্বলা তাকে ছাড়িয়া তার পবিত্র কুলে কলঙ্ক লেপিয়া দিয়া আর এক জনের সহিত চলিয়া গিয়াছে, এত বড় নিদারুণ সংবাদ—সে কি তা সহিতে পারিবে? আর হরিই বা এ দুঃসংবাদ বন্ধু হইয়া কেমন করিয়া উহাকে জানাইবে?

তথাপি ভীমের রাত্রি জাগরণ ক্লান্ত রক্ত চক্ষু, পাগলের মত মূর্ত্তি—যার এতটুকুও পাওয়া সঙ্গত নয়, তারই পরে এতখানিই দেওয়া—সে আর

সহিতে পারিল না, তাই আচমকা মুখ দিয়া কথাটা এমনই ভাবে বাহির হইয়া পড়িল।

সখার প্রশ্নে হরি এবার বাস্তবিকই বিপত্তি বোধ করিল। অর্থ যে কি, সে কথা এই উত্তপ্ত মস্তিষ্ক, অর্দ্ধ ক্ষিপ্ত স্বামীর কাছে প্রকাশ করা তো সহজ কথা নয়!

হরি নীরবে নদীপারের নবোদিত সূর্য্যের পানে চাহিয়া রহিল, মনে মনে নিজের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাঁহারই শরণ প্রার্থনা করিল কি না, বলা যায় না।

ভীম ডাকিল, "হরি!"

"কি ভাই?"

"চুপ ক'রে রৈলে যে?"

হরি মনে মনে অশান্তি বোধ করিতেছিল, মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "কি বল্‌বো?"

ভীম গম্ভীরমুখে কহিল, "যা জান্‌তে চাইলাম?"

"কি জান্‌তে চাইলে?"—হরির গলার স্বর কাঁপিয়া গেল।

"তুমি কি আমার সঙ্গে তামাসা করচো? কি জান্‌তে চাইলাম, তাও এর মধ্যে ভুলে গেছ? বেশ, তাহলে আমায় তুমি কি জানাতে এসেছ, না হয়, তাই-ই ব'ল শুনি?"

"আমি ত তোমায় কোন কথাই জানাতে আসি নি।"—হরির গলাই শুধু নহে, ঠোঁট দুইটাও কাঁপিতেছিল।

ভীম পরুষকণ্ঠে কহিল, "তবে ও কথাটা বলার কি দরকার ছিল? কেন বল্লে? ছিঃ!"

"কি কথা বলেছি তোমায়?"

"আঃ, তাও আবার আমার মুখ দিয়ে না বলিয়ে তুমি ছাড়বে না?

'সে হয় ত তোমায় ছেড়ে গিয়ে দিব্যি আমোদেই দিন কাটাচ্ছে!'—এ কথা কেন বল্লে?"

হরি নীরব রহিল। ক্ষণপরে নীরব থাকাতেও মুক্তি পাইবে না বুঝিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "তোমায় বলাটা হয় ত আমার ভাল হয় নি।"

"আমায় 'বলাটা হয় ত তোমার ভাল হয় নি!'—তা হলেও বলবার বিষয়টা যেন বর্ত্তমান থেকে যায় মনে হয় না?—তাই যদি মনে করচো, তখন বলাটাই বা কি এমন অন্যায় হয়েছে? হরি! হেঁয়ালী রেখে দাও, কি বলতে চাও, বল।"

হরির মুখ শুকাইয়া গেল,—"বাস্তবিকই আর কিছু বলার নেই ভীম!"

"হরি!"

"তোমার দিব্যি, ভীম!"

"হরি! তুমি যে অনর্থক খেয়ালের বশেই অত বড় কঠোর নির্ম্মম মিথ্যা শুনিয়ে আমায় মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে এসেছিলে, এও কি আমায় বিশ্বাস করাতে পারবে? যার পুণ্যস্মৃতিকে আমি আমার এই আধমরা বুকে জীবনের একমাত্র শেষ সম্বল ক'রে রেখেছি, তার উপরে কালি ঢেলে দিয়ে আমায় তুমি অনাবশ্যকে হত্যা করতে চাইচো, একথাও আমি বিশ্বাস করবো?"

হরি হাত কচলাইতে লাগিল, বলিল, "বিশ্বাস কর, সাক্ষাৎ! সত্যি বলচি, আমি কিছু জানিনে।"—

"তুমি আমায় কি মনে কর? যদি কিছু নূতন কথা জেনে থাক, যা জান, কেন বলচো না? যদি কিছু না জান, কেন তবে অমন নিষ্ঠুর কথা বলতে গেলে?—কেন বল্লে, হরি!"

হরি কাতর হইয়া বলিল, "ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, ভীম! তখন ঠিক বুঝতে পারিনি, যে এ সংবাদটা তোমার পক্ষে এত বড় ভয়ানক হ'তে

পারে! এ রকম ভীষণ সংবাদ ভরসা ক'রে কেউ কি কারুকে দিতে পারে?"

ভীম গভীর নৈরাশ্যের স্বরে বলিয়া উঠিল, "ভরসা! তোমার না থাকে আমার যথেষ্ট আছে। তুমি ব'লে ফেল, আর আমায় দগ্ধ ক'র না, হরি! ছিঃ, এই কি তোমার আজন্ম বন্ধুত্বের ফল?"

হরি মাথা নত করিল, মুখে তার কোনমতেই বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না, কথা কহিতে গিয়াও সে তাই কথা কহিতে পারিল না।

ভীম হরির দুইটা হাত ধরিয়া তাহাকে সবলে নাড়া দিল, "বল, বল, বল! কি বলবার আছে তোমার, বল? আমি আর দেরী সইতে পারছিনে, যা তুমি বলবে, সে কি আমার এই ভীষণ সংশয়ের চেয়েও বেশী ভয়ানক হবে? হরি! দেখতে পাচ্ছো না, আমায় তুমি কি অবস্থার মধ্যে রেখে দিয়েছ! আমার মনে হচ্ছে, তোমার জিভটা টেনে ধ'রে তা থেকে কথা গুলো জোর করে বা'র ক'রে নিই। হরি! হরি! মিথ্যে তুমি লুকোতে চাইচো, কিছুই লুকোতে পারচো না, অথচ, ঐ আধ ঢাকা মিথ্যার চাইতে উলঙ্গ সত্যের চেহারা ঢের বেশী সহ্য হয়!"

হরি এবার সঙ্কটাবস্থা হইতে জোর করিয়া নিজেকে কথঞ্চিৎ বিমুক্ত করিয়া লইয়া কতকটা সহজভাবেই উত্তর করিল, "তা হ'লে তাই শোন, ভীম! তুমি যার জন্ম প্রাণ দিতে বসেচ, বাস্তবিকই সে তার যোগ্য নয়, সে মরে নি।"

"মরে নি? উজ্জ্বলা,—আমার উজ্জ্বলা বেঁচে আছে? কেমন ক'রে তুই জানলি, হরি? কোথায় আছে রে, সে?"

"কোথায়? ভগবান্ জানেন, কোথায় আছে! সে সংবাদ ত পাইনি, ভীম! তবে বেঁচে যে আছে, এইটেই জেনেচি।"

হরির কণ্ঠে এই 'বেঁচে আছে'—কথাটার উপর এরূপ ঘৃণার তীক্ষ্ণতা

প্রকাশ পাইল—যাহাতে ভীমকে সহসাই কতকটা স্তম্ভিত করিয়া দিল।

"সে রকম বেঁচে না থেকে যদি সত্যিই সে ম'রে যেত, সে অনেক ভাল হ'ত, ভীম!"

ভীমের মাথার উপর প্রভাতের সেই সুপ্রসন্ন রবি কিরণ সম্পাত সমুজ্জ্বল বিশাল সুনীল আকাশার্দ্ধ যেন ভাঙ্গা বাড়ীর ছাদের মত মড়মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল, সে যেন তারই বজ্রচাপে আহত, স্তম্ভিত, রুদ্ধশ্বাস হইয়া রহিল, তার চিন্তা, ধারণা সহসা রুদ্ধস্রোত নদীজলের মতই স্তব্ধ, তার জীবনী-সঞ্চারক শোণিত স্রোত যথাস্থানে বদ্ধ—তার ইন্দ্রিয়গ্রাম নিশ্চল হইয়া পড়িল। বহুক্ষণ সে সেই একই ভাবে স্তব্ধ অসাড়বৎ বসিয়া থাকিয়া পরে প্রাণপণ বলে যেন শত মণ ভারের তলায় পড়া গভীর ভারাক্রান্ত আর্ত্তশ্বাসটাকে কোন মতে টানিয়া লইয়া আত্মরক্ষা করিল। তার পর তেমনই প্রাণান্তপণে কোন মতে তার অসাড় অবশ জিহ্বাকে স্ববশে আনিয়া স্খলিত জড়িত স্বরে কথা কহিল—বলিল, "তার বেঁচে না থাকাই ভাল ছিল হরি! জান কি তুমি তার জন্যে এ পৃথিবী আমার কতখানি শূন্য হয়ে গেছে?"—

"তা' কেনই বা যাবে, ভীম? একটা বিশ্বাসঘাতিনী মেয়েমানুষের শোকে তোমার মত লোক যদি এত অধীর হয়, তা হ'লে পৃথিবী থেকে ভাল মন্দের বিচার চ'লে যাবে যে!"

ভীমের মুখ আগুনের মত লাল হইয়া উঠিল—একটা দমকা হাওয়ার মত সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে তীব্রস্বরে কহিয়া উঠিল, "উজ্জ্বলা বিশ্বাসঘাতিনী? মিথ্যা কথা! অসম্ভব!"

"মিথ্যা কথা নয়, ভীম! হ'লে ভালই হ'তো, তা হলো না। মহাপ্রতীহারের পাল্কী চ'ড়ে তাকে যে নিজের চোকে যেতে দেখেছে, তার মত

বিশ্বাসী ও হিতৈষী এ সংসারে কমই আছে। সাজসজ্জা... সে হাসি মুখেই যাচ্ছিল, হঠাৎ উপরের ঢাকাটা বাতাসে খ'সে ...তে সে তাকে দেখতে পেয়েছিল, বড়বৌ তক্ষুনি ব্যস্ত হয়ে কাপড়টা টেনে দিল। তার ও রকম কাণ্ড দেখে ঐ লোকটার এমনই অশ্রদ্ধা হলো, যে আর তার সঙ্গে কথা কইতেও মন হলোনা।"

ভীমের সেই আগুন লাগার মত লাল মুখ দেখিতে দেখিতে ছাইয়ের মত বিবর্ণ হইয়া তাহা মরার মুখের মতই বিবর্ণ দেখাইল, ঝড়ে ভাঙ্গা শাল-গাছের মত সে ঘুরিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহারাজাধিরাজ সে দিন তাঁর অমাত্যমণ্ডলী সঙ্গে মৃগয়ায় গিয়াছিলেন, সারাদিন বনের মধ্যের বিশুদ্ধ বায়ুসেবনে ও শিকারের সানন্দশ্রমে শরীর মন দুইই তাঁর সে দিন আশ্চর্য্যরূপে তাজা হইয়া উঠিয়াছিল। মহাপ্রতীহার, মহামাণ্ডলিক, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাক্ষপটলিক, মহাসেনাপতি প্রভৃতি রাজপদোপসেবী ও প্রিয়বান্ধবগণ সকলেই রাজধিরাজের সঙ্গী হইয়াছিলেন। সমস্ত দ্বিপ্রহর ধরিয়াই মৃগ, পক্ষী, শশকাদি নিরীহ পশু-মৃগয়ায় আনন্দ উপভোগ করিয়া অপরাহ্ণ-বেলায় সদলবলে রাজাধিরাজ রাজধানীতে প্রত্যা-বর্ত্তন করিলেন।

মহাপ্রতীহার কুমার রুদ্রদমন রাজাধিরাজের নিকট বিদায় লইয়া সেই মাত্র নিজের আবাসভবনে প্রত্যাগত হইয়াছেন, মৃগয়াবেশ পরিত্যাগ করিয়া সবে মাত্র হস্তমুখ প্রক্ষালন করিতেছিলেন, এক জন প্রতীহার আসিয়া জানাইল, এক ব্যক্তি বিশেষ প্রয়োজনে ভট্টারকের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছে।

মহাপ্রতীহার দর্শনার্থীকে লইয়া আসিতে আদেশ দিলেন।

প্রতীহারের পশ্চাতে যে ব্যক্তি আসিয়া মহাপ্রতীহারকে সগর্ব্বভাবে অভিবাদন জানাইল, উহাকে দেখিয়া মহাপ্রতীহার কিছু বিস্ময় বোধ করিলেন। তাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত এক সাধারণ নাগরিক মাত্র। একটু রূঢ় কণ্ঠেই মহাপ্রতীহার প্রশ্ন করিলেন,—"কে তুমি ?"

উত্তর হইল, "কৈবর্ত্ত-নায়ক' দিব্যোকের আত্মীয় হরি।"

'কৈবর্ত্ত নায়ক' ও 'দিব্যোক' এই শব্দ কয়টা কানে আসিতেই মহাপ্রতীহারের প্রভুত্বসূচক ভাব ও অপ্রসন্ন কণ্ঠস্বর এক নিমেষেই পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিল।

"আমার কাছে কি প্রয়োজন ?"

হরি কহিল, "আপনার কাছে বিচার চাইতে এসেছি।"

"আমার কাছে বিচার ? তুমি কি এ দেশে নূতন এসেছ ? বিচারের জন্য রাজার ধর্ম্মাধিকরণ রয়েছে, বিচার করবার ভার ত আমার উপর নয়।"

হরি কহিল, "আমার অভিযোগের বিচার প্রথমে আমি আপনারই কাছে পেতে চাই, কারণ, আমার অভিযোগ আপনারই বিরুদ্ধে।"

"আমার—বিরুদ্ধে ?"—মহাপ্রতীহারের অহঙ্কারদৃপ্ত নেত্র দৃপ্ততর দেখাইল, "কি তোমার অভিযোগটা শুনি ?"

"আপনি আমার কোন বিশেষ বন্ধু ও আত্মীয়ের ভয়ঙ্কর ক্ষতি ও অপমান করেছেন।"

"তোমার কোন বিশেষ বন্ধু ও আত্মীয়ের ক্ষতি ও অপমান করেছি,—আমি ? আশ্চর্য্য বটে ! আমার ত সে রকম কোন ঘটনাই স্মরণ হয় না। যা হোক, তোমার সেই বিশেষ আত্মীয় বন্ধুটি কে, যার আমি 'ভয়ঙ্কর ক্ষতি ও অপমান করলেম ?' একটু শীঘ্র কথা শেষ ক'রে নাও, আমার এখনই আবার রাজার কাছে ফিরে যেতে হবে।"

হরি ধীর কণ্ঠে উত্তর করিল—"তার নাম ভীম। সে—"

এইটুকু শুনিয়াই মহাপ্রতীহার রুদ্রদমন নিকটবর্ত্তী একখানা আসনের উপর বসিয়া পড়িয়া হস্তস্থিত গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা ললাটের স্বেদস্রুতি মুছিতে ব্যস্ত হইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ স্পষ্টই শুকাইয়া গেল।

হরি তার কথা শেষ করিল, "সে কৈবর্ত্ত-নায়ক দিব্যোকের ভাইপো, আপনি তাকে যে না জানেন, তা মোটেই নয়, বরং ভাল করেই জানেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।"

কুমার বিশুষ্কভাবে ঈষৎ একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন—"তোমার কথার ধরণ-ধারণ নিতান্ত চাষারই মত।"

হরি যোড় হাত করিয়া কহিল, "আমি ত চাষা বই আর কিছু ব'লে আপনাকে নিজের পরিচয় দিইও নি, আমি যা, তা আমায় সবাই দেখলেই জানতে পারে; এটাকে আমি ভাল বলেই মনে করি এবং যাদের বাইরে খুব ভদ্রলোক ব'লে বোধ হয় ও ভিতরে ইতরের মত প্রবৃত্তি ভরা থাকে, তাদের আমরা মর্ম্মান্তিক ঘৃণা করি।"

রুদ্রদমন এই কথায় রোষ দীপ্তনেত্রে বক্তার মুখের দিকে চাহিলেন, "সাম্রাজ্যের মহাপ্রতীহারের সঙ্গে কি রকম ভাষায় কথা কইতে হয়, সেটা শিক্ষা করবার ব্যবস্থা করতে খুব বেশী দেরী হবে না—এই কথাটা স্মরণ রেখে, যা তোমার বলবার আছে, বলতে পার। আমার এইটুকু বলবার আছে, যে, আমি তোমার বন্ধু বা আত্মীয়ের ক্ষতি বা অপমান কিছুই করি নি। এ সব করবার মত ক্ষুদ্র অবসর ও প্রবৃত্তি আমার নেই।—এখন তুমি যেতে পারলেই দুজনকার পক্ষে সুবিধা হয়।"

হরি এ কথায় দৃক্‌পাতও করিল না। সে নির্ভীক দৃপ্তভাবে জনসাধারণের পক্ষে ভয়াবহ মহাপ্রতীহারের ক্রোধপরুষ মুখের দিকে চাহিয়া স্থিরস্বরে কহিল—"আমার যা বলবার আছে তা না বলেই চ'লে যাবার

জন্য আমি আসিনি। ভীমের স্ত্রীকে আপনি চুরি ক'রে এনে কোথায় রেখেছেন, এই উত্তর টুকু মাত্র আমি আপনার কাছে পেতে চাই, এবং সদুত্তর পেলেই চলে যাব।"

মহাপ্রতীহারের মুখ একান্ত বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি স্খলিত কণ্ঠে কহিলেন "ভীমের স্ত্রীকে আমি চুরি ক'রে এনেছি?"

তারপর মহাপ্রতীহার অত্যন্ত মৃদুস্বরে যেন আত্মগতই এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিলেন, "কে' এ'কথা বলেছে?"

"যে স্বয়ং আপনার শিবিকা ও বাহকদের দ্বারা বাহিত হয়ে তাকে যেতে দেখেছে, সেই বলেছে। জনশূন্য গৃহ থেকে গৃহপতি-বধূকে হরণ করার শাস্তি কি, মহাপ্রতীহার? এ স্থলে আপনারা অন্যকে কি দণ্ড দিতেন, শুধু সেই টুকুই আমি জান্‌তে চাইচি।"

মহাপ্রতীহার এত বড় অবমাননার পরেও বহুক্ষণ বাক্যহীন ও ভূমি নিবদ্ধ নেত্রে রহিলেন, তাঁর অন্তরের বিচলিত ভাব কেবলমাত্র তাঁর মৃদু মৃদু অথচ ঘন ঘন ভূমিতলে পাদুকা-সংযুক্ত চরণাঘাত হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছিল। ক্ষণপরে মুখ তুলিয়া তিনি শিথিলভাবে উত্তর দিলেন, "শিবিকা বাহক যে আমারই, তার প্রমাণ কি? আমিই ভীমের স্ত্রীকে চুরি করেছি, কেমন ক'রে তোমরা স্থির করলে?"

"সে দিন বেলা তৃতীয় প্রহরে আপনার প্রেরিত দূতী ও যানবাহন কি ভীমের বাড়ীর পিছনে পিণ্ডারিকা খাটিকার ধারে উলুবনের মধ্যে লুকানো ছিল না? শিবিকায় রক্তবস্ত্রের বিচিত্র আবরণ ঢাকা ছিল ত? দূতীর পরিধানে শুভ্রবর্ণের পাটের পাছড়া?—সে যাই হোক, আপনি দয়া ক'রে একবার আমার সঙ্গে চলুন, ভীমের সন্দেহভঞ্জন ক'রে তাকে শান্ত ক'রে আসতে পারেন, ভালই, নতুবা আমরা ধর্ম্মাধিকারের কাছে বিচার-প্রার্থী হ'ব।"

মহাপ্রতীহারের মুখ সমধিক বিবর্ণ দেখাইল,—"তুমি বুঝতে পারচো না! কেন অনর্থক একটা সন্দেহের বশে আমায় এ রকম অপমান করচো? এর ফল নিশ্চয়ই ভাল হবে না! সামান্য একটা কৈবর্ত্তানীকে চুরি করবার যে আমার কি প্রয়োজন হ'তে পারে, আমি ত তা' ভেবেই পাই নে! ভীমকে বুঝিয়ে বলো, তার স্ত্রী হয় ত চরিত্রহীনা ছিল, স্বেচ্ছাতেই পুরুষান্তর গ্রহণ করেছে।"

হরি সক্রোধ নেত্রে মহাপ্রতীহারের বিচলিত মুখের দিকে চাহিল,—"যা বল্‌বার আছে, আপনি তাকেই বলবেন আসুন; সে সেই খাটিকারধারে আপনার প্রতীক্ষা করচে।"

মহাপ্রতীহার সক্রোধে মাথা তুলিলেন,—"হাস্‌বো না কাঁদবো! আমি যাব সেই ভীম কৈবর্ত্তর সন্দেহভঞ্জন করতে?—এ লোকটা পাগল না কি?"

"না যান না-ই যাবেন; আমার কর্ত্তব্য আমি পালন ক'রে গেলেম। মনে রাখবেন, মহাপ্রতীহার! এ অত্যাচার আমরা নীরবে সহ্য করব না, এর প্রতীকার হয় কি না হয়, দেখা যাক্! ভীম-কৈবর্ত্তকে এতটাই ছোটলোক মনে করবেন না।"

"প্রতীহার!"

কুমার রুদ্রদমনের আহ্বানে দ্বারপার্শ্ব হইতে নিমেষমধ্যে একজন প্রহরী আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন জানাইল।

"এই লোকটাকে বন্দী ক'রে রাখ, আমার আদেশ না পেলে ছেড়ে দেবে না।"

কুমারের বাক্যসমাপ্তি হইবার পূর্ব্বেই হরি ক্ষিপ্রহস্তে বস্ত্রমধ্য হইতে একখানা তীক্ষ্ণধার তরবারি বাহির করিয়া তাহা প্রহরীর দিকে প্রদর্শন করিল এবং চক্ষুর পলকে এক লম্ফে কক্ষত্যাগ করিয়া বাহির হইতে দ্বারের অর্গল বন্ধ করিয়া দিয়া ধীরভাবে প্রস্থান করিল। এত ত্বরিতে সে এই

কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিয়া গেল যে, প্রভুভৃত্যের মধ্যে কেহই তাহাকে বাধা দিতে পারিলেন না।

মহাপ্রতীহার তখন কতকটা মূঢ়ের ন্যায় চাহিয়া থাকিয়া পরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আত্মগতই কহিলেন,—"ভীম কৈবর্ত্ত আমায় তার সন্দেহভঞ্জন করবার জন্য দূত পাঠাতে ভরসা করে? নির্জ্জন খাটিকার ধারে সন্ধ্যা-বেলায় বধূ-চোরের নিমন্ত্রণ!—ব্যবস্থাটা বড় মন্দ করা হয় নি।—যা হোক, রাজাধিরাজকে সংবাদটা দিয়ে আস্‌তে হলো।—দেখি তিনি এই নিমন্ত্রণটা গ্রহণ করেন কি না; ন্যায়তঃ এটা ত তাঁরই প্রাপ্য!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সে দিন আকাশপ্রান্তে প্রকৃতির দীর্ঘবেণীর ন্যায় সজল কালো মেঘ লুটাইয়া পড়িয়াছিল, আর্দ্র বায়ু কাঁদিয়া কাঁদিয়া নদীবক্ষে আছড়াইয়া পড়িতেছে, একটা সুগভীর স্তব্ধতা বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তরের গভীরতম বিষাদকে সূচিত করিতেছে, আর সেই সঙ্গে একটি শিশু-প্রতিম ক্ষুদ্র ও সরল হৃদয় গভীর বেদনায় কাতর হইয়া অন্তরে বাহিরে তেমনই করিয়াই নিঃশব্দে দিনে রাত্রে লুটাইতেছিল।

যখন অবিশ্রান্ত জলধারায় চারিদিক্ ধূসর হইয়া উঠিল, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে কোথাও কোন প্রভেদ রহিল না, সব একাকার হইয়া গেল, নদীতীরবর্ত্তী ম্লান তরুরাজি অশ্রুসজল দেহে নিরুপায়ে মস্তক অবনত করিয়া প্রকৃতির সহস্র উৎপীড়ন নীরবে সহিয়া লইতে লাগিল, তখন সেই অষ্টাদশ-বর্ষীয়া তরুণী বধূর এমনই মেঘ-মেদুর বর্ষণ-সিক্ত কত দিবসরজনীর সুখচিত্র স্মরণপথে ভাসিয়া আসিয়া তাহার এই ব্যর্থ দিবসের ভীষণ নগ্নতাকে একেবারে যেন তাহার দীর্ণ চিত্তের সমক্ষে প্রকট করিয়া ধরিল। দীর্ঘশ্বাস

ফেলিয়া সে সেই অবিরল জলধারা বর্ষিত রন্ধ্র শূন্য আকাশের দিকে শূন্যনেত্রে চাহিয়া রহিল। তার হৃদয়ের সকল তন্ত্রী যেন অসহ্য বেদনার কঠিন স্পন্দনে খান খান হইয়া ছিঁড়িয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, রুদ্ধবাষ্প-তাপে ভূগর্ভের মত বিদীর্ণ হইতে চাহিতেছিল, অথচ তাহা ছিঁড়েও না, ফাটেও না! তাই সেই যন্ত্রণার তীব্রতাও যেন সহনাতীত বলিয়াই বোধ হয়।

আবার এ দিনে ঝুলন-পূর্ণিমা, রাখী উৎসবে রাজপুরী আনন্দে মাতোয়ারা। সারা দিন ধরিয়াই নহবত বাজিতেছে। সন্ধ্যায় বুদ্ধ ও তারাদেবীর মন্দির আলোকে, কুসুমে, সুগন্ধে, পূজা সম্ভারে, উৎসবে, আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল। প্রায় সমুদয় দেশবাসী—সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত সকলেই সে দিন রাজবাড়ীতে উৎসব দেখিতে আমন্ত্রিত হইয়া থাকে, আজও তাহারা আসিয়াছে। এখন বর্ষার আকাশ মেঘমুক্ত, নির্ম্মল, রাজকীয় চন্দ্রাতপের উর্দ্ধভাগে তাহা সুপ্রশস্ত চাঁদোয়ার মতই অযুত তারকার রত্নভূষায় বিভূষিত হইয়া সুবিস্তৃত হইয়া আছে। রজত-শুভ্র চন্দ্রকরে চারিদিক আলোকিত। স্তবকে স্তবকে কদম্ব, কুরুবক, কেতকী ও নিশিগন্ধার গুচ্ছ, শ্বেত ও রক্ত স-নাল পদ্মদলে নৈশ লঘু বায়ু সুগন্ধের গুরুভারে যেন ভারাক্রান্ত। হীরক-শীর্ষ তরঙ্গরাজি যেন আপন মনে হিন্দোলায় চড়িয়া মৃদু মৃদু ভাবে দুলিতেছিল, তটের প্রান্তে অস্ফুট মর্ম্মরে হিন্দোল খাইয়া তারাই আবার আনন্দে লুটাপুটি করিতেছে। নীলাকাশের স্নিগ্ধ সুন্দর পূর্ণচন্দ্র দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যারাণীর দুই চোখ প্লাবিত করিয়া দুঃখের উষ্ণ অশ্রু বেগে বাহিরে আসিতেছিল। আর একখানি অমনই সুন্দর—বুঝি ততোধিক মনোহর স্নিগ্ধ মুখ তার হৃদয়া-কাশে সমুদিত হইল, সে আর কোনমতেই দেবদর্শনে যাত্রা করিতে পারিল না, ঘরের সর্ব্বাপেক্ষা অন্ধকার কোণে লুকাইয়া বসিয়া একেবারে সর্ব্বশরীর-মনের হাল ছাড়িয়া দিয়া অসম্বরণীয় শোকে আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

এমন সুন্দর জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী, এমন আনন্দময়ী প্রকৃতি, আজ এই প্রথমবারই যে তার এই তরুণ জীবনে একান্ত ব্যর্থ অর্থহীন হইয়া রহিল! কত স্বপ্নভাবময় সুখস্মৃতিভরা মধুযামিনীকে স্মরণ করিয়া তার প্রিয় বিরহিত অশান্ত ব্যাকুল চিত্ত বিপদ হাহাকারে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে চাহিল।—হায়, সে সবই আজ স্বপ্ন! সে সকলই যেন ক্ষণিকের ইন্দ্রজাল! সে দিন সন্ধ্যার আজ কোথায়? আর কি এ জীবনে সে দিন তার কখনও ফিরিয়া আসিবে?

স্বামী পরিত্যক্ত শয্যায় কোন দিনই সে এখন আর একা শয়ন করিতে পারে না, কিন্তু যখন বড় অসহ্য বোধ হয়, তখন একবার তার সেই পুণ্য-তীর্থে—সেই তার ইষ্টদেবতার পূজার মন্দিরে, যেখানে তার জন্য অজস্র সুখস্মৃতি পুঞ্জীভূত হইয়া তার গভীর বেদনার হেতু হইয়া তাহাকে প্রতি নিমেষে পীড়ন করিতেছে, অথচ সান্ত্বনার উপায় শুধু সেইখানেই নিহিত হইয়া আছে, তাহারই উপর পতিত হইয়া অবিরল অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে করিতে সেই সকল সুখময় ও আনন্দ মধুর পূর্ব্বস্মৃতিগুলিকে প্রাণপণে যেন বুকের মধ্যে সবলে চাপিয়া ধরিতে থাকে। নতুবা বুক যে তার ফাটিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হয়। এই অবস্থায় কখনও মুদিতনেত্রে, স্বেদ রোমাঞ্চিত কলেবরে নিজ দেহে সে স্বামীর স্পর্শসুখানুভব করিয়া নবজলকণানিষিক্ত স্ফুট-কোরক কদম্বের মতই সুখ স্পন্দিত হয়, ইন্দ্রিয় সকল তার সেই অতীত সুখের অনুভূত স্মৃতিতে যেন এককালে জড়বৎ অভিভূত হইয়া আসে, আবার ক্ষণপরে সেই ক্ষণিকের মোহ অপসৃত হইয়া নিষ্ঠুর কঠিন বাস্তব জাগ্রত হইয়া উঠিয়া, সেই স্বপ্নসুখে বাধা প্রদান করে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুটি চোখের কোণ ফুলিয়া উঠে। অন্তরাত্মাও অবসন্ন হইয়া পড়ে, মোহ তাহাকে গ্রাস করিতে আইসে, সমস্তই যেন অন্ধকারে তলাইয়া যায়।

এমনই করিয়াই পতি বিরহিতা পতিপরায়ণার বি... রাত্রি ও দীর্ঘ দিন বড় কষ্টে—বড় পরিতাপেই অতিবাহিত হইতেছিল। ...ত বড় বিপুল বিশাল রাজপ্রাসাদে যেন আর কোথাও একটি জনপ্রাণী ... নাই, এমনই তার বোধ হইত; সব যেন শূন্যময়, চারিদিক যেন অন্ধক... মহাদেবীর সমবেদনা, স্নেহ ও সান্ত্বনা সর্ব্বদাই তাহাকে ঘেরিয়া না র... এত বড় মনোবেদনার গুরুভার যে কেমন করিয়াই অতটুকু ক্ষুদ্র দু... বক্ষে সহ্য হইত, বলা যায় না! শুধু এই মাতৃসমা ভগ্নী-প্রতিম স্নেহপ্রতি... ইহার মৃতকল্প শরীরে জীবনীধারা সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁ... সকল কার্য্যের উপরেই এই ক্লিষ্টা বিবশা আত্মহারা বালিকাকে সান্ত্বনা দা... করা তাঁর যেন সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যকার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। অসুস্থ ...খী কোলের ছেলেটিকে মা যেমন করিয়া চোখে চোখে বুকে বুকে আ...িয়া রাখিয়া দেন, লজ্জাদেবীও সন্ধ্যারাণীকে তেমনই করিয়াই নিয়...ছে কাছে রাখিতে চাহিতেন, আবার পরিজনবর্গের তীক্ষ্ণ সমালো... দৃষ্টি হইতে তার অত্যন্ত ভীরু দুর্ব্বল হৃদয়টুকুকে চাপা দিয়া রাখি...র জন্য অনেক সময়ই তাহাকে তাহাদের সান্নিধ্য হইতে লুকাইয়া রাখিবার প্রয়োজন ঘটিত, সেই সময় সন্ধ্যা একবার করিয়া ছুটিয়া গিয়া নিজের ঘরে, তার সেই সর্ব্বসুখময় স্মৃতিমন্দিরে প্রবেশ করিয়া তার প্রাণপণের বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া রাখা অশ্রুর ঝরণা উৎসারিত করিয়া দিয়া পাষাণ গুরু প্রাণের বোঝাকে কথঞ্চিৎ সহনীয় করিয়া লইত। ওঃ, এইটুকু না থাকিলে কি মানুষ বাঁচিতে পারে? ভগবান্ যে শোকার্ত্তকে বাঁচাইয়া রাখিবার এই একটিমাত্রই পথ করিয়া দিয়াছেন!

সে দিন বর্ষাধারার সঙ্গে সমান হিসাবে অশ্রু বিনিময় করিয়া ম্লান সান্ধ্যচ্ছায়ায় যখন সন্ধ্যারাণী তার ক্ষীণ দেহলতাকে বিলীন করিয়া দিয়া সেই বিজন গৃহের বাতায়নতলে লুটাইয়া পড়িয়াছিল, আর্দ্র বায়ু তার

অশ্রুসিক্ত মুখের উপর শুধু নিজের করুণা-সুশীতল হাতখানি বুলাইয়া তাহাকে বৃথা সান্ত্বনার ব্যর্থ চেষ্টায় ব্যাকুল হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস মোচন করিতেছিল, তখন তাহারই মত অমনই আর একটি করুণাস্নিগ্ধ মৃদু স্পর্শ সে তার তপ্ত ললাটের উপর অনুভব করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে কানের কাছে চির-পরিচিত স্নেহমধুর মিষ্ট ভর্ৎসনা বাণী বাজিয়া উঠিল :—

"পোড়ারমুখী! এমনি ক'রে কোন্ দিন না কোন্ দিন দেখছি, আমার মাথাটা তুই চিবিয়ে খেয়ে ছাড়বি! যদি কত আরাধনার ফলে মহাদেবের দয়ায় এত বড় রাজবংশের নামরক্ষার একটু আশা হচ্চে, তাতে দিনরাত কান্নাসাগরে ডুব দিয়ে দিয়ে তুই সেটুকুকে কি নষ্ট না ক'রে নিশ্চিন্ত হবি না? এত ক'রে তোকে বোঝাচ্চি, তুই কি, বল দেখি?"

মহাদেবীর ভর্ৎসনায় সন্ধ্যা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। কিন্তু তার অশান্ত অবাধ্য চোখের জলকে সে কোনমতেই প্রতিরোধ করিতে পারিল না। জানুর উপর চিবুক রাখিয়া অধোমুখে বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহা দেখিয়া মহাদেবী কাছে সরিয়া আসিয়া হাত দিয়া তার মুখখানা তুলিয়া ধরিলেন, "ছি, ছি, চোখের কোলগুলো রাঙ্গা হয়ে ফুলে উঠেছে যে! সন্ধ্যা! সম্রাটবংশের বংশধর তোর পেটে, তুই কি দিন-রাত কেঁদে কেটে আমার ছেলে খুন করবি, রাক্ষুসি? তা যদি করিস্, তোর মুখ আমি আর এ জন্মে দেখবো না, এটা কিন্তু তুই খুব জেনে রেখে দিস্!—কি ছিঁচ্‌কাঁদুনী মেয়েই তুই হয়েছিস্ রাণু! বোঝালে একটা কথাও বুঝিস্ নে?"

সন্ধ্যা একবার ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া লজ্জাদেবীর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজিল,—"দিদি! দিদি! আপনি আমার উপর রাগ করবেন না,—আমি যে ঐ জন্যই আরও সইতে পারছি নে! তার চেয়ে ও যদি আমার

কাছে না আস্‌তো, তা হ'লে—তা হ'লে আমি যে ম'রে গিয়েও বাঁচতে পারতুম"—বলিতে বলিতে সন্ধ্যা অবোধ বালিকাটির মতই ক্রন্দনে অভিমানে হাঁপাইতে লাগিল।

মহাদেবীরও দুই চোক চোকের জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, সেই পতনোদ্যত অশ্রু সংবরণ করিতে গিয়া তাঁহার সঙ্কল্পস্থির শান্তকণ্ঠ সলিলার্দ্রতায় অস্ফুট হইয়া আসিল, তথাপি বাহিরে সহজ ভাবপ্রদর্শনের চেষ্টা করিয়া তিনি ঈষৎ তিরস্কারের ভাবেই কহিলেন, "কি আমার হিতৈষিণী রে! 'ও যদি ওঁর কাছে না আস্‌তো!'—যাঃ, চুপ কর বলছি, অমন কথা আর কক্ষনো তুই আমার কাছে বলবিনে! দেখিস্, মনে থাকে যেন। গর্ভে তোমার সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্ররত্নের উদ্ভব হয়েছে, এ আমি তারাদেবীর পুরোহিত মহাস্থবির তারানাথকে দিয়ে গণনা করিয়েছি। একদিন ঐ সন্তান তার পিতার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হয়ে পালবংশের পূর্ব্বগৌরবকে সমুজ্জ্বলতর করবে, এখন এই দুটো দিন একটু ধৈর্য্য ধ'রে ওটাকে বাঁচিয়ে রেখে সুদিনের প্রতীক্ষা করবি, না সকল আশা ভরসাকে জন্মের মত জলাঞ্জলি দেওয়াবি, তাই আমায় বল্ ত?"

এ কি মন্ত্রকুহক! মায়ামুগ্ধা আশার এ কি অমর বাণী কানে শুনাইলে? এই মাতৃগর্ভলীন অজাত সন্তান একদিন তার পিতৃসহায় হয়ে সাম্রাজ্য-গৌরব রক্ষা করবে! তবে পিতা তার সকল বিপন্মুক্ত হয়ে সাম্রাজ্য গগনের প্রদীপ্ত ভাস্কররূপে আবার এই বরেন্দ্রভূমির অন্ধকার আকাশে উদিত হবেন কি? ওগো কবে,—কবে কত দিনে সে দিন আসবে?

সন্ধ্যা মুহূর্ত্তমধ্যে যেন সম্বিৎপ্রাপ্ত হইয়া সপুলকে উঠিয়া বসিল। একবার ভাল করিয়া সব কথা—জ্যোতিষী গণনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া শুনিবার জন্য তার সমস্ত হৃদয় লোভে আকুল ও চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু কেমন করিয়া এ সব কথা, স্বামীর কথা, বিশেষতঃ যে

সন্তানের এখন পর্য্যন্ত জন্ম হয় নাই, তাহারই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা— যদিও তাহা শুনিবার জন্য মায়ের মনে লোভের সীমা থাকে না, তথাপি কেমন করিয়া এই মাতৃকল্পা মাননীয়ার নিকট করা যায়? কিন্তু তা না পারিলেও ঐ ভবিষ্যতের আশাটুকুকেই সে যে আজ তার এই গভীর হতাশায় নিমজ্জনোন্মুখ অর্দ্ধমূর্চ্ছিত চিত্তে সম্বল করিয়া বসিল, ভাল করিয়া না বুঝিলেও ইহার একটা ক্ষীণ আভাস সে অনুভব করিল এবং তাহারই প্ররোচনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া নত দেহে এই একান্ত কল্যাণপ্রার্থিনী স্নেহময়ীকে সাগ্রহে প্রণাম করিয়া পদধূলি তুলিয়া উজ্জ্বল সিন্দূরমণ্ডিত সীমন্তে রাখিল।

মহাদেবী তার ক্ষুদ্র মুখখানা দুই হাতের মধ্যে লইয়া গভীর স্নেহভরে তাহাকে চুম্বন করিলেন, "ভগবান্ কৈলাসপতি সর্ব্বতোভাবে তোমায় রক্ষা করুন, ইন্দ্রতুল্য এবং স্কন্দ-জননীর ন্যায় ত্রিভুবনবন্দিত স্বামি-পুত্রের সঙ্গসুখে চিরসৌভাগ্যবতী হও।"

এই অকৃত্রিম কল্যাণকামনা ও গভীর স্নেহচুম্বনে শোকাহতা বালিকা আজ যেন তার অসহায় জীবনের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় গভীর শান্তি ও শক্তির ধারা প্রবাহিত বোধ করিতে লাগিল। তার আশাহীন তমসা অন্তরে একটি ক্ষীণ আশালোক দেখা দিল। সেই উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া সহসা তখন সে গাঢ়স্বরে বলিয়া ফেলিল, "মহাদেবি! দিদি! আপনাকে ভাগ্যে আমি হারাইনি!"

শুনিয়া লজ্জাদেবীর নিজের পক্ষে তখন আর অশ্রুসংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা তখনও হয় নাই, রাজোদ্যানে অপরাহ্নের মৃদু-মন্দ মলয় হাওয়া অসংখ্য ফুলগন্ধে মাতিয়া রহিয়াছে। বসন্ত আসিতে না আসিতেই বসন্ত-সখা কোকিল তাহার বন্দনা-গানে পঞ্চমে তান ধরিয়া আজই প্রথম বসন্তের আগমনী গাহিতেছিল,—কুহু, কুহু, কুহু, কুহু।

যৌবনমদবিলসিত, অলস তনুভার সুখাসনে বিস্তৃত করিয়া দিয়া মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব এই উদ্যানসমীপবর্ত্তী অলিন্দোপরি মৃগয়া-শ্রান্তি অপনোদন করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সচকিত নেত্রে ইতস্ততঃ চাহিয়াও দেখিতেছিলেন, যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

পশ্চাতে রাজপাদমূলিকত্রয় শ্রেণীবদ্ধভাবে রাজাজ্ঞার প্রতীক্ষায় চিত্র করা পুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া আছে। বামপার্শ্বে নবযৌবনশ্রী-বিমণ্ডিতা তরুণী কাশ্মীরবাসিনী সুন্দরী সুবর্ণময় তাম্বুলকরঙ্ক হস্তে দণ্ডায়মানা, কর্পূর, কেতকী ও সুগন্ধি চুয়া মিশ্রিত তাম্বুলের সহিত যে মিষ্ট মধুর হাসিটুকু সে রাজাকে প্রদান করিতেছিল, তাহারই বিনিময়ে রাজাধিরাজ বারেকমাত্র প্রীতিচত্তে তাঁহার হীরকাঙ্গুরীযুক্ত অঙ্গুলী দ্বারা তার লোধ্রপরাগ চূর্ণে আপাণ্ডুর কপোল স্পর্শ করিয়া স্নেহ প্রকাশ করিলেন।

সাংবাদিক অবনতশিরে মহামাত্য ভট্টরাজ বাসুদেবের আগমনসংবাদ জ্ঞাপন করিল। সংবাদ শুনিয়া রাজাধিরাজের ললাটদেশ কুঞ্চিত হইল। খুবই সম্ভব, তিনি যাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, ইনি তিনি নহেন।

নূতন মহামাত্য প্রবেশ করিলেন, বৃদ্ধ না হইলেও প্রবীণবয়স্ক বটে, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে দীর্ঘ শিখা, উহা গ্রন্থিবন্ধনীমধ্যে তাঁর পূজাসময়ে ব্যবহৃত একটি কুন্দপুষ্প গ্রথিত রহিয়াছে। ভ্রূদ্বয় অত্যন্ত ঘন, মুখ মাংসল

ও গম্ভীর, ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটির মধ্যে ধূসর তারকাদ্বয় ধূর্ত্ততাব্যঞ্জক। কিন্তু যোধদেবের মত বিচঞ্চল এবং মহত্ত্বের জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল নয়।

মহামাত্য যোধদেবের নির্ব্বেদ সহকারে পদত্যাগ ও তীর্থযাত্রার সুযোগে ইনিই নিজের অশ্রান্ত চেষ্টা দ্বারা এই পদ অধিকার করিয়াছেন। রাজা মনে মনে ইঁহাকে পছন্দ না করিলেও প্রকাশ্যে কিছু সম্মান করিতে বাধ্য হইতেন; যেহেতু, ইদানীং রাজার পরিবর্ত্তে রাজকার্য্য ইনিই পরিচালিত করিতেছিলেন বলিলেও অসঙ্গত হয় না।

একজন রাজপাদমূলিক মহামাত্যের জন্য উপযুক্ত সম্মানাসন আনিয়া দিল।

রাজাধিরাজ অর্দ্ধশায়িতাবস্থা হইতে ঈষন্মাত্র উত্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন প্রয়োজন আছে?"

মহামাত্য রাজসম্মান জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার স্বভাবগম্ভীর কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "অপ্রয়োজনে রাজাধিরাজের শান্তিভঙ্গ করা আমার স্বভাব বহির্ভূত।"

সূচনা শুনিয়াই রাজাধিরাজের অপ্রসন্ন চিত্ত অপ্রসন্নতর হইয়া উঠিল।

"তা হ'লে কি প্রয়োজন, শীঘ্র করে ব'লে ফেলুন, আমায় এখনই কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হ'তে হবে।"

মহামাত্য দাঁতে দাঁত চাপিয়া মনে মনে ইহার উত্তর দিলেন, "তোমার যা' কাজ, তা' আমার জানাই আছে!" কিন্তু প্রকাশ্যে সে ভাবটা আদৌ প্রকাশ পাইল না। বিনীত গাম্ভীর্য্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমার দ্বারা রাজাধিরাজের সময় নষ্ট হবে না, আমি শীঘ্রই কথা শেষ ক'রে উঠে যাচ্চি। আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের ব্যয়-পত্র অত্যন্ত অধিক হওয়ায় রাজকোষ শূন্য হয়ে গেছে, এ বৎসর মগধের এবং উত্তর রাঢ়ের রাজকর অজন্মার জন্য পাওয়া যায় নি, কোটিবর্ষের প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, সৈন্যরা

বেতন না পাওয়ায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ; ফলে ম… …াপতি দণ্ডমাধবে সঙ্গে কোষাধ্যক্ষ সাহীলের বিষম কলহ হয়ে গেছে। …াধ্যক্ষ আমায় এ সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত করে তাঁর সঙ্কটাবস্থা আপনা… নিবেদন করে অনুরোধ করলেন। আমি আজ সমস্তদিন তাঁকে … হিসাবপত্র দে… জানলাম, বাস্তবিকই রাজকোষ শূন্য এবং অন্ততঃ সৈন্যদে… …তন না দিে একটা রাষ্ট্র-বিপ্লবের আশঙ্কাও রয়েছে এবং—”

রাজাধিরাজ এবার সম্পূর্ণ সোজা হইয়া বসিয়া অত্যন্ত অপ্র…ন্ন স্বরে বাধ দিলেন, “নিশ্চয়ই তা হ’লে রাজকোষ লুণ্ঠিত হয়েছে! আপনি মহাসেনাপতি দণ্ডমাধবকে তার সৈন্যদের আপাততঃ ঠাণ্ডা করে রাখতে উপদেশ দিন, আর মহীপ্রতীহারকে সত্বর আমার আহ্বান জানিয়ে লোক পাঠান। আমার বরাবরই সন্দেহ ছিল, যে কোষাধ্যক্ষ সাহীল লোকটি পা…া চোর। তাকে ধৃত ক’রে কারাগারে নিক্ষেপ করলেই রাজ্যের অথ…াব দূর হয়ে যাবে।”

মহামাত্য স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, “কো…ক্ষকে ধৃত করলেই অর্থাভাব কেমন ক’রে দূর হবে, রাজাধিরাজ? ব… ইতিপূর্ব্বে যতবার আমাদের অর্থাভাব হ’য়েচে, সাহীল নিজে থেকে তাঁর আত্মীয়জনের নিকট, হতে ঋণ করেও প্রত্যেকবারই আপনার আদেশ পালন করে এসেছেন, কোন দিনই আপনার কোন অসুবিধা হ’তে দেননি। তিনি বলছিলেন, তাঁর জন্য, তাঁর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়রাও তাই দরিদ্র হয়ে গ্যাছেন। অনর্থক এই চারিদিকের অসন্তোষের মধ্যে আরও একটা নূতন অসন্তোষের উদ্ভব ক’রে তাঁর আত্মীয়বান্ধবদের রাজাধিরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা কি সমীচীন হবে?”

“আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, কোষাধ্যক্ষ এতদিন ধ’রে আমায় যে মনের সাধে লুণ্ঠন ক’রে এসেছেন, তাতে তো কোনই সন্দেহ

নেই? তাঁকে বন্দী ক'রে তাঁর বাড়ী-ঘর সমস্ত লণ্ডভণ্ড ক'রে অনুসন্ধান করলেই অন্ততঃ তার অর্দ্ধেকটা আমাদের হাতে ফিরে আসবে এবং তা হলেই সম্প্রতি যে সব অভাবের কথা শোনা যাচ্চে, তার মধ্যে অনেকখানিই পূর্ণ হ'তে পারবে। দ্বিতীয়তঃ দোষীকে দণ্ড দিতেই রাজার সৃষ্টি, তাতে যদি কেউ অসন্তুষ্ট হয়, তা হ'লে নিরুপায় এবং সে স্থলে সেই ভয়ে ভীত হয়ে যদি ন্যায়বিচার বন্ধ রাখতে হয়, তার চেয়ে রাজা ও মন্ত্রীর রাজ্যশাসন পরিত্যাগ ক'রে মঠবাসী ও বনবাসী হওয়াই সঙ্গত।"

মহামাত্য অগত্যা নীরব রহিলেন। মনে মনে বলিলেন, "আমার অদৃষ্টে হয় ত শেষ পর্য্যন্তয় বনবাসী হওয়াই লেখা আছে। তবে তোমার অদৃষ্টে কি আছে, জানি না! দিনে দিনে অবস্থা বেশ জটিল হয়েই উঠছে।"

মহামাত্যকে নীরব দেখিয়া রাজাধিরাজ শ্লেষপূর্ণ হাস্যের সহিত পুনশ্চ কহিলেন,—"বোধদেব চ'লে যাবার পর থেকে রাজকোষে পূর্ণভাবেই শনির দৃষ্টি দেখা যাচ্চে! তাঁর আর যা দোষই থাক, এটা ছিল না, এসব তিনি দেখা শোনা করতে জানতেন।"—

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মহামাত্যের কুৎসিত মুখের উপর একটা বিষাক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই মহামাত্যের মুখখানাও এই কঠোর ইঙ্গিতে আরক্ত হইয়া উঠিল। রাজাধিরাজ বলিতে লাগিলেন, "এ সব লুটের টাকা আমি কি ছেড়ে দেবো? কখনই না। এ সমস্তই আমার কাছে আদায় হয়ে ফেরত আসবে। এখন প্রথমতঃ দস্যুরাজ সাহীলই এর পথ মুক্ত ক'রে দেবেন। রাজকোষের অর্দ্ধেক টাকা অন্ততঃপক্ষে তাঁর গর্ভে স্থান পেয়েছে, তার মধ্যের কিছু উদ্গার করিয়ে নেওয়া আমাদের আপাততঃ নিতান্তই আবশ্যক হয়ে পড়েচে দেখচি। এর আগে তিনি বার কতক আমায় কিছু কিছু সাহায্য করেছিলেন বলেই, এতদিন নীরব ছিলেম, আর চলে না।"

মহামাত্যের আরক্ত মুখ নিরক্ত হইয়া গেল। অপমানক্ষুব্ধ বক্ষে তিনি নীরবেই রহিলেন। রাজাধিরাজ কহিলেন, "কোটিবর্ষে প্রজাদ্রোহ হয়েছে বল্লেন না? তা' মাঝে মাঝে ওরকম হয়, কিন্তু মহাসেনাপতির ত মৃত্যু ঘটেনি? তিনি নিশ্চিন্ত চিত্তে রাজধানীতে ব'সে ব'সে রাজার অন্ন ধ্বংস করছেন কেন? কিছু সৈন্য সাজিয়ে কোটিবর্ষ বিষয়ে গিয়ে বিদ্রোহ-দমন ক'রে এলেই তো অনায়াসে পারেন।"

এতক্ষণে মহামাত্য বাসুদেবভট্ট ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন; কহিলেন, —"আমি তাঁকে সে কথা বলায় তিনি হেসে উত্তর দিলেন, 'সূচীবেধে মুষল'!"

"তাঁকে ডাকিয়ে বলুন যে, সূচীর যদি স্তূপ হয়ে ওঠে তা হ'লে অগত্যাই মুষল ব্যবহার প্রয়োজন হয়ে পড়ে বই কি! মিথ্যা সূচীবেধ সহ্য করায় লাভ কি? ভাল, আপনার আর ত কিছুই বলবার নেই? হ্যাঁ, —আচ্ছা, অমনই মহাপ্রতীহারের কাছে লোক পাঠিয়ে তাকে আমার ত্বরিত আহ্বান জানাতে ব'লে দেবেন তো।"

রাজা যে তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেও মহামাত্য তাঁর আসন হইতে নড়িলেন না, যথাপূর্ব্ব চাপিয়া বসিয়া থাকিয়াই চিন্তাম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোষাধ্যক্ষ সাহীলকে ধৃত করাই কি তা হ'লে স্থির সিদ্ধান্ত করলেন, রাজাধিরাজ?"

রাজাধিরাজ ইতঃপূর্ব্বেই মহামাত্যকে বিদায় দিয়া নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছেন বোধে কিছু নিশ্চিন্তভাবে তাঁর কর্ণপার্শ্ববিলম্বী কেশগুচ্ছ অপসারিত করিয়া তাঁহার বামপার্শ্ববর্ত্তিনী রূপসী তাম্বুলিকার প্রতি প্রীতনেত্রে চাহিয়াছিলেন, পুনশ্চ সেই মাদলধ্বনির অনুকৃত সুগম্ভীর কণ্ঠ ও প্রশ্ন তাঁহাকে মুহূর্ত্তেই অপ্রসন্নভাবে ফিরাইল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রূঢ়ভাবে তিনি কহিলেন, "স্থির সিদ্ধান্ত না ক'রে রাজাজ্ঞা প্রচারিত হওয়া কি সম্ভব

ভট্টরাজ ? কোষাধ্যক্ষকে ধৃত করা সম্বন্ধে আমি স্থিরসিদ্ধান্তই হয়েছি। এ বিষয়ে আর বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন।”

ভট্টরাজের বক্ষ ভেদ করিয়া একটা নিশ্বাস উত্থিত হইল। তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়াও একবারেই নিরুত্তরে বিদায় লইতে পারিলেন না। কেশবিরল মস্তকে বারকয়েক হাত বুলাইয়া একটু কুণ্ঠার সহিত বলিয়া ফেলিলেন, “আর একটু ভেবে দেখে শেষ আদেশটা দান করবেন, রাজাধিরাজ কোষাধ্যক্ষ সাহীল নগরীর এক জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁর আত্মীয়জন অনেকেই রাজ কর্ম্মচারীদের মধ্যে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। এমন কি, মহাক্ষপটলিক এবং নৌ-বাটকের উচ্চ কর্ম্মচারীও অধিকাংশ তাঁর আত্মীয় ও বন্ধু, আপনি কি এ বিষয়ে আরও একবার ভেবে দেখবেন না ?”

রাজাধিরাজ অসহিষ্ণুতার সহিত ভূমে পদাঘাত করিয়া মহামন্ত্রীর এই শেষ আবেদনের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, “না, এক হাজারবার না,— আপনি না পারেন, আমার অনেক রাজভক্ত কর্ম্মচারীই আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করবে।”

“রাজভক্তদের মধ্যে আমাকেই সর্ব্বপ্রধান জান্‌বেন, রাজাধিরাজ! তা হ’লে লিখিত আদেশ পত্র প্রদান করা হোক।”

রাজাধিরাজের ইঙ্গিতে এক জন রাজপাদমূলিক অগ্রসর হইয়া আসিয়া চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত আধারমধ্য হইতে একটি রাজমুদ্রাঙ্কিত আদেশপত্র মহামন্ত্রীর হস্তে প্রদান করিলে, তিনি দুঃখিত ও চিন্তিত চিত্তে রাজার কাছে বিদায় লইলেন। অবিচারে বা নির্ব্বিচারে এক জন পদস্থ ব্যক্তিকে অপদস্থ করার ফলে যে এ সময় চারি দিকের অশান্তি অনলে ইন্ধনমাত্র যোগাইয়া দিবে, তাহা বুঝিয়াই তিনি বিষণ্ণ হইলেন, অথচ রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনেও কোন সুফলই ফলিবে না, ইহাও তাঁর বিশেষরূপে জানা কথা।

মহামন্ত্রী যখন কয়েক পদমাত্র অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় মহাপ্রতী-

হার প্রায় ছুটাছুটি আসিয়া অলিন্দের উপর উঠিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভট্টরাজ দাঁড়াইয়া পড়িয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতে যাইতেই অদূর হইতে মহারাজাধিরাজের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল—"রুদ্রদমন!"

"রাজাধিরাজ!" বলিয়া কুমার রুদ্রদমন সোৎসাহে সেই দিকেই অগ্রসর হইয়া গেলেন, এ সময়ে মহামাত্যের হাতে পড়িতে তাঁহারও আদৌ ইচ্ছা ছিল না।

রাজাও প্রিয় বয়স্যকে পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

"রুদ্রদমন! আমার মনে একটা বাসনা উঠেছে। এস, আমরা কাল বনভোজনে যাই। নদীপথে গিয়ে কোন একটা রম্যস্থানে সকলে মিলিত হয়ে স্নানাহার করা যাবে, আর সারা দিন ধ'রে মৃগয়া! কি বল হে? খুব একটা বড় ক'রে দল নিয়ে যেতে হবে, আর তার সঙ্গে বিদ্যুৎকেও নিয়ে নিও, সে সঙ্গে থাকলে লাগবে ভাল। তোমার কি ভাল লাগছে না? পছন্দ হচ্ছে ত?"

মহাপ্রতীহার ঈষৎ বিষণ্ণভাবে হাসিয়া কহিলেন, "ভালই লাগছে, রাজাধিরাজ! আদেশ যা দিচ্ছেন, প্রতিপালিতও হ'তে পারবে; তবে যদি না এর মধ্যে আমায় ওর চাইতে বেশী দূরে এবং কোন নিরানন্দ পর্য্যটনে বেরিয়ে পড়তে হয়!"

"বটে! কোথায় যাচ্চো? কখন্ যাচ্ছো?"

রুদ্রদমন সেইরূপ ম্লান হাস্যের সহিতই উত্তর করিলেন, "পিণ্ডারিকা খাটিকার ধারে,— ঘন উলুবনের মধ্যে,—ভরা সন্ধ্যায়!"

"ওঃ!" বলিয়া রাজাধিরাজ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

মহাপ্রতীহার প্রত্যুত্তর করিলেন, "হাসি নয়, মহারাজাধিরাজ! সেই-খানেই আজ আমার নিমন্ত্রণ হয়েছে। এখন নিমন্ত্রণটা নেবো কি না নেবো তা-ও ঠিক বুঝতে পারছি না। সম্ভবতঃ নেওয়াই উচিত।"

রাজাধিরাজ হাসিতে লাগিলেন,—"তোমার কথার একটা বর্ণও যে বুঝতে পারা গেল না! কেন, সেখানে কি আজ রাত্রে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হবে? তা' এত ব্রাহ্মণ সজ্জন দেশে থাকতে তোমারই বা নিমন্ত্রণ হতে গেল কেন? দেখ এই নিমন্ত্রণটা তোমার পরিবর্ত্তে আমাদের পরম সম্মানিত পরম শ্রদ্ধাস্পদ ভট্টরাজ মহামাত্যের হয় না? জাতিতেও ব্রাহ্মণ, বপুখানিও বিরাট, ধর্ম্মেও বৈদিক—এতে ফল তারা অনেক বেশীই পাবে, সব দিক থেকে। অনর্থক তোমার মত ক্ষত্রিয়, ভণ্ড, পাষণ্ডকে ডেকে নিজেদের কার্য্য পণ্ড করতে চায় কেন?"

বলিয়া মহারাজাধিরাজ পুনশ্চ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

মহাপ্রতীহার সে হাসিতে যোগ না দিয়া কিছু অপ্রসন্ন হইয়া কহিলেন,"আপনি যদি একটু মনোযোগী হন, তা হ'লে আমি সব কথাগুলো বলবারও অবসর পাই।"

"বেশ ত, বলই না।"

"রাজাধিরাজ হয় ত জানেন, এ দেশে একটা নূতন গুপ্ত সমিতির সৃষ্টি হয়েছে? তাদের মধ্যে অনেকে ধরা পড়লেও অনেকেই পড়েনি এবং তারা খুব ভাল ক'রে লাঠিখেলা ও তলোয়ার চালানো শিখছে।"

"তাদেরই কেউ তোমায় খুন করতে এসেছিল না কি?"

"খুন করতে না হোক, খুন করাতে চেয়েচে,—সে একই কথা!"

"মাথায় একটু হিমসাগর তেল ঢ'লে দেত রে এর!"

"হাসবেন না রাজাধিরাজ! আমি আপনার কাছে আষাঢ়ে গল্প তৈরী ক'রে শোনাতে আসিনি।"

"গুপ্ত সমিতির সভ্যরা তোমায় হত দেখতে ইচ্ছুক, এ আর নূতন সংবাদ কি সখা? আমার সম্বন্ধেও হয় ত বা তাদের মনে এর চাইতে বেশী সদিচ্ছা না ও থাকতে পারে।"

"এটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, এবং—"

"তা যদি হয় এবং তুমি যদি নির্দ্দোষ হও, আমি তোমায় রক্ষা করবো, এক শত নাসির সেনা সঙ্গে নিয়ে বেড়ালেই নিশ্চিন্ত।"

মহাপ্রতীহারের ওষ্ঠাধরে মৃদু হাস্য ক্রীড়া করিয়া গেল,—" 'যদি আমি নির্দ্দোষ হই' !"

রাজাধিরাজ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যক্তিগতভাবে কি অপরাধটা তুমি তাদের কাছে করেছ, শুনি? সত্যি সত্যি কিছু অত্যাচার করা হয়েছে নাকি?"

"রাজাধিরাজই বিচার ক'রে বলুন।"

রাজাধিরাজ বাতাসে ইতস্ততঃ উড়িয়া পড়া কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ ললাট হইতে অপসৃত করিয়া দিয়া কুটিল মন্দ হাস্যে প্রশ্ন করিলেন, "কি ঘটেছে, সবটা অপক্ষপাতভাবে ব'লে যাও ত, মনে কর, এর কর্ত্তা তুমি নও, অন্য কেউ। তুমি তার কি করেছিলে?"

"তার না, তার বন্ধুর।"

"বন্ধুর! আচ্ছা সে একই কথা! তা' তার বন্ধুর কি করেছিলে? কোন নারীঘটিত ব্যাপার না কি? আচ্ছা, তার সেই বন্ধু কি কোন উচ্চপদস্থ মানী লোক?"

মহাপ্রতীহার কহিলেন, "বন্ধুর পদ তেমন উচ্চ নয় বটে, তবে সে এখন এক জন বিশিষ্ট লোকের ভ্রাতুষ্পুত্র। আর ব্যাপারটাও নারীঘটিতই বটে!

"—পত্নী না উপসর্গ?"

মহাপ্রতীহার একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিলেন, " 'উপ' নয়, পত্নীই বটে।"

"পত্নীটিকে তুমি ছলে না বলে, না কূট কৌশলে কি রকম ক'রে হাত করলে? তাদের কাছে তুমি নিশ্চয়ই তা স্বীকার কর নি?"

মহাপ্রতীহার কহিলেন, "স্বীকার করি আর না করি, সত্য যে গোপন নেই, সেটা ত আর অস্বীকার করতেও পারচি নে।"

"তা হ'লে তুমি নিজের দোষ স্বীকার করচো? এ অবস্থায় সে বা তারা যদি তোমার হত্যাও করে, তাদের খুব বেশী দোষও ত দেওয়া চলে না! কি বল?"

"মহারাজাধিরাজের বিচার এই রকমই বটে!"

মহারাজাধিরাজ মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, "কেন? অবিচারটা এর কোন্‌খানটায় দেখতে পেলে বল? তোমাদের পরমেশ্বর পরম ভট্টারক ধর্ম্মপাল, দেবপাল শূরপাল বা বিগ্রহপাল এর চেয়ে সুবিচার আর বেশী কি করতে পারতেন?"

মহাপ্রতীহার মুখখানা অসন্তোষপূর্ণ করিয়া নীরস কণ্ঠে কহিলেন, "আপনি হাসবেন না কেন? এ দিকে পিণ্ডারিকা খাটিকার ধারে আমায় যে জোর ক'রে ডেকে পাঠাতে পারে, তার সাহস ও বল যে নিতান্তই তুচ্ছ নয়, সে কথাটা কি একটুখানি ভেবে দেখেছেন?"

"রজ্জুতে-সর্পভ্রম হে কুমার!—একেই বলে রজ্জুতে সর্পভ্রম! আচ্ছা, তা হ'লে না হয় একটা কায করা যাক না; তোমার পরিবর্ত্তে এক দল দ্রুতগামী নাসির সেনা সেই উলুবনের আতিথ্যরক্ষার্থ পাঠান যাক। আচ্ছা সে লোকটা কে হে? নামটা কি তার?"

"কৈবর্ত্ত ভীম।"

"ভীম! দিব্যোকের ভ্রাতুষ্পুত্র!"—একটা উচ্চ হাস্যস্রোতকে শৈবালদাম-নিরুদ্ধ চলনোদ্যত জলস্রোতের মতই অকস্মাৎ মধ্যপথে আবদ্ধ হইয়া যাইতে দিয়া বায়ুনির্ব্বাপিতশিখ প্রদীপের মতই রাজাধিরাজ এক নিমেষে ম্লান ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল নীরব স্তব্ধ থাকিবার পর ঘর্ম্মাপ্লুত ললাটের স্বেদবারি মুছিতে মুছিতে মৃদু স্বরে তিনি যেন আপনার

কানকেই শুনাইবার জন্য উচ্চারণ করিলেন, "ভীম? দিব্যোকের ভ্রাতুষ্পুত্র, ভীম?"

মহাপ্রতীহার ঈষৎ উৎফুল্ল স্বরে উত্তর করিলেন, "সেই লোকটার কথাই বলছি, ভীম কৈবর্ত্ত।"

"ভীম! উজ্—হ্যাঁ তার স্বামী, না? সে কি সমস্ত জান্‌তে পেরেছে?"

মহাপ্রতীহার উত্তর দিলেন, "সমস্ত নয়,—তবে জান্‌তে পেরেছে। তারা আমাকেই দোষী স্থির করেছে ব'লে বোধ হচ্ছে এবং সেই জন্য আমাকেই তার শোধ নিতে ডেকে পাঠিয়েছে।"

রাজাধিরাজ মাথা নত করিলেন। তাঁহাকে গভীর দুশ্চিন্তামগ্নের মতই বিষণ্ণ দেখাইল। হয় ত বা একটা সূক্ষ্ম অনুতাপের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা তাঁর তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবেক এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার হৃদয়ে জাগাইয়াও তুলিল। মৃদুস্বরে কহিলেন, "রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়বে দেখছি।"

কুমার রুদ্রদমন রাজার সেই বিচলিত ভাব নিরীক্ষণ করিয়া সাগ্রহে কহিয়া উঠিলেন,—"রহস্য যাতে রহস্যই থেকে যায়, তার জন্য এ দাসের যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না রাজন্! হয় ত আমার সঙ্গেই এ রহস্য চিরদিনের মতই গোপন থেকে যাবে।"

"ও কি! তুমি চল্লে কোথায়?"

"পিণ্ডারিকা খাটিকায়।"

"আহা, থামো, থামো! অত তাড়া কিসের? আমি সব কথা এখনও ভাল ক'রে বুঝতেই পারি নি যে! একটু ব'সো দেখি। কে তোমাকে বল্লে যে, তারা জানতে পেরেছে যে, উজ্জ্বলাকে তুমিই চুরি করিয়ে এনেছ?"

"ভীমের বন্ধু হরি, কৈবর্ত্ত দলের একটা লোক। আমার বাড়ী এসে আমার মুখের উপরেই সে স্পষ্ট ব'লে গেছে যে, তাদেরই কেউ উজ্জ্বলাকে আমার বাহক ও শিবিকা দ্বারা বাহিত হ'তে দেখেছে।"

"সে লোকটাকে নিশ্চয়ই তুমি বন্দী করেছ ?"

মহাপ্রতীহার হরির পলায়নের কাহিনী প্রকাশ করিয়া বলিলেন। শুনিয়া রাজাধিরাজ আরও কিছু বিমর্ষ হইলেন।

"রাজাধিরাজের আর ত জানবার কিছু নেই ? আমি তা হ'লে এখন আমার নিমন্ত্রণটা রাখতে যাই, ভদ্রলোক সেখানে আমার অপেক্ষা করবে।"

"তুমি ক্ষেপেছ রুদ্র ! সামান্ত কৈবর্ত্ত ভীমের সঙ্গে মহাপ্রতীহার কুমার রুদ্রদমনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ !"

"কিন্তু যুদ্ধের আমন্ত্রণে নীরব থাকা ক্ষাত্রধর্ম্মের বিরোধী যে, রাজাধিরাজ ! যখন নিমন্ত্রিত হয়েছি, যেতেই হবে।"

"এ দ্বন্দ্ব ত তার তোমার সঙ্গে নয়, রুদ্রদমন ! এ আহ্বান ধরতে গেলে সে ত আমাকেই করেছে।"

"তারা ত তা জানে না, রাজাধিরাজ ! তারা বলচে আমিই দোষী। এখন আমি যদি না যাই, আর কি এ রাজ্যে আমায় কেউ ভয় করবে ? ভীরু ব'লে উপহাস করবে না ?"

"তোমার রাজার আদেশ তা হ'লে তোমার কাছে আত্ম-মর্য্যাদার চেয়ে নীচে নেমে গেছে !"

"রাজাধিরাজ !"

"আমার আদেশ, তুমি যেতে পাবে না।"

"কিন্তু রাজাধিরাজ !—"

"মহাপ্রতীহার ! সাবধান !"

"রাজাধিরাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"

"আমিই আমার শত্রুদের যদি প্রয়োজন বোধ করি, শিক্ষা দেবার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করবো। তারা ত তোমায় অপমান করেনি, দমন ! তারা

এ বিদ্বেষ আমার পরেই প্রকাশ করেছে, তোমার উপরে নয়। যেহেতু, তুমি যে উপলক্ষ মাত্র, সেটুকু তারা না জানে এমন মনে করো না।"

কুমার কহিলেন, "আমি যতদূর বুঝেছি, তাতে তাদের সন্দেহ আপনাতে গিয়ে পৌঁছেচে মনে হয় না। তাই বলি, যেটা উহ্য আছে, সেটাকে উদ্‌ঘাটিত না করাই হয় ত সঙ্গত। আমার সম্বন্ধে এটা ব্যক্তিগত অপরাধ দাঁড়াবে, কিন্তু আপনাকে সে ভাবে দেখবে না এবং ঐ কৈবর্ত্তর দলটাকে খুবই তুচ্ছ বলা যায় না। আমাদের নৌবাটক একরকম ওদেরই হাতে, তার উপর ওদের সঙ্গে হাড়ী বাগ্‌দী পালোয়ানদেরও যথেষ্ট সহানুভূতি রয়েছে। ওদের মধ্যে দিব্যোকের সম্মান ও প্রতিপত্তি বড় কম নয়। কোষাধ্যক্ষ সাহীল নৌবল ব্যাপৃতক যুধিষ্ঠির ও মহাক্ষপটলিক সুষেণ এরাও ওদের কুটুম্ব।"

অপ্রসন্ন ভ্রূভঙ্গী করিয়া রাজাধিরাজ কহিলেন, "মহাপ্রতীহারের যোগ্য কথা তো এ নয়!—অবশ্য, আপনা হ'তে আমি রহস্য প্রকাশ করতে যাচ্চি না, কিন্তু দৈবাৎ যদিই তা হয়ে পড়ে, তাতেও আমাদের ভয় করবার মত কিছুই নেই। ক্ষুদ্র একটা নাগরিক সে, যদি রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে আসে, একটা ক্ষুদ্র পতঙ্গের চেয়ে তাকে ধ্বংস করতে কি আমাদের বেশী শক্তি ব্যয় করতে হবে?"

"আবার আমি আপনাকে মিনতি ক'রে স্মরণ করিয়ে দিচ্চি যে, ভীম বা দিব্যোকের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধ আমাদের না করাই ভাল। দেশের হাওয়ায় ঝড়ের গন্ধ নিত্যই বর্দ্ধিত হচ্চে এবং এখন তরুণ দলের মধ্যে ভীমই এক রকম অধিনায়ক। তারপর জলপথে কৈবর্ত্ত সেনাই আমাদের প্রধান সহায়।"

মহারাজাধিরাজ রোষকঠিন কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "আমায় বারে বারে আর সাবধান করবার প্রয়োজন নেই, কুমার! কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা

অন্যায়, কাকে ভয় ও কাকে ভক্তি করতে হবে, সে শিক্ষা আমার যথেষ্ট হয়েছে। এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যাও, আমিও একটু বিশ্রাম ক'রে নিই।"

মহাপ্রতীহার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, রাজাকে অভিবাদন জানাইয়া পুনশ্চ আবদারে শিশুর মতই জিদ ধরিয়া আরম্ভ করিলেন, "যদি এখনও অনুমতি করেন, রাজাধিরাজ! একবার তাদের অনুরোধটা রক্ষা ক'রেই আসি।"

"আমি অনেকক্ষণ ধ'রে তোমার উপদ্রব সহ্য করেছি, রুদ্রদমন! এইবার আমার কথার অবাধ্য যারা, তাদের শাস্তি দিয়ে আমায় জানাতে হবে যে, এ রাজ্যের আমিই রাজা, তারা নয়।—এই, কে তোকে এখন এখানে আস্‌তে বল্লে?"

এই কথা বলিয়াই ভীষণ ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া রাজাধিরাজ যাহার প্রতি তাঁহার অন্তরস্থ সমুদয় কোপাগ্নি বর্ষণ করিতে গেলেন, সে এক জন ক্ষুদ্র প্রতীহার মাত্র, সেইক্ষণেই এ স্থলে সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সভয়ে সে উত্তর করিল, "পরমেশ্বর পরমকুশলী পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজের চরণদর্শনার্থিনী হয়ে ভট্টারিকা বিদ্যুন্মালা উদ্যানের চিত্রগৃহে অপেক্ষা করছেন, এই সংবাদ তিনি অবিলম্বে ভট্টারকপ্রধানের পাদপদ্মে বিজ্ঞাপন করতে এ দাসকে অনুজ্ঞা প্রদান ক'রে পাঠালেন।"

"ওঃ! আচ্ছা, সে ভালই হয়েছে। মহাপ্রতীহার! সুস্থ শরীরে সানন্দ চিত্তে গৃহে প্রতিগমন ক'রে যথেচ্ছ ভোগসুখে নিরত থাকো গে যাও। যত সংখ্যক ইচ্ছা রাজসৈন্যকে তোমার রক্ষক নিযুক্ত ক'রে নিয়ে নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ কর। রাজসখা! তোমার কোন ভয় নেই। তাম্বুলিকা! ওঃ, তাদের বুঝি তুমি সরিয়ে দিয়েছিলে? ভালই করেছিলে! আচ্ছা এখন যাও।"

মহাপ্রতীহার রাজাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাইয়া আনন্দোজ্জ্বল মুখে

প্রস্থান করিলে, মহীপালদেব আসন হইতে উত্থিত হইয়া চিন্তিত বিমর্ষ মুখে অলিন্দের প্রান্তভাগে কুরুবক ও কুন্দপুষ্পখচিত বৃক্ষসারির সান্নিধ্যে আসিয়া ধীরপদে দাঁড়াইলেন। একটা ক্লান্তিপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস তাঁর নাসাপথে বহিয়া গেল। তিনি অজস্র নবপুষ্পিত উদ্যানের অভিমুখে অনির্দেশ্য দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া আত্মগতই কহিলেন,—

"উজ্জ্বলা! বড় উজ্জ্বল রূপ তোমার, কিছুতেই তোমায় ভুলতে পারিনি, তাই নানা উপায়ে, যথেষ্ট অর্থব্যয়ে তোমায় নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসেছি। এখন জানি না, তোমার কাছ থেকে এর কতটুকু মূল্য ফেরত পাব! যেন মনে হয়, তোমায় আমি ভালবেসেছি। শুধু তোমার দেহ নয়, ইচ্ছা হয়, তোমার মনটাকেও যেন আমি লাভ করতে পারি। তা কেনই বা পাব না? আমার কাছে কি সেই গোঁয়ার ভীম কৈবর্ত্ত? চন্দ্রকলা! তোমায় আমি ভালবেসেছিলেম,—একে ভালবেসেই তোমায় হারানোর ক্ষোভ হয়ত আমার দূর হবে। তানৈলে তোমায় আজও আমি ভুলতে পারছি না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শরতের উজ্জ্বল আকাশকে নানাবর্ণে সুরঞ্জিত করিয়া অপরাহ্ণের সূর্য্য ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল এবং তাহারই ঈষত্তপ্ত কিরণধারায় করতোয়ার জল এবং তার পরপারবর্ত্তী নদীতীরের বৃক্ষশীর্ষ ঝলমল করিতেছিল। এমন সময়ে নগরী হইতে দূরে রাজধানীর অপর পারে রাজাধিরাজের বিলাস-ভবনের দ্বিতলস্থিত একটি প্রশস্ত কক্ষের ক্ষুদ্র বাতায়ন রন্ধ্র পথে দাঁড়াইয়া একটি সুন্দরী রমণী নীরবে সেই দিকে চাহিয়া ছিল। তার দৃষ্টি সেই দিকেই নিবদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু সেই

অপলক চক্ষু দুইটির পানে চাহিয়া দেখিলেই বুঝা যাইত যে, মানুষ শুধু চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকিলেই কিছু দেখিতে পায় না, যদি না তার সঙ্গে তার মনকেও সেই দিকে প্রেরণ করে। এই মেয়েটি যে ওই রকম করিয়া এই শান্ত অপরাহ্ণের স্নিগ্ধ আলোকে উদাস দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া আছে, এর উদ্দেশ্য ত ওই নদীতীরের তরঙ্গভঙ্গী অথবা স্নিগ্ধকিরণোজ্জ্বল তীর-তরুদলের আনন্দনর্ত্তন দেখা নয়, সমস্ত দেখা-শোনার সাথে ইতি দিয়া সে শুধু এখন ঝটিকা পূর্ব্বের স্তব্ধ আকাশের মত থমথমে হৃদয়মন লইয়া ওই রকম স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তার মেঘাচ্ছন্ন চিত্তের সম্মুখে সমস্ত জগৎটাই একটা বিরাট ছায়াবাজির মত মিথ্যা হইয়া গিয়াছিল।

এমনই করিয়া চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তার সেই দৃষ্টিশূন্য চক্ষুর উপর দিয়া বাহিরে অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহাই ভেদ করিয়া নদীপারের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত জমাটবাঁধা কালো অন্ধকার গাছের গায়ে জোনাকির ঝিকিমিকি এই মৌন স্তব্ধ নারীর দৃষ্টির সম্মুখে স্বপ্নের মত ভাসিতে লাগিল। বিকট স্বরে কতকগুলা শৃগাল বাতায়নের ঠিক নীচেই নদী-সৈকতে আসিয়া তারস্বরে ডাকিতে লাগিল, তথাপি উজ্জ্বলার অর্দ্ধপ্রচ্ছন্ন চিত্তদ্বার মুক্ত হইল না—এই বন্দিনী নারী উজ্জ্বলা।

ঘরের একটি মাত্র প্রবেশদ্বার বাহিরের দিক্ হইতেই বোধ করি রুদ্ধ ছিল, খটাস্ ঝনাৎ করিয়া ভারী শিকল খোলার শব্দ হইল, তথাপি এই শব্দের প্রতিধ্বনি ওই নিথর নারীমূর্ত্তির কর্ণে ধ্বনিত হইল না, সে যথাপূর্ব্ব সেই একই ভাবে রহিল।

দ্বারের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল দুই জন দাসী। একের হস্তে প্রদীপ, আর এক জনের হস্তে স্বর্ণপাত্রে পূর্ণ আহার্য্য। ইহারা আসিয়াই ঐ সকল বস্তু যথাস্থানে স্থাপন করিতে গিয়া বিস্ময়ধ্বনি করিয়া উঠিল—

"আই মা! যেথায় জিনিস সেথায় পড়ে, একটুকুও তো খ্যাতে গ্যাওনি মা!"

তার পর কাছে আসিয়া গায়ের উপর হাত দিয়া বলিল, "এমন ধারা করলে যে মারা যাবে, দু'দিন দু'রাত্তির উৎরে গ্যাছে, জলরত্তি গলায় গলাওনি, ই কি করচো মা?"

এতক্ষণে ইহার এই মাতৃ-সম্বোধনে সহসা সেই প্রস্তরীভূতা নারীর হারানো সম্বিৎ যেন ফিরিয়া আসিল। সে সেই অন্ধকারের জগৎ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক যেন ঈষৎ বিস্ময়ভরেই ইহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, কোন কথাই কিন্তু কহিল না।

তার এই নিরুদ্যোগ নীরবতা ইহাদের পাষাণ চিত্তকেও বোধ করি বা একটুখানি বিচলিত করিয়াছিল, তাই এই শ্রেণীর লোকের মত কাঠিন্য প্রকাশ না করিয়া পুনশ্চ সে সহানুভূতির কোমলকণ্ঠেই কহিল—

"বুকের মধ্যে ফাঁক হয়ে গ্যাচে কি না, ঘর দুয়োর সোয়ামী হারিয়ে এসতে হয়েচে! তা' কি করবে মা! বরাতের ল্যাকোন তোমার এই রকমই ছ্যালো যখন, তখন শুকিয়ে ম'রে আর হবে কি? আর ত ওরা তোমায় ঘরে নেবেই না, তখন একুল ওকুল দুকুল, খুইয়ে কি করবে? মহাপ্রাণীকে নষ্ট করতে নেই বাছা! খ্যাতে একটু কিছু দ্যাও দিকি।"

রমণী মুখ ফিরাইয়া লইয়া শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল; এবারও সে কোন উত্তর দিল না।

তখন অপরা একটু রাগ করিয়া বলিল, "সেই ত সবই হবে বাছা, তবে অনর্থক আমাদের দুঃখ দ্যাও কেন? ন্যাও, খেয়ে ন্যাও, এই দেখ, গা-ভরা গয়না এনেছি, পরো; আমাদের সঙ্গে এসো, পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ তোমার কাছে আজ আসবার কথা ব'লে পাঠিয়েচেন। এসে যেন তাঁকে এই রকম দেকতে না হয়।"

এই কথা কয়টা যেন জলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জলার কানের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং এ কথা শোনার পর কি এক প্রকার অর্দ্ধ-চেতন অর্দ্ধ-অচেতন আধপোড়া কাঠের মতন হইয়া গিয়া সে নিথর হইয়া বসিয়া রহিল। কখন ও কেমন করিয়া এই বিলাস কাননের দাসীরা তার মলিন বস্ত্র ছাড়াইয়া তাহাকে বিচিত্র চীনাংশুক পরাইয়া দিয়াছে, তার সর্ব্বাঙ্গ মণি-মাণিক্যে খচিত করিয়া দিয়াছে, তাহার কিছুই সে জানিতে পারে নাই? খাবারও হয় ত বা তাহারা তার মুখে তুলিয়া দিতে গিয়াছিল; কিন্তু সেখানে যে শুধু বাহ্য প্রয়োগের দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধির পথ নাই, তাই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

এই নারীদ্বয় ইহাদের অভ্যস্তভাবে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে করিতে এই দরিদ্র বধূর দুই শব্দ প্রবেশশূন্য কানের কাছে তার ভাবী সুখ সৌভাগ্যের কত স্বপ্নজালই না রচনা করিতেছিল, সুখের বিষয় সেগুলা ইহার আড়ষ্ট অভিভূত ও একান্ত বিকল বিহ্বল চিত্তদ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ পথ পায় নাই, তাই সে তার এই সকল চরম লজ্জার কথায় স্তব্ধ থাকিয়াই যাইতেছিল, কিন্তু ইহারা মনে করিল, এই লক্ষ সুবর্ণ মূল্যের অলঙ্কাররাশি এবং তাহাদের অমূল্য উপদেশ এই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রা কৈবর্ত্তবধূকে একেবারে তাহাদের পরমেশ্বর পরমভট্টারক, পরমসৌগত মহা-রাজাধিরাজের শ্রীচরণের দাসী করিয়া দিয়াছে!

সেই ক্ষুদ্রতম কারাগৃহের পার্শ্বেই সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত রাজকীয় শয়ন-কক্ষে দাসীদ্বয় দ্বারা আনীত হইবার পর সহসা ইহার তীব্র আলোকচ্ছটায় অথবা কিরূপে বলা যায় না—তার বিহ্বলতা একবারের জন্য কাটিয়া গেল। সে তখন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চারি দিকে চাহিয়া চাহিয়া তার সম্পূর্ণরূপেই অপরিচিত ও অজ্ঞাত এই সকল বিলাস উপকরণের সর্ব্বোত্তম সজ্জায় সুসজ্জিত, জগতের শ্রেষ্ঠতম বস্তুজাত সজ্জিত সুবৃহৎ কক্ষটিকে পর্য্যবেক্ষণ

করিয়া দেখিল। বহুতর সুবর্ণ দীপে গৃহ আলোকোজ্জ্বল, সেই আলোকে রজতময় সুবৃহৎ পর্য্যঙ্কে যেন বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছে। সুবর্ণময় জলাধার, পানপাত্র, বসিবার বিচিত্র কারুযুক্ত আসন ইতস্ততঃ রক্ষিত। পুষ্পমাল্য-পুষ্পগুচ্ছে সর্ব্বত্র সজ্জিত, সুগন্ধে কক্ষ আমোদিত। উজ্জ্বলার বোধ হইল, সে যেন স্বপ্নযোগে স্বর্গলোকে প্রবেশ করিয়াছে! মর্ত্ত্যবাসীদের জন্য এত ভোগ—এত ঐশ্বর্য্য যে থাকা সম্ভব, এ ধারণাও তার মনের মধ্যে ছিল না। এ কোথায় সে আসিল? তার পর ত্বরিতেই একটা নিদারুণ সন্দেহ তার মনের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে দেখা দিল।—এখানে সে আসিলই বা কি করিয়া? সে ত একটা সিন্দুকের মত ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে বন্দিনী ছিল! গভীর আশঙ্কায় তার বক্ষের ভিতরটা দুলিতে লাগিল। তার পর আচমকা নিজের গায়ের দিকে চোখ পড়িতেই তার বিস্ময় ও সেই সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ উথলিয়া পড়া প্রচুরতর লজ্জা ও ভয়ের মিশ্রণে এই সকল তার অদৃষ্টপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্যরাশির প্রকৃত ইতিহাসটাকে তার বিহ্বল মনের দ্বারে মুহূর্ত্ত মধ্যেই পৌঁছাইয়া দিল।

এই সত্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই উজ্জ্বলার সমুদয় কৌতূহল ও বিস্ময়কে অপসৃত করিয়া তার সমস্ত দেহ মন একসঙ্গেই যেন একটা অচেতন পদার্থের মত কঠিন ও ভারী হইয়া উঠিল, আর ঠিক এমনি সময়েই তার এক পূর্ব্বপরিচিতের রূপ ধরিয়া এক সুন্দর সুপরিচ্ছদধারী তরুণ পুরুষ হাস্যরঞ্জিত মুখে তাহারই দিকে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে ডাকিয়া উঠিলেন,

"উজ্জ্বলা! উজ্জ্বলা! এতদিনে আমাদের মিলন হ'ল!"—

উজ্জ্বলার বোধ হইল, সেই সে দিনের স্নিগ্ধ মধুর কোমল কণ্ঠে আজ যেন একটা প্রলয়ঙ্কর আবেগের ভীম ঝঞ্ঝা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে! ইহার মধ্যে যেন বিশ্বের সমুদয় আর্ত্তনাদ পুঞ্জীভূত হইয়া

রহিয়াছে এবং শ্মশান-শিবাদলের ঘোর কর্কশ রব উহারই মধ্য দিয়া শ্রুত হইতেছিল।

এক মুহূর্ত্ত মধ্যেই সে—"রাজাধিরাজ! সত্যিই তুমি তাহলে এই রকম!" বলিয়াই সম্পূর্ণরূপে চৈতন্যহারা হইয়া উহারই পায়ের কাছে ঠিকরাইয়া পড়িল।

রাজাদেশে মহল্লিকাদ্বয় ত্রস্তে আসিয়া অপহৃত-চেতনা উজ্জ্বলাকে বহন করিয়া লইয়া তখনই কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মহীপালের জীবনের উপর উপর্য্যুপরি এমন কতকগুলি ঘটনার সঙ্ঘাত আসিয়া পড়িয়াছিল, যদি মহীপালের চিরাভ্যস্ত বিলাস-ব্যসনের ঘোর কাটাইয়া একটুখানি চক্ষু চাহিয়া নিজের অবস্থাটা দেখিয়া লইবার অবসর-মাত্র থাকিত, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই সে দৃশ্য দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেন এবং হয়ত বা সবিশেষ চেষ্টা করিলে এখনও নিজেকে কথঞ্চিদ্রূপে রক্ষা করিতেও সমর্থ হইতেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্য করায় উহার পালন বা শাসন ত তাঁর ইপ্সিত ছিল না, রাজ্যভোগই তাঁর আজন্মের আদর্শ উপলক্ষ্য যখন লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়, তখন ছোটর বড় হওয়ার মতই দুর্গতি ঘটিয়া থাকে। রাজার অবস্থা এখন সেই রকমই। নিশ্চিত বিপদের মধ্যে মাথা গলাইতেছেন জানিয়াও চিরাভ্যস্তভাবে আজও প্রবৃত্তি-দমনের বিন্দুমাত্র স্পৃহা তাঁহার হৃদয়ে স্থান লইতে পারে নাই। প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে সকল মানুষেই বাধ্য, যে তা' করে না, প্রবৃত্তির হস্তে অসহায় শিশুর মতই আপনাকে সঁপিয়া দিয়া, আপনাকে সে অতি সহজেই হারাইয়া বসিয়া থাকে। মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় মহীপালদেবের অবস্থাও

আজ ঠিক এই রকমই দাঁড়াইয়াছিল। দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া তিনি যে ক্রমশঃ পাথারের দিকেই তলাইয়া চলিয়াছেন, জানিতে পারিয়াও তাহা হইতে নিজেকে টানিয়া তুলিবার শক্তি বা প্রবৃত্তিও তাঁর হইল না; তাই স্রোতের মুখে তিনি ভাসিয়াই চলিলেন।

গতরাত্রে চিরসঙ্গিনী বিদ্যুতের সাগ্রহ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতীক্ষিত বহুদিনের ঈপ্সিত উজ্জ্বলার কাছে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই, সেই জন্য মনের মধ্যে উৎপ্রেক্ষার অভাব ছিল না। মন-প্রাণ প্রতিক্ষণেই সাগ্রহে নদীপারের সেই বিজন বিলাসকুঞ্জে ক্ষণেক্ষণেই ছুটিয়া চলিতেছিল। কত দিন অবসরকালে যে ক্ষণদৃষ্ট নিরাড়ম্বর রূপ-রাশির ধ্যানে তন্ময় হইয়া কাটিয়াছে, সে আজ আয়ত্ত গত হইলেও আত্ম-গত হইল না, এ কি সহ্য হয়! অথচ কি কুগ্রহেরই কাল পড়িয়াছে, যে কোনমতেই একটুখানি অবসর পাওয়া যাইতেছে না।

বিশ্রাম শয্যায় অর্দ্ধ-শায়িত হইয়া মহীপাল নিমীলিত নেত্রে সেই আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যরাশির কথাই ভাবিতেছিলেন। মনে মনে বলিলেন,—"চন্দ্রকলার পর এত রূপ আর দেখিনি! পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পট্টমহিষী হবার যোগ্য প্রতিমা! উজ্জ্বলা! বাস্তবিক নামের যোগ্য রূপ বটে! সামান্য গৃহস্থ-বধূ ঘাটে জল নিতে আসে, কঠোর গৃহকার্য্য করে দিন কাটায়, তাতেই এই রূপ!. আমার হাতে পড়লে না জানি এ অপরূপ রূপ কতগুণই বেড়ে যাবে? সে দিন পট্টবস্ত্রে অলঙ্কারে কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করেছিল! কিন্তু চোখ ভ'রে একটু দেখতেও পাওয়া গেল না। হঠাৎ মূর্চ্ছিত হয়ে গেল কেন? হয় ত অত্যন্ত আনন্দে! এ ভিন্ন আর কি? ভাম-কৈবর্ত্তের স্ত্রী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপতির অঙ্কলক্ষ্মী হবে, এ'কি কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল? সেই তীব্র আনন্দ সহ্য করতে পারে নি,—নিশ্চয়ই তাই! সে বারে আনন্দভট্টের পুত্রবধূটাও এই রকমই আমায় প্রথম দেখে মূর্চ্ছিতা

হয়, তার পর—ওঃ, কিছুতেই আর তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়াতে পারিনে। এখনও মাসান্তে—দুই মাসে একবার করে তাঁকে দেখা না দিলে ছাড়ে না,—তা' উজ্জ্বলাও সেই রকমই হবে। আমি একে ওদের মত অত শীঘ্র ত্যাগ করবো না। মনে হচ্চে, হয় ত বা, বরাবরের মতই ওকে আমি ভালবেসে ফেলেছি!—কি সংবাদ?"

প্রতীহার জানাইল, "ভূতপূর্ব্ব মহারাজাধিরাজের শরীররক্ষী সৈন্যদলের মধ্যের এক জন বিশেষ গুরুতর কার্য্যে মহারাজাধিরাজের দর্শনপ্রার্থী। নাম জানাতে বললে, 'বলো নামের প্রয়োজন নেই, গুরুতর গোপনকার্য্য, এই কথাই জানাবে।"

" 'গুরু গোপনকার্য্য' !—আচ্ছা বেশ, তাকে এইখানেই নিয়ে এস,"—বলিয়া রাজাধিরাজ নিজের আসনে উঠিয়া বসিলেন।

ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল পুরাতন রাজ-ভৃত্যের পূর্ণপরিচ্ছদ ও উহারই আনুষঙ্গিক অস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হইয়া বৃদ্ধ দিব্যোক। ইহার দিকে চাহিয়াই রাজা উহাকে চিনিতে পারিলেন এবং তাঁর মুখ শুকাইয়া গেল।

দিব্যোক আসিয়া সসম্ভ্রমে শ্রদ্ধাভরে রাজাধিরাজকে প্রণাম করিয়া বিনীত নতমুখে দাঁড়াইল, সবিনয়ে কহিল, "বড় প্রয়োজনে এসেছি প্রভু! অধীনজনের এ ধৃষ্টতা মাপ করতে আজ্ঞা হোক। বড় প্রাণের জ্বালায় আমি আমার রাজার দ্বারে ছুটে এসেছি। আর ত আমার এ জ্বালা জানাবার অপর কোন যায়গা নেই, তাই আপনাকেই জানাতে এসেছি—।"

এ বৃদ্ধের প্রাণের জ্বালা ত মহীপালের অজ্ঞাত নয়, কাযেই ইহার প্রত্যেকটি বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই রাজাধিরাজের চিত্ত অসহিষ্ণু-উদ্বেগে ভরিয়া উঠিতেছিল; তথাপি ইহার সহিত আত্মসংযত থাকিয়া

সুব্যবহার করাই সমীচীন বোধে তিনি নিজেকে যথাসাধ্য চেষ্টায় শান্ত রাখিয়া কহিলেন, "কি জানাতে চাও, বলো, আমিও যথাসাধ্য তোমায় সন্তুষ্ট করতে সচেষ্ট থাকবো।"

"আপনার আমার পরে' যথেষ্ট দয়া মায়া আছে, আমি তা' জানতাম, —সেই জন্য ছেলেদের ঘোর আপত্তিসত্ত্বেও আমি তাদের লুকিয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আপনি দয়া ক'রে একটু মনোযোগী হোন, আমার সমস্ত কথাই একে একে আপনাকে শুনতে হবে।"

ভাল করিয়া আসন গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তরের মধ্যে একান্ত অসহিষ্ণু রাজা কহিলেন, "তুমি বলো, আমি শুন্‌ছি।"

"মহারাজাধিরাজের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, বহুবর্ষ পূর্ব্বে পরমসৌগত মহারাজাধিরাজের পিতামহদেব পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ নয়পালদেবের শেষ রাজত্ব সময়ে চেদিরাজ কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে এক সময় সমস্ত বরেন্দ্রভূমি টলমল করেছিল। রাজকোষ শূন্য, রাজসৈন্যমধ্যে ভীষণ অসন্তোষ, সর্ব্বত্র খাদ্যাভাব, দ্বারে শত্রু সমাগত, বরেন্দ্রীর সে এক ভীষণ দুর্দ্দিনের কাহিনী ভট্টারকপ্রধান হয় ত কবি-গাথায় অথবা পণ্ডিতগণের মুখে মুখে শুনে থাকবেন ?"

রাজাধিরাজ ঔদাস্যের সহিত উত্তর করিলেন, "শুনেছি বই কি! আমার পিতামহ সেবার আমার মাতামহের কাছে সর্ব্বত্রই প্রায় পরাভূত হয়েছিলেন।"

দিব্বোক প্রোৎসাহিত মুখে কহিতে লাগিল, "হ্যাঁ, সে কথা অস্বীকার করা চলে না। চেদির হাতে বাস্তবিকই আমাদের পরাভব ঘটে গেছলো। অতটাই হয় ত হতো না, খাদ্যের অভাবটাই আমাদের এ রকম শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়ে দিয়েছিল। আমাদের নগর তোরণের বাইরেই শত্রু এসে পৌছুতে আর বেশী দেরী নেই, ঠিক এম্‌নি সময়ে কতকগুলি নগরবাসী

তাদের ধন জন প্রাণ সমস্তই রাজার হাতে সঁপে দিয়ে অর্দ্ধাহারে—অনাহারে সেই ভীষণ যুদ্ধ সাগরে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে, সে যাত্রা পালসাম্রাজ্যের সম্মান রক্ষা করেছিল, সে সংবাদ কি মহারাজাধিরাজের জানা আছে ?"

মহারাজাধিরাজ শুষ্কভাবে বলিলেন, "আছে বই কি।"

দিব্যোক বলিতে লাগিল, "তার পর যা ঘটেছিল, সে সব আমার বক্তব্যের ভিতরের কথা নয়। সেই চেদিরাজের পুনরাক্রমণের ফলে এবার বরেন্দ্রীরই বিজয়লাভ, ফলে মহারাজাধিরাজের উৎপত্তি, সে সব কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত। সে কথার পুনরুল্লেখ ক'রে মহারাজাধিরাজের অমূল্য সময়ের অপব্যয় করবো না। আমার বলবার কথা এই যে, সাম্রাজ্যের সেই ঘোরতর দুর্দ্দিনে সম্রাটের যে সকল ভক্ত প্রজা তাদের সর্ব্বস্ব প্রদান ক'রে তাঁর দক্ষিণ পাশে স্থান নিয়েছিল, নূতন বলে বলীয়ান্ হয়ে অসাধ্য-সাধন ক'রে তুলেছিল, তাদের সঙ্গে এ সাম্রাজ্যের সম্বন্ধ কি সেই—দুর্দ্দিনের অন্তে শেষ হয়ে গেছে অথবা তা' চিরদিনের মতই দৃঢ় হয়ে আছে ?"

ধৈর্য্য রাখা কঠিন হইয়া উঠিতে থাকিলেও রাজা জোর করিয়া সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতেছিলেন ; কহিলেন, "তাও কি কখন যায় !"

দিব্যোক সাগ্রহকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "মহারাজাধিরাজ এটাও হয়ত জানেন যে, সেই দেশের জন্যে—রাজার জন্যে সর্ব্বত্যাগীদের মধ্যে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব পুণ্যোকও এক জন ছিলেন ?"

রাজা ঈষৎ অসহিষ্ণু হইয়া নড়িয়া বসিয়া কহিলেন, "জানি ?"

দিব্যোক কহিতে লাগিল, "তার পর আমি কিছু দিন আপনার পিতৃদেব স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজের দেহরক্ষীদের মধ্যে প্রধান হয়েছিলেম, চেদীর সঙ্গের দ্বিতীয় যুদ্ধে জাতবর্ম্মার গর্ব্ব চূর্ণ যে এই দিব্যোকের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছিল, সেও হয় ত আপনি শুনে থাকবেন ? কিন্তু শেষকালে একটা কঠিন রোগে কায ছেড়ে দিয়ে যৎসামান্য জমী জমা যা' আমার স্ত্রী তার বাপের ঘর হ'তে

পেয়েছিল, তারই সামান্য উদ্‌বৃত্ত থেকে দীনভাবে দিন কাটিয়ে গেছি, তবু কোন দিনই পূর্ব্ব উপকারের দাবী দিয়ে রাজাধিরাজদের বিরক্ত করতে আসিনি। কায ক'রে তার দাম চাওয়া, এ বড় ছোট কায,—কৈবর্ত্তদের এ স্বভাব নয় যে, তারা কৃতকার্য্যের পুরস্কারের জন্য লালায়িত হয়ে বেড়াবে—"

রাজা এবার অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন, বাধা দিয়া কহিলেন, "তোমারও হয় ত স্মরণ থাকতে পারে যে, সে পুরস্কার তোমাদের রাজা স্বেচ্ছায় সন্ধান ক'রে অযাচিত ভাবেই তোমার দ্বারে পৌঁছে দিয়েছে!"

দিব্যোক যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিল,—"সে কথা ভুলে যাবে দিব্যোক? রাজাধিরাজ! রাজাধিরাজ! আপনি জানেন না, এই রাজবংশকে আমি কত বড় শ্রদ্ধা ক'রে থাকি। আপনাকে আমি জন্মাতে দেখেছি, শুধু শ্রদ্ধা নয়,—বৃদ্ধ আমি, কি গভীর স্নেহে আমার এ জীর্ণ বুক ভরা, সে ত দেখাবার নয়। রাজা আমার! আমি রাজাকে মানুষের চোক নিয়ে দেখিনে ত, আমার কাছে আপনি স্বয়ং সর্ব্ব দেবতার প্রতিমূর্ত্তি, —লোকপাল! তাই আমি আমার এই এত বড় দুর্দ্দিনে আপনারই পায়ের তলায় ছুটে এসেছি। এতে কারু কোন কথা কানে তুলিনি। আমি বিচার চাইতে এসেছি, রাজা! যেন যথার্থ ন্যায়বিচারই পাই,—দেখবেন যেন অবিচারিত হয়ে এই মর্ম্মাহত শোকাকুল বুড়োকে মাথা হেঁট ক'রে ফিরে যেতে না হয়।"

মহীপাল মনে মনে দারুণ অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়া স্বগত কহিলেন, "এইবার নিশ্চয়ই সেই কথা বলবে!" প্রকাশ্যে কহিলেন,—"কিসের বিচার চাও, বলো, আমারও যথাশক্তি ন্যায় বিচারে ত্রুটী হবে না।"

"আমার ঘরের বউকে যে নরাধম চুরি ক'রে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছে, আমি তার সমুচিত শাস্তি চাইতে এসেছি। নির্ব্বিচারে তাই আমায় দেওয়া হোক।"

রাজা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

"রাজাধিরাজ! আমার পুত্রবধূ উজ্জ্বলা মা আমার,—আমার গরীবের সংসার উজ্জ্বল ক'রে, কুঁড়ে ঘরে চাঁদের আলোর মতন আমার সংসার আলো ক'রে বসেছিলেন; ধনীর ঘরে কিসের অভাব? কিসের দুঃখে ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত নরপিশাচ এসে দরিদ্রের ধন চুরি ক'রে নিলে বলুন ত? আপনি সুবিচার করুন, সে যত বড় লোকই হোক, এর সমুচিত ফল তার পাওয়া চাই।—বলুন তা' সে পাবে?"

রাজা নীরব রহিলেন।

দিব্যোক উত্তেজিতকণ্ঠে কহিতে লাগিল, "ভীম আমার উজ্জ্বলা অন্ত প্রাণ! ছেলের সমস্ত সুখ তার সঙ্গে সঙ্গেই চিরদিনের মত চ'লে গেছে। আমি তাকে আমার প্রাণ দিয়ে জানি, সেও যে সে লোকের মত নয়, রামচন্দ্রের মতন সে সেই এক জন মাত্রকেই নিজের করেচে। আমায় ফিরিয়ে দিন, রাজাধিরাজ! আমার ঘরের লক্ষ্মীকে চোরের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আমায় ফিরিয়ে দিন, না হ'লে আমার ছেলে বাঁচবেনা!"

বৃদ্ধ কৈবর্ত্ত-নায়কের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। রাজাধিরাজ এ অবস্থায় থাকিয়া রীতিমতই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তাঁর ক্রমশঃই ইহা অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল, অথচ উপায়ও ত কিছুই দেখা যায় না? এই রাজভক্ত বৃদ্ধকে বিরক্ত করিয়া বিদায় দিতেও ভরসা হয় না! রাজা ফাঁপরে পড়িলেন।

তাঁহাকে নির্ব্বাক্ উদাসীন দেখিয়া দিব্যোকের সহসা উচ্ছ্বসিত শোকোচ্ছ্বাস আপনা হইতেই মন্দীভূত হইয়া আসিল। হাত দিয়া অশ্রু মুছিয়া নিজের এই দুর্ব্বলতায় ঈষৎ যেন লজ্জা পাইয়া এবার একটু সংযত-ভাবেই সে পুনশ্চ কথা কহিল, "আপনি হয় ত বিস্মিত হচ্ছেন? না, আমি সোজা ভাবেই সব কথা বলচি,—যে দিন মেলার উৎসবে মল্লক্রীড়া

দেখান হয়, ভীম তাতে প্রথম পুরস্কার লাভ করে, সেই দিন দুপুরবেলা আমার বাড়ীর মেয়ে পুরুষের অনুপস্থিতিতে মহাপ্রতীহারের পাল্কী ও দূতী এসে আমার পুত্রবধূ উজ্জলাকে চুরি ক'রে নিয়ে গ্যাছে।—আমি এর প্রতীকার চাই।"

মহীপাল এবার স্পষ্টই অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন, ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে কহিলেন, "মহাপ্রতীহারের লোকেই যে তোমার বউ চুরি করেচে, তার প্রমাণ?"

দিব্যোক কহিল, "তার সাক্ষী আছে, আদেশ করেন ত ডাকতে পারি।"

রাজা কহিলেন,—"কিন্তু দূতী ও পাল্কী পাঠিয়ে কেউ কখন কারুকে চুরি ক'রে না, তবে এ হ'তে পারে যে, পূর্ব্ব হ'তে তাদের মধ্যে সঙ্কেত ছিল, তাই দূতী ও পাল্কী পাঠিয়ে দিতেই উজ্জলা স্বেচ্ছায় সেখানে চ'লে গেছে।" রাজার কণ্ঠ প্রত্যাঘাতের কুটিল অভিসন্ধিতে ভরা।

এ আঘাতে বৃদ্ধ ক্ষণকাল বাক্‌শক্তি হারা হইয়া স্তব্ধ রহিল। ক্ষণপরে আত্মসম্বিৎ লাভ করিয়া ঈষৎ অনুযোগ, ঈষৎ বিলা[illegible] কণ্ঠে উচ্চারণ করিল, "আমার মা'র চরিত্র সে রকম নয়। মা আমার সাক্ষাৎ সতীরাণী!"

রাজা কোপ কুটিল কটাক্ষ আহত বৃদ্ধের বিষাদিত মুখের পরে নিক্ষেপ করিয়া শ্লেষ-প্রচ্ছাদিত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"যদি তিনি সতী-রাণীই হবেন, তা হ'লে অনায়াসে পর পুরুষের পাঠানো পাল্কী চ'ড়ে দূতীর সঙ্গে চ'লে গেলেন কেমন ক'রে? এ ত সতী সাবিত্রীর কোন মতেই লক্ষণ নয়!—তাই বলি কি, একটা অসতী স্ত্রীর জন্য বৃথা শোকে আচ্ছন্ন থেকে পৌরুষ নষ্ট না ক'রে, ভীমকে বরং একটা কিছু কায নিয়ে কিছু দিন দেশান্তরে যাবার পরামর্শ দাও গে' যাও, তার পর একটি সুন্দরী

দেখে বড়সড় মেয়ে এনে তার বিয়ে দিয়ে দিও, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আপাততঃ মগধে ও কৌশিকী-কচ্ছে কতকগুলি লোক নিযুক্ত করতে হবে, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমি মগধে দণ্ডপাশিকের পদ প্রদান ক'রে পাঠাতে প্রস্তুত আছি। এমন কি, তাকে কৌশিকী-কচ্ছের মহা-প্রতীহারের পদ দেওয়াতেও আমার আপত্তি নেই।"

দিব্যোক এই অপ্রত্যাশিত রাজানুগ্রহে বিস্ময় শ্রদ্ধায় যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। এমন না হইলে রাজা! নিশ্চয় ভীমের সে দিনের বীর্য্যবত্তায় প্রীত হইয়াই তার জন্য এতখানি করিতে চাহিতেছেন। আহা, তাই যদি ঘটিত! কিন্তু এ প্রস্তাবে ভীম যে কিছুতেই সম্মত হইবে না, তাহা জানিয়াই বিষণ্ণমুখে মাথা নাড়িয়া প্রকাশ্যে কহিল, "আপনার দয়ার সীমা নেই, রাজাধিরাজ! এ বৃদ্ধ সেবকের পরে' এই রকমই কৃপা যেন চিরদিন ধ'রে বর্ষিত হয়। কিন্তু ক্ষমা করবেন প্রভু!—ভীম আপাততঃ আমি বল্লেও যে এ প্রস্তাবে সম্মত হবে, এমন আমার আশাই হয় না। আপনি যদি তাকে দয়া করতেই চান, তবে এই অত্যাচারের প্রতিবিধান করুন।"

মহীপাল বৃদ্ধের এই পুনঃ পুনঃ নির্ব্বন্ধ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, উঠিয়া বসিয়া সবেগে কহিলেন, "গৃহত্যাগিনী কুলবধূকে তোমার কুলে কি তুমি ফিরিয়ে নেবে, বলতে পারো? বলি, এত যদি তার পরে মায়া ত তাকে পথেঘাটে কলসী নিয়ে রাত দুপুরে জল আন্‌তে পাঠাতে কেন? দুঃখে, কষ্টে, লাঞ্ছনায় ডুবিয়ে রেখেছিলে কেন?"

ব্যথিত হইয়া দিব্যোক কহিল, "রাজাধিরাজ! কেন বারেবারেই ঐ কথাটা উল্লেখ ক'রে ব্যথার উপর ব্যথা দিচ্ছেন? সে কুলত্যাগিনী নয়, সতী-লক্ষ্মী! আমি কোনমতেই এ কথা বিশ্বাস করতে পারবো না। যদি তাকে পাই, তাকে নিয়ে একঘরে হয়ে থাকবো, সেও স্বীকার! আর যে বলচেন, কষ্ট দেওয়া,—তা' সে সব ঘরেই আছে। কেউ স্বামীর কাছে,

কেউ শাশুড়ীর কাছে লাঞ্ছনা পায়, গঞ্জনাও পায়;—সয়েও নেয় তা'; তার জন্যে সাধ্বী মেয়েরা তাদের ঘর ছাড়ে না।"

রাজার মাথা এই কথাটায় আপনা হইতেই হেঁট হইয়া আসিল। দিব্যোক কিছু না ভাবিয়াই নির্দ্দোষভাবে বলিলেও ইহার মধ্যে তাঁর নিজের ঘরের গ্লানি উদ্ঘাটিত হইয়া তাঁর মনকে সমধিক উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। এবার আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়াই তিনি সরোষে কহিয়া উঠিলেন,

"বিনা প্রমাণে অনর্থক আমি এইটুকুর জন্য আমার সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড স্বরূপ এক জন রাজবংশীয় সম্ভ্রান্ত রাজভক্ত লোককে অপমানিত করতে পারিনে। আমার প্রস্তাব যখন তোমাদের মনঃপূত নয়, তখন আমি নিরুপায়! অতএব এ সম্বন্ধে আমার আর কর্‌বার কিছুই নেই।"

"রাজাধিরাজ! এই কি ন্যায়পরায়ণ পালসম্রাটের ন্যায়বিচার? যার পর এত বড় মহাসাম্রাজ্যের ভিত্তি সংস্থাপিত?"

"দিব্যোক! তোমার মত এক জনের উপর পালসম্রাটের যথেষ্ট সময় অপব্যয় করা হয়ে গেছে, এর চেয়ে বেশী নষ্ট কর্‌বার মতন অবসর রাজার হাতে থাকে না।"

এই কথাতেই বিদায় লওয়ার পূর্ণ আদেশ প্রদত্ত হইলেও দিব্যোক উঠিল না। সে যথাপূর্ব্ব চাপিয়া বসিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল, "যতক্ষণ না আমায় সন্তুষ্ট ক'রে বিদায় দিতে পারবেন, ততক্ষণ আমি বিদায় হবো না। আমার পুত্রবধূ ভাল হোক, মন্দ হোক, আমায় তাকে ফিরিয়ে দে'বার আদেশ দিন, গৃহস্থের পবিত্র কুল ভঙ্গ ক'রে যে নরাধম নরপশু অপরের গৃহবধূর পরে' হস্তক্ষেপ করতে ভরসা করে, তার সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা হোক, তার পর আমি ফিরে যাব, এ ভিন্ন আমায় আপনি এক পাও নড়াতে পারবেন না।"

রাজাধিরাজ উঠিয়া বসিলেন, "দিব্যোক! কার সঙ্গে কথা কইচো, স্মরণ আছে কি?"

"আছে রাজাধিরাজ! অতি দুঃখের আঘাত পেয়ে আমি আমার রাজার কাছে ছুটে এসেছিলেম, আর তাঁর অবিচারে আমার এই ভাঙ্গা বুকখানা ফেটে গেচে!—এ কি এক মুহূর্ত্তও ভুলে যাবার?"

রাজা নীরব রহিলেন।

"এখনও ইতস্ততঃ করচেন, রাজাধিরাজ! দুষ্টের দণ্ড প্রদানে দণ্ডধরের এ কুণ্ঠা কেন?"

কঠিন কণ্ঠে রাজা কহিলেন, "ইতস্ততঃ কিসের? আমি বলেই দিয়েছি যে, এ সম্বন্ধে আমি কিছুই করতে প্রস্তুত নই এবং তা' করবোও না। তবে ভীম যদি কৌশিকী কচ্ছের মহাপ্রতীহারত্ব নিতে ইচ্ছুক থাকে, তা' দিতেও আমি প্রস্তুত আছি। তোমার অন্য পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্রদের রাজ-সৈনিকের মধ্যে স্থান দিতে যদি ইচ্ছুক থাকো, তাও পাবে। তোমায় আরও একটা বিষয়ের মধ্য হ'তে কিছু সম্পত্তি প্রদান করতে আমার অনিচ্ছা নেই—একটা তুচ্ছ নারীর বিনিময়ে এতগুলো সুযোগ কি কোন বুদ্ধিমান লোকে ত্যাগ করতে পারে? অবশ্য এ সম্বন্ধে তোমার কাছে আমার কোন অনুরোধ নেই, এ বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ ই স্বাধীন।"

দিব্যোক তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার সেই লোলচর্ম্মাবৃত অর্দ্ধাবনত বার্দ্ধক্য-কম্পিত দেহ সহসা যেন নবযৌবনের আকস্মিক দীপ্ততেজে সতেজ হইয়া উঠিল। কোটরাবস্থিত নিষ্প্রভ চক্ষুর্দ্বয় ভিতর হইতে একটা অনৈসর্গিক দীপ্তিলাভে সহসা উজ্জ্বলতর দেখাইল, স্থিরগম্ভীর অথচ দৃপ্তকণ্ঠে বরেন্দ্রীর সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন রাজভক্ত সেবক আজ তার রাজার মুখের উপরেই বলিল,—

"রাজাধিরাজ! রাজাধিরাজ! বুঝেচি! লোকে যে কথা নিয়ে গোপনে

আন্দোলন করচে, তা হ'লে সেটা মিথ্যে নয়? মহাপ্রতীহার আপনা আজ্ঞাবাহক মাত্র! এই ঘৃণিত, নারকীয় অভিনয়ের অভিনেত রাজরাজেশ্বর স্বয়ং? তাই এই পাপ কার্য্যের কদর্য্য অভিসন্ধি মনের মধে ভ'রে রেখে, আমার পিতার দীর্ঘ—সুদীর্ঘ কালের দান করা সম্পত্তি অযাচিত কৃপার ভাণ দেখিয়ে আমায় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন? মল্লক্রীড়ায় উচ্চ পুরস্কা ঘোষণা ক'রে আমার বীরপুত্রকে বাড়ীর বার ক'রে, সেই অবসরে অতি ক্ষুদ্রাশয় চোরের মতন আমার ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরছাড়া ক'রে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছেন? তাই তার অবমানিত স্বামীকে উচ্চপদ প্রদান করে নিজের অত বড় অকার্য্যের দাম দিতে চাইছিলেন? রাজাধিরাজ! ঐশ্বর্য্যের মধ্যে জন্ম নিয়ে, আজন্ম তারই মধ্যে আপনি ডুবে রয়েছেন,—ভোগবিলাসকেই জীবনের সার্থকতা বোধ করেছেন, সেই চোখে সমস্ত সংসারটাকেই দেখে থাকেন, কিন্তু জেনে রাখবেন, এমন অনেক লোক আছে, তাদের কাছে, এ সকলের দাম একটা কপর্দ্দকের চাইতেও বেশী নয়। আর তার প্রমাণ এক দিন আপনার পিতৃ পিতামহ পেয়েছিলেন, আবার আপনি নিজেও পাবেন।—এই ফিরিয়ে নিন—আমি এই পরিণাম আশঙ্কা ক'রে সঙ্গেই এনেচি,—আপনার দেওয়া—এই তাম্রশাসন।—ঘরের বৌ বেচা ধনের একটা কাণাকড়িও আমি ছুঁইনে, তা হোক, সে আমারই পৈতৃক সম্পত্তি।—আর তার সঙ্গে ফিরিয়ে নিন,—এই আমার গায়ের রাজভৃত্যের পোষাক, আর এই রাজার হাতে ক'রে দেওয়া তরোয়াল! আজীবন বড় যত্নেই এদের রক্ষা ক'রে এসেচি।—এও আজ আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্চি। আমার কাছে আজ থেকে এর আর কোনই মূল্য নেই। এখন ও শুধু ছেঁড়া-জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড মাত্র!"

এই বলিয়া দিব্যোক দৃঢ়হস্তে নিজের অঙ্গ হইতে অঙ্গাবরণ মোচন পূর্ব্বক উহা দুই হস্তে দলিত মর্দ্দিত করিয়া রাজার পায়ের তলায় ছুঁড়িয়া

ফেলিয়া দিয়া, অসিকোষ হইতে মুক্ত কৃপাণখানা লইয়া তাহা নিজের পায়ের চাপে দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া রাজপদপ্রান্তে নিক্ষেপ করিল।

তার পর এই আকস্মিক কাণ্ডের অভিঘাতে বিস্ময় স্তম্ভিত রাজার কোনমতে নিঃসারিত,—"যাও—চ'লে যাও!"—আদেশের প্রতিবাদে, দুঃখে ক্ষোভে অভিমানে উত্তেজনায় অধীর হইয়া উঠিয়া ঘনকম্পিত শ্বাসে, রোষাশ্রুবাষ্পাকুল গাঢ় স্বরে বৃদ্ধ নায়ক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,— "যাবো,—এখনই যাবো—তবে শুধু এইটুকু ব'লে যাবো,—'কিন্তু এ ও জেনে রাখবেন মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় মহীপালদেব! আজ হতে চিরদিনের জন্যে আপনার সিংহাসন তার অনেকগুলি বিশ্বস্ত ভৃত্য থেকে চির বঞ্চিত হলো! হয় ত এক দিন এ ক্ষতিকে খুব সামান্য ব'লে আপনি মনে করতে পারবেন না, হয় ত এক দিন এর জন্যে আপনাকে অনুতাপও করতে হবে।—আজ থেকে আপনি আমার এবং আমি আপনার মহা শত্রু!"

ক্রোধাতিশয্যে বাক্যস্ফূর্তি হইবার পূর্ব্বেই রাজা দেখিলেন, সেই সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ এক জন তরুণ পুরুষের মতই বেগে রাজকীয় কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

প্রহরীকে ডাকিয়া উহাকে বন্দী করার কথা একবার মনে হইল; আবার তখনই ভাবিলেন, "কোথাকার কয়েকটা ক্ষুদ্র নাগরিক, এত বড় প্রবল প্রতাপ একটা রাজার বিরুদ্ধে ওদের কি করবার আছে? থাক্, একটা আপদের শান্তি হলো। এখন, উজ্জ্বলা! তোমায় একবার আমার করতে পারলেই সকল চেষ্টা সার্থক হয়। আর কেনই বা তা না হবে? আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্য,—আর কি আছে সেই অভাগা ভীমের?"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিশ্ব দেবতার অনন্ত আরতির বাদ্য তাঁর অসীম পূজার দেউলে অনা
কাল ধরিয়াই বাদিত হইতেছে, কোন দিন কোন কারণেই ইহার অখ
ধ্বনি নিমেষের জন্য বাধিত হয় না; কিন্তু মানুষের না কি অবসরও ক
এবং আগ্রহও বেশী নয়, তাই সে অহোরাত্র নন্দিত বিশ্ববরেণ্যের সে
বন্দনা গীতি শুনিয়া তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইতে সকল সময় পারিয়া উঠে ন
কদাচিৎ একটা শুভলগ্নে এ ধ্বনি তার হৃদয়কে হয় ত স্পর্শ করে।

সে দিন ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথি। এই চতুর্দ্দশী শিব চতুর্দ্দশী না
চিরপ্রসিদ্ধ। প্রভাতকৃত্যাদি ও সাংসারিক সকল কর্ত্তব্য যথাযথ সম্প
করিয়া দিয়া কিছু নিশ্চিন্ত চিত্তে পট্টমহাদেবী করতোয়াস্নানান্তে তাঁ
ইষ্টদেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। বিশেষ পূজার সর্ব্বপ্রকার উপহার
সম্ভার বহন করিয়া লাটদেশজ ব্রাহ্মণত্রয় তাঁর পশ্চাতে আসিয় যথায
পূজোপকরণ সজ্জিত করিয়া দিয়া গেল। আকন্দ, ধুতূরা কুন্দপুষ্পে
স্তূপ, সরক্তরাগযুক্ত নবজাত বিল্বদল, পক্ক বিল্ব, স্বর্ণপাত্রে সুপ্রচুর ফল
মিষ্টান্নাদি সংযুক্ত ধবলগিরিনিন্দিত উচ্চচূড় নৈবেদ্য শ্রেণী, সুবৃহৎ রজত ও
কাংস্যপাত্রে মিষ্টান্ন ভোজ্যাদি সকলই সুসজ্জিত হইল, ইহার উপর সুবর্ণ
দক্ষিণারও অপ্রতুলতা ছিল না। দেউলগৃহ ধূপ ধূনা চন্দনচূর্ণ ধূমে ও
পুষ্প সুরভিতে দেবতার গৃহেরই উপযোগী হইয়া উঠিল। দেবসেবক ব্রাহ্মণগণ
মন্দিরদ্বারে উভয় পার্শ্বে পূর্ণকুম্ভ স্থাপন পূর্ব্বক দ্বারের উপর পুষ্পস্তবক ও
আম্রপত্র দ্বারা গ্রথিত মাল্য দোলাইয়া দিল।

পট্টমহাদেবী কলধৌত পট্টাম্বরে তাঁর উন্নত দেহ আবৃত করিয়া,
বস্ত্রাঞ্চল কণ্ঠে বেষ্টিত করিয়া ভক্তিভরে দেব প্রণাম করিলেন, তারপর

পূজার আসনে বসিয়া যেমন স্বুবর্ণময় কোশা হইতে পবিত্র গঙ্গোদক লইয়া আচমন মন্ত্র পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন, অমনই তাঁর মনে হইল, মন্দিরের বাহিরে কে যেন তাঁহার নাম লইল।—

"পট্টমহাদেবী কোথায় ?"

কার কণ্ঠ এ ? মহাদেবীর শান্ত হৃদয় শোণিতে একটি মুহূর্ত্তেরই একটা রুদ্ধ আবেগ উদ্দাম হইয়া উঠিয়াই পুনঃ শান্ত হইয়া গেল। এ কণ্ঠ তাঁর স্বামীরই বটে! আজ কত দিনের পরে এই আহ্বান! রাজাধিরাজ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—

"এখনও যে সেই আগের মত ভূত পুজোটুজোগুলো চালাচ্চো দেখছি!"

মহাদেবী আচমনার্থ গৃহীত গঙ্গোদক হস্তচ্যুত করিয়া জিজ্ঞাস্থভাবে ফিরিয়া চাহিলেন, মনের মধ্যে তাঁর ঈষৎ একটা উদ্বেগের আশঙ্কা মৃদু ছায়াপাত করিল।

রাজাধিরাজ দ্বারের নিকটে আরও এক পদ অগ্রসর হইয়া আসিলেন, কহিলেন,—"আমি কি ভিতরে যেতে পারি? আপত্তি আছে কিছু?"

মহাদেবী তৎক্ষণাৎ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দৃঢ়পদে দ্বার সমীপস্থ হইলেন; শান্ত অথচ স্থিরস্বরে কহিলেন—"কোন কথা আছে কি ?"

রাজাধিরাজ ঈষৎ হাসিলেন, কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না। মন্দির মধ্যে যে তাঁর প্রবেশ নিষেধ, এ কথা তাঁর জানা ছিল! পরে কহিলেন—"হ্যাঁ, আছে একটু। কিন্তু এইখানেই কি আমায় এই রকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে সব কথা বলতে হবে? তোমার মহল্লিকারা দেখলে কি ভাববে! কথা শেষ করতে কিছু সময়ও লাগতে পারে।"

পট্টমহাদেবীর শান্ত ও দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে অতি ক্ষীণ একটুখানি মৃদু হাস্য-রেখা অতিশয় সন্তর্পণে ফুটিয়াই মুহূর্ত্তে আবার মিলাইয়া গেল। ভাবা

চিন্তার ভাবনা এখনও আছে না কি? কিন্তু তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৃদু গম্ভীর অথচ কোমল কণ্ঠেই কহিলেন—"তা হ'লে আসুন, আমরা প্রাসাদে যাই; এখানে বস্‌বার ত সে রকম কোন ব্যবস্থা নেই।"

"তাই এস।"—বলিয়া রাজাধিরাজ প্রথমেই অগ্রসর হইলেন। মহাদেবী তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে ফিরিয়া করপুটে মন্দির-দেবতার উদ্দেশ্যে তাঁর নীরব প্রণাম নিবেদনটুকু সকরুণভাবে জানাইলেন। তাঁর বক্ষ ভেদ করিয়া স্বতঃই একটি দীর্ঘনিশ্বাস উঠিয়া আসিল। তার পর মন্দির দ্বার অর্গল বদ্ধ করিয়া চিরাভ্যস্ত সংযত শান্ত চরণে স্বামীর পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

পট্টমহাদেবীর বিশ্রাম কক্ষ—যে কক্ষে তাঁর দ্বৈপ্রহরিক বিশ্রাম অবসরে মহাকুমার রামপালদেব তাঁকে ছল করিয়া মহোদয়ে যুদ্ধযাত্রার কথা বলিয়া, বিনিময়ে সন্ধ্যার ঈপ্সিত সঙ্গলাভে চরিতার্থ হইয়াছিলেন,—এ সেই কক্ষ! ভিত্তিগাত্রে সেই রামায়ণের সুচিত্রিত সুবিখ্যাত চিত্রাবলী, চিক্কণ রক্তপ্রস্তরের হর্ম্ম্যতলে আজও সেই রাঙ্গা মাদুর বিছানো, মধ্যস্থলে পট্টমহিষীর মর্য্যাদার উপযোগী সুকোমল শয্যা আস্তৃত, আর কোনখানে বড় কিছুই নাই। রাজাধিরাজ বিস্মিত কৌতূহলে একবার শূন্য গৃহের চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন বহুকাল এ কক্ষের মধ্যে তিনি পদার্পণও করেন নাই। মনে পড়িল, তাঁর মাতার জীবিতকালে এই কক্ষ কত প্রকার ভোগ্য ঐশ্বর্য্যের সমাবেশে সুসজ্জিত ছিল। মানসিক অবস্থা যদিও আজ তাঁর একেবারেই ভাল থাকিবার কথাও নহে এবং ভাল ছিলও না, তথাপি আজ বহু—বহু দিন পরে জীবনের এক জটিলতাময় সঙ্কটের ক্ষণে নিজেরও সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সহসা কেমন করিয়া চির বিমুখ চিত্ত তাঁর এই চির অনাদৃতা জীবন-সঙ্গিনীর প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়া বসিল। অতিশয় বিস্ময়ের সহিত সহসা তাঁর মনে হইল, তিনি যেন ইহাকে ঠিক ভাল করিয়া কোন দিনই দেখেন নাই! এই চির-পুরাতনকে যেন আজ একান্তই

নূতন ঠেকিল। তাই চারিদিকের সমুদয় বিপত্তির দুশ্চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হইয়া গিয়া তাঁর কৌতূহলী চিত্ত সহসা কোমলভাবে প্রশ্ন করিয়া বসিল,—"এ ঘরের সে সব জিনিষপত্রগুলো কোথায় গেল, লজ্জা ?"

এই যে 'লজ্জা' সম্বোধন, এ যে কত যুগযুগান্তরের পর, এর কি কিছু হিসাব আছে ? আর এই শ্লেষ-বিদ্বেষহীন কোমল কণ্ঠ ? মহাদেবী ইহাতে এতই বিস্মিতা হইয়াছিলেন যে, তাঁর মত সংযত-স্বভাবা নারীর পক্ষেও প্রশ্নোত্তর দিতে কিছু অধিক বিলম্ব ঘটিল, এবং স্বামীর এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে তিনি ঈষৎ বিস্ময়ভরে একবার তাঁর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া তার পর কথা কহিলেন, "অন্য ঘরে আছে রাজাধিরাজ !"

মহারাজাধিরাজ লজ্জাদেবীর সেই চকিত দৃষ্টিটুকু দেখিতে পাইয়াছিলেন। নিজের এই আকস্মিক দুর্ব্বলতায় তাঁর মনে মনে ঈষৎ লজ্জার উদয় হইল, মুহূর্ত্তে গাম্ভীর্য্যাবলম্বন করিয়া কহিলেন, "তোমার কাছে কেন এসেছি, তুমি হয় ত তার কিছু কিছু বুঝতে পেরেও থাকবে ? শুনেছ বোধ হয় যে, অর্থাভাবে আমাদের অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করতে হচ্চে ? আজই—এখনই যথেষ্ট অর্থ না পেলে অধিকাংশ রাজসৈন্য বিদ্রোহী হ'য়ে উঠতে পারে,—এ রকমও সংবাদে জানা গ্যাছে—"

রাজাধিরাজ এই পর্য্যন্ত বলিয়া একটুখানি নীরব হইলেন, হয় ত তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই মহাদেবী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁর ইচ্ছা নিজেই পূর্ণ করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিবেন এবং তাঁকে এ বিষয়টা মুখ ফুটিয়া বলিবার হীনতা হইতে রক্ষা করিবেন, কিন্তু একটুক্ষণ প্রতীক্ষিত-ভাবে থাকিয়া দেখিলেন যে, তাহা হইল না। মহাদেবী যথাপূর্ব্ব সেইরূপ শান্ত ঔদাস্যের সহিত যেমন এক দিকে চাহিয়াছিলেন, সেই রকমই রহিলেন, রাজ্যের এত বড় বিপত্তির আশঙ্কাতেও তাঁর কোন প্রকার চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। যেন এ সকল সম্বাদ তাঁর

কাছে একবারেই নূতন নহে। মহাদেবীর এই নির্লিপ্তভাবে মনা তাঁর ঈষদুত্তেজিত হইয়া উঠিল। এবার তাই একটু জোরের সহিত বলিয়া ফেলিলেন, "শুধু এই নয়, কতকগুলা নিষ্কর্ম্মা গোঁয়ার জুটি নাগরিকরা একটা ক্ষুদ্র বিদ্রোহ কোটীবর্ষে উপস্থিত করেছে, সেই জন্য আরও সৈন্যদের সন্তুষ্ট রাখা এ সময়টায় নিতান্তই প্রয়োজন, অথচ আমাদে রাজকোষ শূন্য, তাই তোমার অলঙ্কারগুলো এ সময় না পেলে কোনমতেই আর সুবিধা করা যাবে না। তোমার ও রামপালের স্ত্রী সমুদয় অলঙ্কার এখনই দিলে তবে যদি কোনমতে কোন সুবিধা হয়, চেষ্টা ক'রে দেখি।"

রাজাধিরাজ আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কথা শেষ করা হইল না। তিনি দেখিলেন, তাঁর শ্রোত্রী তাঁকে সে অবসরটুকু না দিয়াই উঠিয়া যাইতেছে। পাশের একটা ছোট কুঠারীর দ্বার খুলিয়া মহাদেবী সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। রাজাধিরাজ মনে করিলেন, হয় ত তিনি তাঁর অলঙ্কার না দিবার ইচ্ছাতেই পলাইতেছেন। এই মনে করিতেই দুশ্চিন্তা ও ক্রোধ তাঁহাকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া তুলিল। তিনিও দ্রুতপদে লজ্জাদেবীর অনুসরণ করিয়া সেই ছোট ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিতেই যে দৃশ্যটি চোখে পড়িল, তাহা একেবারেই অপ্রত্যাশিত!

তিনি দেখিলেন, এই ঘরটি পট্টদেবীর ভাণ্ডারঘর। ইহার ইতস্ততঃ কাঠের এবং লোহার বড় বড় সিন্দুক শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজান আছে। মহাদেবী ঘরে ঢুকিয়াই ইহারই একটির কাছে দাঁড়াইয়াছেন, খুবই সম্ভব যে, উহারই মধ্যে তাঁর অলঙ্কার পেটিকা রক্ষিত। রাজাধিরাজ ঈষৎ লজ্জিত হইলেন।

সহসা গৃহ প্রান্তবর্ত্তী আর একটি দৃশ্য তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই অন্যের অ-প্রবেশ্য ক্ষুদ্র গৃহে একটি নিভৃত কোণে একখানি অতি সুদৃশ্য

স্বর্ণখচিত চন্দনকাষ্ঠের চৌকির উপরে কুন্দপুষ্পের মাল্য-বিজড়িত চন্দন-চর্চ্চিত দুইটি পুরাতন কাষ্ঠ-পাদুকা স্থাপিত রহিয়া, ইহার সঙ্গোপন নিত্যপূজার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে! ফুল ও চন্দন বাসি হইয়া গেলেও তাদের স্বভাবজ সুরভি দান করা হইতে এখনও নিবৃত্ত হয় নাই। এক সঙ্গে বদ্ধগৃহের রুদ্ধ বায়ুর সহিত সংমিশ্রিত ধূপ ধূনা গুগ্‌গুলের সুগন্ধও সুস্পষ্টরূপেই অনুভূত হইতেছিল। মহারাজাধিরাজ সাগ্রহ কৌতূহলে সেই দিকে নেত্রপাত করিয়াই সবিস্ময়ে চিনিতে পারিলেন, এই সযত্নে সশ্রদ্ধায় সংপূজিত উপানহ দুইখানি তাঁহারই পূর্ব্ব ব্যবহৃত ও বহু দিনের পরিত্যক্ত।

একটা অননুভূত বিষম লজ্জা অনুতাপের প্রচণ্ড তরঙ্গ সবেগে তাঁর বুকের উপর দিয়া বহিয়া গেল। এ কি দেখিলেন? যাহাকে জীবনের তরুণ প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া আজ এই জীবন-মধ্যাহ্নে কোন দিনই এক বিন্দু স্নেহ দিয়া; প্রেম দিয়া,—এমন কি, এতটুকু শ্রদ্ধা দিয়াও অভি-নন্দিত করা হয় নাই, যার সমস্ত জীবনের সর্ব্বস্ব উপহার অনায়াসে গ্রহণ করিয়া বিনিময়ে একটা কপর্দ্দক ফেলিয়া দিবারও অবসর ঘটে নাই, যাহাকে তার ন্যায়নিষ্ঠা এবং কর্ত্তব্যের প্রচুরতায় স্নেহহীন, নির্লিপ্ত বিচারক-মাত্রই মনে করিয়া চিরদিন সযত্নে যার সান্নিধ্য হইতে নিজেকে অতি সুদূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন এবং যার দাম্পত্যের সমস্ত দাবীকেই নির্দ্দয় ও নির্দ্দয় ভাবে সরাইয়া দিয়া পাপ পঙ্কিল অপবিত্রতার মধ্যে জীবনের শ্রেষ্ঠতম দিনগুলাকে নিশ্চিন্তে কাটাইয়া দিলেন, কোন দিন চোখের কোণেও যার দিকে একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না, সেই চির-অনাদৃতা রাজাধিরাজ-পত্নী—চির অবমানিতা রাজরাজ্যেশ্বর-দুহিতা তাঁর সেই নির্ম্মম নিষ্ঠুর স্বামীর চরণ-পূজার অবসর না পাইয়া, তাঁহারই মত পরিত্যক্ত একটি পাদুকার এই সভক্তি সহিষ্ণু নিত্যপূজা এমন নীরবে এমন গোপনে কিসের শ্রদ্ধায় সম্পন্ন

করিতেছে? পূজিত বস্তুর অবস্থানব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয়, এ পূজার সাক্ষী হয় ত আজ সর্ব্বপ্রথম তিনিই—একমাত্র তিনি—যার উদ্দেশ্যে এই পূজার নিবেদন—সেই তিনিই হইলেন। মহারাজাধিরাজের সমস্ত বক্ষ মথিত আলোড়িত করিয়া তুলিয়া একটা বিস্ময়ার্ত্ত অস্ফুট ধ্বনি তাঁর আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে ঠেলিয়া আসিল, "মহাদেবি! লজ্জা! লজ্জা!—"

তিনি এক প্রকার ছুটিয়াই মহাদেবীর দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন, কিন্তু মধ্যপথেই তাঁর সে প্রবল উচ্ছ্বাস সহসা বাধাপ্রাপ্ত হইল।

এই যে অতি গোপনীয় দৃশ্য আজ রাজাধিরাজের চোখে ধরা পড়িল, এর যে কত বড় প্রচণ্ড লজ্জা, তাহা, যার এ লজ্জা. সে-ই শুধু জানে! তাঁর এই যে পূজা, অতি গোপনে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত ইহা তিনি সকলেরই কাছে গোপন রাখিয়াছিলেন; এমন কি, সন্ধ্যাদেবীও তাঁর এ পূজার পূজ্য কে, তাহা জানিতেন না। বাহিরের কোন লোকের কাছে নিজের শূন্যময় অন্তরের এতটুকু দৈন্য প্রকাশ, এ তাঁর স্বভাবের বহির্ভূত। তাঁর বিদলিত বিপর্য্যস্ত জীবনের চির হাহাকার তাই তিনি অতিশয় সাবধানেই সর্ব্বত্র হইতেই গোপনে রাখিয়া শান্ত সংযত সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত সহিষ্ণুতার সহিত অটল মূর্ত্তিতে স্থির থাকিতেন। ভিতরে যে কি অভাবের মহাশূন্যতা বিশাল শুষ্ক মহামরুর মতই ধূ ধূ করিতেছে, এই কর্ত্তব্যপরায়ণ, কার্য্যরত, স্নেহপ্রবণ বাহ্যমূর্ত্তি হইতে কেই বা তাহা অনুমান করিবে? স্বামী প্রেমের জন্য চিত্তে যে তাঁর বিন্দুমাত্র লোভ বা মোহের স্থান আছে, সে কথা হয় ত কোন দিনই কেহ সন্দেহ করিবার অবসরও পায় নাই; তিনি কাহাকেও,—এমন কি, তাঁর স্বামীকেও সে সুযোগ একটী দিনের জন্য পাইতে দেন নাই। আর আজই তাঁর অতি নিভৃত জীবনের সকল গোপন-রহস্যই এ কার কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িল? হয় ত সে তাঁর এই দুর্ব্বলতাকে কঠোর নির্ম্মম উপহাসের সহিত—

তাচ্ছিল্যের সহিত,—আর না হয় ত বড় জোর এতটুকু একটু কৃপার সহিতই চাহিয়া দেখিবে!—

হায়, এত দিনের সযত্নরুদ্ধ হৃদয়গুহানিহিত সকল গোপনতারই কি এই এত বড় অকরুণ পরিণাম ঘটিয়া গেল? ছি ছি ছি! এ কি ঘৃণা! এ কি লজ্জা!

কোনমতে সুগভীর লজ্জা জ্বালাকে দমনে রাখিয়া মহাদেবী ঈষৎ কম্পিত হস্তে সিন্দুকের ডালা তুলিয়া একটি সুবর্ণ-পেটিকা বাহির করিলেন। বক্ষের মধ্যে তখন উত্তাল শোণিতস্রোত এতই উদ্দামভাবে নৃত্য করিতেছিল যে, তাহারই গতিবেগে তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম করিতেছিল। তাঁর ভয় হইল যে, সে শব্দটা বাহিরেও হয় ত বা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে! হয় ত উনিও তাহা শুনিয়া তাঁর সম্বন্ধে আরও কত কিই ভাবিতেছেন! তাঁর এই চলিষ্ণুতাকে অলঙ্কারদানের অনিচ্ছাও হয় ত মনে করিয়া লওয়া অসম্ভব নয়? সত্য সত্যই ত তিনি তাঁকে ভাল করিয়া জানেনও না।

"মহাদেবি!—লজ্জা! লজ্জা!"—ব্যাকুল উন্মাদনাময় স্বরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে এই নামোচ্চারণ করিয়াই রাজাধিরাজ মহাদেবীর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

ততক্ষণে রত্ন মঞ্জুষা উন্মোচন করিয়া ধরিয়া প্রাণপণে আত্মসংযত হইবার চেষ্টার সহিত ধীরকণ্ঠে মহাদেবী কহিতেছিলেন;—"এই নিন, এরই মধ্যে আমার সমস্ত অলঙ্কার আছে।"

তাঁদের দুইজনকার মাঝখানে এই বহুমূল্য মণি রত্ন সুবর্ণাধার স্বর্ণ-পেটিকা দুর্ল্লঙ্ঘ্য বাধা স্বরূপেই যেন দেখা দিল।

বাধাহত হইয়া ঈষৎ সলজ্জভাবে মহারাজাধিরাজ এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিলেন, তার পর আবরণ মুক্ত রত্নসম্ভারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উৎফুল্ল মুখে কহিয়া উঠিলেন,—"এদের মূল্য নিতান্ত অল্প হবে না! কিন্তু এই

প্রকাণ্ড মরকতমাল্য এত পূর্ব্বে কখন দেখিনি! এটা কবে কিনেছ? ঐ সুগোল মুক্তার সাতনলী, আর শতেশ্বরী হার—এও অতি সুন্দর! ঐ মুকুটখানা আমার মায়ের ছিল, না?"

মহাদেবীর মনের ভিতরকার প্রবল আলোড়ন তখনও সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয় নাই, ইহারই উত্তেজনায় তাঁর শুভ্র মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়াই রহিয়াছিল; রাজার প্রশ্নে তাহা আরও একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কিন্তু কথা তিনি সংযত কণ্ঠেই কহিলেন—"এগুলি প্রায় সবই কল্যাণেশ্বরের দেওয়া, ঠাকুরাণীর অলঙ্কার আপনার অনুজ্ঞামত রাজকোষাগারে রক্ষিত ছিল এবং—"

পট্টমহাদেবী "এবং"—বলিয়াই তাঁর বক্তব্যটাকে অসমাপ্ত রাখিয়া দিলেন, "এবং তাহা হয় ত এত দিনে আপনি নিজেই নষ্ট করে ফেলছেন"— এ কথাটা আর তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না, যেহেতু, সেটা বলাও একটু কঠিন এবং বলিলেও ত কোন লাভ নাই; বৃথা বাক্য ব্যয় তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

ঐ "এবং"এর পরের কথাগুলা রাজাধিরাজেরও স্মরণ হইল তাঁর জননী মহাদেবীর ও পট্টমহাদেবীর সমুদয় মহামূল্য এবং প্রায় অমূল্য অলঙ্কাররাশি মহীপালদেব লজ্জাদেবীর হাতে না রাখিয়া নিজের কাছেই রাখিয়াছিলেন এবং বাস্তবিকই তার সমুদয় সারাংশ তাঁরই খেয়ালের খেলায় নিঃশেষিত হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেব যে কৌস্তভতুল্য মহামণি শিরোভূষণ স্বরূপে ব্যবহার করিতেন, সেই জগৎ বন্দিত অমূল্য রত্নও তিনি গণিকার কণ্ঠভূষার্থ স্বেচ্ছায় প্রদান করিয়াছেন। নর্ত্তকী বিদ্যুৎমালা ঐ মণি ব্যতীত পালসম্রাজ্যের পট্টমহাদেবীগণের উত্তরাধিকারিত্বে অবশ্য প্রাপ্য গজমতিহারও তাহারই অযোগ্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া অহঙ্কৃতা হইয়াছে। আজ সে সব কথাই রাজাধিরাজের স্মৃতিপথে

উদিত হইয়া তাঁহাকে বিমনা ও ম্লান করিয়া দিল। এত বড় তুঃসময়ে সেই রত্নসম্ভার গৃহে থাকিলে কতই না উপকার পাওয়া যাইত! তখন তাঁর চকিতের মত স্মরণে আসিল, আর এক জনকে—যে তার সমস্তই তাঁর অধিকারে ফিরিয়া আসিতে দিয়া তাঁর দেওয়া দণ্ড লইয়া চিরাপস্থতা হইয়াছে!

ক্ষণ পরে কথঞ্চিৎ আত্মস্থ হইয়া তিনি মহাদেবীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতেই কি তোমার ও রামপালের স্ত্রীর সমস্ত অলঙ্কার আছে?"

পট্টমহাদেবী অলঙ্কার পেটিকা বন্ধ করিয়া রাজাধিরাজের পায়ের কাছে উহা নামাইয়া রাখিয়া উত্তর করিলেন,—"এতে আমার সবই আছে, এ ছাড়া আর এই আছে"—এই বলিতে বলিতে নিজের উভয় হস্তে তুইখানি শঙ্খবলয়-মাত্র বাকি রাখিয়া সুবর্ণ কঙ্কণ, বাজুবন্ধ, গলার মোহনমালা, কটির মেখলা সমস্তই একে একে খুলিয়া সেই পেটিকা মধ্যে স্থাপন করিলেন। বাম হস্তের অনামিকা হইতে পঞ্চরত্নসমন্বিত অঙ্গুরীটি পর্য্যন্ত খুলিয়া লইতে বাকি রাখিলেন না। পরে রাজার পায়ের কাছে একটি প্রণাম করিয়া উঠিয়া সবিনয়ে বলিলেন, "আমার যা কিছু ছিল সমস্তই দিলাম,—কিন্তু সন্ধ্যার অলঙ্কার আমি আপনাকে দিতে পারবো না, সেগুলি আপনার নে'ওয়াও সঙ্গত হবে না,—তাই দিই নাই।—সেগুলি আপনি আমায় দয়া করে দিতে বল্‌বেন না।"

রাজাধিরাজ লক্ষ্মাদেবীর ব্যবহারে প্রীত, বিস্মিত, আবার এই কথায় কিছু বিরক্তও হইয়াছিলেন, তথাপি বিরক্তি দমন করিয়াই উত্তর করিলেন—"ধরে নাও, দেশে যদি ভীষণ রাষ্ট্র-বিপ্লবই ঘটে, তখন সন্ধ্যার অলঙ্কার ব'লে কি বিদ্রোহীরা সেগুলি ছেড়ে দেবে? তার চেয়ে যাতে সেটা না ঘটে, তার ব্যবস্থা করাই কি সঙ্গত নয়?"

মহাদেবী ক্ষণকাল নতমুখে কি চিন্তা করিলেন, পরে ঈষৎ একটা

দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক উঠিয়া গিয়া সেই কক্ষেরই একটা স্থান হইতে লেখ্যদ্রব্য লইয়া আসিলেন; রাজার সম্মুখে উহা স্থাপন করিয়া কহিলেন, "তবে আপনি লিখে দিন যে, আপনার অবশ্য প্রয়োজনীয় অর্থের আবশ্যকতায় এই অলঙ্কার ঋণস্বরূপ গ্রহণ করা হচ্চে, যত শীঘ্র সম্ভব ঐ অলঙ্কার অথবা ঐ পরিমাণ অর্থ তাকে পরিশোধ করবেন।"

রাজাধিরাজের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল; তিনি হাত দিয়া লেখ্যদ্রব্য ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, "লেখার দরকার নেই, তুমি যেরূপ বল্‌চো, সেই রূপই হবে।"

মহাদেবী ঈষৎ দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "লেখাতেই বা আপত্তি কি, রাজাধিরাজ?"

মহারাজাধিরাজের মুখ এবার অপমানে রাঙ্গা হইয়া উঠিল, রুষ্টস্বরে কহিয়া উঠিলেন,—"তুমি কি আমায় অবিশ্বাস করচো মহাদেবি?—আমি যখন ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্চি, তখন সামান্য ব্যক্তির মত আমায় লেখালেখি করাতে চাও কেন?—আমার স্ত্রীর কাছে কি আমার এতটুকু সম্মানও নেই?"

মহাদেবীর শান্তমুখে এ তিরস্কার এতটুকুও চাঞ্চল্যের রেখাপাত করিল না, তিনি মৌন নতমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া রাজাধিরাজের এতক্ষণকার নম্রচিত্ত উত্তেজনায় উত্তপ্ততর হইয়া উঠিতে লাগিল,—সক্রোধে কহিলেন, "মহাদেবি! জ্যান্ত মানুষকে তুচ্ছ ক'রে শুধু খড়মের পূজো কর্‌লেই পতিব্রতা হওয়া যায় না! তোমার স্বামীকে তুমি এইটুকু বিশ্বাস কর না? এই তোমার পতিভক্তি?—"

মহাদেবী এ কথার যে সহজ প্রত্যুত্তর ছিল, তাহার উল্লেখ করিলেন না। শুধু তাঁর দৃঢ়তার রেখাপাতে ঈষৎ কঠিন অথচ ম্লান ও সংযত স্থিরদৃষ্টি তুলিয়া স্বামীর মুখে তাহা সুধীরে স্থাপন পূর্ব্বক পূর্ব্বেরই সেই অটল

স্বরে এবার ঈষৎ মিনতি ভরিয়া কহিলেন, "লিখিত স্বীকার ব্যতিরেকে আমার গচ্ছিত ধন আমি দিতে পারি না, রাজাধিরাজ।"

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও নিরতিশয় অবমানিত বোধ করিয়াও অগত্যাই মহারাজাধিরাজ সন্ধ্যার কাছে ঋণ-স্বীকার ও তাহা শীঘ্র পরিশোধের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াই অলঙ্কারগুলি হস্তগত করিতে বাধ্য হইলেন। নিরতিশয় ক্রোধের সহিত মনে মনে বলিলেন,—"রেখে দাও তোমার লিখিত ঋণ! না যদি আমি ঋণ শোধ করি, তোমরা কি ঐ লেখাটুকু নিয়েই আমায় তা পরিশোধ কর্তে বাধ্য করতে পারবে?"

পট্টমহাদেবী মহল্লিকা সিদ্ধাকে ডাকিয়া পেটিকা দুইটি রাজাধিরাজের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন, তার পর মহারাজাধিরাজ যাইবার কালে তাঁকে একটা সম্ভাষণ পর্য্যন্ত না করিয়া, একবার তাঁর দিকে না চাহিয়া নীরব গাম্ভীর্য্যের সহিত উদ্ধতভাবে প্রস্থান করিলে, ক্ষণকাল অনিমেষে ও অনির্দ্দেশ্য দৃষ্টিতে তাঁর গমনশীল মূর্ত্তির দিকে শুষ্ক চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া পট্টমহাদেবী একটা বুকফাটা যন্ত্রণার্ত্ত দীর্ঘশ্বাস মোচনপূর্ব্বক শুষ্ক রুক্ষ জ্বালাময় নেত্র ফিরাইয়া লইলেন। সহসা সেই হৃত-সর্ব্বস্ব নির্জ্জন ক্ষুদ্র কক্ষের মৃত্তিকাতলে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িয়া এই সর্ব্বহারা নারী আর্ত্তকাতরতার সহিত উর্দ্ধস্বরে মর্ম্মের মধ্য হইতে সভয়ে উচ্চারণ করিলেন, —"দেবাদিদেব! জানি না, এ অভাগীর কি ভাগ্যফল! না জানি, কি দুর্দ্দিনই তার জন্যে প্রেরণ করচো! তাই কি আজ এ হতভাগীর হাতের পূজো নিলে না? আসন থেকে উঠিয়ে দিলে? হে বিশ্বনাথ! আমি না পাই, না-ই বা পেলেম! ওঁকে তুমি ভাল রাখো,—সুখে রাখো! সুমতি দাও—সকল অমঙ্গল—সর্ব্ব আপদ শান্তি ক'রে দাও। মা গো! ভবরাণি! আমার বুক চিরে সমস্ত রক্তধারা তোমার রাঙ্গা পায়ে আমি ঢেলে দেব মা! এ বিপদ থেকে ওঁকে মুক্ত ক'রে দিও।"

নবম পরিচ্ছেদ

দিব্যোক যখন রাজপ্রাসাদ হইতে নিজের বাড়ী ফিরিয়া গেল, তখন সে যে কোথা দিয়া যাইতেছে, তার পা দুইখানা পৃথিবীর মাটীর উপর অথবা শূন্যমার্গে কোথায় যে পড়িতেছে, ইহাও সে যেন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না। রাস্তায় লোক চলাচল করিতেছিল, দুই পার্শ্বে বিপণি-শ্রেণীতে বেচাকেনা চলিতেছে। এক দল পাহাড়ী শ্বেত চামর, অগুরু-চন্দন, রুদ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ, ভূর্জ্জপত্র, শিলাজতু প্রভৃতি হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশ জাত বস্তুজাত লইয়া হাঁকিতেছিল,—"প্রভু বুদ্ধের সেবার যোগ্য চন্দন-চামর এসেছে ; ভক্তগণ ! শীঘ্র এস, গ্রহণ কর !"—

দিব্যোক তাদের দলের মাঝখানে আসিয়া পড়িল। একজন বিক্রেতা একটি অমল ধবল চমরী-পুচ্ছ আন্দোলিত করিয়া তাহাকে দেখাইল—"বুদ্ধ ভগবানের সেবার জন্য কিনে নাও, বৃদ্ধ ! এ সুযোগ আর পাবে না। তিব্বত হ'তে এনেছি।"—দিব্যোকের কানে সে কথা প্রবেশ পথই পাইল না। সে যেমন নতমুখে পথ চলিতেছিল, তেমনই চলিয়া আসিল। পর্ব্বতবাসী চামর-বিক্রেতা তার উদ্দেশে কৃপণ বলিয়া উপহাস করিয়া পুনশ্চ অন্য ক্রেতার সন্ধানে চলিয়া গেল।

দিব্যোকের সমস্ত মনটা একটা গভীর বিষাদে যেন সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এত বড় যে দুষ্কার্য্য,—আর এরই অধিনায়ক কি না, রাজা !—তার যে রাজাকে সে দেব প্রতিনিধি বলিয়া এতকাল মনে মনে পূজা করিয়া আসিয়াছে, যাঁকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমান চক্ষে অপরে দেখিলেও তার সহ্য হয় নাই, সমস্ত নরের ঊর্দ্ধে নরপাল রূপে—নরনাথ রূপে যাঁর স্থান, সেই লোকেন্দ্র—প্রজার পিতৃ স্বরূপ সেই নরপতি এত বড়

অধর্ম্মাচারী! সমস্ত ধন-মান-প্রাণ যাঁর হাতে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়া দিয়া এই লক্ষ লক্ষ প্রজা নিশ্চিন্ত হইয়া আছে, সেই সরল, বিশ্বস্তচিত্ত, একান্তভাবে আত্মসমর্পণকারী পুত্রতুল্য প্রজার সঙ্গে এত বড় নির্ম্মম বিশ্বাসঘাতকতা! এরিই নাম রাজা? একেই দেবতার মত ষোড়শোপচারে পূজা করিতে প্রজা বাধ্য?—কখনও নয়! কখনও নয়! কিছুতে না! রাজা যিনি, তাঁর ব্যক্তিত্ব নাই, পরের সুখের হন্তারক হওয়া দূরের কথা, নিজের সুখদুঃখ দেখিবারই বা অধিকার তাঁর কোথায়?—আত্মপরায়ণের রাজা হওয়া সাজে না। যে রাজা প্রজার জন্য নিজেকে বঞ্চিত করিতে পারে না, নিজের শান্তি, নিজের স্বার্থ খুঁজিয়া বেড়ায়, সে রাজবেশী প্রজা-শত্রু,—প্রজা তাকে রাজপূজা দিতে বাধ্য নয়,—বাধ্য নয়!—

দিব্যোকের রুদ্ধ বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল—"মহীপালদেব! আজ থেকে তুমি আমার রাজা নও; শত্রু!—শত্রু! মহাশত্রু! এত বড় সাঙ্ঘাতিক শত্রু পৃথিবীতে কেউ কারু থাকে না। তুমি আমার তেমনুই শত্রু!—তোমার এই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করবার সময় এসেছে, এ আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্চি। মহীপাল! একদিন তোমার পূর্ব্বপুরুষ গোপাল-দেবকে এই প্রজারাই তাদের রাজা ব'লে বেছে নিয়েছিল, আর আজ তারাই আবার ছেঁড়া কাপড়ের মত তোমায় তাদের গা থেকে টেনে নিয়ে আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।—পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। যারা গড়তে জানে, তারা ভাঙ্গতেও পারে।"

দিব্যোকের বহু দিনের অ-সংস্কৃত ঘরদ্বার বর্ষা শেষ হইতেই এবার নূতন করিয়া সংস্কৃত হইতেছিল। ইহার গায়ে গায়ে বাঁশের খুঁটা দিয়া ভারা-বাঁধা, ক্ষেতখোলার এক ধারে চুণ পোড়ান ও ইট-গড়া হইতেছে, ভাঙ্গা কোঠা ঘরগুলি মেরামত ও নূতন দুই একখানি তৈয়ারী হইতেছিল। দিব্যোক বাড়ী ফিরিয়াই মজুরদের ঐ সকল ভারার বাঁশ খুলিয়া ফেলিতে

আদেশ দিল। তার পর ভাইপোদের ডাকিয়া বলিল, "চূণের ভাঁটায় ও ইটের পাঁজায় কলসী কতক জল ঢেলে আগুন নিবিয়ে দে।"—এক জনকে বলিল "ভীমকে এক্ষনি ডেকে আন।" তারপর তাদের বৃহৎ অঙ্গনের এ মুড়া হইতে ও মুড়া পর্য্যন্ত পদচারণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাড়ীর লোক সকলেই একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এ গৃহের গৃহস্বামী সাধারণতঃ সদানন্দ মহাদেব। কিন্তু এই সদাশিবও যখন বিচলিত হন, সে দিন মহারুদ্র রূপ ধরেন, এটা সবাই না জানুক, কেহ কেহ জানিত।

ভীম আসিয়া জ্যেষ্ঠতাতের চরণ বন্দনা করিল। গভীর যন্ত্রণার একটা অকথ্য জ্বালাভরা ক্ষতচিহ্নে তার সমস্ত শরীর মন চিহ্নিত হইয়া উঠিয়াছিল। স্নেহময় জ্যেষ্ঠতাত তাহাকে দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

"আমি কোথায় গিয়েছিলেম,—জানো ভীম?"

ভীম বারেকমাত্র তার ভীম গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল, কহিল—"জানিনা"—

"রাজবাড়ী—রাজার সঙ্গে দেখা করতে।"

ভীমের বিস্ময়স্খলিত কণ্ঠ হইতে নির্গত হইয়া পড়িল, "রাজার সঙ্গে দেখা করতে? কেন?"

"হ্যাঁ, রাজার সঙ্গে দেখা করতে—বিচার চাইতে গেছলেম—ন্যায়বিচার! সকল প্রজার অবশ্য প্রাপ্য ন্যায় বিচার! কিন্তু সে বিচার কার কাছে চাইতে গেছলেম জানো, ভীম?—যে নিজে অপরাধী, তার কাছে। এ মন্দ প্রহসন নয়!—কি বল? দোষী—নিজের সম্বন্ধে নিজের ন্যায়বিচার করবে!—হায়রে!"

ভীম এবার অতি সহজভাবেই মুখ তুলিল, স্থির অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, "এ আমি জানতেম।"

"কি তুমি জান্‌তে?"—দিব্যোক চমকিয়া উঠিল।

"আপনার বিচারকই যে অপরাধী, তা আমি জানতেম,—মহাপ্রতীহার তাঁর আজ্ঞাবাহক মাত্র।"

"তুমি জান্‌তে? কৈ, কিছুই বলনি ত?—কেমন ক'রে জেনেছিলে?"

ভীম ঈষৎ হাসিল, অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ চমকিলে যেমন দেখায় তেমনই তাহাতে তার মনের অন্ধতমিস্রা রাশি ঈষন্মাত্রায় প্রকাশ পাইল।

"বলিনি,—না বলিনি,—কিন্তু বল্লেই কি আপনি তা' বিশ্বাস করতে পারতেন?"

দিব্যোক ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিল,—"হয়ত পারতেম না। রাজা প্রজার রক্ষাকর্ত্তা, জননাথ, দোষীর দণ্ডদাতা, প্রত্যক্ষ পরমেশ্বরস্বরূপ, তাঁর যে আবার এত বড় অনাচার—এত বড় অত্যাচার থাকতে পারে, এ আমার স্বপ্নেরও অতীত!"

ধীরকণ্ঠে ভীম কহিল, "কিন্তু রাজাও ত মানুষ! মানুষের দুর্ব্বলতা রাজা ব'লে তাকে—"

দিব্যোক অধীর স্বরে বাধা দিল,—অস্থির হইয়া কহিল, "বল কি, ভীম! রাজা মানুষ? না, না রাজা,—রাজা! রাজার ব্যক্তিত্ব নেই, সুখ দুঃখ নেই, দুর্ব্বলতা থাকতে পারে না। তাই যদি না হলো, তবে কিসের জন্যে তিনি সমস্ত দেশের মাথার উপর ব'সে থাকেন? কি অধিকারে সমস্ত লোকের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা উপার্জ্জনের প্রধান অংশ ভোগ করেন? দুর্ব্বল, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, স্বার্থান্ধ, ক্ষুদ্র মানুষই যদি তিনি, তবে কেন আমরা তাঁকে আমার চেয়ে অতখানি উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠা ক'রে পূজার অঞ্জলি প্রদান করি? না, সে হ'তে পারে না, সে হ'তে দেওয়া হবে না, হয় তিনি তাঁর সমুদয় জাগতিক দুর্ব্বলতাকে পরিহার ক'রে পৃথিবীর মলামাটীর উর্দ্ধে উঠুন,—না হয় তাঁর পঙ্কিলতার ঘূর্ণাবর্ত্তে প'ড়ে নিমজ্জিত হয়ে যান। এ দেশের আদর্শ রাজা ভগবান রামচন্দ্র, কর্ণ, যুধিষ্ঠির, শিবি, নিমি,

মান্ধাতা, চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত স্কন্দগুপ্ত, অশোক, হর্ষবর্দ্ধন গোপাল, ধর্ম্মপাল, দেবপাল, এমন কি, প্রথম মহীপালও ; যাঁরা প্রজার চিত্তে চিরদিনের মতই পূজার আসন পেতে রেখে দিয়ে গেছেন।—সেই দেশে এই রাজা ?—ভীম ?”

“জ্যেঠামশাই !”

“আমি তাকে কি ব'লে এসেচি জানো ? ব'লে এসেছি, আজ থেকে সে আমাদের, এবং আমরা তার মহাশত্রু !”

“কিন্তু যদি কেউ স্বেচ্ছায় কারু অনুগমন করে, তা'তে তাকেই প্রধান অপরাধী ধ'রে নিয়ে বিচার করতে গেলে সুবিচার কেমন ক'রে করা হবে ?”

দিব্যোক ভীমের এই সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ় অভিব্যক্তিতে বিস্ময়ে পুনশ্চ চমকিয়া উঠিল, ক্ষণকাল বিহ্বল দৃষ্টিতে প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রের অচঞ্চল মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ঈষৎ বেদনার্ত্ত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “স্বেচ্ছায় অনুগমন করা তুই কাকে বলচিস্ রে পাষাণ ? তুই কি তাকে চিনিস নে ? সে স্বেচ্ছায় তোকে ছেড়ে গেছে, এত বড় কথা তুই মনে করতে পারলি ?”

তার পর তথনও ভীমকে অবিচলিত দেখিয়া গভীর বিদ্ধ বেদনায় ব্যাকুল কণ্ঠে আর্ত্তনাদের মত করিয়া কহিয়া উঠিল,—“ওরে নিষ্ঠুর মায়ের নির্ম্মম ছেলে ! তুই এত দিন একসঙ্গে ঘর ক'রেও তাকে চিন্‌লি নে ? আমি শিব ভবানীর পা ছুঁয়ে তোকে বলতে পারি, যে সে নিজের ইচ্ছায় যায়নি,—যায়নি,—যায়নি।—কোন রকম চাতুরী ক'রেই তাকে তারা ধ'রে নিয়ে গেছে !”—ঈষৎমাত্র থামিয়া থাকিয়া পুনশ্চ নিরুদ্ধ অভিমানের সহিত কহিয়া উঠিল, “তোর যদি তাই মনে হয়ে থাকে, তোর ঘরে তাকে ঠাঁই দেবার কিচ্ছু দরকার নেই, আমি তাকে বুকে ক'রে নিয়ে কাশীবাসী হয়ে থাকবো। তুই যদি বাপের সুপুত্র হোস্ ভীম !—শুধু আমায় তাকে

এনে দে, যেমন ক'রে পারিস,—যদি এর জন্যে সমস্ত রাজ্যকে ধ্বংস ক'রে ফেলতে হয়, সে ও সই, তবু তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে এনে দে! ওরে বল্, তুই পারবি ?"

স্নেহময় জ্যেষ্ঠতাতের চরণপ্রান্তে নত হইয়া ভীম কহিল, "পারবো"—

তার কঠিন কণ্ঠে কঠোর প্রতিজ্ঞার এই একটী বাণী এক অশনি-সম্পাতের মতই ভীষণ শুনাইল।

ভীমকে বিদায় দিয়া একটা নির্জ্জন কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িয়া এতক্ষণের সেই রুদ্রতেজে তেজোদীপ্ত মূর্ত্তি বৃদ্ধ এক্ষণে একটি মাতৃ ক্রোড়চ্যুত ক্ষুদ্র শিশুর মতই অসহায় আর্ত্ত রোদনে মূক মৌন প্রকৃতিকে শুদ্ধ যেন অশ্রুভারে আতুরা করিয়া তুলিয়া একবারে হা হা শব্দে কাঁদিয়া উঠিল,—"ওরে মা মা আমার! ওরে মা আমার! তোর ভাগ্যে এ ও ছিল রে ?"

দশম পরিচ্ছেদ

সংসারের চারিদিক্ শ্রান্তিহরা শান্তিতে ভরাইয়া দিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে—অতি ধীরে বিস্তৃত হইতেছিল। জনশূন্য নদীতীরে অস্তগমনোন্মুখ রবির আলো ম্লান মূর্চ্ছাতুরের মত করুণ দেখাইতেছিল। যেন কার অজস্র রোদনারক্ত নেত্রের মতই তপনের স্তিমিত করুণ মূর্ত্তিটি ক্রমশঃ দিক্চক্রের প্রান্তশায়ী হইতেছে এবং জলে স্থলে চরাচরের সর্ব্বত্রই একটা সুগভীর শ্রান্তি ও অবসাদের খিন্ন ছায়া আপতিত হইয়া উহাকে যেন বাক্যহীন ও শোকাহতবৎ প্রতীয়মান করাইতেছে।

রাজ-বিলাসভবনের সেই সুবৃহৎ সুসমৃদ্ধ প্রশস্ত শয্যাগৃহের বাতায়ন-পার্শ্বে আজিও উজ্জ্বলা একাকিনী বসিয়া আছে। অঙ্গে তার ভারত-রত্নসম্ভারের সারভূত মহামূল্য মণিরত্নের অলঙ্কার ; পরিধানে বারাণসীজাত

শিল্প-চাতুর্য্যের সারভূত বালার্ক-সদৃশ বর্ণ ও তেমনই ঔজ্জ্বল্য সংযুক্ত মহামূল্য ক্ষৌমবাস। এই অনন্যসাধারণ বেশভূষায় তার অসাধারণ রূপ লাবণ্য যেন সহস্র গুণে বর্দ্ধিততর হইয়াছিল, সে যে সেই সামান্য বেশী গৃহস্থ-বধূ উজ্জ্বলা, কার সাধ্য আজ তেমন কথা মনেও স্থান দিতে পারে!

আর শুধু রূপেই নহে, উজ্জ্বলা—এই অশ্রু-আঁখি, নতমুখী উজ্জ্বলা যে সেই গর্ব্বিতা তেজস্বিনী উজ্জ্বলা, এ কথাও আর মনে করিবার কিছু বাকি নাই! আজ রাজরাণীর আসনে বসিয়াও সে যেন একটা কাঙ্গালিনীর মতই দীনা, আর এত দিন সামান্য ঘরের বধূ হইয়াও সে যেন একটা রাজরাজেন্দ্রাণীর মতই দীপ্তিমতী ছিল। হায়, অশ্রুসাগরে সাঁতার দিয়াও সে যে আজ তার চারিদিকে এতটুকু একটু কূলের রেখাও দেখিতে পাইতেছে না! হাহাকারে বুক তার ফাটিয়া পড়িলেও কোথাও তার জন্য এক বিন্দু সান্ত্বনা নাই যে।

একাকিনী বসিয়া বসিয়া নিজের সমস্ত অতীতটাকে এই মহাশূন্য বুকটার মধ্যে জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরা—এই একমাত্র সম্বল লইয়াই উজ্জ্বলার দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি কাটিয়া গেল। আর সে কি দীর্ঘতর দিবা-রাত্রি! উজ্জ্বলা আজও তার স্বামীর কথাই ভাবিতেছিল। হতভাগিনী সে, তেমন স্বামীকেও হারাইয়া ফেলিল! কে জানে, সেখানে তার এই নিরুদ্দেশ লইয়া কতই না সত্যে মিথ্যায় জল্পনা কল্পনা চলিতেছে? এই যা ঘটিয়া গেল, ইহা কি কেহ ঘূণাক্ষরেও জানিতে পারিয়াছে? সম্ভব ত মনে হয় না! আর যদিই বা জানিতে পারে, তাতেই বা কি? সামান্য প্রাণী তারা, কোন্ ভরসায় এই প্রবল-প্রতাপ সাম্রাজ্যপতির সঙ্গে বিরোধ করিতে আসিবে? তার পর কেহ কি বিশ্বাস করিবে যে, সে নিজের ইচ্ছায় গৃহত্যাগিনী হইয়া এখানে আসে নাই? এমন বিরুদ্ধ প্রমাণ পাইয়া এমন অবিশ্বাস্য কথা কেহ কি বিশ্বাস করে? আর বাস্তবিকই কেহ ত তাহাকে

বলপ্রকাশ করিয়া ধরিয়া আনেও নাই। সে ত ইচ্ছা করিয়াই একজন অজানা—অচেনা স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া সাগ্রহে—সানন্দেই অপরিজ্ঞাত শিবিকায় চড়িয়া বসিয়াছিল। এমন অবিমৃষ্যকারিণী, কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানহীনা না হইলে তার এত বড় দুর্গতিই বা ঘটিবে কেন?

আচ্ছা, যদিই কোনমতে উজ্জ্বলার উদ্ধার হয়, আর কি উহারা উজ্জ্বলাকে তাদের ঘরে লইবে? সম্ভব বোধ হয় না। তার অপরাধ যতই যা হোক্ বা না হোক্, সমস্ত অপরাধটাই ত তারই ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসিবে? কলঙ্কিনী বলিয়া হয় ত উহারা তাকে তাদের দ্বারেও বসিতে দিবে না। আচ্ছা, সত্যই কি অতটা পারিবে? উজ্জ্বলা যদি দাসী হইয়া সেখানে থাকিতে চায়? তাতেও কি তাহাকে একটু স্থান দেয় না? সে না হয় ওদের ঘর ঝাঁট দিবে, বাসন মাজিবে, গোবরনাদি দিবে, গোয়াল কাড়িবে, তবু ত তার স্বামীর মুখখানি সে দিনান্তে একটীবারও দেখিতে পাইবে? এইটুকুর জন্য সে যে সবই সহিতে পারে। না, না, তা সে পারিবে না! না, পারিবে না তো কি? পারিবে বই কি! পারিতেই হইবে। কিন্তু তার স্বামী যদি তারই সাক্ষাতে আর এক জনকে বিবাহ করে? সে সেই অসহন দৃশ্য সহিতে পারিবে কি? ওঃ! মা ভবানি! কি অপরাধে তার এমন দুর্দ্দশা ঘটাইলে, মা? সে ত জানিয়া শুনিয়া তোমার পায়ে এ জন্মে কোন অপরাধই করে নাই, তবে সকল মেয়ের যাহা হয়, তার কেন তাহা হইল না? সে স্বামীর পায়ের গোড়ায় একটুখানি স্থান লইয়া এ জন্মটা কেন সেই ঘরেই পড়িয়া থাকিতে পাইল না? এ কি হইল? তার এ কি হইল? মা! এমন পাষাণী তুমি কেন হইলে মা? হায় মা!

একবার সহসা উজ্জ্বলার মনে পড়িয়া গেল, শাশুড়ীর সেই অসহ্য গালাগালি! তার চোখ দিয়া হু হু শব্দে জল পড়িতে লাগিল। "মা হরে

সন্তানের দুঃখ না বুঝে বড় যা' তা ব'লে যেতিস, সেই গুরুজনের শাপ লেগেই আজ আমার এমন দশা গো! ও মা, নিজে সতীলক্ষ্মী হয়ে এ কি অভিশাপ দিলি মা! ছি ছি, কি কর্লি মা! কি কর্লি!—তবে সেই যে সে দিন মরণকে ডেকেডুকে আমায় নিয়ে নিতে বলেছিলি, সেই গালটাই বা তোর ফল্লো না কেন? তাই হোক্ গো, তাই হোক্! আমায় তোরা নিয়ে নে' গো মা! কে কোথায় আছিস্, নে' গো!—ওগো! দয়া ক'রে তুলে নিয়ে যা,—আর যে আমি পারিনে গো!"

উজ্জ্বলা মাটীতে পড়িয়া মাথা কুটিতে কুটিতে অজস্রধারে কাঁদিতে লাগিল, আর আর্ত্তস্বরে ডাকিতে লাগিল,—"হে মা ভবানি! যদি তুই যথার্থ সতীর মেয়ে সতী হোস, তবে আমায় সতী নাম নিয়ে যেন আমি যেতে পারি। মা তারাদেবি! রোগ-মন্তি ত তোমারই হাতে, আমায় এমন রোগ পাঠিয়ে দে' গো মা, যাতে ক'রে আমার তিন সীমানায় কেউ না ঘেঁষতে পারে। মরণ যদি না আসে ত রোগে যেন আমি জেরে পড়ি!"

অন্ধকারে পথভ্রষ্ট পথিক তার হারানো পথরেখা খুঁজিয়া পাইলে যেমন ফিরিয়া দাঁড়ায়, উজ্জ্বলা তেমনই করিয়া সহসা যেন আশা প্রফুল্ল মুখে চমকিয়া উঠিয়া বসিল। ঠিক ত! এত ভাবনাই বা কিসের? আর কিছু না থাক, মৃত্যু ত এখনও তার সহায় আছে! না হয় সে মরিবে, এর বেশী আর ত কিছুই নয়? তবে দুঃখ এই যে, তার স্বামী হয় ত সে সংবাদটা কোন দিনই জানিবেন না, আর সমস্ত জগতের লোক জানিয়া রাখিল যে, উজ্জ্বলা অসতী!

তথাপি এই একমাত্র পথ, এই একটিই উপায় তার হাতে আছে, আর সে তাহাই বাছিয়া লইবে, এ ভিন্ন ত আর কোন উপায়ই তার নাই!

উজ্জ্বলা উঠিয়া দক্ষিণের জানালার ধারে আসিল, ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে

বিশেষ কিছুই দেখা যায় না, শুধু দেখা গেল, এই গৃহের পরেই দৃঢ় উচ্চ প্রাচীরের কঠিন বেষ্টনী।

এ কি? এত অলঙ্কার তার অঙ্গে কেন? নড়িলে চড়িলে এক একটা মণি রত্ন বিদ্যুৎপ্রভায় জ্বলিয়া উঠিতেছে যে! এ সব তাকে কে পরাইয়া দিল? নিশ্চয়ই সেই দূতীটা! উজ্জ্বলা একে একে সবগুলি খুলিয়া খুলিয়া টান মারিয়া ঘরের এক দিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। ছি ছি, এ কি ঘৃণা! নিজের গায়ের দিকে চাহিতেই শোণিত-রক্ত সূক্ষ্ম সাড়ীখানা চোখে পড়িল। সধবার সুন্দর চিহ্ন! হাতে পূর্ব্বেকার সেই রাঙ্গা শাঁখা আর এই সাড়ী! তার মনে হইল, ইহা যদি তার স্বামীর দান হইত! চারিদিকে চাহিয়া নিজের পরিত্যক্ত বস্ত্র না পাইয়া সে হতাশ হইল। তখন ঘর হইতে বাহির হইবার চেষ্টায় দ্বার খুলিতে গিয়া দেখিল, সে দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ, এই ঘরে সে তবে সত্য সত্যই বন্দিনী!

তবে ত এখান হইতে পলায়ন করা অসম্ভব! দূতী আসিলে তাহাকে তার পরিত্যক্ত রত্ন সম্ভারের লোভ দেখাইল, তার পায়ে ধরিল, তাহাকে জঘন্য গালি দিল, কিছুই ফল হইল না। যত কিছুই বলে, উত্তর শোনে, "ও সব এখন দুদিন মনে হবে, মা! এর পরে আর সেই ভাঙ্গা ঘরখানা দেখলেও চিন্‌তে পারবে না! কথায় বলে যে রাজরাণী,—সেই রাজরাণী হয়েছ মা! তবে রাজাধিরাজ এ ক'দিন কেন জানি না আসতে পারেন নি, তাই মন লাগচে না বুঝি? এই আজকে এলেন ব'লে! তা দেখ মা, তখন যেন আমাদের একেবারে ভুলে যেও না।"

গভীর বিরক্তি-তিক্ত বড় হতাশ চিত্ত মন লইয়া উজ্জ্বলা ইহাদের সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া আসিল। নাঃ, তবে তাহাকে মরিতেই হইবে! সে যে তার সমস্ত জীবন দিয়া এই পৃথিবীকে ভালবাসিয়াছিল। এই পৃথিবী যে তার প্রিয়ের স্থিতি-গৌরবে গৌরবান্বিত! তাঁর স্মৃতি সুখে

সুখময়! এ জগতের আলো হাওয়া সে যে তার কত আশার, কতই আনন্দের—এ সবই কি আজ এই একান্ত অসময়ে বিদায় দিতে হইবে? তৃষিত বাসনায় বুক যে তার আজও অপরিতৃপ্তিতে ভরিয়া আছে, সকল তৃষ্ণাই কি তার চিরদিনের জন্য অতৃপ্ত রহিয়া গেল? এ কি নিদারুণ পরিণাম? হে বিধাতা! হে নিষ্ঠুর! এমন করিয়াই কি তার শত বাসনার জাল কঠিন চরণাঘাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া ছিঁড়িয়া দিতে হয়?

নির্জ্জন প্রাসাদ কক্ষে গন্ধ-দীপ জ্বলিয়া উঠিল, পুষ্পবাসে, ধূপগন্ধে, চন্দনচূর্ণ সুবাসে কক্ষ বায়ু প্রমত্ত হইয়া পড়িল, মহারাজাধিরাজ কক্ষ প্রবিষ্ট হইলেন; ডাকিলেন—"উজ্জ্বলা!"

উন্মুক্ত গবাক্ষপথে মেঘাপসৃত অপ্রচুর নক্ষত্রালোক অতি ক্ষীণভাবে কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তার উপর উজ্জ্বলা তেমনই সুন্দর, তেমনই বিবর্ণ, তেমনই করিয়াই পড়িয়া আছে। রাজাধিরাজ নিঃশব্দে যন্ত্রচালিতের মত তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মুখে তাঁর কথা সরিল না, শুধু নির্নিমেষ চক্ষে ভূ-লুণ্ঠিতা সুন্দরীর শোকাহত মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

বর্ষণ পূর্ব্বের শ্রাবণ মেঘের মতই অপর্য্যাপ্ত মুক্ত কেশজালে অর্দ্ধাবৃত মেঘজাল-সমাচ্ছন্ন চন্দ্রকরলেখার ন্যায় সেই অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি ও তার সেই অকথ্য যন্ত্রণা, সে যেন চোকে দেখা যায় না! রাজার বোধ হইল, নিখিলের শোক একত্রিত হইয়া যেন তাঁর এই পাদমূলে জমা হইয়া পড়িয়া আছে। ইহাকে লইয়া কি করা যায়? কি বলিয়া ইহাকে সম্বোধন করিবেন? রাজাধিরাজ যেন একটুখানি সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গেলেন, এ রকমটা যেন তিনি প্রত্যাশাই করেন নাই।

ধীরে ধীরে নিকটস্থ হইয়া কুণ্ঠিত মুখে পুনশ্চ ধীরে ধীরে ডাকিলেন, "উজ্জ্বলা!"

উজ্জ্বলা মুখ তুলিল না, উপুড় হইয়া পড়িয়া তেমনই অব্যক্তস্বরে গভীর

বিষাদে বুক ফাটা হতাশায় লুটিয়া লুটিয়া কাঁদিতে লাগিল, দারুণ দুঃখে যেন বুক তার ফাটিতেছিল।

"উজ্জ্বলা! কেন কাঁদ? শুনলেম, এ কয় দিন জলস্পর্শ করনি,—এত কি দুঃখ? তুমি যা ছিলে, আমি কি তোমায় তার চেয়ে শতগুণ সুখে রাখি নি? এ কি! গায়ে তোমার অলঙ্কার মাত্র নেই কেন? খুলে ফেলেছ? এই যে সব ছড়িয়ে প'ড়ে! এস, নিজের হাতে পরাবো ব'লে আজ এই মরকতের অপূর্ব্ব অমূল্য হার পট্টমহাদেবীর কাছ হতে নিয়ে এসেছি, ঐ শ্বেতপদ্মের মত সুন্দর বুকের উপরেই এর প্রকৃত শোভা! ছিঃ, অত ক'রে কাঁদে কি? উঠে বসো, আমার পানে চেয়ে দেখ। তোমায় আমি ভালবেসেছি, বড় ভালবেসেছি, এমন আর কারুকে—হ্যাঁ, এখন এ পৃথিবীতে জীবিত কারুকেই বাসি না। একটা কথা কয়ে আমায় একটুখানি আশা দাও।"

"আমায় ছোঁবেন না, রাজা!—আমি পরের বউ, আপনার প্রজার বউ—কেন আমায় ছল চাতুরী ক'রে আপনি ধ'রে আনালেন?—আমার যে সব ফুরিয়ে গেল!"

উঠিয়া বসিয়া কাতরকণ্ঠে এই কথা বলিয়াই—উজ্জ্বলা আবার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রাজাধিরাজ তার একখানা হাত জোর করিয়া টানিয়া লইয়া নিজের উভয় হস্তের মধ্যে সাগ্রহে ধারণ পূর্ব্বক সহাস্যে কহিলেন, "কেন ধ'রে আনালেম? সে তোমার ঐ আকাশের বিদ্যুতের মত আশ্চর্য্য দাহকারী রূপকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ! কেন তুমি অত রূপের পসরা নিয়ে আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালে? সেই থেকে তোমায় ত আর ভুলতে পারিনি।"

"ওগো, সে কি আমার দোষ? ওগো, পোড়ামুখো বিধাতা তবে

এমন ছাইয়ের রূপ আমায় দিলে কেন গো? সে কি শুধু আমার মাথা খেতে?"

এই কথা বলিতে বলিতে উজ্জ্বলা উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া উঠিয়া গিয়া ইতস্তত: চাহিয়া একটা সুবর্ণের পুষ্পাধার দেখিতে পাইয়া তাহাই তুলিয়া লইল ও নিজের কপালের উপর উপর্যুপরি সজোরে তাহারই দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল, আর হাহাকার করিয়া বলিতে লাগিল, "হে মা ভবানি! হে মা ভবানি! আমার এই ছাই পাঁশ রূপ তুমি ফিরিয়ে নাও মা! ফিরিয়ে নাও,—ও মা, এমন ছাইয়ের রূপে আমার দরকার নেই গো,—আমি চাইনে!"—

রাজাধিরাজ এই অভাবনীয় কাণ্ডে প্রথমটা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেও ক্ষণপরে আত্মসংবৃত হইয়া উঠিয়া দ্রুতপদে আসিয়া উজ্জ্বলার হাত হইতে সেই রক্ত-চিহ্নিত স্বর্ণপাত্র কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, তার পর সবলে তার হাত চাপিয়া ধরিয়া সরোষে কহিয়া উঠিলেন, "তোমার সকলই বাড়াবাড়ি! জল তুলে, বাসন মেজে, দুঃখে কষ্টে মরছিলে, আমি তোমায় তার বদলে রাজরাণী করতে এনেছি, সে আবার পছন্দ হচ্চে না! ফে[illegible] যদি এ রকম অভদ্র কাণ্ড করবে ত এমন শিক্ষা দেব যে, তখন [illegible]তে পারবে। উঃ! রক্তে যে সব ভেসে গেল! এমন ঘ্যানঘেনে একটা অসভ্য মেয়েমানুষকে এমন আশ্চর্য্য রূপ দেওয়া স্থষ্টিকর্ত্তার বিড়ম্বনাই বটে!—কি বিপদ্!—একে নিয়ে ত মহা সমস্যায় পড়েছি দেখচি!"

"রাজাধিরাজ! রাজাধিরাজ! ওগো, আপনার দুটি চরণে পড়ি গো! —দয়া ক'রে আমায় ছেড়ে দিন, আমি আমার সেই কুঁড়ে ঘরেই ফিরে যাই।—আপনার অভাব কি? কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে আপনার চরণ সেবা করতে পেলে বত্তে যাবে।"

"তবে তুমিই বা যাবে না কেন শুনি? সে হচ্চে না। শোন উজ্জ্বলা!

মাথাই ফাটাও, আর কেঁদে কেটে প্রাণই বার করো, তোমায় আমি কিছুতেই ছেড়ে দেব না। আর দিলেই কি তারা এখন তোমায় ঘরে নেবে মনে করেচ ?"

উজ্জলা রাজার পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া তাঁর দুই পা দু হাতে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, এই কথায় সে পা দুখানা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া বসিল। তার ললাটের ক্ষত হইতে রক্তধারা তখনও ক্ষীণধারে বহিতেছিল, সেই রক্তে রাজাধিরাজের পদদ্বয় রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল। ঊর্দ্ধে মুখ তুলিয়া রাজার মুখের দিকে স্থির ভয়লেশহীন কঠিন চক্ষে চাহিয়া সে এবার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত সহজ স্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় আপনি তাহলে কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না ? তারা আমায় নেয় না নেয়, আমি তাদের দোরে বসেই কাটাতুম, না হয় আঁস্তাকুঁড়ই ঝেঁটোতুম, সে-ও আমার আপনার এই ঐশ্বর্য্যের চাইতে ঢের বেশী সুখ, এতেও আমার সে সুখটুকুন থেকে আপনি জোর ক'রে আমায় বঞ্চিত করতে চান ?—আপনার পরাণে কি একটু দয়াও হয় না ?"

রাজাধিরাজ নিকটস্থ পর্য্যঙ্ক শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া দুই হাতে উজ্জলাকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া নিজের পাশে জোর করিয়া বসাইয়া মৃদু হাস্যের সহিত কহিলেন, "এ ত গেল তোমার সুখের কথা! আমার সুখের কথাটাও ত আমায় একটু একটু ভাবতে হবে ? তোমায় হাতে পেয়ে ছেড়ে দেব, তত বড় মহাপুরুষ আমি নই, তবে এর পরে, ভবিষ্যতে, নেহাৎই যদি তোমার আমার ঘরে মন না বসে,—কিছুদিন বাদে যদি চ'লে যেতেই চাও, তখন না হয়, ওদের আঁস্তাকুঁড় ঝাঁট দিতেই যেও, কিন্তু তা ব'লে ত আর এখনই তোমায় আমি বিদায় দিতে এত কাণ্ড করেই নিয়ে আসিনি! এখন দু দিন একটু আমার হয়েই দেখ না, ভাল লাগে বা না লাগে—"

"ওগো! মরতে আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না—গো! নেহাৎই আমি বাঁচতে পেলাম না!"—বলিতে বলিতে কাপড়ের মধ্য হইতে একখানা খোলা পাতলা তরবারি টানিয়া লইয়া উজ্জ্বলা তার অগ্রভাগ নিজের বুকের এক পাশে সবেগে বসাইয়া দিয়াই আবার তাহা সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া তুলিয়া আর এক পাশে সজোরে তাহা বিঁধিয়া দিলে তীর-বেঁধা পাখীর মত ব্যাকুলতায় ছটফট করিয়া উঠিল। রাজাধিরাজের দৃঢ় বদ্ধ বাহুপাশ তার অঙ্গ হইতে মুহূর্ত্তে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, তিনি সভয়ে লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর ক্ষিপ্রহস্তে উজ্জ্বলার বক্ষোবিদ্ধ তরোয়ালখানা টানিয়া তুলিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"এ যে মরণ আঘাত! সর্ব্বনাশি! রাক্ষসি!—এই করতেই কি তোকে আমি এত ক'রে এনেছিলাম?"

উজ্জ্বলার কীটে কাটা ফুলের মতই দুঃখ জীর্ণ ও উপবাস শুষ্ক মুখে এই বার জয়ের হাসি সগৌরবে ফুটিয়া উঠিল, সে কহিল,—"আমি ত মরতে চাইনি, রাজা! আপনিই ত আমায় মরতে ঠেলে দিলেন? নৈলে ঘরে আমার অমন দেবতার মতন স্বোয়ামী, আমার কি মরবার কোন দরকার ছিল?"

"উঃ দু' যায়গায় আঘাত লেগেচে, পাঁচ আঙ্গুল গভীর গর্ত্ত হয়ে ব'সে গেছে! নাঃ, এর আর কোন উপায় নেই! ওঃ, এমন ক'রে ম'রে আমায় এ কি শাস্তি দিলে, উজ্জ্বলা?—উঃ, কি করলে!—কি করলে!"

রাজাধিরাজের চোক দিয়া হয় ত বা জীবনে এই প্রথমবার জল পড়িল। এই রক্তমাখা নারীদেহ তাঁর অন্তরের আর একটা জ্বলন্ত স্মৃতিকে সবেগেই আকর্ষণ করিয়া টানিয়া তুলিতেছিল, সে দৃশ্য তাঁর মানসনেত্রে আজও তেমনই সমুজ্জ্বল রহিয়াছিল বটে, কিন্তু সেদিনকার সকল অশ্রু আগুন হইয়া প্রলয়াগ্নি বর্ষণ করিয়াছিল, এমন তুষার গলিয়া জল তো ঝরিতে পায় নাই!

উজ্জ্বলা ধীরে ধীরে পর্য্যঙ্ক হইতে নামিয়া কক্ষতলে শুইয়া পড়িল,—মৃদুকণ্ঠে কহিল "আমার স্বামীকে একবার এ সময়ে দয়া করে যদি—"

"অসম্ভব! উজ্জ্বলা! সে অসম্ভব!—উঃ, এ আমি সহ্য করতে পারচি না!—আমি যাই।—তুমি এমন করবে জান্‌লে আমি তোমায় ধ'রে আনতেম না। ওঃ—অনর্থক কতকগুলো শত্রু তৈরী হলো বৃথাই।—আর কলঙ্কের ভাগী হলেম মাত্র! ওঃ, এ কি হলো! সব মিথ্যা হয়ে গেল!"

রাজাধিরাজ চলিয়া গেলেন। সেই নীরব নিঝুম রাত্রে এই জন-বিরল পুরীর মধ্যে একাকিনী মৃত্যুর প্রতীক্ষায় জাগিয়া পড়িয়া রহিল—উজ্জ্বলা। বাতাসে কক্ষস্থিত গন্ধ-দীপ নিবিয়া গিয়াছিল, আকাশে মেঘের ছায়ায় নক্ষত্রগুলি ক্ষণে ক্ষণে ঢাকা পড়িতেছিল, তাদের ক্ষীণ পাণ্ডুর আলোকে মৃত্যু-পাণ্ডুরতা ধীরে ধীরে মিশিয়া আসিতে লাগিল, আর পাশে পড়িয়া তাহারই মত রক্ত-রঞ্জিত দেহে সহানুভূতি পূর্ণ চিত্তে তার আজিকার একক রক্ষাকর্ত্তা সেই তীক্ষ্ণধার তরবারিখানা শুধু ম্লানমুখে তাহার অবস্থার এক মাত্র সাক্ষী হইয়া রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মানুষ আর কাহার দাস, তাহা ঠিক জানা নাই; তবে সে যে সম্পূর্ণ-রূপেই প্রমাণের দাস, এ কথাটা ভাল করিয়াই জানা গিয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্রে প্রমাণকে ছয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তার মধ্যে বড় প্রমাণ দুইটি—একটি চাক্ষুষ এবং একটির নাম আপ্ত। অনেক স্থলে এই আপ্ত প্রমাণটি আবার চাক্ষুষ প্রমাণেরও উপরে উঠিয়া যায়, এমনও আমরা দেখিতে পাই। বস্তুতঃ, অনেক সময় আমাদের মনে সংশয় জন্মিতে থাকে যে, অজ্ঞের চক্ষু অথবা বিজ্ঞের বাক্য, কোন্‌টি অধিক বিশ্বস্ত?

ভীম যে অবস্থায় পড়িয়াছিল, তাহাতে তার নিজের চাক্ষুষ প্রমাণকে কোন দিক্ দিয়াই খর্ব্ব করিবার প্রয়োজন ঘটিতে পারে নাই বটে, তবে তার অতি বিশ্বস্ত বন্ধুর চক্ষু অথবা অত্যন্ত স্নেহশীল ও সুবিজ্ঞ জ্যেষ্ঠতাতের দৃঢ় বিশ্বাস, ইহার কোন্‌টাকে যে সে প্রাধান্য দিবে বা দিবে না, ইহা লইয়াই তাহাকে গোলকধাঁধায় পড়িতে হইয়াছিল। হরি সে দিন স্বীকার না করিলেও পরে করিয়াছে যে, উজ্জ্বলাকে তার সর্ব্বোত্তম অলঙ্কারবস্ত্রে সাজিয়া হাসিমুখে পাল্কী চড়িয়া যাইতে সে নিজের চোখেই দেখিয়াছে, আবার বাতাসে পাল্কীর ঢাকা খুলিয়া গেলে, নিজের হাতেই সে তাহা তুলিয়া দিয়াছিল। এই খবরটা শুনিবার পর হইতেই ভীমের সমস্ত মনটা যেন একটা গভীর ঘৃণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। উজ্জ্বলার কথা স্মরণ হইলেই তার সর্ব্বশরীর যেন বিতৃষ্ণায় শিহরিয়া উঠিতে থাকে। এই পরপুরুষের অভিলাষিণী,—হয় ত মনের মধ্যে একান্ত ভাবে তাহারই অনুরাগিণী স্ত্রীকে সে যে এত দিন ধরিয়া কি একনিষ্ঠ ভাবে ভালবাসিয়া আসিয়াছে সেই কথা মনে করিয়া তার মন যেন পাথরের মত ভারী হইয়া গিয়াছে সে ত দু'দিনের কথা নয়! রাজার সহিত উজ্জ্বলার দেখা সাক্ষাতের পর বৎসর ঘুরিয়া গিয়াছে, এত দিন ধরিয়া তবে ভিতরে ভিতরে এত বড় একটা ষড়যন্ত্র চলিয়া আসিতেছিল? আর এই স্ত্রীকে নিতান্ত নিজের জানিয়া কি গভীর স্নেহেই বুকে তুলিয়া রাখিয়াছিল সে!

অথচ মন বেশীক্ষণ ধরিয়া এত বড় সন্দেহ লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেও তো কই পারে না? উজ্জ্বলা যে এত দিন ধরিয়া তার সঙ্গে নিয়তই প্রতারণা করিয়া আসিয়াছে, সে যে বাস্তবিকই তাকে ভালবাসিত না, বাহিরে মাত্র তার থাকিয়া অন্তরে অন্তরে নিয়তই অন্য পুরুষের ধ্যান করিয়া গিয়াছে, এ কথাও যেন মনকে কোনমতে বিশ্বাস করানো যায় না। উজ্জ্বলা—তার উজ্জ্বলা—তার সেই দীপ্ত তেজ—সে যে সতীতেজ নয়, অতি হীনচরিত্রা

নারীর মতই তাহা মুখরতা মাত্র, তার সেই অকৃত্রিম ভালবাসা, তার মধ্যে যে এত বড় ছলনা ঢাকা দেওয়া ছিল, এ যে মনে করিতেও পারা যায় না! উজ্জ্বলা সতী নয়, স্বয়ং দেবতা আসিয়া এ কথা বলিলেও যে ভীম সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিত না।

এই উভয় সঙ্কটের মহাসমস্যার মধ্যে পড়িয়া ভীম যখন হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, ঠিক এমনই সময়ে তার প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ পূজ্য পিতৃব্য তার মানসিক বিপ্লবের যেটুকু বা বাকী ছিল, তাহারই পূরণ করিয়া দিয়া আর একটা ঘোরতর সমস্যা তুলিয়া দিলেন।

"তুই কি তাকে চিনিস্‌নে? স্বেচ্ছায় সে তোকে ছেড়ে গেছে, এমন কথা তুই মনে করতে পার্‌লি?"

বজ্রের মতই এই কঠোর তিরস্কার ভীমের সংশয় দোলায়িত বুকের উপর পড়িয়া তাহাকে যেন একেবারেই স্তম্ভিত করিয়া দিল। সে কি তাহাকে চেনে না? এই যে দীর্ঘকাল ধরিয়া দুইটি প্রাণী অনন্য-সহায় হইয়া পরস্পরকে লইয়া কাটাইল, এত দিনে তাদের পরস্পরকে চিনিয়া লওয়া নিশ্চিতই উচিত ছিল বইকি! তার মনে পড়িল, এক দিন সন্দেহের কারণ সত্ত্বেও উজ্জ্বলা তাহাকে কিছুমাত্র সংশয় করে নাই, সে কিন্তু তার তুলনায় নিজেকে আজ খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছে। উজ্জ্বলা পরপুরুষাভি-লাষিণী নয়, সতী! ভীমের একমাত্র প্রিয়তমা—মনে জ্ঞানে তাহারই। নিশ্চয়ই সে স্বেচ্ছায় চলিয়া যায় নাই, এমন কি, হয় ত হরির সন্দেহ অমূলক,—সে হয় ত কাহাকে দেখিতে কাহাকে দেখিয়াছে। উজ্জ্বলা হয় ত বাঁচিয়া নাই, এত দিন কবে সে মরিয়াছে,—বাড়ীর লোকের অবিচার ও অত্যাচারে অভিমানে দেহত্যাগ করিয়াছে। সে যে বড় অভিমানিনী।

কিন্তু হায়! সংশয়ের বিষ যে বড় তীব্র! তার দহন জ্বালা মন হইতে মুছিতে চাহিলেও যে মুছা যায় না।

ইহার পর যখন সে উজ্জ্বলাকে উদ্ধারের জন্য জ্যেষ্ঠতাতের আদেশ পাইল, তখন এই সম্পূর্ণ বিস্মৃত কর্ত্তব্যটাকে তার মনে পড়িয়া গেল, এটা যে তাহার মনে পড়ে নাই, তাও নয়। আসল কথা, হরির বিশ্বাসমতে যদি সে মহাপ্রতীহারকে উজ্জ্বলার অপহর্ত্তা বলিয়া মনে করিত, নিশ্চয়ই কুমার রুদ্রদমন এতক্ষণ পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিতে বাধ্য হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই কাহিনীর প্রথমেই যে সেই পূর্ব্ব-সূচনার সংযোগ ঘটিয়া ইহার মূর্ত্তি বদলাইয়া গিয়াছিল, তাই উজ্জ্বলার অপহরণ-কর্ত্তাকে চিনিতেও ভীমের ভুল হয় নাই এবং উজ্জ্বলার প্রতি তীব্র সংশয়ের নিগূঢ় অভিমান জ্বালা তার উদ্ধারের কথা এক রকম জোর করিয়াই তার মনের কাছে সে তুলিতে দেয় নাই। যে আপন ইচ্ছায় স্বচেষ্ট আয়োজনে উদ্‌যোগী হইয়াই তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, উহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পিছনে ছুটিবে, এত হীন সে নয়!

কিন্তু যুক্তিটা হঠাৎ এবার বদলাইয়া গেল। দিব্যোকের দৃঢ় বিশ্বাসের জোর হাওয়ায় ভীমের মনের মধ্যের সংশয়-মেঘ যেন সহসা ছিন্ন হইতে আরম্ভ করিল। এই উভয় সঙ্কটের দ্বন্দ্ব তার মনের ভিতর একটা প্রবল বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে থাকিলেও বাহিরে তাহাকে সেই সঙ্গে সমান আয়োজনে ব্যাপৃত করিয়া রাখিল। জ্যেঠামহাশয়ের আদেশ, উজ্জ্বলাকে উদ্ধার করিতে হইবে, যেমন করিয়াই হউক এ কার্য্য তাহাকে করিতেই হইবে। এ তার পক্ষে অলঙ্ঘ্য আদেশ যে!

* * * * *

প্রায় ত্রিশতাধিক কৈবর্ত্ত যুবক বৃদ্ধ ও কিশোর একসঙ্গে গর্জ্জিয়া উঠিল, "এস ভীম! আমরা আমাদের ঘরের বউকে দস্যুর হাত হ'তে কেড়ে নিয়ে আসি,—কিসের ভয়?"

তরুণ-সঙ্ঘের সভ্যদল এই সংবাদ পাইয়া ভীমের চারি পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—"আর কেন? আমাদের কায আরম্ভ হয়ে যাক না? আদেশ দাও কি করতে হবে। আমরা তোমার জন্যে সব করতে প্রস্তুত আছি।"

ভীম কহিল, "কিন্তু হয় ত এই এক সহস্র জীবন আহুতি যাবে। হয় ত এর এক জনও ফিরে আসতে পারবে না।"

তাহারা বলিল, "ক্ষতি কি? এদের মধ্যে অমর হবার আশা ত এক জনও ক'রে না, একবার করে মরতে ত সব্বাইকেই হবে, দুবার ত আর নয়।"

ভীম গভীর আবেগে বক্তাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল।

গভীর অন্ধকার রাত্রির অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া সেই সহস্রাধিক মৃত্যুপণে বদ্ধ নাগরিক উল্কার মত তীব্র গতিতে ছুটিয়া চলিল। এই ক্ষুদ্র অভিযানের অধিনায়ক আজ ভীম। যে তার প্রাণাধিক প্রিয়, তাহারই উদ্ধারের আশায় আজ সে চলিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে তার মনে হইতেছিল, "হায়, সেই যদি চলিলাম, তবে দুদিন আগে গেলাম না কেন?"

নগরী সুষুপ্তিমগ্ন। প্রশস্ত রাজপথের আশে পাশে সঙ্কীর্ণ ও আঁকা-বাঁকা গলীপথ, রাস্তাগুলি অন্ধকারে ভরা—সে সব স্থানে সাবধানে ধীরে চালিত হইতেছিল। রাস্তার পাশে, বাগানের বেড়ায়, ছোট ছোট কুটীর ও ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে পুঞ্জীকৃত অন্ধকার জমাট বাঁধা, চতুর্দ্দিক্ গভীর নীরবতায় ভরা, অথচ যেন সেই নীরবতার মধ্য দিয়া একটা অমঙ্গলের আর্ত্তরব এই প্রত্যেকটি রাত্রিচর প্রাণীর নির্ভীক চিত্তের মধ্যে আসিয়া দ্রুত আঘাত করিয়া যাইতেছিল। মাথার উপর প্রথম শুক্ল পক্ষের অন্ধকার আকাশ স্বল্প-মেঘাবৃত, তারাগুলি মেঘান্তরালপথে জোনাকীর মতই ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ আলো জ্বালাইয়া পরক্ষণে নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছিল। সেই

নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে প্রহরীর মত স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া আছে বড় বড় গাছের শ্রেণী, অথচ মানুষের কোন লাভ-ক্ষতিতেই উহাদের লক্ষ্যমাত্র নাই, এমনই উদাসীন।

ক্রমে সহর ছাড়াইয়া যাত্রীদল মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল। এতক্ষণ কদাচিৎ একটা আলোর রেখা, কদাচিৎ কোথাও বিনিদ্র এক দল লোকের সম্মিলিত মত্ততা সূচক গানের শব্দ শুনা যাইতেছিল, এখন শৃগালের সম্মিলিত রব মাত্রই জাগিয়া রহিল, আর আলোর মধ্যে জোনাকীর। একটা গাছের শাখায় বসিয়া অতি কর্কশ গম্ভীর কণ্ঠে একটা কালপেঁচা ডাকিয়া ডাকিয়া অবশেষে ভীমের মাথার উপর দিয়া সেটা উড়িয়া গেল। গাছের শাখায় ঘুমন্ত পাখীরা সেই শব্দে একটা ভয়ার্ত্ত ধ্বনি করিয়া উঠিল, ভীমের প্রশস্ত বক্ষ চিরিয়া তার উদ্বেগ শঙ্কিত অন্তরেরও অন্তর মধ্য হইতে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া আঁসিল। এই মহাবিপদের করাল ছায়ায় সমাচ্ছন্ন সঙ্কটের পথে চলিতে, পদে পদেই যেন আশঙ্কা ও অমঙ্গল, মূর্ত্তি ধরিয়া আজ দাঁড়াইয়া আছে। কে জানে, এর কি পরিণাম! অবশেষে নদীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস শুনিতে পাওয়া গেল। নদী জল সংস্পৃক্ত শীত শেষের শীতল বায়ুস্পর্শে ভীমের প্রবল জ্বরতাপদগ্ধবৎ জ্বলন্ত ললাট ঈষৎ শীতল হইয়া আসিল। পরিধেয় বস্ত্রে অঙ্গের স্বেদক্রুতি সে মুছিয়া ফেলিল, নদীজলে নামিয়া অঞ্জলি অঞ্জলি জল লইয়া সে নিজের শুষ্ককণ্ঠ আর্দ্র করিল।

সেই সহস্রাধিক বিদ্রোহীর জন্য প্রায় শতাধিক নৌকা নদীতীরের কসাড় ও বেতবনের মধ্যে লুকান ছিল। গুপ্ত স্থানে কয়েক জন লোকও লুক্কায়িত থাকিয়া স্থানের নিশানা রাখিয়াছিল, সঙ্কেত শুনিয়া তাহারা এই এতক্ষণের পর এইবারই সর্ব্বপ্রথম দ্রুত হস্তে আগুন জ্বালিয়া মশাল ধরাইল।

গভীর নৈশ নীরবতার মধ্যে বেগবতী করতোয়ার অশ্রান্ত কলরোল যেন একটা মর্ম্মবিদারক অস্ফুট রোদনরবের মতই করুণ বোধ হইতেছিল, তীরের বটগাছে উৎকট ধ্বনিতে ঝিঁঝিঁ ডাকিতেছিল, এই ভীম-গম্ভীর স্তব্ধ অন্ধকারের রাশির মধ্যে এই একটিমাত্র উল্কালোক তার জমাট বাঁধা অন্ধকারকে তাড়াইতে না পারিয়া যেন তাদের আরও বেশী করিয়া জমাইয়া দিল। উহারই ভিতর যতটুকুর অভাব সে মোচন করিয়াছিল, তাহাতেই কূল প্লাবিনী নদীজলের মধ্য দিয়া এই নীরব নিস্তব্ধ নৈশ অভিযানকে অতি ভয়াবহ দেখাইতেছিল। সে সময় যদি সেই স্বল্পায়তন আলোকিত স্থানটুকুর মধ্যে দৈবাদৃষ্ট ভীমের মুখের দিকে কেহ চাহিয়া দেখিত,—নিশ্চিত ভয় পাইত।

নদীপারে আসিয়া আবার সেই নৌকাগুলিকে তেমনই ঘন জঙ্গলের মধ্যে রক্ষা করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনবাসিগণ অতি সতর্ক অথচ ক্ষিপ্র চরণে এইবার উৎসাহিতভাবে মাঠের আলের উপর দিয়া, নূতন শস্যভরা ক্ষেতের ভিতর দিয়া রাজার নূতন বিলাস কাননের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

সে রাত্রে এই জনহীন প্রান্তর মধ্য স্থিত রাজপুরীতে লোকসংখ্যা এক হাতের অঙ্গুলী গণনার বাহিরে উঠিতে পারে নাই। রাজাধিরাজের এই গুপ্ত বিলাসের অনতিবৃহৎ প্রমোদ-গৃহখানিকে বিশেষভাবেই বন্দীশালার মত করিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছিল। ইহার চারিদিক উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত, একটিমাত্র তোরণদ্বার ভিন্ন অন্য প্রবেশপথ পর্য্যন্ত কোন দিকেই রাখা হয় নাই। তোরণে দুই জন সশস্ত্র প্রহরী মাত্র রাত্রে সতর্ক হইয়া জাগিয়া থাকে, দিনেও দু জন পাহারা দেয়। ভিতরে বন্দিনী স্বয়ং নিজে এবং তাহারই পরিচর্য্যার প্রয়োজনীয়তায় দুই তিন জন মহল্লিকামাত্র। এতদ্ভিন্ন উদ্যানরক্ষী ও উদ্যানপালক জন দুই ঐ উদ্যানের প্রান্তেই বাস করে। যে দিন রাজাধিরাজ এখানে পদার্পণ করেন, সেই দিন অবশ্য ইহার

বিজনতার উচ্ছেদ ঘটে। তাঁর শরীর রক্ষী সেনাদল ও দাসগণ এবং পার হওয়ার প্রমোদ তরণীর নাবিকরা অনেক লোকেই এখানে রাত্রিযাপন করে। সে দিন এই জন-বিরল স্বল্পালোকিত নিরানন্দ রাজকীয় পুরী উৎসবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে।

আজিকার এই মেঘ-মন্দ্রিত বায়ুশূন্য অন্ধকার মধ্যরাত্রে দীপালীর দীপাবলী যেন আকস্মিক ঝঞ্ঝাবাত্যায় একই ক্ষণে নিবিয়া গিয়াছিল, প্রায় দেড় প্রহর রাত্রে সহসা সদ্যো নিদ্রিত অথবা তন্দ্রাচ্ছন্ন রাজপাদোপজীবিগণের ডাক পড়িল। রাজাধিরাজ তখনই নদী পার হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতেছেন। ব্যাপার কি, না বুঝিলেও, এত রাত্রে হঠাৎ অবিশ্রান্ত আসা ও যাওয়ার আদেশে ঈষৎ অপ্রসন্ন চিত্তেই রাজানুগ্রহজীবিগণ রাজাজ্ঞা প্রতিপালনে প্রস্তুত হইল। এই প্রমোদ গৃহে যে আজ অকস্মাৎ অকাল ভীম ঝঞ্ঝার বেশে নির্ম্মম করাল মৃত্যু আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, এ কথা কেহ জানিতেও পারিল না। এ সম্বন্ধে কাহারও সহিত কোন আলোচনা করিবার শক্তি মহীপালের ছিল না, তিনি এখান হইতে একেবারে নিঃশব্দেই প্রস্থান করিলেন।

আর তেমনই নিঃশব্দে ভীমের বাহিনী সেই ভীষণ নিশীথে নীরবে আসিয়াই এই কেলি-কুঞ্জ বেষ্টন করিল এবং অনায়াসেই ইহার অধিকার লাভ করিয়া বসিল।

কিন্তু এই ঘটনা সেই শত শত যুদ্ধকামী উন্মত্ত বীরকে যেমন হতাশ করিয়াছিল, ভীমকে সেই পরিমাণেই বিস্মিত করিতে ছাড়ে নাই। তবে কি উজ্জ্বলা এখানে নাই? মাত্র চারিজন রক্ষক! তবে কি উজ্জ্বলার বন্দী জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়া এখনই স্বাধীন জীবনের আরম্ভ হইয়া গিয়াছে? হয় ত যতক্ষণ ভীম এই অন্ধকার গভীর রাত্রে উজ্জ্বলার উদ্ধারের জন্য প্রাণান্ত হইয়া মরিতেছে, সে তখন স্বর্ণ পর্য্যঙ্কে তার ঈপ্সিতের

কণ্ঠলগ্ন হইয়া সুখনিশা যাপন করিতেছে! সে ত আর কাহারও দ্বারা বলপূর্ব্বক গৃহীত হয় নাই, সে ত স্বেচ্ছা-সুখে সানন্দ চিত্তেই চলিয়া আসিয়াছে।

স্তব্ধ জনবিরল কক্ষে কক্ষে সশব্দ-চরণধ্বনি প্রতিধ্বনিত করিয়া যতই তাহারা অগ্রসর হইতেছিল, ভীমের বুকের মধ্যে ক্ষণে উষ্ণ, ক্ষণে শীতলতর রক্তস্রোত ততই যেন নিশ্চল হইয়া পড়িতে ছিল! আর কেন? কেনই বা সে জ্যেঠা মহাশয়ের এই অসঙ্গত খেয়ালে নিজেকে সম্মত হইতে দিল?—যদি এখনই তার এই দুইটা চোখের উপর উজ্জলার সেই ছবি—যাহা সে কল্পনা করিতেও উন্মাদ হইয়া যায়, তাহাই যদি বাস্তব হইয়া ফুটিয়া উঠে? যদি কঠিন কঠোর তিরস্কারের ভ্রূকুটি করিয়া রাজরাজেন্দ্রাণীর মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া উজ্জলা তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলে, "তুমি এখানে কেন? আমি যাহাকে চাই, আমি যার যোগ্য, আমি সেইখানেই এসেছি,—তাকেই পেয়েছি,—তুমি তা'তে বাধা দাও কেন, কিসের জন্য? কি আছে তোমার?"—তারপর?—

ভীমের বক্ষ সহসা অনিশ্বসিত রুদ্ধ নিঃশ্বাসের গুরু ভারে একখণ্ড পাষাণের মতই কঠিন ও নিশ্চল হইয়া পড়িল, আর অগ্রসর না হইয়া সে সেইখানেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।—ওঃ, এখনও কি আর ফেরা যায় না?

হরি আসিয়া ব্যস্ত স্বরে কহিয়া উঠিল, "বড় সুযোগ ভীম ভাই! ছুটো মাগীকে ঘুম থেকে টেনে তুলে বড় বউয়ের সংবাদ জিজ্ঞেস করতে, শেষে অনেক কষ্টে জানলাম যে, সাম্‌নের ঐ বড় ঘরে তিনি রাজাধিরাজের সঙ্গে যাপন করচেন। শীগ্‌গির এস, তুমি আমি একসঙ্গে দু'জনকার ভব যন্ত্রণা মোচন ক'রে দিতে পারবো। কিন্তু জ্যেঠামশাই,—না,—তিনিও তাঁর গুণবতী বউয়ের গুণটা স্বচক্ষেই দেখুন না!—এই যে এই দিকে পথ।"—

ভীমের সেই গুরুভারাতুর বক্ষ সহসা সমুদ্র-প্লাবনের বেগে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল। হিমায়মান রক্তধারা অসহ্য উত্তাপে ফুটন্ত হইয়া উঠিল, মুক্ত কৃপাণ দৃঢ়হস্তে ধরিয়া সেই প্রদর্শিত দ্বারপথে কেন্দ্রচ্যুত উল্কার বেগেই ঘরে ঢুকিয়া সে বজ্রস্বরে ডাকিয়া উঠিল,—"মহীপালদেব!"—

উত্তরে অতি ক্ষীণ অথচ আনন্দ-তীক্ষ্ণ কণ্ঠের হৃদয়ভেদী স্বরে শুনিল, "এ যদি স্বপন না হয়, তবে এ যে তারই গলা গো? ওগো মা ভবানি! সত্যি কি তবে এনে দিলি মা?"

পূর্ব্বাপর সমস্ত কথা একই ক্ষণে ভুলিয়া গিয়া আত্ম বিস্মৃত ভীম উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল,—"উজ্জ্বলা!"—

উজ্জ্বলা তখন প্রাণপণ শক্তিতে হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—"ওগো, সেই যদি এলে, তবে এত দেরী করলে কেন গো [illegible] আমার যে তোমায় ছেড়ে মরতে মোটে মন ছিল না। শুধু কোন উপ[illegible]ই দেখেই না আমায় অনেক দুঃখেই এমন ক'রে আজ মরতে হলো।"

মশালের তীব্র আলোকচ্ছটায় ভীমের সহিত শত শত [illegible] সমস্বরে উচ্চারণ করিয়া উঠিল, "এ কি! বড় বউ কি আত্মহত্যা করেছে!"

উজ্জ্বলা আবার কাতরস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল,—"ওগো! সে কি আমি আজ সাধ করেই করেছি গো? আমায় তোমরা কাল কেন নিতে এলে না? তা হ'লে কি আমায় আজ মরতে হতো?—একটু আগেও যদি আসতে।"

শতাধিক জিঘাংসা-পরায়ণ রক্ত-পিপাসু রুদ্রমূর্ত্তি বীরের মূর্ত্তি পাষাণের মতই নিশ্চল হইয়া পড়িল, তার মধ্যে ভীমও একজন।

উজ্জ্বলার আসন্ন মৃত্যু তখনই তাহাকে গ্রাস করিয়া লইয়াছে। চন্দ্রের পূর্ণ-গ্রহণকালে তাহাকে যেমন দেখায়,—একটা চন্দ্রাকার বস্তু, কিন্তু চন্দ্রত্ব তাহাতে কিছুই নাই, এ উজ্জ্বলাকেও ঠিক তেমনই দেখাইতেছিল। তার

পরিহিত রক্তবাসে জানা না গেলেও তার সন্নিহিত কক্ষভূমে শোণিত-পঙ্ক জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, তার সুদীর্ঘ কেশদাম শোণিত সিক্ত হইয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, আর সমস্ত দেহ তার অতসী পুষ্পের মতই রক্ত হীনতায় পাণ্ডুবর্ণ। তার সেই বর্ষাকালের নিবিড় জলদের ন্যায় তীক্ষ্ণ কালো চোখের মধ্যস্থ তেমনই বিদ্যুৎপ্রভ সমুজ্জল দৃষ্টি—যার দ্বারা তার উজ্জ্বলা নামের সার্থকতা দেখা যাইত, আজ তারই উপর একটা সূক্ষ্ম জাল পড়িয়া গিয়াছিল। শ্বাস লইবার আর তাহার শক্তিমাত্রও নাই, তথাপি মরণ বলে সবল হইয়া সে এতগুলা কথা কহিয়াছিল, কিন্তু এইবার তার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া গেল।

সকলেই যখন ভূতাহত বা বজ্র স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছিল, তাহারই মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আত্ম-সংযত দিব্যোক অগ্রসর হইয়া আসিল, ধীর অবিচলিত স্বরে সে উজ্জ্বলাকে সম্বোধন করিল, "মা আমার! যাবার আগে শুধু একবার এদের কাছে এই কথাটা স্পষ্ট করে ব'লে যা, মা! তুই কি নিজের ইচ্ছেয় এখানে চলে এসেছিলি? মরবার কালে মিথ্যে কথা বলিসনে বেটি, যা সত্যি ঠিক করে তাই বল।"

উজ্জ্বলার বিবর্ণ মুখ এক নিমেষের জন্য একটা গভীর উত্তেজনায় মত্ত আগুনের শিখার মতই উজ্জ্বল দেখাইল, "কও কথা!—কেউ কি বাঘের গর্ত্তে ইচ্ছে সাধে মাথা গলাতে আসে গা? ওরা যে আমায় ওনার নাম ক'রে পাল্কী ক'রে নিয়ে এলো গো! বল্লে যে,—বল্লে যে,—আপনার— আপনার ছেলে তাঁর খেলা দেখাতে আমায় চুপু চুপু ওর সঙ্গে যেতে বলে,—বলেচে,—আমি এম্‌নই—পাগল—তাই—তাই—তাই—কিনা— বিশ্বাস—ক'রে—ক'রে চ'লে এলাম!—এ তারই প্রাচিত্তির গো!— নৈলে,—আমায়—এমন—ক'রে আজ—মরতে হ'লোই বা—কেন? পাপ না থাকলে—না—থাকলে কি—কি—এমন দশা—কারুর হয়?"

উজ্জ্বলা একেবারে হাঁপাইয়া পড়িল, তার শ্বাস প্রশ্বাস কখনও দ্রুত, কখন স্তিমিত ভাবে উঠিতে পড়িতে লাগিল, গভীর অবসাদ কিছুক্ষণ তাহাকে একবারেই স্তব্ধ করিয়া দিল। মনে হইল, সব শেষ হইয়া গিয়াছে!

দিব্যোক গৃহ মধ্যস্থ স্বর্ণ-ভৃঙ্গার হইতে জল লইয়া বধূর মুখে সেচন করিল, তারপর স্তব্ধ অ-নড় ভীমের ভীম গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"এইখানে ব'সে আমার মায়ের মাথাটা কোলের উপর তুলে নে ভীম! মা'র আমার বড় যন্ত্রণা হচ্ছে, একটু কমতে পারে।"

ভীম একটা প্রাণহীন স্তম্ভের মতই এ আদেশ পালন করিল। একবার মুদ্রিত নেত্র উন্মীলিত করিয়া ভীমের মুখের দিকে চাহিয়া উজ্জ্বলা অতি মৃদু মন্দ সুখের হাসি হাসিল,—"আঃ! এখনও আমি—কি—ভা—ভা ভা—গ্য—ব—তী!—আঃ! আমা—য়—আমায়—ভু—ভুলে যাবে—না—তো?—"

"উজ্জ্বলা! উজ্জ্বলা! তোমার উপর আমি মস্ত বড় অবিচার করেছি,—তারই প্রায়শ্চিত্তে এবার বাকী জীবনটাকে আমার আজ এই মুহূর্ত্ত থেকেই আমি উৎসর্গ ক'রে দিলেম। এ জীবনে আমার এ ছাড়া আর কোন কিছুই করবার বাকী রইলো না, জেনে যাও। শোন, উজ্জ্বলা! আর একটুখানি থাকো, আমার—"

"'প্রায়শ্চিত্তে' নয় ভীম! আমার মায়ের মাথার উপর হাত রেখে বল, প্রতিশোধে। এর কি প্রতিশোধ জানো, ভীম?"

"জানি, মহীপালের ধ্বংস!"

"না,—পালসাম্রাজ্যের উচ্ছেদ"—

দিব্যোকের এই দৃঢ় বজ্র-কঠিন কণ্ঠস্বরকে অনুসরণ করিয়া সমবেত সহস্র

কণ্ঠ এক সঙ্গেই মেঘমন্দ্রে গর্জ্জিয়া উঠিল—"আমরা পাল-সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ চাই—উচ্ছেদ চাই !—"

অসহ্য লজ্জায় ভীমের সকল দ্বিধা যেন সেই মুহূর্ত্তেই চূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। সতীর এ রক্তস্রোত—এ কি বৃথা? সহস্রের এ আত্মদান কি অহেতুক? এর কোন মূল্যই কি বিধাতার দরবারে ধার্য্য হয় নাই? বিশ্বের ভাণ্ডারী কি এ ঋণের পরিশোধ করিতে বাধ্য নন?

উজ্জ্বলার মাথার উপর নিজের দক্ষিণ হস্ত স্থির রাখিয়া ভয় উদ্বেগ-সংশয় বিহীন অচঞ্চল স্বরে ভীম পুরোহিতের উচ্চারিত মন্ত্রের পুনরুক্তির মতই উচ্চারণ করিয়া গেল,—"পালসাম্রাজ্যের উচ্ছেদই এর একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত এবং সেই প্রায়শ্চিত্তই আমি গ্রহণ করলেম।"

* * * * *

বাতাসে তখনও ঘুমের ঘোর মাখানো, আকাশে ভোরের আলো তখনও আধফোটা, রাত্রির শিশির তখনও পাতার গায়ে টলটল করিতেছে, তৃণের উপর ঝিলমিল করিতেছে। রাগরক্ত কিংশুকে, কমলে, অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিত হাস্য-সুধার ন্যায় জীবন মৃত্যুর পবিত্র সঙ্গম-তীর্থে আবার এই দুইটি বিরহ-বিধুর চিত্ত প্রণয়ীর পুনঃ সম্মিলন ঘটিল। একজন কিন্তু ইহার একটু পরেই অনন্তের পূজার মন্দিরে চলিয়া গেল, আর একজন এই ক্ষণিক মিলনের শেষে গভীর বিচ্ছেদাহত পরিতপ্ত হাহাকারে পরিপূর্ণ মন প্রাণ লইয়া একখণ্ড অগ্নিদগ্ধ জলন্ত অঙ্গারের মতই দগ্ধ হইতে হইতে বাঁচিয়া রহিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অমাবস্যার পর আজ দ্বিতীয়া মাত্র ; চাঁদের আলো নাই, আকাশেও অল্প অল্প মেঘ জমিয়া উঠিতেছিল। অন্ধকারের পর অন্ধকার যেন গায়ে গায়ে জড়াইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই নিবিড়তা যেন নিশ্ছিদ্র, কোনখানে এর এমন একটু ফাঁক দেখা যায় না, যেখান দিয়া এতটুকু আলোর রেখা চোখে পড়ে। আবার মধ্যে মধ্যে দম্‌কা হাওয়ায় আকাশের মেঘগুলা খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়া চলন্ত মেঘের ফাঁকে ফাঁকে এক একটা নক্ষত্র একটুখানি উঁকি দিয়া দেখিয়া যেন তখনই সভয়ে মুখ লুকাইতেছে। কখনও এই বিরাট্‌ অন্ধকারের গ্রাসের মধ্যে একীভূত কোন একটা গাছের গায়ে কতকগুলা জোনাকীও ঠিক উহাদেরই অনুকরণ করিতেছিল। ঐ অসীম অন্ধকাররাশির উপরে সুগভীর লজ্জা-জ্বালাময় বেদনার্ত্ত দৃষ্টি স্থির রাখিয়া রাজাধিরাজ মূঢ়ের মতই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। নিদারুণ দুঃখ গ্লানির একটা অকথ্য আবেগ তাঁর স্বভাবতঃ অনুতাপ হীন নিষ্ঠুর চিত্তকে আজ একটা নূতন পথে পরিচালিত করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দোলা আসিয়া তীরসংলগ্ন হইল, রাজপাদোপজীবী দাসগণ আসিয়া হাত ধরিয়া নামাইয়া পুনশ্চ তাঁহাকে সুসজ্জ তরণীর উপর আস্তৃত সুকোমল রাজাসনে বসাইয়া দিল, রাজাধিরাজ সে সবের কিছুই যেন উপলব্ধি করিতেও পারিলেন না। তিনি যন্ত্র পরিচালিত প্রাণহীন পুত্তলিকার মতই নিজেরও অজ্ঞাতে অন্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া চলিতেছিলেন। মনের মধ্য হইতে তাঁর তখনও আজিকার এই অভাবনীয় ভয়াবহ ও শোচনীয় ঘটনার আঘাতের বিহ্বলতা বিদূরিত হয় নাই। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে আজ চির দিনান্তে মহীপালদেবকে যেন তাঁর চির বিস্মৃত অন্তর্যামী

বড় কঠিন বলেই আঘাত করিয়াছিলেন। এই দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অবিস্মৃত ভীষণ স্মৃতি—যে স্মৃতির জ্বালা ভুলিবার জন্য আজিকার এই নূতন জ্বালায় সৃষ্টি করা, সেইটা শুদ্ধ যেন তাঁর চিত্ত সাগরের তলদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত করিতে থাকিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছিল। সেই সঙ্গে এই দুইটি নারীরক্তের গাঢ় উজ্জ্বল রক্তিমার মধ্য দিয়া কি ভীষণভাবেই প্রকটিত হইয়া উঠিতেছিল—তাঁর নিজের সমস্ত জীবন!

করতোয়া কুলু কুলু রবে গাহিয়া ভঙ্গীভরে নাচিয়া চলিতেছিল। জগৎ প্রসিদ্ধ পাল সম্রাটগণের সহস্র কীর্ত্তিগাথা হয় ত বা ঐ কলধ্বনির মধ্য দিয়া বিচিত্র সুরে গাহিয়া চলিয়াছে! কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তি-সমূহ দ্বারা বিভূষিত, কীর্ত্তি-মেখলা মহানগরীর সুপবিত্র পদরজঃ ধোয়াইয়া দিয়া অমৃত সলিলা করতোয়া পুণ্যবতী ভাগীরথী সঙ্গমের মহোল্লাসে ছুটিয়া চলিয়াছে। বক্ষে তার এই সাম্রাজ্যেশ্বরগণের কত উন্নতি অবনতির, হর্ষ শোকের স্মৃতিচ্ছায়া একসঙ্গে বিজড়িত। প্রজা সুখে আত্মসুখ নিমজ্জনকারী রাজযোগিগণ ইহারই অঙ্কে সহস্রের আশীর্ব্বাদপূত পবিত্র দেহ বিসর্জ্জন করিয়া কে জানে আজ কোন্ সে অজানা আনন্দলোকে অধিষ্ঠিত! তাঁদেরই কীর্ত্তি সঙ্গীত এর কণ্ঠে এখনও গীত হয়।—আর আজ?—আজ এই যে তার এই অফুরন্ত কলতান, এ কি শুধু কোন এক সেই মর্ম্মন্তুদ করুণ কাহিনীর স্মৃতি-গাথা নহে? এ কি আজিকার এই অপ্রত্যাশিত শোচনীয় ব্যাপার—যাহা স্মরণপথে আসিয়া শোক লেশহীন, করুণা লেশ-শূন্য পাষাণচিত্ত রাজাধিরাজকেও ভিতর হইতে শব-শীতল ও বজ্র-স্তম্ভিত করিতেছে, তাহারই জন্য মর্ম্মান্তিক বিলাপকাতরতা?—উঃ!

রাজাধিরাজ অর্দ্ধমূর্চ্ছিতবৎ নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। চিরশ্রুত এই নদীজলের কলস্বর যাহা এক সময় প্রমোদ মত্ততায় কেলি-কুঞ্জে বসিয়া সুন্দরীর সুমধুর নূপুর নিক্কণ রব, অথবা বনমালী বেণুরব মুখর

প্রেমোন্মাদিনী যমুনার আনন্দ-বিলাস বোধ হইত, আজ তাহাই যেন তাঁর উভয় কর্ণে কাহার মরণ যাতনায় মর্ম্মবিদারক রোদনের মতই অসহ্য হইয়া উঠিল!—এ কি হইল? এ কি হইল?—উজ্জ্বলা!—ওঃ, চন্দ্রকলা! উজ্জ্বলা! এই যুগল স্মৃতির বেড়া আগুনে যে আজ চারিদিক দিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এ যে তাঁহাকে রীতিমতই ভস্ম করিতে লাগিল।

ঘুমন্ত স্তব্ধ বিশাল রাজপ্রাসাদটা যেন একটা প্রকাণ্ডাকার দৈত্যের প্রাণহীন শবদেহের মতই নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছে। ইহার কোন অঙ্গেই যেন এতটুকু একটু প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয় না। প্রাসাদে ঢুকিয়া রাজাধিরাজ ক্ষণে ক্ষণে যেন চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন। প্রতি পদক্ষেপে তাঁর অনুভব হইতে লাগিল, এই সুষুপ্ত অন্ধকারের কৃষ্ণ আচ্ছাদনে আবৃত হইয়া যেন কার মৃত্যু-শীতল নিস্পন্দ দেহ কোথায় পড়িয়া আছে, চলিতে গেলে হয় ত এখনই তার সেই তুষার শীতল অঙ্গে তাঁর এই থর কম্পিত চরণ স্পৃষ্ট হইয়া যাইবে! রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে আর্ত্ত-ব্যাকুলতায় কোনমতে উচ্চারণ করিলেন, "ক্ষেমন্ত! আরও আলো চাই,—আলো, আলো—আরও অনেকগুলো আলো জ্বালাও!"

বিশ্রাম! হায়, বিশ্রাম আজ কোথায়?—এ কি শয্যা! স্বর্ণ পর্য্যঙ্কে কোমল পট্টশয্যা—এ যে কণ্টকশয্যার মতই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে! চন্দ্রকলা?—কে,—ঐখানে? ঐ—যে অতি মৃদু অলঙ্কারের শিঞ্জনরব শ্রুত হইল না?—কতবার সে যে এমনই নিঃশব্দ পদে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁর চক্ষু চাপিয়া ধরিয়াছে! আঃ, কি সেই নবনীত-কোমল হাত দুখানি। কি স্নিগ্ধ মধুর সেই প্রিয় স্পর্শ! সর্ব্বাঙ্গে সহসা সে কি স্মিত শিহরণ আনিয়া দিত! কত কাল—কত দিন—কত যুগই রে। ওরে, এ জন্মের মতই সেই প্রিয় স্পর্শসুখ ফুরাইয়া গিয়াছে! কিন্তু—কিন্তু—

এ স্মৃতি যে যায় না। নশ্বর জগতে সবই যখন অস্থায়ী, তখন স্মৃতিগুলাই বা এত বড় স্থায়ী কেন? ওরে, যাক্, যাক্, এই সুখের স্মৃতি দুঃখের মধ্যে বিলীন হইয়া যাক্! প্রতি রাত্রের এত কষ্ট আর এমন করিয়া সহ্য করা যায় না! চন্দ্রা! না না, চন্দ্রা! কোথা তুমি? কোথা তুমি প্রিয়া! প্রেয়সী আমার! কেন মিথ্যা মহাশত্রু রামপালকে ভালবাসিতে গেলে? তার প্রেমে আমায় কেন তুচ্ছ করিলে? কেন নিজের অমন সুন্দর সুকুমার সানন্দ জীবনকে অকালে এমন নিষ্ঠুর মরণে শেষ হয়ে যেতে দিলে?—ওঃ,—ওঃ,—কেন দিলে চন্দ্রা! কেন দিলে?

রাজাধিরাজ উপাধানতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তাঁর সমস্ত দেহ ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে আকুঞ্চিত প্রসারিত হইতে থাকিল, তাঁর উত্তপ্ত ললাট ও কর্ণমূল গাঢ় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়া যেন তাদের অগ্নিদাহ জ্বালায় জ্বালাইয়া তুলিল। ক্ষণপরে পুনশ্চ অতি মৃদুমন্দ স্বরে আত্মগতই বলিয়া উঠিলেন, ওকে ত এক রকম চাপা দিয়েছিলেম, কিন্তু এ'কি আর ভুলতে পারবো? পেলুমও না, কিছুই না, শুধু শুধু একটা যন্ত্রণা বাড়িয়ে গেল! ওঃ কি শত্রুই যে ছিল ও! কেন বাপু, সে দিন ভরা সন্ধ্যাবেলা প্রকাণ্ড একটা কলসী নিয়ে জল নিতেই বা এলি? আর আমার চোখেই বা পড়তে গেলি কেন? নাঃ, এ সব যেন কার ষড়যন্ত্র! ওকে না দেখলে ত আর আমি কোন দিনই ওকে পেতে চাইতুম না। এ সব মিথ্যা বিড়ম্বনার ভোগও আমায় তা হ'লে ভুগতে হ'ত না! আঃ, এখন করি কি? যাই কোথায়? ঘুম ত আর হ'বার কোনই সম্ভাবনা দেখা যাচ্চে না! যাই কোথায়?—পারছি না যে! একা থাকতে পারছি না যে!—কি করি? কি করি? সেই মূর্চ্ছা-কাতর মুখখানা ভোরবেলার চাঁদের মত ক'দিন আমায় ক্রমাগত তারই দিকে টেনেছিল, কিন্তু আজ ওর রক্তমাখা মূর্ত্তি কি বীভৎস—কি ভয়ানকই যে দেখাল!—অকথ্য যন্ত্রণায়

অমন যে অপার্থিব সুন্দর মুখ সে যেন এক নিমেষেই কালিঢালা হয়ে গেল। না না, মনে কর্‌তে পারচি না;—সহ্য কর্‌তে পারচি না;—কা'কে ডাকতে বলি?—কার কাছে যাই?—কে আমায় সে দৃশ্যটা ভুলিয়ে দেবে?—কে' দেবে?—পারবে কি কেউ? বিদ্যুৎ? উহুঁ, না—না—না—ও হাসি-খুসী রঙ্গ-রস, ও যেন আজ আর মনে কর্‌তেও পার্‌চিনে—মনে কর্‌তে ভাল লাগচে না; বোধ হচ্চে যেন একটুও ভাল লাগবে না! এ জন্মেই আর ভাল লাগবে না। তাহলে, কা'কে ডাকি? কার কাছে যাই? কে আস্‌বে?—কে আমায় এতটুকু শান্তি দিতে পার্‌বে? একটু শান্তি, একটু ঘুম—একটু শান্তি, একটু ঘুম! কে', কে', কে'—দেবে? কে' দেবে? কেউ না—কেউ না—কে' আছে? কে' আমার আছে যে আমার এ কষ্টের সান্তনা দেবে?"

মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহীপালদেব তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে দীনাতিদীন দীনতম ভিখারীরও অধমভাবে অনন্ত-সহায় একা সেই গভীর মনোদ্বেগের মধ্যে শয্যালুণ্ঠিত থাকিয়া আর্ত্ত বিলাপের সহিত মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আমার কে আছে? কেউ নেই—কেউ নেই!"

সহসা তাঁর মনের ভিতরে যেন গভীর অন্ধকার রাশির মধ্যে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মতই চকিতে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল একখানা চির পরিচিত মুখ! সবিস্ময়ে তিনি দেখিলেন, সে মুখ গৌড় মগধের এবং বরেন্দ্রীর পট্টমহাদেবীর!

মহারাজাধিরাজের বক্ষোবদ্ধ কৃচ্ছ্র শ্বাস জোরে বহিল, উষ্ণরক্তের পূর্ণ তাপ শীতলতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল, সহসা তাঁর প্রাণেরও প্রাণের মধ্য হইতে একটা নিদারুণ তীব্র আকাঙ্ক্ষা সবেগে জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে সবলে টানিয়া তুলিল এবং সে তার সমুদয় বিরুদ্ধ যুক্তি এবং অপরিসীম

লজ্জার ব্যবধানকে তারস্বরে অস্বীকার পূর্ব্বক তীব্র প্রলোভনের সঙ্গে বলিতে লাগিল,—"হোক তা, তবু সেই তোমার আপনার! সে তোমায় কখনই ত্যাগ করে নাই, আজ একমাত্র তার সেবা-শীতল সঙ্গই তোমার প্রার্থিত।—তাই যাও—তাই যাও।"

মহীপালদেব ডাকিলেন,—"শুভদাস!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

"—মহাদেবি!"

সেই মাত্র দুঃস্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে পট্টমহাদেবী লজ্জাদেবী শিব স্মরণ করিয়া দারুণ দুঃস্বপ্নের দুশ্চিন্তাকে চাপা দিতে চেষ্টিত হইতেছেন, সহসা তাঁর কর্ণ-কুহরে এই একান্ত অপ্রত্যাশিত আহ্বান ধ্বনি জাগিয়া উঠিল।

ও কে ডাকে? এ কি, মহারাজাধিরাজের কণ্ঠস্বর না? সত্যই কি তিনি? অথবা এ ও ঐ রকমেরই আরও একটা দুঃস্বপ্ন?—লজ্জাদেবী কি এখনও নিদ্রিতা?

কৈ না! এই ত চোখ তাঁর খোলাই আছে। স্তিমিত-শিখ সুবর্ণ দীপ সুবৃহৎ কক্ষের মধ্যে আলোছায়ার স্বপ্নলোক যদিও রচনা করিয়া রাখিয়াছে, তথাপি স্বপ্নের অপেক্ষা ইহাতে বাস্তবেরই প্রাধান্য বেশি।

"পট্টমহাদেবি! লজ্জাদেবি!"

সত্য সত্যই তবে মহারাজাধিরাজ আসিয়াছেন! রাত্রির এই তৃতীয়-যামে এই একান্ত অসময়ে—এ সময়ে তিনি এখানে কেন? এ কি অদ্ভুত-পূর্ব্ব অত্যদ্ভুত ঘটনা? নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিতান্তই কোন বিসদৃশ কাণ্ডের,

অঘটনঘটনার সমাবেশ আছে। পট্টমহাদেবী ত্রস্ত বিস্ময়ে দ্বার মুক্ত করিলেন।

"আঃ মহাদেবি! বড় ক্লান্ত আমি! একটু ঘুম,—একটু বিশ্রাম চাই,—তুমি দেবে কি আমায়?"

"আসুন,—রাজাধিরাজ!"

লজ্জাদেবী ক্ষীণপ্রভ দীপশিখা উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। তাহার পর ত্বরিত পদে অগ্রসর হইয়া আসিয়া নিজের উপভুক্ত শয্যা হইতে পুরাতন আস্তরণ উঠাইয়া লইয়া তদুপরি নূতন ও শুভ্রতর আবরণ বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া তাহাতে নাগেশ্বর পুষ্পরেণু সংযুক্ত অগুরু চন্দনের ছড়া দিয়া দিলেন, কক্ষ-ভিত্তিগাত্রে বিলম্বিত খসখসের তৈয়ারি হাতপাখাখানা হাতে লইয়া ধীরকণ্ঠে কহিলেন, "শয্যা গ্রহণ করুন, আমি বাতাস করচি, ঘুমোতে পারবেন।"

"আঃ, পারবো কি? পারবো, লজ্জা! ঘুম কি আমার হবে? আমার যেন মনে হচ্চে, এ জন্মে আর কখন আমি ভাল ক'রে ঘুমোতেই পারবো না। তুমি বল, পারবো ত?"

"পারবেন বই কি"—বলিয়া মহাদেবী স্বর্ণপাত্র-পূর্ণ শীতল জল ল[illegible]য়া তাঁর মুখের কাছে তুলিয়া ধরিলেন,—"পান করুন, শরীর স্নিগ্ধ হবে।"

জলপানান্তে অনেকখানি সুস্থ বোধ করিয়া রাজাধিরাজ বলিয়া উঠিলেন, "আঃ!"—তার পর ঈষৎ সঙ্কুচিত পদে অগ্রসর হইয়া নিজের প্রথম জীবনের মাত্র কয়েক দিনেরই অধিকৃত পালঙ্কে আরোহণ পূর্ব্বক শয্যা গ্রহণ করিলেন।

এই কার্য্যটি করিতে তাঁহাকে অনেকখানিই দ্বিধা লজ্জা কাটাইতে হইল, কিন্তু যতটা হইতে পারিত, মহাদেবীর স্বাভাবিক ব্যবহারে তেমন কিছুই হইল না। তাঁর মনের মধ্যে ইহার পূর্ব্বে যেটুকুও সংশয় ছিল, তাহাও এবার বিদূরিত হইয়া গেল। বাস্তবিকই এ জগতে এর চেয়ে

কেহই তাঁর আপনার নাই! এই চির অনাদৃতা তাঁর চিত্তে সে দিনের প্রভাতে যে নূতন বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল, আজ যেন তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করিল। এই জন্যই তবে জগতে সতীর এত মহিমাগান! এতই তাহার সম্মাননা!—কোথায় চন্দ্রকলা, আর কোথায় এই লজ্জা-দেবী! অত স্নেহ ঢালিয়াও এক জনকে অনন্যানুরাগিণী রাখিতে পারা যায় নাই, আর এক জনকে স্নেহ ত দূরের কথা, এক দিনের জন্য এক বিন্দু কৃপাকণা পর্য্যন্তও দান না করিয়া, বরঞ্চ অকথ্য অবমাননা, লাঞ্ছনা এবং সর্ব্বহারা করিয়াও এই একান্তানুরাগিণী করিয়া রাখিয়াছে! রাজাধিরাজের চক্ষু দিয়া সহসা দুইটি অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। এমন পুণ্যবতী স্নেহময়ী পত্নী যার ঘরে, সে কি না,—সে কি না—উঃ—বলিবার—ভাবিবার আর বুঝি কোন ভাষাই নাই!

বহুক্ষণ স্তব্ধ অনড় অবশদেহে মহীপালদেব শয্যালীন হইয়া রহিলেন। তাঁর উত্তপ্ত মস্তিষ্ক ক্রমে ক্রমে অনেকখানিই যেন শীতল ও তাঁর সঘনে আলোড়িত উদ্দাম চিত্তবেগ বহুলাংশে প্রশমিত হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি এখন প্রাণপণ শক্তিকে একীভূত করিয়া তুলিয়া মুদিতচক্ষে যেন ধ্যান নেত্রে এই লজ্জাদেবীকেই দেখিতেছিলেন। জগদ্বিজয়ী প্রবল পরাক্রান্ত কর্ণাটেশ্বর-দুহিতা প্রথম যে দিন পাল সাম্রাজ্যেশ্বরের পুত্রবধূ বেশে মগধ-বরেন্দ্রীর ভবিষ্যৎ পট্টমহাদেবীরূপে এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে দিনের সকল উৎসব ও সকল দৃশ্যই আজ রাজাধিরাজের মানস-দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিল। তার পর? তার পর, তার খুবই বেশী দিন পরের কথাও নহে,—এই দুই বিভিন্ন চরিত্রের পতি পত্নীর মধ্যে ঐকটা সুগভীর এবং সুদৃঢ় বিচ্ছেদের ব্যবধান ক্রমশঃই সৃষ্ট হইতে লাগিল এবং এক দিন সহসা সেটা সম্পূর্ণরূপেই সুদৃঢ়তর হইয়া উঠিয়া তাঁদের দুজনকে একবারেই দুই দিকে ঠেলিয়া দিল। রাজভ্রাতা রামপালই যেন

বিশেষ করিয়া ইহাদের মধ্যের এই বিচ্ছেদ ঘটনার প্রধান অধিনায়ক হইয়া দেখা দিয়াছিলেন। রাজাধিরাজ আজ সহসা বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, এই রামপালকে যে চিরদিনই তিনি তাঁর পরম শত্রু বোধে হিংসা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু কৈ, সে ত তাঁর সঙ্গে সে রূপ কিছুই করিল না? এমন কি, অত বড় যন্ত্রণাপূর্ণ কষ্টাগারের জীবন হইতে মুক্ত হইয়াও না?—দেশে প্রজাদ্রোহের সূত্র বর্ত্তমানেও তার দ্বারা রাজদ্রোহের কোন চেষ্টাই ত দেখা গেল না! তবে কি বাস্তবিকই তিনি চিরদিন একটা অনর্থক ভ্রান্তির উপরেই তাঁর এই মিথ্যা বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছেন? বস্তুতঃ রামপাল ভ্রাতৃদ্রোহী এবং রাজদ্রোহী ত নহেনই, বরং তাঁর কার্য্যাবলী হইতে যেন এই রকমটাই দাঁড়ায় যে, তিনি এতদুভয়েরই বিপরীত।—সত্যই কি তাই? বোধিদেব বলিয়াছিল, রামপাল তাঁর বিরুদ্ধাচরণ না করিতে যেন কোথাও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! এই কি তবে সত্য কথা? তবে কি—তবে কি সে প্রতিজ্ঞা এই তার পরম শ্রদ্ধাস্পদা ভ্রাতৃজায়ারই অনুরোধের ফল? ওঃ! এ সব কি নিগূঢ় রহস্যের জালই আজি তার এই ঘোরতর দুর্ঘটনা কুটিল কাল রজনীতে অকস্মাৎ তাঁর কাছে বিমুক্ত হইতেছে?—সেই চির অত্যাচারিত ভাই,—আর এই চির অনাদৃতা পত্নী,—এরাই কি তবে এ পৃথিবীতে সব চেয়ে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী? তীব্র অনুশোচনার সহিত মিশ্রিত অতর্কিত একটা প্রবলতর লজ্জার উচ্ছ্বাসে নৃপতির সমস্ত মনটা যেন একই ক্ষণে ভরিয়া উঠিল। মনের মধ্যে অত্যন্ত একটা অস্বস্তিকর কি যেন মুহুর্মুহুঃ ঠেলিয়া উঠিতেছিল। এমন করিয়া নীরব স্তব্ধ ভাবে আর থাকিতে পারা যেন সম্ভব হইতেছিল না, অথচ বলিবার মত ভাষাই বা এর কোন্‌খানটায় কি আছে যে, সেই কথাটাই আজ বলিবেন? তা' ছাড়া মনের মধ্যেই বা তত বড় বল কোথায় যে, যাহাতে করিয়া আজ—বিশেষতঃ এই রাত্রিতেই আবার আর একটা অত

বড় ভয়াবহ আলোচনার সূত্রপাত করা চলে? বর্ষার মেঘভরা আকাশে একটুখানি দমকা হাওয়া লাগিলেই হয় ত তার মধ্যে জমা করা জলের স্রোতে সৃষ্টি ভাসিয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে! অথচ,—অথচ এই যে নীরবতা এ ও যেন মানুষের সহিষ্ণুতার সীমা ধরিয়া নাড়া দেয়,—বিশেষতঃ আজিকার মত রাত্রে!

রাজাধিরাজ ডাকিলেন, "মহাদেবি!"

লজ্জাদেবী ব্যজনী চালনা বন্ধ করিয়া এক মুহূর্ত্ত প্রশ্ন প্রত্যাশী স্থিরনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ যথাকার্য্যে নিরত হইলেন, মৌখিক কোন উত্তর তাঁর কাছে পাওয়া গেল না।

রাজাধিরাজও কিছুক্ষণ আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, তাঁর মনের ভিতরটা তখন যেন কি এক রকম অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুতভাবে অভিভূতবৎ হইয়া আসিতেছিল, তাই ক্ষণকাল বাক্যহারা স্তব্ধতার সহিত তাঁর পার্শ্ববর্ত্তিনী ধর্ম্মপত্নীকে সবিস্ময়ে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এ কি! তিনি কি অন্ধ হইয়াছিলেন? এত দিন, এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়াই তাঁর কেমন করিয়া এত বড় দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটিয়া থাকিয়া ছিল? আজ সেই উজ্জ্বল সূর্য্যাস্তরাগ-সদৃশ প্রভাময় শোণিত স্রোতে তাঁর সেই রুদ্ধদৃষ্টি কি ধুইয়া গিয়া নির্ম্মল হইল নাকি? তাই যদি, তবে কেন এত দিনে, কেন এত দেরিতে এমন হইল? হায় এ যদি এর কিছুদিন আগেও ঘটিত!

কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ীই এই কর্ণাট রাজকুমারী! যেমন উজ্জ্বল শ্বেত পদ্মপ্রভ অনন্যসাধারণ দেহ-বর্ণ, তেমনই কি মৃণাল সদৃশ সুগঠিত দেহলতা! আর তারই সঙ্গে মিলাইয়া—এই যে মহিমময় শান্ত ভঙ্গী, এ যেন কোন অপার্থিব অমর লোকের বার্ত্তাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

মৃদুস্বরে মহারাজাধিরাজ ডাকিলেন, "মহাদেবি! লজ্জাদেবি!"

ঈষৎ সরিয়া আসিয়া তাঁর ব্যজনীযুক্ত হাতখানি ধরিয়া নিজের কাছে তাঁহাকে আকর্ষণ করিলেন।

মহাদেবীর শান্ত মুখের উপর পরিবর্ত্তনের রেখা একটিও পরিলক্ষিত হইল না; কিন্তু তিনি একটি মুহূর্ত্ত পরেই ধীরে ধীরে হাতখানি টানিয়া লইয়া পুনশ্চ পাখা তুলিয়া লইলেন।

রাজা কহিলেন, "পাখা থাক্ মহাদেবি! আমার বুকের ভিতর যেন আগুন জ্বলছে, তোমার ঐ ঠাণ্ডা হাতের শীতল স্পর্শ পেলে হয় ত বা একটুখানি জুড়োতেও পারে—"

ব্যজনী রাখিয়া লজ্জাদেবী স্বামীর নিকট সরিয়া আসিলেন। ধীর হস্তে তাঁর বুকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

সেই শীতল কোমল স্নেহ সহানুভূতিভরা স্পর্শসুখে কিছুক্ষণ বিহ্বলবৎ রাজাধিরাজ অবশ ভাবে পড়িয়া রহিলেন। তাঁর বোধ হইল, এ যেন তিনি কোন কল্পনালোকে বা অপার্থিব লোকে অবস্থিত রহিয়াছেন। এ যেন সত্য নয়! এ যেন এই নশ্বর জগতের কোন কিছুই নহে। তাঁর এই ত্রিতাপতপ্ত জ্বলন্ত হৃদয় প্রাণকে শুদ্ধ এর অতুলনীয় স্পর্শশক্তি যেন এক মুহূর্ত্তে শীতল করিয়া জুড়াইয়া দিল।—ওরে, অভাগা রাজা! এত বড় শান্তির উপাদান তোর নিজের ঘরেই থাকিতে তুই কিসের মোহে কাঁটা বনে শান্তির ফুল খুঁজিতে ছুটিয়া ফিরিলি? হায় রে মূঢ়!

"দেবি!"

"রাজাধিরাজ!"—অকস্মাৎ তাড়িতপূর্ণ কোন বস্তু হস্তস্পৃষ্ট হইলে মানুষে যেমন করিয়া শিহরিয়া উঠে, লজ্জাদেবীর পৃষ্ঠে তাঁর স্বামীর সপ্রেম করস্পর্শ তাঁহাকে তেমনই করিয়াই—হয় ত বা তাঁহারও অজ্ঞাতে, তেমনই করিয়াই শিহরিত করিল। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার সান্নিধ্য হইতে

একটুখানি দূরে সরিয়া গিয়া স্থিরকণ্ঠে কহিলেন, "আমায় আপনি স্পর্শ করবেন না, রাজাধিরাজ!"

মহীপালদেব তাঁর এই কথায় ঈষৎ বিস্ময় বোধ করিয়াছিলেন। অবশ্য এই বাক্য এবং ব্যবহার তাঁর সুদীর্ঘ দিনের পরিত্যক্তা অবমানিতা ধর্ম্ম-পত্নীর পক্ষে একটুও যে অস্বাভাবিক নহে, এ কথাটা আত্মাভিমানে বাধিলেও আজিকার দিনে নিতান্তই নিজের কাছে অস্বীকার করিবারও নহে, কিন্তু ঐ যে শান্ত স্তব্ধ সেবাপরায়ণা নারীর জিহ্বা এই কথাগুলি উচ্চারণ করিল, ইহার মধ্যে যে অভিমানের তুচ্ছতার চেয়ে অনেকখানি বড় জিনিষেরই আভাস ভাসিয়া উঠিতেছিল, এটাও যেন তেমনই স্বীকৃত।

তথাপি নারী-চরিত্রে পূর্ণ অভিজ্ঞতার অহঙ্কার লইয়া রাজাধিরাজ ইহাকে তীব্র অভিমানেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র অনুমানে ঈষৎ সলজ্জ মিনতির সহিত কহিলেন, "ক্ষমা যখন করেছ, তখন আর দূরে সরে যেও না, লজ্জা! আজ আমার তোমাকেই একান্ত প্রয়োজন।"

মহাদেবী পুনশ্চ নিকটে সরিয়া আসিয়া এবার স্বামীর পদপ্রান্তে আসন লইলেন। তাঁর পায়ের উপর নিজের সুকোমল দুটী হস্ত স্থাপন করিয়া এবার তাঁর স্বভাব-কোমল শান্ত স্বরেই উত্তর করিলেন, "আমি ত কোন দিনই আপনার থেকে দূরে যাইনি, রাজাধিরাজ!—কোন দিন তা' যেতেও পারবো না, আপনার সেবাধিকার যে একমাত্র আমারই।—কিন্তু দয়া ক'রে ও ভাবে আমায় আপনি আর কখন স্পর্শ করবেন না, এই আমার আপনার কাছে একমাত্র অনুরোধ। যে হেতু, এতে আপনার প্রত্যবায় ঘটবারই আমি বেশী ভয় করি।"

নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত মহারাজাধিরাজ অর্দ্ধোত্থিতভাবে স্ত্রীর দিকে চাহিলেন, সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কথার অর্থ কি মহাদেবি?

তোমায় স্পর্শ করলে আমি প্রত্যবায়গ্রস্ত হবো? অথচ তুমি আমা বিবাহিতা স্ত্রী!"

পট্টমহাদেবী দৃঢ়স্বরে অথচ মনুত্তেজিতকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আপনা যে দেহ বারনারী এবং পরনারীর স্পর্শ কলুষিত হয়ে গেছে, সে দেহ দি আর আপনি এ জীবনে নিজের সতী স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারেন ন রাজাধিরাজ! করলে, আপনি ধর্ম্মের কাছে দায়ী হবেন, আর আমি হবো। তাই আপনাকে যোড়হাতে মিনতি করচি, আমার এ দেহ স্প ক'রে একে আর অপবিত্র হ'তে দেবেন না।"

তারপর ঘোর বিস্ময়ে এবং অপ্রত্যাশিত কঠিন আঘাতে একেবা বিমূঢ়বৎ স্তব্ধ রাজাধিরাজের দিকে চাহিয়া তাঁর পা দুখানি ব্যাকুলভাবে দুই হাতে চাপিয়া ধরিলেন,—কহিলেন, "কিন্তু যদি দাসীকে এত দিন পরে তার এই ন্যায্য অধিকারটুকু দয়া ক'রে ফিরিয়েই দিয়েচেন,—আর যেন তা' কেড়ে নেবেন না।"

মহীপালদেব অনেকক্ষণ কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। বহুক্ষণ সেই ভাবেই থাকিয়া তার পর গভীর অবসাদ অবসন্ন দেহে উপাধানে ক্লান্ত মস্তক হতাশ ভাবে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ঈষৎ গাঢ় স্বরে উত্তর করিলেন,—"তাই হোক লজ্জা! বাস্তবিকই আমি তোমায় স্পর্শ করবার যোগ্যও হয় ত নেই।"—পরে ঈষৎ ব্যগ্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "কিন্তু আমায় তুমি এ সময়ে ত্যাগ করো না, মনে হচ্চে আমার জীবনে যেন একটা দুঃসময় দেখা দিয়েছে।—কি জানি কি হবে! মনটা যেন আজ আমার একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে।"

ধীর হস্তে স্বামীর পদসেবা করিতে করিতে নম্র কোমলকণ্ঠে লজ্জাদেবী কহিলেন, "সব অমঙ্গল কেটে যাবে, প্রভু! আমি কি কখন আপনাকে ত্যাগ করতে পারি? আমি যে আপনার চিরদাসী।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মহাপ্রতীহার রুদ্রদমন রাজ-বন্ধুত্ব-গর্ব্বে গর্ব্ব স্ফীত বক্ষে নিজের আবাসভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, মহামাত্যের প্রেরিত লোক পত্র লইয়া তাঁর প্রতীক্ষা করিতেছে। পত্রে অবিলম্বে সাক্ষাতের প্রয়োজনীয়তা জানাইয়াছেন।

মহাপ্রতীহার রুদ্রদমন অস্ফুট গর্জ্জনে উচ্চারণ করিলেন,—"উৎসন্ন যাক্ ঐ বিটুলে বামুন ব্যাটা! ভেবেছিলেম, বড় বেঁচে গেছি! নাঃ, এ ব্যাটাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা দেখছি সহজ নয়! একে ব্রাহ্মণ, তাতে বৈদিক! সোনায় সোহাগা!"—তার পর নিরুপায়ে অগত্যাই পুনশ্চ অশ্বারোহণে বাহির হইতে হইল। সঙ্গে চলিল—মহারাজাধিরাজের নির্দ্দেশানুমোদিত সেই এক শত সশস্ত্র নাসির সেনা।

বাসুদেবভট্ট কোষাধ্যক্ষঘটিত সকল কথাই জানাইয়া অবশেষে কহিলেন, "আমার মনে হয়, রাজ্যের এই বিশৃঙ্খলার দিনে সাহীলের মত এক জন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে বিনা বিচারে বন্দী করা এবং তার সম্পত্তি অধিকার করা মহারাজাধিরাজের অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক ভ্রম হচ্চে, সাহীলের বিরুদ্ধে এর পূর্ব্বে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি, যাতে নিঃসংশয়িত হ'তে পারা যায় যে, তিনি রাজকোষ লুণ্ঠন করেছেন।"

রুদ্রদমন কহিলেন, "তা হ'লে তাঁকে বন্দী করা হচ্চে কেন? না করলেই ত হয়!"

মহামাত্য কহিলেন, "উপায় কি? রাজার আদেশ।"

মহাপ্রতীহার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন রাজাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন না?"

মহামাত্য হতাশাক্লান্ত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "চেষ্টা কি আর করি নি
তিনি যদি বুঝালে বুঝতেন, তা হ'লে আর ভাবনা কি ? আমি এখন এ
কথাটাই ভাবচি যে, সাহীল যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হ'ত, তা হ'লে তাকে ব
করতে আমি এতটা ভয় পেতাম না, কিন্তু সে কৈবর্ত্ত, কৈবর্ত্তদের ম
একতাটা আমাদের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের চেয়ে বেশী, ওদের মধ্যে এক জনে
সম্বন্ধে সামান্য অন্যায় হলেও ওরা ক্ষেপে উঠে, হিতাহিতজ্ঞান হারায় ! আ
আমাদের সমস্ত নৌ-বাহিনীই ঐ কৈবর্ত্তদের হাতে। তা ছাড়া নৌবং
ব্যাপৃতক প্রভৃতিও সাহীলের আত্মীয়।"

রুদ্রদমন কিছু বিমনাভাবে প্রশ্ন করিলেন, "এ সব কথাও বলেছিলেন ?

বাসুদেব কহিলেন, "সমস্ত।"

"শুনেও মতি পরিবর্ত্তিত হলো না ?"

"না।"

"তবে আর উপায় কি ?"

রুদ্রদমন পুনশ্চ কহিলেন, "ধীরাজের আদেশপত্র আছে ?"

মহামাত্য দুঃখিতচিত্তে নীরবে রাজাধিরাজের প্রদত্ত আদেশপত্র দিলেন।

"এই রাত্রিতেই বন্দী করবার আদেশ দেখছি যে !"

মহামাত্য মাথা হেলাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন, পরে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "কিন্তু এর পরিণাম—"

"অশুভ হওয়াই সম্ভব !—তবে উপায় কি ? আমরা আজ্ঞাবাহী দাসমাত্র।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মহামাত্য আরম্ভ করিলেন, "আপনাকে স্নেহ করেন, আপনি যদি একবার অনুরোধ জানিয়ে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন, হয় ত—"

মহাপ্রতীহার সবেগে বাধা দিয়া কহিয়া উঠিলেন, "ওঃ না না, সে

সম্ভব ! আমায় স্নেহ করেন ! হ্যাঁ, তা করেন বটে ! কিন্তু কেন করেন ? আমার কাছ থেকে তাঁর ইচ্ছার অণুমাত্র বাধা পান না বলেই না ? স্নেহ আমায় করেন না, ভট্ট মশাই ! আমার বাধ্যতাকেই করেন। এ ক্ষেত্রে আমার কাছ থেকে তাঁর কার্য্যের প্রতিবাদকে তিনি অধিকতর অপরাধ স্বরূপেই গ্রহণ করবেন, আর তার সামান্য প্রমাণ আমি এই ক্ষণ-মাত্রই পেয়ে আসছি।”

“তবে আর উপায় কি ?”

“কিছু না, রাজ আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য !”

“পাল-সাম্রাজ্যকে জগদীশ্বর রক্ষা করুন !”

মহাপ্রতীহার রাজার স্বহস্ত লিখিত আদেশপত্র লইয়া দ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে মৃদু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, “ডেকে দেখুন,—ইচ্ছে হলেই পারতে পারেন। আপনাদের তিনি ত সহস্রবাহু সহস্রশীর্ষ এবং সহস্রাক্ষ ! এক হাজারটা শক্তিমান পুরুষ আর কতকগুলা নাগরিককে পরাস্ত করতে পারবেন না ?”

কোষাধ্যক্ষ সাহীল সাম্রাজ্যের মধ্যে এক জন ধনী এবং সৌখীন ব্যক্তি, তাঁর বাসগৃহ আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও ভৃত্যে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকে, পান ভোজন, নৃত্যগীত সকল সময়েই সে গৃহকে নন্দনকাননে পরিণত করিয়া রাখে। ‘যত্র আয় তত্র ব্যয়’ বলিয়া যে কথাটা আছে, ইঁহার সম্বন্ধে সেটা একেবারে চৌচাপটে খাটিয়া যায় !

সে রাত্রেও সে গৃহে উৎসবের বাতি তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। পান ভোজনে সুপরিতৃপ্ত অতিথিবর্গ প্রমোদ নিরত রহিয়াছিল। যন্ত্রালাপ ও কণ্ঠ-সঙ্গীতের মধুর আরাবে গৃহপথ মুখরিত; সহসা সেই রঙ্গভূমে বিনা মেঘে অশনি সম্পাত তুল্য সসৈন্য মহাপ্রতীহারের অপ্রত্যাশিত আগমন বিঘোষিত হইল। শশব্যস্তে সাহীল উঠিয়া আসিয়া দ্বারের বাহিরেই মহাপ্রতীহারকে

অভ্যর্থনা করিলেন, "আজ আমার এ অতর্কিত সৌভাগ্যের কারণ কি, ভট্টারক-পাদীয় মহাপ্রতীহার মশাই ?"

মহাপ্রতীহার অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "রাজার আদেশে আমি আপনাকে বন্দী করলেম, কোষাধ্যক্ষ !"

কোষাধ্যক্ষের উত্তেজিত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, "বন্দী করলেন ? আমাকে ?—রাজার আদেশে ? কৈ ? দেখি ? কোথায় রাজার আদেশ ?"

"এই দেখুন"—বলিয়া মহাপ্রতীহার বস্ত্রমধ্য হইতে বাহির করিয়া রাজার স্বহস্ত লিখিত আদেশলিপি প্রদর্শন করিলেন।

কোষাধ্যক্ষ সাহীল উহা দেখিয়াই রাজহস্তলিপি চিনিতে পারিলেন, ধীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আমার অপরাধ কি, মহাপ্রতীহার ?"

মহাপ্রতীহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিলেন, "এতেই লেখা আছে, এই দেখুন, রাজকোষ লুণ্ঠন !"

কোষাধ্যক্ষের আরক্ত মুখ শবশুভ্র হইয়া গেল। তিনি স্খলিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "আমি চোর !—প্রমাণ ?"

রুদ্রদমন কহিলেন, "আমি ত বিচারক নই, কোষাধ্যক্ষ ! প্রমাণ প্রয়োগ উপস্থাপিত করা হবে ধর্ম্মাধিকরণে।"

সাহীল উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, তাঁর সেই বিকৃত হাস্য একটা অস্বাভাবিক অশুভ ছন্দে কক্ষভূমির প্রত্যেক কেন্দ্রে কেন্দ্রে গিয়া আঘাত করিল, গৃহমধ্যস্থ আকস্মিক রসভঙ্গে উন্মনা জনমণ্ডলীর উৎপ্রেক্ষিত বক্ষ-তলে উহা সভয় শিহরণ আনিয়া দিল।

"বিচারক !—বিচারক কি এ সাম্রাজ্যের ধর্ম্মাধিকরণে আর বেঁচে আছে মহাপ্রতীহার ?—বিচারক এদেশে কোথায় ?"

"কোষাধ্যক্ষ সাহীল !"

সাহীল পুনশ্চ সেইরূপ মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া কহিয়া উঠিলেন, "মরার আবার খাঁড়ার ভয়' 'কি মহাপ্রতীহার? আমি ত মরেই গিয়েছি। তবে আর নিঃশব্দে মুখ বুজে মরবো কেন? বলি, আমার বিচার হবে ত তাঁরই কাছে, যাঁর কাছে মহাবলাধিকৃত ও মহাসামন্ত মহাকুমারদ্বয়ের ন্যায় বিচার হয়েছিল? যিনি পালসম্রাটদের বংশগত মহামাত্যের উপযুক্ত পুত্র অমাত্য বোধিদেবকে সুবিচার করেছিলেন? নিজের উপভুক্তা প্রেয়সী নর্ত্তকীকে স্বহস্তে যিনি বধ করেছেন? গরীব চাষাদের হল-লাঙলে যিনি কর বসিয়েছেন? রাজ-অত্যাচারের প্রতিবিধান চাইতে যাওয়ায় সমস্ত জন-প্রতিনিধি প্রধানবর্গের বিনা বিচারে নির্ব্বাসন এবং মুণ্ডচ্ছেদ যাঁর প্রকাশ্য কীর্ত্তি! তার পর—তার পর—সমস্ত ভদ্রাভদ্র ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকল প্রজার গৃহবধূ ও কন্যাগণকে—"

"সাহীল!—সাহীল!"—

প্রবল উত্তেজনা প্রমত্ত সাহীল এই দুর্ব্বল প্রতিবাদ চেষ্টাকে অগ্রাহ্য করিয়া তীব্র বিদ্ধ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "হ্যাঁ, সমস্ত প্রজা-সাধারণের গৃহবধূগণকে নিজের পাপ সম্ভোগের ক্রীড়নক রূপে ব্যবহার করা যাঁর সাধারণ ধর্ম্ম! নারীর সতীত্ব যাঁর চক্ষে উপহাসের বস্তু, অশ্রদ্ধার বিষয়, খেলার সামগ্রী, সেই চরিত্রহীন—"

"সা—হী—ল! এ সব রাজদ্রোহ!"

আবার সেই উন্মত্ত ঝটিকা-গর্জ্জনবৎ হাস্যধ্বনিতে উৎকর্ণ গৃহাভ্যন্তরস্থ অতিথিগণ এবং আত্মীয়বর্গ চমকিয়া উঠিল।

"মহাপ্রতীহার! রাজদ্রোহী আমি নই, ইচ্ছা করলে হয় ত এখনই আমি রাজাদেশ প্রত্যাখ্যান ক'রে আত্মরক্ষা করলেও করতে পারি, কিন্তু তাতে আমার স্পৃহা নেই। নিন, বন্দী করুন, রাজ আজ্ঞা জয়যুক্তই হোক।"

মহাপ্রতীহারের ইঙ্গিতে দুই জন সৈনিক কোষাধ্যক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল।

"এক মুহূর্ত! কুমার! একবার আমার নিমন্ত্রিতদের কাছে বিদায় নিয়ে আসতে দিতে আজ্ঞা হোক।"

মহাপ্রতীহার দ্বার রোধ করিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "অসম্ভব!"

শান্তস্বরে সাহীল কহিলেন, "অসম্ভব? তবে কায নেই, চলুন যাই।"

একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া মহাপ্রতীহার কহিলেন, "যাবার আগে আর একটি অপ্রিয় কার্য্য আমায় সম্পন্ন ক'রে যেতে হবে। আদেশপত্রে লেখাই আছে, দেখেছেন বোধ হয়, আপনার সম্পত্তি রাজকোষে প্রত্যর্পিত করবার নির্দ্দেশ রয়েছে?"

একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের মৃদুহাস্যমাত্র সাহীলের বিবর্ণ মুখকে একটি নিমেষের জন্য ঈষৎ অনুরঞ্জিত করিয়াই পর মুহূর্ত্তে তাহাকে সমধিক বিবর্ণতর করিয়া অদৃশ্য হইয়া মিলাইয়া গেল। তিনি নম্রকণ্ঠে কহিলেন, "তাই হোক, কিন্তু অনুসন্ধানের সময়টায় আমায় সঙ্গে রাখবেন, তাতে আপনাদের অনুসন্ধানের সুবিধাই হবে,—অবশ্য বন্দীভাবেই।"

মহাপ্রতীহার ইঁহাকে এতটাই সহজে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবেন, এ আশা করিতে পারেন নাই, তাই ইঁহার এই বিনম্র বাধ্যতায় পরিতুষ্ট ও তাঁর দৃঢ় আত্মসংযমে সহানুভূতিপূর্ণ হইয়া কহিলেন "আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আমরা আপনার অতিথিদের মধ্য দিয়ে ভিতরে যেতে ইচ্ছা করি না, ভিতরে যাবার অন্য কোন পথ নেই?"

"আসুন"—বলিয়া সাহীল মহাপ্রতীহারের অগ্রবর্ত্তী হইতেই মহা-প্রতীহার দ্রুত নিকটে আসিয়া কহিলেন, "ক্ষমা করবেন!"

রক্ষিদ্বয় আসিয়া সাহীলের দুই হাত ধরিল। তিনি কিছুই বলিলেন না বা বাধাও দিলেন না।

অন্তঃপুরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া সাহীল ডাকিলেন, "সুদেষ্ণা!"

এক জন বর্ষীয়সী রমণী কোন একটা ঘরের মধ্য হইতে তাঁর আহ্বানের প্রত্যুত্তরে ডাকিয়া বলিল, "ছোটবৌ পান সাজচে, বড়বৌকে ডেকে দেবো কি?"

সাহীল বলিলেন, "দু'জনকেই ডেকে দাওত, দিদিমা! শীঘ্র আসতে বল, আর ব'লে দিও, সমস্ত কুঞ্চিকা যেন সঙ্গে আনে।"

অনতিবিলম্বে দুই জন নারী এক সঙ্গে কোন একটা ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া দালান পার হইয়া অঙ্গন অতিক্রম করিয়া খিড়কির দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল, দুই জনই যুবতী, দুই জনই সুন্দরী, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কনিষ্ঠা নবীনা, ষোড়শী এবং বিশেষরূপে রূপসী। জ্যেষ্ঠা বলিলেন, "কৈ, কোথায় তোর বর লো, ছুঁড়ি?"

কনিষ্ঠা সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল, "ও মা গো! দিদি যেন কি! ও বুঝি শুধু আমার একলারই বর? তোমার নয় বুঝি?"

জ্যেষ্ঠাও হাসিয়া কি প্রত্যুত্তর করিতে যাইতেছিল, এমন সময় দ্বার সন্নিহিত হইয়া সাহীল ডাকিলেন, "তিলোত্তমা! সুদেষ্ণা!"

সুদেষ্ণা ঈষৎ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া সপত্নীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল।

"এই নাও কুঞ্চি, কিন্তু এ কি! এ কারা? তুমি—বন্দী?"

বন্দী গৃহস্বামী দ্বারের নিকট ঈষৎ অগ্রসর হইয়া আসিলেন, কহিলেন,— "আমি বন্দী। কি অপরাধে?—আমি রাজকোষ লুণ্ঠন করেছি, তাই রাজা আজ আমায় লুণ্ঠন ক'রে তার শোধ তুলবেন! শোন তিলোত্তমা! তুমি বড়, তোমার উপরেই আমি সমস্ত ভার দিয়ে গেলাম। আমার অন্তঃপুরিকারা যেন রাজসৈন্যের দ্বারা অবমানিতা না হয়, আর আমাদের সমস্ত গুপ্তগৃহ, পেটিকা প্রভৃতি যাতে এই রাজপ্রতিনিধি মশাই অনুসন্ধান ক'রে দেখতে সমর্থ হন, তার যথোচিত ব্যবস্থা তোমার ভাই যুধিষ্ঠিরকে

ডেকে করিয়ে দিও। তার পর? তার পর আর কি? আমাদের শিশু দুটিকে নিয়ে ভ্রাতৃগৃহেই বাস করো। নৌবল-ব্যাপৃতক যুধিষ্ঠির তার অনাথা ভগিনী ও ভাগিনেয়দের নিশ্চয়ই আশ্রয় দেবেন।”

তিলোত্তমার ভয়ার্ত্ত কণ্ঠ হইতে একটা অস্ফুট রব নির্গত হইয়া গেল, সে দ্রুতবেগে স্বামীর দিকে ছুটিয়া আসিল, কিন্তু অপরিচিত পুরুষদলের সান্নিধ্যে অদম্য আগ্রহসত্ত্বেও সে তার স্বামীকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল না। সর্ব্ব-শরীরে কম্পিত হইয়া আর্ত্তনাদের মতই সে উচ্চারণ করিল,—“তুমি চোর? নিজের সর্ব্বস্ব নির্ব্বিচারে সকলকে বিলিয়ে দিচ্চে ব’লে আজ যার গৃহ মুক্তাশূন্য শুক্তির মত শূন্যগর্ভ, সে রাজকোষ লুণ্ঠন করেছে? এত বড় অবিচার!—এর কি কোন প্রতিবিধান নেই?”

সাহীলের রক্তশূন্য অধরে আবার সেই তীব্র জ্বালাময় উপহাসের হাসি এবার অতি মৃদুভাবেই ফুটিয়া উঠিল, হাসিবার শক্তিও বোধ হয় তাঁর এইবার ফুরাইয়া আসিতেছিল, বলিলেন,—“প্রতিবিধান? তিলোত্তমা! তুমি মেয়েমানুষ ব’লেই এমন প্রশ্ন করতে পারলে, এ রাজ্যের কোন পুরুষ মানুষেই এমন সন্দেহ করতো না। যাক্, মিথ্যা সময় নষ্ট নিষ্প্রয়োজন,—ভিতরে যাও, দিদিমা আর সকলকে নিয়ে ছাদের উপর গিয়ে চিলে কুঠরীতে নিজেদের বন্ধ ক’রে রাখ গে, এঁরা অনুসন্ধান ক’রে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেলে নেমে এস।—আর আমার কিছুই বলবার নেই।”

তিলোত্তমা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতেই অন্দরের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল, তার কান্নার শব্দে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে দাসী, আত্মীয়া ও আশ্রিতারা শশব্যস্তে গৃহমধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিতে লাগিল, সকলেরই ত্রস্তগতি এবং সন্দেহ-শঙ্কিত মুখভাব।

তিলোত্তমা ফিরিয়া গেলে অবগুণ্ঠন মুক্ত হইয়া সুদেষ্ণা আসিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইল। সৈনিকের হস্তধৃত উজ্জ্বল মশালের আলো তার মুখের

উপর পতিত হইতেই সাহীলের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী মহাপ্রতীহার যেন বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলেন ; তাঁর মনে হইল, সহসা ঘন মেঘজাল মধ্য হইতে পূর্ণাবৃত পূর্ণিমার চাঁদ বুঝি বাহির হইয়া আসিল ! এতক্ষণ পরে সাহীলের প্রতি একটা প্রবল অনুকম্পার ভাব তাঁর চিত্তে উদিত হইল । আহা, বেচারা সাহীল ! এমন অপ্সরাতুল্যা পত্নীকে অনাথা অভাগা করিয়া তাহাকে যাইতে হইবে ।

সুদেষ্ণার সুন্দর মুখে একটিও ভাবের রেখা পরিবর্ত্তিত হইল না। স্থির শান্ত সেই মুখখানি সমুজ্জ্বল তীব্র আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া সে রমণী অতি সহজকণ্ঠেই কথা কহিল,—"আমায় ত তুমি কিছুই ব'লে গেলে না ?"

"তোমাকে !" বলিয়া সাহীল ক্ষণকাল নীরব হইয়া থাকিলেন, বোধ করি, মনের ভিতর সহসা উচ্ছ্বসিত একটা দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত দেখা দিয়াছিল, প্রাণপণ চেষ্টায় তার হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতে কতকটা সময় লাগিল। তা যাই হোক, ফলে কিন্তু কৃতকার্য্য হইয়াই তিনি কথা কহিলেন। স্নেহপূর্ণ অথচ গাম্ভীর্য্যময় কণ্ঠে ধীরে ধীরে সাহীল কহিলেন, "তোমায় বেশী কিছু বলবার মত নেই, সুদেষ্ণা! শুধু আমার একটি জিনিষ তোমায় দিয়ে যাবার আছে। একটুখানি দাঁড়াও।"

সাহীল মহাপ্রতীহারের দিকে ফিরিলেন, "আপনাকে আমার এই শেষ অনুরোধ যে, একবারের জন্য প্রহরীরা যদি আমার হাতটা ছেড়ে দেয়—"

রুদ্রদমন সৈনিকদের ইঙ্গিত করিলে তাহারা তাঁর হস্ত ত্যাগ করিল। তখন মহাপ্রতীহার কহিলেন, "আমারও আপনাকে কিছু বলবার আছে, যদি উপদেশ নেন, একটু স'রে এলে বলতে পারি।"

সাহীল সুদেষ্ণাকে দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিয়া মহাপ্রতীহারের সহিত কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

"আদেশ করুন।"

মহাপ্রতীহার একটুখানি ইতস্তত: করিতে লাগিলেন, তার পর জোর করিয়াই যেন মনের মধ্য হইতে সঙ্কোচের জড়তাকে দূর করিয়া দিয়া সহজ গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কোষাধ্যক্ষ সাহীল! আপনি নিশ্চয়ই বেঁচে থাকতে চান? মুক্তি কি আপনার এখনকার প্রধান কাম্য নয়?"

সাহীল বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলেন, প্রথমতঃ তাঁর বাক্যস্ফূর্ত্তিই হইল না, পরে সচেষ্টায় আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "এ পৃথিবীতে যার যত দুঃখই থাক, তবু কে না বাঁচতে চায়? মুক্তি কার না একান্ত কামনার বস্তু মহাপ্রতীহার?"

মহাপ্রতীহার বলিলেন, "আপনি ইচ্ছা করলেই এই মুহূর্ত্তে আপনার প্রাণ, মান এবং সম্পদ সমস্তই রক্ষিত হ'তে পারে। অবশ্য তার জন্য সামান্য একটা ত্যাগও আপনাকে করতে হবে।"

সাহীলের বক্ষ গভীর আগ্রহে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, আরক্ত মুখে তিনি সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "কুমার রুদ্রদমন! আপনি মহৎ! আপনার মনে দয়া আছে। আদেশ করুন, কি করলে আমি এ মহা বিপদ হ'তে মুক্তি পেয়ে আজীবন আপনার দাসানুদাস হয়ে থাকতে পারি? আমার পক্ষে অসাধ্য না হ'লে আমি আপনার উপদেশ নিশ্চয়ই গ্রহণ করব এবং জানবো, আপনি দীনের বন্ধু!"

মহাপ্রতীহার একটু কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, "কোষাধ্যক্ষ! চাণক্য শাস্ত্রটা কি জানা আছে? না জানো ত শোন বলি,—তাতে বলছেন, 'আত্মানাং সততং রক্ষেৎ, দারৈরপি ধনৈরপি'—এটা শুনেচ কি? আমাদের রাজাধিরাজ এই দুটি জিনিষকেই সমানভাবে গ্রহণ করতে ভালবাসেন, ধন যদি পর্য্যাপ্তরূপে সত্যই তোমার কাছে আর না থাকে, ঐ সুদেষ্ণা নামের বউটিকে তুমি রাজার কাছে পাঠিয়ে দাও দেখি, এখনই সমস্ত বিপদ তোমার কেটে যাবে। চাই কি—উঃ, রাক্ষস! পাষণ্ড! চণ্ডাল!—

তোর ভাল করতে গেলেম—তার এই ফল? প্রহরী! হতভাগাকে শীঘ্র শেকল দিয়ে বেঁধে ফেল!"

মহাপ্রতীহারের অমূল্য উপদেশবাণীর সমস্তটুকু সমাপ্তির ধৈর্য্য পর্য্যন্ত না রাখিয়াই কোষাধ্যক্ষ উহার প্রস্তাবমাত্রে আহত সিংহের মত গর্জ্জিয়া নিমেষমধ্যে তাঁর পার্শ্ব বিলম্বিত কৃপাণ মুক্ত করিয়া মহাপ্রতীহারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু অতর্কিততায় তাঁর লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া তাহা মহাপ্রতীহারের বাম বাহুমূলে লঘুভাবেই বিদ্ধ হইয়াছিল মাত্র।

পরমুহূর্ত্তে অসংখ্য সৈনিক আসিয়া সাহীলকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিল। তখন উন্মত্ত সাহীল তরবারি ঘুরাইয়া তাহাদের মধ্যের দুই তিন জনকে ধরাশায়ী করিলেন, তার পর তেমনই ক্ষিপ্ত ক্ষিপ্রবেগে ছুটিয়া আসিয়া এই অতর্কিত বিপ্লবে হতবুদ্ধিপ্রায় সুদেষ্ণার বক্ষে প্রচণ্ডবেগে আমূল তরবারি বসাইয়া দিয়া প্রলয়াগ্নিশিখার মতই চণ্ড হাস্য করিয়া কহিলেন, "সুদেষ্ণা! সুদেষ্ণা! এই আমার তোমাকে শেষ দান! নারীর সতীত্বকে যে অসভ্য বর্ব্বরেরা খেলার জিনিষ মনে করে, পণ্যের বিষয় বোধ করে, তারা তাদের নিজের ঘরের অসতীদের নিয়ে সে খেলা খেলুক, ব্যবসায় চালাক। জগতে নরের সাধুতার এবং নারীর সতীত্বের মূল্য বাস্তবিকই তুচ্ছ নয় এবং কোন দিনই তা হবেও না। আসুন মহাপ্রতীহার! এইবার জল্লাদের খড়্গতলে বিকট পূতিগন্ধময় মশানক্ষেত্রে অনায়াসে কোষাধ্যক্ষ সাহীল তার এই অনাবশ্যক জীবন নিশ্চিন্ত আনন্দের সঙ্গেই সঁপে দিতে পারবে।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রির অন্ধকারে যাহা রহস্যময় ও ভয়াবহ বোধ হয়, দিনের আলো তাহাকে সুপরিস্ফুট ও সহজতর করিয়া তোলে, দিবালোকের মধ্যের এই শক্তিকে আমরা অনেকবারই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মহারাজাধিরাজ মহীপালদেবও গত রাত্রির অপ্রত্যাশিত ও শোচনীয় ঘটনার সঙ্ঘাতে যেরূপ বিহ্বল ও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, রাত্রিশেষে সুপরিচ্ছন্ন ও সমুজ্জ্বলতর দিবারম্ভের প্রথমে সে সমস্তকে যেন একটা ক্লেশকর দুঃস্বপ্নের মতই অনুভব করিলেন এবং উহার দিক্ হইতে মন ফিরাইয়া লইয়া নিজের চিরাভ্যস্ত পথেই গা ভাসাইয়া দিলেন। রাজকীয় প্রাসাদ উদ্যানে অনেক-গুলি পালিত পশু পক্ষী রাজার চিত্তবিনোদন জন্য রক্ষিত ছিল, উহদের জন্য লতাকুঞ্জ, কাষ্ঠময় ক্ষুদ্র গৃহ, কৃত্রিম নির্ঝর যুক্ত গণ্ড-শৈল এবং পদ্ম-কুমুদ-খচিত দিব্য সরোবর সকল প্রস্তুত হইয়াছিল। মহীপালদেব প্রভাতে উঠিয়া ইহাদের মধ্যেই নিজের স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। বাঘ, ভল্লুক, মৃগযূথ, মরাল, শশক, পারাবত, নানাজাতীয় পক্ষী এবং একটা সালঙ্কৃতা বানরী তাহাদের নানা ভাব ও নানা ভাষা দিয়া মগধ গৌড়ের অধিশ্বরকে সুস্বাগত জানাইল।

প্রতীহার আসিয়া মহামাত্যের আগমন সংবাদ প্রদান করিল।

"আঃ! ঐ শিখাধারীটার অশুচিজনক মূর্ত্তিটা দেখলেই আমার অমঙ্গল ঘটে, অথচ ওটার হাত ছাড়াবারও যেন পথ নেই। ওর চেয়ে যদি বোধিদেবকে কষ্টাগার থেকে মুক্ত ক'রে এনে মহামন্ত্রিত্ব প্রদান করতেম, বোধ করি, ভাল হ'ত। লোকটা অপ্রিয়বাদী হ'লেও প্রিয়দর্শন বটে!"

মহামাত্য শুষ্কমুখে প্রবেশ করিলেন।

"কি? রাত্রে সুনিদ্রা হয় নি, না? ভোরে উঠেই আমার পিছনে তাড়া ক'রে বেরিয়ে পড়েছেন যে! ব্যাপার কি ভট্টরাজ?"

বাসুদেবভট্ট কহিলেন, "গত রাত্রের ঘটনা রাজাধিরাজের কর্ণগোচর হয়ে থাকবে? কোষাধ্যক্ষ সাহীলকে বন্দী করা হয়েছে, কিন্তু এ দিকে আর এক দুঃসংবাদ জানা গেছে, সাহীলের আত্মীয় বলেই কি অন্য কোন কারণে, তা ঠিক বলা যায় না, কৈবর্ত্তদের মধ্য থেকে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছে ব'লে সংবাদ পেয়েছি।"

শুনিয়া রাজাধিরাজ ঈষৎ শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই যথাসম্ভব স্থৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন,—"বিদ্রোহ-দমনের ব্যবস্থা হ'তেও নিশ্চয়ই এতক্ষণ বাকি নেই?"

মহামাত্য ঈষৎ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন,—"আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে আমাদের বল প্রয়োগ না ক'রে ধীরতার সঙ্গে বিদ্রোহীদের অভিযোগ শুনে তার যথাসাধ্য প্রতীকার চেষ্টা করা ও তাদের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করাই সমীচীন। যত দূর সংবাদ পাওয়া যাচ্চে, তাতে মনে হয়, যদি একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তা হ'লে এমন কি, রাজসৈন্যদের মধ্য হ'তেও অনেকে তাতে যোগদান করতে পারে; তাই বলি—"

রাজাধিরাজ ঘোর অসন্তোষে ভরা অসহিষ্ণু দৃষ্টি মহামাত্যের মুখের উপর তীব্রভাবে নিক্ষেপ করিয়া অধীর কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "কিছু ব'লে আর কায নেই, ভট্টরাজ! আপনাকে কি গুণেই যে মহামন্ত্রিত্ব প্রদান করা হয়েছে, আমি যদি তার কিছুই বুঝতে পারচি! এ পদের আপনি আদৌ যোগ্য নন। গোটাকত কৈবর্ত্ত কোথায় একটা বিদ্রোহ করেচে, তাতেই আপনি ভয়ে একেবারে চোখের সামনে সর্ষে-ফুল দেখতে পেলেন! এই শক্তি ও সাহস নিয়ে এত বড় দায়িত্বপূর্ণ পদের অমর্য্যাদা করতে আপনাকে কে এখানে আসতে বলেছিল? এ কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজের পল্লীগৃহে ফিরে

যান,যজ্ঞকুণ্ডে গব্যঘৃত ও পক্ক কদলী দগ্ধ ক'রে,তোষামোদের দ্বারা আপনার মিত্রাবরুণ অর্য্যমাদিগকে সন্তুষ্ট রাখুন গিয়ে,—বিদ্রোহীদের সঙ্গে আমায় যথোচিত ব্যবস্থা করতে ছেড়ে দিন। দেবতাদের স্তব স্তুতি ক'রে ক'রে আপনাদের এমন অভ্যাসটী পাকা হয়ে গেছে,—এখন ইতর ভদ্র, শত্রু মিত্র সবার সম্বন্ধে ঐ এক পন্থাই অবলম্বন করা সঙ্গত বোধ করে থাকেন।"

এই তীব্র ও নিতান্ত অবমাননাজনক তিরস্কারে মহামাত্য মনের মধ্যে যথেষ্ট আহত হইলেও বাহিরে তাঁর এমন শক্তি ছিল না, যাহাতে তিনি রাজবাক্যের প্রতিবাদ করেন। বাসুদেবভট্ট জানিতেন, রাজা রাজকার্য্য দেখেন না; সে এক প্রকার তাঁহাদেরই মঙ্গলজনক, এই হেতু তাঁর ক্ষমতাও যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে, অর্থাগমও প্রচুর। তাই নিতান্ত কর্ত্তব্য-বোধে অথবা নিশ্চিত বিপদে তাঁকে মধ্যে মধ্যে রাজার অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হয়, নতুবা সহজে তিনিও রাজাকে কোন অন্যায় অহিতা-চরণ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন না। বিশেষতঃ যেখানে জানাই আছে যে, শত চেষ্টাতেও কাহারও দ্বারা তাহা সম্ভব নহে, অথচ, তাঁর নিজের পক্ষে হয় ত সেই চেষ্টা সাঙ্ঘাতিক হইতে পারে, কাযেই নীরব হইয়া রহিলেন।

একযোড়া কৃষ্ণসার পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া একটা খণ্ড-যুদ্ধের ক্ষুদ্রাভিনয় করিতেছিল, রাজা আকৃষ্ট দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া তাহাদের কাণ্ড দেখিয়া মধ্যে মধ্যে হাসিতেছিলেন, মধ্যে মধ্যে বলিয়া উঠিতেছিলেন, "ধন্য!" "বাঃ!"—মহামাত্যকে নীরব দেখিয়া নিজেকেই জয়ী বোধে প্রসন্নমুখে মুখ ফিরাইলেন:—"বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে খুব কঠোরতার সঙ্গেই ব্যবহার করা আবশ্যক। এই মুহূর্ত্তে মহাপ্রতীহারকে ডেকে পাঠান, তাঁর মতামত সমস্ত শুনা যাক্, তার পর—ঐ যে! আঃ—নাম করতেই যে আমাদের উপযুক্ত মহাপ্রতীহার মশাই স্বশরীরে এসেই উপস্থিত! এস,

এস, রুদ্রদমন! এইমাত্র আমি তোমার কথাই বলছিলেম। রাজ্যের সংবাদ কি?"

রুদ্রদমন আসিয়া সবিনয়ে নতজানু হইয়া মহারাজাধিরাজকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাইলেন :—"রাজ্যের সংবাদ, মহারাজ, কিছু শুভ, কিছু অশুভও বটে! গত রাত্রে প্রভুর আদেশমত কোষাধ্যক্ষ সাহীলকে বন্দী করা হয়েছে, কিন্তু—"

রাজা সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ, এ ত খুবই সুসংবাদ! সেই ক্ষুদ্র রাক্ষসটির গর্ভ থেকে আশা করি, আমরা যা ফিরিয়ে পেয়েছি, তাতে আমাদের বর্ত্তমান অর্থকষ্ট সম্পূর্ণই বিদূরিত হ'তে পারবে? কি বল হে রুদ্রদমন?"

মহাপ্রতীহার মুখ বিকৃত করিয়া উত্তর করিলেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে তা হবে না রাজাধিরাজ! সাহীল লোকটা বাদুড়জাতীয়, সে যা খেয়েছে, তা একেবারেই শুষে খেয়েছে, কিছু বাকি রেখে দেয় নি, আজ তার পরিবারস্থ লোকেরা কি খাবে, তা পর্য্যন্ত তার ভাণ্ডারে সংস্থান নেই; অথচ কাল যখন তাকে বন্দী করি, তখনও তার গৃহে প্রায় বিশ পঁচিশ জন লোক পানভোজনে আমোদ প্রমোদে নিরত ছিল!"

"ওঃ! তা হ'লে ত কাযটা তেমন ভাল হ'ল না! কি বল হে কুমার? অনর্থক একটা—যাক্, গতস্য শোচনা নাস্তি!—এ শাস্ত্রেই বলেছে। এখন ওটাকে নিয়ে আর বন্দিশালা বোঝাই ক'রে লাভ কি? না হয় ওকে মুক্ত করেই দাও গে।"

কুমার রুদ্রদমন নতমস্তকে রাজাজ্ঞা গ্রহণ করিয়া পরক্ষণে কহিলেন—"কিন্তু এখন আর সাহীলকে মুক্তি দিলেও সে যে আমাদের শত্রুতা ছাড়বে তা সম্ভব নয়; বরং ঐ বিদ্রোহী দলের মধ্যেই নিজের স্থান বাড়িয়ে তাকে পুষ্ট করবে।"—এই বলিয়া রুদ্রদমন সাহীলের গৃহে গতরাত্রে যে যে

ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে সমস্তই বর্ণনা করিলেন, কেবল মহামাত্যের উপস্থিতি জন্ম সুদেষ্ণাকে যে তিনিই উৎকোচস্বরূপে রাজার হাতে সঁপিয়া দিবার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই কথাটিই শুধু চাপিয়া গেলেন। রাজা ঈষৎ চিন্তিত হইলেন। গত রাত্রের আর একটা ভীষণ দুর্ঘটনা, যেটা এখনও তাঁর মনকে থাকিয়া থাকিয়া ঈষৎ পিষ্ট ও ক্লিষ্ট করিয়া তুলিতেছিল, সেই ভয়াবহ কাণ্ডটার কথাই মনে পড়িয়া গেল।

মহামাত্য এতক্ষণ নীরবে থাকিয়া মহাপ্রতীহারের বর্ণনা শুনিতেছিলেন, এতক্ষণে কথা কহিলেন, বলিলেন "বিদ্রোহ দমন সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করেছেন, মহাপ্রতীহার? বিদ্রোহীদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করা হচ্ছে কি না? এ সম্বন্ধে কি কি সংবাদ জান্‌তে পারা গেছে? তাদের সংখ্যা কত, সে সংবাদটা পেয়েছেন ত?"

মহাপ্রতীহার ঘোর অবজ্ঞাসূচকভাবে মুখ বিকৃত করিলেন,—"বিদ্রোহী-দের সম্বন্ধে যেরূপ করা কর্ত্তব্য, সে সমস্তই আমি ইতিমধ্যে স্থির ক'রেই নিয়েছি এবং তার মত সমুদয় সুব্যবস্থাও এতক্ষণ হয়ে যেতে বাকি থাকেনি; এর জন্ম আপনাদের কিছুমাত্র ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। সংখ্যা তাদের যতই হোক, আমাদের সৈন্যসংখ্যা তার অপেক্ষা অন্ততঃ পঞ্চাশ গুণও ত বেশী?"

মহামাত্য কহিলেন, "নৌবল-ব্যাপৃতক যুধিষ্ঠির জাতিতে কৈবর্ত্ত, আমাদের নৌ-সৈনিকদের মধ্যে অধিকাংশই কৈবর্ত্তজাতীয় এবং দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিদ্রোহটা যেন ঐ জাতীয় লোকেদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে বলেই বোধ হচ্চে।—তাই একটু ভয় হয়, মহাপ্রতীহার!"

মহাপ্রতীহার ঘোর বিদ্রূপের সহিত উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন,—হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "ভয় হয়?—তা হ'লে আর উপায় নেই! যজ্ঞোপবীতটী গ্রহণ ক'রে ইষ্টমন্ত্রটী ভক্তিভরে জপ করুন।—তবে এইটুকু

ভরসা রাখবেন যে, যতই যা হোক, পালসাম্রাজ্য এখনও এত দুর্ব্বল হয়নি যে, দু'টো লাঙ্গল-বওয়া চাষার ভয়েই আমাদের মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তে হবে! এতটুকু যদি সহ্য না হয়, তা হ'লে সাম্রাজ্য শাসনের পরিবর্ত্তে আপনার বানপ্রস্থ এবং আমাদের শ্রমণবৃত্তি গ্রহণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ।"

রাজাধিরাজ নৌবলব্যাপৃতক এবং নৌ-সেনা ও সেনানীবর্গের কথায় মনের মধ্যে কিছু অশান্তি অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এক দিকে সাহীল; আর এক দিকে দিব্যোক, ভাগ্যক্রমে এ দুই জনই ঐ একই জাতীয়, যে জাতীয় নায়কের হস্তে পালসাম্রাজ্যের প্রধান বল নৌবল সংরক্ষিত। সাহীলের শ্যালক যুধিষ্ঠির হয় ত এই বিদ্রোহী দলে যোগদান করিলেও করিতে পারে; কৈবর্ত্তদের আর বিশ্বাস নাই! কিন্তু মহাপ্রতীহারের নির্ভীক ও সগর্ব্ব বাক্যে তাঁর সেই ক্ষণিক চলচিত্ততা বিদূরিত হইয়া গেল। প্রসন্ন স্মিতমুখে রাজাধিরাজ কহিলেন,—"যাও রুদ্রদমন! এই বিদ্রোহ দমনের সম্পূর্ণ ভার আমি তোমারই হাতে ন্যস্ত ক'রে দিলেম; এর জন্য যা ভাল হয়, তাই কর। আমায় আর এ সম্বন্ধে তোমরা উত্যক্ত ক'র না, তার চেয়ে বরং আমি একটু—আঃ, দেখ দেখ! রুদ্রদমন! রুদ্রদমন! শীঘ্র যাও, ঐ দেখ, রূপসী বানরীটা শিকল ছিঁড়ে পালাচ্চে। আঃ, একটু যদি ওদের উপর আমার মন দেবার উপায় আছে! রাজা হওয়া যেন চোরদায়ে ধরা পড়া! রাজা হ'লে তার আর ব্যক্তিগত আমোদ বা বিশ্রামের প্রয়োজন থাকবে না?—এযে দেখি মহাবিপদ!—ধরতে পেরেচ? বেশ! এখন ওটাকে আমার কাছে এনে দাওতো ভাই, এই পক্ক রম্ভাটি দিয়ে ওর স্বাধীনতা হরণের ক্ষতিপূরণটা করা যাক্। কি বল? আঃ! দেখ, দেখ, কেমন পরিতোষের সঙ্গে খাচ্চে! মানুষগুলোও যদি ওদের মত এই রকম রম্ভা-প্রিয় হ'ত, তবে জগতের অনেক সমস্যারই সহজ সমাধান হ'য়ে যেতে পারত!"

মহামাত্য এবং মহাপ্রতীহার প্রস্থান করিলে রাজাধিরাজ অনেকখানি সুস্থ চিত্তে তাঁর পারিপার্শ্বিকবৃন্দের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে নিমগ্ন রহিলেন। কাকাতুয়া সকৌতুকে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিল। দোয়েল তাঁর শিষ দেওয়ার অনুকরণ করিল, হরিণ-দম্পতি একত্র আসিয়া তাঁর হস্ত হইতে নবীন দূর্ব্বাদল স্বচ্ছন্দভাবে আহার করিতে লাগিল। রাজাধিরাজ ক্ষণকাল ইহাদের সহিত ক্রীড়া করিয়া প্রসন্নচিত্তে শিষ দিতে দিতে মনে মনে বলিলেন, "উজ্জ্বলা, সুদেষ্ণা, চন্দ্রকলাদের চেয়ে এরাই দেখচি যথেষ্ট নিরাপদ! নাঃ, আর ও পথে নয়। পট্টমহাদেবীর সঙ্গে একটা সন্ধি ক'রে নিতে পারলে মন্দ হয় না! ভাল ক'রে কখন কি ওকে চেয়েও দেখিনি? ও যে অত সুন্দরী, কৈ, এর পূর্ব্বে কখন তা' মনে হয়নি ত!—কি?—আবার কি সংবাদ রুদ্রদমন?"

"রাজাধিরাজ! রাজাধিরাজ! প্রায় এক শত বিদ্রোহী ধরা পড়েছে? বলুন দেখি, এখন তাদের সম্বন্ধে আমাদের কি কর্ত্তব্য?"

রাজাধিরাজ উত্তেজিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—"ধরা পড়েছে! কেমন ক'রে?"

"ওরা রাজসভার দ্বারে এসে উৎপাত করছিল, বলছিল,—আপনার কাছে শেষ উত্তর নিতে এসেছে, সাহীল কি জন্য এমন বিনা বিচারে নিগৃহীত হলেন,—এই হচ্চে তাদের প্রশ্ন!—এর নায়ক হচ্চে নৌ-বল-ব্যাপৃতক যুধিষ্ঠির!"

রাজাধিরাজ ঈষৎ চিন্তিত হইলেন,—"যুধিষ্ঠির! তাকে কিন্তু আমি অসন্তুষ্ট হ'তে দিতে পারিনে। নৌবল আমাদের বিপক্ষে না যায়, এই এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য রাখতে হবে। কি করা যায়, বল ত?"

মহাপ্রতীহার এবার একা আসেন নাই, তাঁহার সহিত মহাসান্ধি-বিগ্রহিক কুমার ভদ্রপাল এবং মহামাণ্ডলিকও আসিয়াছিলেন। মহা-

সন্ধিবিগ্রহিক কহিলেন, "যা করলে আর তাঁর শত্রুতা সম্বন্ধে আমাদের ভয় করবার কোনই পথ থাকবে না, সেই উপায়ই শ্রেষ্ঠ উপায়।"

মহামাণ্ডলিক কহিলেন, "কিন্তু তিনি বিদ্রোহী দলে যোগ না দিয়ে রাজার কাছেই বিচার চাইতে এসেছেন, এটা তাঁর মহত্ত্ব! বিচার চাইবার অধিকার সকলেরই আছে!"

ভদ্রপাল কহিলেন, "সকলের থাক্‌তে পারে, তাঁর নেই! একে বিচার চাওয়া বলে না, আদেশ বলে।"

মহাপ্রতীহার বলিলেন, "ঠিক তাই! এ চাওয়া নয়, আদেশ করা।"

রাজাধিরাজ ঈষৎ উন্মনা হইয়া সন্দিগ্ধভাবে কহিতে গেলেন, "কিন্তু অত বড় শক্তিমান লোকটাকে হঠাৎ আবার এ সময়ে—"

রুদ্রদমন মৃদু হাসিয়া বাধা দিলেন, বলিলেন,—"শক্তিমান বলেই ত আমাদেরও এতটা ভয়-ভাবনা! তা' না হ'লে ত এত সব প্রশ্নোত্তর উঠতেই পে'ত না।"

রাজার মনের মধ্যে তখনও একটুখানি দ্বিধার দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, একটু ইতস্তত: করিয়া বলিলেন, "তা হ'লে কি তোমাদের মতে—"

পুনশ্চ বাধা দিয়া মহাসান্ধিবিগ্রহিক ভদ্রপাল কহিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, আমাদের মতে করতলায়ত্ত শত্রুকে—"

রুদ্রদমন কহিলেন,"সমস্ত বিদ্রোহীকে যদি বন্দী ক'রে আশ্রয় ও আহার যোগাতে হয়, তা হ'লে যারা বিদ্রোহী নয়, তাদেরই নিরাশ্রয় ও অনাহারী হ'তে হবে, তার চেয়ে ও একেবারেই—"

"কিন্তু যদি তাতে নাগরিকরা আরও বেশী অসন্তুষ্ট হ'য়ে—"

"আমাদের পঞ্চদশ সহস্র রাজসৈন্য কি জন্য সর্ব্বদা সুসজ্জিত হয়ে দুর্গদ্বারে রাজ আজ্ঞার প্রতীক্ষা করচে? প্রয়োজন হ'লে আরও অধিক সংখ্যকেরও ত অপ্রতুলতা নেই?"

রাজা কহিলেন, "আঃ, তোমরা যদি এতই শক্তিমান, তা হ'লে এ সব নিয়ে আমায় কেন বিব্রত ক'রে তুল্‌চো? যা ভাল বিবেচনা হয়, নিজেরা করলেই ত পার?—আমি সমস্ত ভার তোমাদের উপরেই ফেলে দিলেম। রুদ্রদমন! যাবার সময় উদ্যানপালককে ব'লে দিয়ে যেও, যেন হীরামনের জন্য পায়স আর কাজলার জন্য আরও কিছু শস্য কণিকা দিয়ে যায়। বাঃ! বাঃ! ময়ূরটা কি চমৎকার পেখম তুলেছে দেখ হে!—নাঃ! ওকে আজ একটা সোনার বালা পুরস্কার না দিলেই নয়! যদিও এইটেই আমার শেষ বালা। আর সব ইতিপূর্ব্বে যত্র তত্র দান করা হয়ে গেছে; অথচ চাণক্য বলেছেন কি না, 'দানে ক্ষয়তি নো বিত্তং'—প্রত্যক্ষ দেখছি যে, নিত্যই তা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্চেই হচ্চে!—অথচ মুখে উচ্চারণ করতে হবে,—'দানে ক্ষয়তি নো বিত্তং'—হাঃ হাঃ হাঃ! একেই বলে মিথ্যা নীতি।"

ভদ্রপাল ও রুদ্রদমন একসঙ্গে উচ্চ হাস্য করিলেন, "হাঃ হাঃ হাঃ! রাজাধিরাজ! যা বল্লেন! চাণক্যের ভুল আপনি ইচ্ছা করলে অমন একশোটাই ধ'রে দিতে সমর্থ! চন্দ্রগুপ্তের পরিবর্ত্তে আপনার মহামাত্য হ'লে তাঁর নীতি শ্লোকগুলি অনেক বেশি সংশোধিত হতে পারতো!—"

রাজাধিরাজ বিস্ফারিত-পুচ্ছ নর্ত্তন-শীল ময়ূরের কণ্ঠ হীরক খচিত সুবর্ণ বলয় দ্বারায় বিভূষিত করিয়া দিতে দিতে ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের সহিত পুনশ্চ কহিলেন, "তা ব'লে কিন্তু এ'ও স্বীকার করবো যে, চাণক্য লোক ভাল!—ওর অনেক কথাই বেশ কথার মত কথা বটে! ঐ যে একটা শ্লোকে ব'লে গেছেন,—'বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু'—এটা আমি বড্ডই মানি। ওদের এখনও কিছুই অন্ত পেলাম না! তা কি নিজের স্ত্রীর, আর কি পরের স্ত্রীদের—"

রাজা একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

মহাপ্রতীহার সহাস্যে কহিলেন, "আর, ঐ—'রাজকুলেষু চ'—এই কথাটা আপনার কেমন মনে হয় ?"

রাজাধিরাজ ক্রূর দৃষ্টি বক্র হাসির সহিত একে একে বন্ধুদ্বয়ের মুখে নিক্ষেপ করিলেন,—"তা' ওটাও বড় মন্দ লাগে না,—আর মিলেও যায় খুব ! ওতে রাজার কথা ত আর বলেনি ? রাজা ব্যতীত যে রাজকুলের আর কেহই বিশ্বাসী নন, সেটা আমার যুগল ভ্রাতা শূরপাল রামপাল তো প্রমাণ করেই দিয়েছেন, আর 'রাজকুলীয়' ব'লে এখন তোমাদের দু'জনকার সম্বন্ধেও একটু একটু সন্দেহ আছে, হে !"

কুমার রুদ্রদমন অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইলেন। পরে কহিলেন, "ধৃত-বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে তাহলে—"

"ও, হ্যাঁ,—তা' সে তোমরা যেমন ভাল বোঝ করবে,—আমিত ও সম্বন্ধে হাত ধুয়েই ফেলেছি। পুষ্পরাণি ! পুষ্পরাণি ! পুষ্ ! পুষ্ ! পুষি ! আয়, আয়, এদিকে আয়—"

রাজাধিরাজ একটী গান্ধার দেশজ অত্যন্ত সুশ্রী শ্বেত বিড়ালীকে তার আদরের নাম ধরিয়া সস্নেহে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সমস্ত দিন দুঃসংবাদের আঘাতে আতঙ্কিত ও ত্রস্তভাবে যাপন করিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মহাদেবী একটুখানি অন্যমনস্ক হইবার জন্য সন্ধ্যারাণীর মহলে প্রবেশ করিলেন।

দুঃসংবাদ বাতাসে ভর দিয়া চলে, এই প্রায় নির্জ্জন পরিত্যক্ত পুরী-মধ্যেও ইহার প্রবেশ পথে বাধা পড়ে নাই। সন্ধ্যা শীর্ণদেহে মলিন বস্ত্রে রুক্ষ কেশে সন্ধ্যাচ্ছায়ার প্রায় মিলাইয়াই গিয়াছিল, আজ আবার তাহাকে

সমধিক শুষ্ক দেখাইতেছে। ক্ষুদ্র শিশুটিকে কোলে লইয়া সে উৎকর্ণ ভাবে মধ্যে মধ্যে দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, মনে মনে বোধ করি পট্টমহাদেবীরই প্রতীক্ষা সে করিতেছে। নিজের জন্য তার আর মনের মধ্যে ইহলোকের ভয় ভাবনা কোন কিছুরই প্রবেশ পথ ছিল না, কিন্তু এই যে ক্ষুদ্র শিশু, ইহার জন্য আবার তাকে যে জগতের সম্পদ-বিপদের সকল সংবাদেই উৎকণ্ঠিত হইতে হয়। তার উপর দিদি যে বলিয়াছেন, এই শিশু একদিন তার পিতার সাম্রাজ্য-বর্দ্ধনের প্রধানতম সহায়স্বরূপ তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইবে। ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে না পারিলে হয় ত এ সকল স্বপ্নই বিফল হইয়া যাইবে। তাই এতদিনকার নিশ্চেষ্ট নিস্পৃহ অর্দ্ধ চেতন সন্ধ্যা আজিকার এই আসন্ন বিপদের ভয়ে সহসা মূর্চ্ছাবসিত হইয়া উঠিয়াছিল। একদৃষ্টে তখনও স্বপ্ন সুখে সহাস্য, ফুল্ল কমল তুল্য সুন্দর কান্তি রাজ শিশুটির মুখ পানে অপলক দৃষ্টি মেলিয়া শঙ্কা-ম্লানমুখে বসিয়াছিল।

মহাদেবী আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন।

"খুকুটা কেমন আছে রে? সারাদিন আজ একটিবারও ওকে দেখতে আসতে পারিনি—"

"ওকে তুমি আর ভালবাস না—।"

"ঠিক বলেচিস্! তোকে বুঝি বাসি? নে' দে' দেখি একবার কোলে নিই।—বাঃ, কি মিষ্টি হাসচে! দেয়লা করচে ঘুমুতে ঘুমুতে। দেখ্ রাণি! এর মুখখানা ঠিক এর বাপের মত! না?"

"হবে।"—বলিয়া সন্ধ্যা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিল।

"দিদি!"

"কি রে?" মহাদেবী শিশুকে বুকে চাপিয়া চুমু খাইয়া গভীর স্নেহে

নিজের অশান্ত চিত্তকে ঈষৎ প্রশান্ত করিয়া লইবার জন্য তাহারই প্রতি নিবিষ্ট হইলেন।

"দিদি!"

"বল্ না"—বলিয়া লজ্জাদেবী শিশুকে আদর করিতে লাগিলেন।

"শুন্‌চি না কি প্রজারা বিদ্রোহী হয়েচে? তা হ'লে খোকার কি হবে দিদি? তারা যদি ওকে—" সন্ধ্যা শিহরিয়া উঠিয়া চুপ করিল।

লজ্জাদেবী শিশুকে সবলে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কি একটা বলিতে গেলেন, এমন সময় মহল্লিকা ভীত ও বিস্ময় ত্রস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া জানাইল,—রাজাধিরাজ!

উভয় রমণীই এ সংবাদে সভয়ে ও সাশ্চর্য্যে চমকিয়া উঠিল। রাজাধিরাজ এইখানে? এই তাঁর চির নিগৃহীত অনাদৃত নির্ব্বাসিত ভাইএর মন্দিরে—তাঁর পরিত্যক্ত অন্তঃপুরে! এ কি অসম্ভব সম্ভব! কিসে আজ এ অঘটন ঘটাইল? না জানি, সে কত বড়ই দুর্দ্দৈব!

"মহাদেবি!"

"মহারাজাধিরাজ!"

"রাজকোষ আজ অর্থশূন্য—রাজান্তঃপুরেও কি আর—"

"বা—ব্বা!—বাব্বা!—"

রাজাধিরাজ তড়িৎ-স্পৃষ্টের ন্যায় সহসা এই নব বসন্তে প্রথম কুজিত পাপিয়া কণ্ঠের মতই অস্ফুটবাক্ শিশুর প্রথমোচ্চারিত পিতৃসম্বোধনে সমস্ত দেহে মনে শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন, মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই চোখে পড়িল, একটি নবমল্লিকার অম্লান স্তবকতুল্য অপূর্ব্ব সুন্দর শিশু-কন্দর্প! মহাদেবীর অঙ্ক হইতে দুই বাহু বাড়াইয়া শিশু তাঁর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া যেন কোন অজ্ঞাত শক্তির প্রেরণায় আধ আধ কল স্বরে তাঁহাকে ঐ সম্ভাষণ করিতেছে। তিনি চাহিয়া দেখিতেই লহর তুলিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

এই অশ্রুতপূর্ব্ব অজ্ঞাত সম্ভাষণে সহসা মহীপাল চমকিয়া উঠিলেন। তাঁর বুকের মধ্যে—সর্ব্বশরীরের শিরাসমূহের মধ্যে, তাঁর স্নায়ু পেশীর মধ্যে তাঁর শোণিত ধারার ভিতরে ভিতরে একটা উৎকট তীব্র আনন্দের সুবিপুল শিহরণ তাঁর সমস্ত দেহ মনকে যেন নিমেষের মধ্যে প্লাবিত করিয়া দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেল। তিনি যেন কোন অচ্ছেদ্য সম্মোহন শক্তির প্রভাবে নিবদ্ধ হইয়াই নিজেরও সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে শিশুর দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আসিলেন, এবং তার দিকে ব্যগ্রভাবে উভয় বাহু বিস্তৃত করিয়া দিলেন। ক্ষুদ্র শিশু উচ্চ কলধ্বনিতে [illegible] রব করিয়া জ্যেষ্ঠতাতের সেই প্রসারিত বাহুমধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ি[illegible] এবং যেন চিরপরিচয়ের বিস্ময়হীন সুপ্রফুল্ল স্মিত দৃষ্টিতে তাঁহা[illegible] নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

মহীপাল ধীরে ধীরে উহাকে নিজের শঙ্কা-ব্যাকুল উদ্বে[illegible] কম্পিত বক্ষতলে চাপিয়া ধরিয়া মন্ত্রসম্মোহিতের মতই সস্নেহে চুম্বন করিলে[illegible]

"মহাদেবি! রামপাল শিশু বয়সে ঠিক এরই মত ছিল—

তাঁর কণ্ঠ ভেদ করিয়া আজ এই একান্ত অসময়ে—বড় অসময়েই সহসা একটা দীর্ঘনিশ্বাস সেই বিতাড়িত অভাগার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া আসিল।

মহাদেবীর দুই নেত্র উত্তপ্ত অশ্রু-নির্ঝরের সহসা আত্মপ্রকাশ চেষ্টায় জ্বালা করিয়া উঠিল, তিনি প্রাণপণে তাহাই রোধ করিতে সচেষ্ট হইলেন। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সন্ধ্যারাণী বিবশা হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাজার আজ অনেক কথাই মনে পড়িল। এই দীনা মলিনা ভিখারিণীর মতই দুঃখিনী রাজবধূর প্রতি যে তাঁর দিক হইতে কত বড় অবিচার ও অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, তাহা মনে পড়িয়া চিত্তকে তাঁর পীড়িত করিয়া তুলিল। তার পর যে কথা গতকল্য হইতে এই বিদ্রোহের

আরম্ভাবধিই বারে বারে মনে হইয়াছে, সেই আজিকার সর্ব্বপ্রধান সমস্যার কথাটাই আবার এ সময়ে মনের অগ্নিতে ইন্ধন প্রদান করিতে লাগিল। রামপাল এ সময়ে থাকিলে হয় ত এ বিদ্রোহ-দমন কত সহজেই হইত! শূরপাল মগধের মহাসামন্ত পদে থাকিলে হয় ত এই ভীষণ অর্থাভাব ঘটিত না। মগধের রাজস্ব আজ বর্ষকাল ধরিয়া একটি কপর্দ্দকও যে পাওয়া যায় নাই। হয় ত তাঁহারই প্রকাণ্ড ভুলের এ ভয়াবহ পরিণাম! রামপাল শূরপাল আদৌ তাঁর শত্রু নহে। কিন্তু আজ কোথায় তারা? জীবিত না মৃত?

মহারাজ সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন।

"মহাদেবি!"

"রাজাধিরাজ!"

"অন্তঃপুরে কি আর কিছুই অবশেষ নেই? তবে কি উপায়ে—"

রাজাধিরাজের বাক্য সমাধা হইল না। সহসা অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত তিনি দেখিলেন, সেই অবগুণ্ঠনবতী রাজবধূ ধীরে ধীরে নিজের কণ্ঠ হইতে ব্যবহার মলিন রত্নহার, হস্ত হইতে শঙ্খবলয় মাত্র রাখিয়া বাজুবন্ধ, স্বর্ণকঙ্কণ দুটী মোচনপূর্ব্বক রাজার চরণতলে স্থাপন করিল।

মহীপালদেব কশাহতবৎ চমকিত হইয়া উঠিলেন।—আর্ত্তস্বরে কহিলেন,—"না মা! না,—মা! এ আমি নিতে পারবো না,—ওঃ,—সুগত!—"

মহীপালদেব দ্রুতপদে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁর অনুতাপ দীর্ণ অন্তরেরও অন্তঃস্থল হইতে আর্ত্ত ধ্বনিতে যন্ত্রণার্ত্ত রবে ধ্বনিত হইয়া উঠিল,—"কোথায় তুমি রামপাল! শূরপাল! কোথায় আজ তোমরা? ভাইয়েরা আমার! এ অসময়ে তোমরা কোথায়?"

মহাদেবী শিশুকে ফিরাইয়া দিয়া বিষণ্ণ ম্লান মুখে স্বামীর অনুসরণ

করিলেন, আর সন্ধ্যা অঙ্ক স্থিত রাজ-শিশুকে অশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিতে করিতে বিদ্ধ-বক্ষ বিহঙ্গীর মতই গুমরিয়া গুমরিয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল ;—"রাজার এ অসময়ে,—রাজ্যের এ বিপৎপাতে কোথায় রৈলে —তবে কি তুমি নেই ?"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রুদ্র যখন তাঁর তূর্য্যধ্বনি করিয়া মানুষকে ডাক দেন, তখন সে ডাকে সাড়া না দিবে, কে' এমন বধির আছে ? ঈশানের মৃত্যু-বিষাণ ঘোররবে দিকে দিকে বাজিয়া উঠিতেছিল, আর সকল দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়িয়া দলে দলে পৌণ্ড্র-নাগরিক সেই সঘনে আহ্বানিত মৃত্যু-আহবে ঝাঁপ দিতে ছুটিয়া চলিতেছিল। মরণকে এমন করিয়া হাসিমুখে বরণ করিয়া লইতে পারা যায়; এমন কথা কি কোন দিনই ভাবিতে পারা গিয়াছে ? অথচ সময় আসিতেই দেখা গেল, বিবাহ সভার আনন্দোৎসবে যোগ দিতে তাদের যতটুকু বিলম্ব ঘটে, ইহাতে তাহাও হইল না। সবাই যেন এই ডাকের মত ডাকেরই জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিল, যেমনই ডাক পড়িয়াছে, অমনই শুধু উঠিয়া আসা !

নিশ্চিন্ত সুষুপ্ত নগরবাসীর জীবন যেন সহসা মরণবিহারে মাতিয়া মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল। ভয় আর সঙ্কোচ এ দুইটাকেই যেন ইহারা ইহাদের মনের ভিতরের সীমা হইতে ঝাঁট দিয়া পুরাতন আবর্জ্জনার রাশির মতই বিদায় করিল। "যুদ্ধং দেহি" এই শব্দটাই যেন ইহাদের সকলকারই মনের ভিতরের একটি মাত্র সম্মিলিত ভাষা। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনীয় আকাশে বাতাসে প্রকৃতির প্রতি স্বরে স্বরেই যেন গঞ্জিত, নন্দিত ও শব্দিত হইতেছিল,—

"যুদ্ধং দেহি।"

কৈবর্ত্ত নাগরিক প্রধান দু'জনকার এক সঙ্গে রাজপক্ষ হইতে যে বিপৎপাত ঘটিয়া গেল, সেই দুইটি ঘটনাকে একই কারণসম্ভূত ধরিয়া লইয়া প্রায় সমুদয় কৈবর্ত্ত নাগরিক রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি রাজভক্ত বরেন্দ্র প্রজা এততেও রাজভক্তি বিস্মৃত হয় নাই, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কয়েকজন দেশমুখ্য ব্যক্তি একত্র হইয়া রাজ-সাক্ষাৎকারের জন্য প্রাসাদদ্বারে আসিয়াছিল; রাজারই বিরুদ্ধে তাহারা রাজার কাছেই বিচারপ্রত্যাশী।

ইহার পর রাজপ্রতিনিধি স্বরূপে মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাপ্রতীহার প্রভৃতি যখন সেই শতসংখ্যক নিরস্ত্র দেশমান্য বিচারপ্রার্থীকে সহস্র সহস্র সৈন্যবেষ্টিত করিয়া বন্দী করিলেন এবং বিনা বিচারে একসঙ্গে সেই শত শীর্ষ সৈনিকের তীক্ষ্ণধার কৃপাণতলে ডালি দেওয়া হইল, তখন আর কোন কিছুকেই কেহ মানিতে পারিল না ; শোণিত গন্ধে রক্তপিপাসু জীব যেমন মাতিয়া উঠে পৌণ্ড্র নাগরিক তেমনই করিয়াই প্রমত্ত হইয়া উঠিল।

রাজাধিরাজ ঈষৎ ভীত হইয়া বলিলেন, "আমার নৌবাহিনী ওদেরই হাতে, ওরাও যখন যুদ্ধ ঘোষণা করলে, এখনও না হয় ওদের একটু শান্ত ক'রে দেখলে হ'ত না ? দণ্ডমাধব ! তোমার কি মত ?"

দণ্ডমাধবের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মহাসান্ধিবিগ্রহিক বলিয়া উঠিলেন, "মহাসেনাপতি কয়েকটা নাগরিক আর জন কতক নাবিকের ভয়ে রাজাকে তাঁর নগণ্য প্রজাদের কাছে পরাভব স্বীকার করতে বলবেন, এ ত আমরা কোনমতেই মনে করতে পারিনে ! কি বল হে দণ্ডমাধব ! এ ও কি সম্ভব ?"

মনের মধ্যে ঈষৎ সংশয় রাখিয়াই উপহাস্যাস্পদ হইবার ভয়ে মহাসেনাপতি বাহ্য সাহসের সহিত উত্তর করিলেন,—"আমরা বেঁচে থাকতে

মহারাজাধিরাজকে ঐ ক'টা ক্ষুদ্র নাগরিককে ভয় করতে হবে? এর চেয়ে মরণই ভাল!"

মহাপ্রতীহার, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহামাণ্ডলিক সমস্বরে প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, মহাসেনাপতি! এর চেয়ে মৃত্যু ভাল! কৈবর্ত্তর কাছে হার স্বীকার করবে ক্ষত্রিয়!—সহস্র বার মৃত্যু ভাল!"

ফলে যাহা ভাল, তাহাই ঘটিল। দণ্ডমাধব তাঁর অর্দ্ধবিদ্রোহী সেনাদল লইয়া প্রাণপণ শক্তিতে শত্রুপক্ষকে বাধা দিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ভীমের অধিনায়কতায় সমস্ত কৈবর্ত্ত, বাগ্দী এবং যথেষ্ট পরিমাণে অত্যাচার পিষ্ট ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নাগরিকও একত্রিত হইয়া একটা বিরাট বাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছিল, দিনে দিনে এই নব নির্ম্মিত বিপক্ষ সৈন্য বর্দ্ধিত-শক্তি হইয়া গ্রামের পর গ্রাম ও নগর অধিকার করিয়া লইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের তোরণদ্বার অবরোধ করিল। রাজপক্ষীয় নগরবাসী শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া আর নগরীর বাহিরে গমনাগমন করিতে সমর্থ রহিল না।

পট্টমহাদেবী এ সংবাদের পর আর ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারিলেন না, রাজাধিরাজের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "এখনও ক্ষান্ত হ'ন রাজাধিরাজ! এখনও কৈবর্ত্ত নায়ককে ডাকিয়ে এনে ক্ষমা চেয়ে নিন, শুনেচি, ভীম ক্ষমাশীল, হয় ত সে ক্ষমা করতেও পারে। না হয়, চলুন, আমরা তীর্থবাসে যাই, যুদ্ধ করলে পরাজয় যে সুনিশ্চিত, সে ত দেখতেই পাচ্চেন?"

যুদ্ধে পরাজয় যে নিশ্চিত, রাজাধিরাজও তাহা বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু কু-আশা এবং কু-পরামর্শ ইহারা তখনও তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। মন্ত্রিদল বুঝাইতেছিল, দণ্ডমাধব মরিলেও রুদ্রদমন ভদ্রপাল, বুদ্ধবন্ধু, সর্ব্বজিৎ আছে, ভয় পাইবার মত এমন কিছু ঘটে নাই। একমাত্র সেনা-

নায়কের উপর নির্ভর করিয়া কেহ কখন যুদ্ধ করে না। ধর্ম্মপাল প্রথম মহীপাল ইঁহাদেরও সেনাপতিরা অমর ছিল না।

রাজা কহিলেন, "তীর্থবাসের ইচ্ছা হয়ে থাকে, তুমি যেতে পার, আমার আপাততঃ তীর্থযাত্রার অবসর নেই ;—তোমার পরামর্শটি দেখি ভাল! আমি ত ভিক্ষুব্রত নেবো, রাজা হবেন কি'নি শুনি? রামপাল না ভীমচন্দ্র? একেই বলে 'স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী'!"

দ্বিতীয় যুদ্ধে মহাসান্ধিবিগ্রহিকের পতনে এইবার যথার্থ ই ভীত হইয়া রাজাধিরাজ মহাদেবীর নিকটে ছুটিয়া আসিলেন, "সত্য সত্যই বুঝি আমাদের প্রব্রজ্যা নেওয়া ভিন্ন আর উপায়ান্তর নেই মহাদেবি! একা রুদ্রদমন আর কত দিক্ রক্ষা করবে? শিক্ষিত সেনানায়ক যদি আর একটি মাত্রও পেতেম! কি হবে, লজ্জা! কেউ ত আমার নেই। আঃ রামপাল! শূরপাল! মহাদেবি! তারা কি বেঁচে নেই? বেঁচে থেকেও কি তারা বরেন্দ্রীকে, কৈবর্ত্তের হাতে পরাভূত হ'তে দিচ্চে? ভাই হয়ে কি এত বড় প্রতিশোধ নে'বে? না না, তা' পারবে না, হয় তারা ফিরে আসবে,—না হয় তারা ম'রে গেছে!"

"রাজাধিরাজ!"

"বল, বল? আমার মন্ত্রী নেই, সেনাপতি নেই, বন্ধু নেই, কেউ নেই, না না, রুদ্র—রুদ্রদমন আছে, প্রাণপণ করচে, করবেও শেষ পর্য্যন্ত,—কিন্তু বিদ্রোহীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে উঠছে, আমার সৈন্যরা অনিচ্ছুক—অশিক্ষিত। দণ্ডমাধব ওদের ভাল ক'রে যুদ্ধ-শিক্ষাও দেয়নি, আর যুদ্ধও ত দেশে ছিল না, ব'সে ব'সে অলস হয়েও গেছে।—একজন ভাল সেনা-নায়ক না পেলে—"

"রাজাধিরাজ! অমাত্যপুত্র বোধিদেবকে এ সময় কষ্টাগার থেকে উদ্ধার ক'রে যদি—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক! বোধিদেবকে কষ্টাগার থেকে উদ্ধার ক'রে যদি সেনাপতিত্ব দিই? ঠিক বলেছ মহাদেবি! বীর সে, চিরমঙ্গলাভিলাষী! কিন্তু এর পর,—এ সময়ে সে কি আর আমার পক্ষ হয়ে—অসম্ভব! এখন তাকে ছেড়ে দিলেই সে আমার বিপক্ষে দাঁড়াবে।"

মহাদেবী কহিলেন, "রাজাধিরাজ! যোধদেবের ছেলে বোধিদেব তাঁর শেষ রক্ত বিন্দু থাকতে তা' পালসম্রাটের জন্যই দান করবে, এর চেয়ে আর সত্য হয় না। আপনি তাঁকে মুক্ত করিয়ে আনিয়েই দেখুন।"

মহীপালের হতাশাক্ষিপ্ত অন্তরও আজ এ কথা বিশ্বাস করিল। তাঁর নিজের মনেও বোধিদেবের কথা উদিত হইয়াছিল, এই বোধিদেব এক দিন তাঁহাকে মনুষ্যত্বের—সত্যের পথে ফিরাইতে প্রাণপণ করিয়াছিল, তার ফলে সে এই সুদীর্ঘকাল যমালয় সদৃশ যন্ত্রণাকর কষ্টাগারে অতিথি! রাজা বোধিদেবের মুক্তিপত্র সহিত দ্রুতগামী রাজপুরুষ প্রেরণ করিলেন।

একখানি নরকঙ্কালের মতই ছায়াবশেষ মূর্ত্তি বোধিদেব আসিয়া রাজাধিরাজকে আশীর্ব্বাদ জানাইলেন। তাঁর ক্লেশশুষ্ক জীর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া রাজাধিরাজের বক্ষে লজ্জার ব্যথা এবং চক্ষে জল দেখা দিল।

"বোধিদেব! বড় বিপন্ন আমি, আমার সেনাপতি, মিত্রগণ, সৈন্যদল সবই প্রায় শেষ হয়ে গেছে—বরেন্দ্রীও যায় যায়, এ সময়ে আমায় রক্ষা করো, আমায় দয়া করে ক্ষমা করো।"

বোধিদেব কষ্টাগার হইতে রাজপ্রাসাদে আসিবার সময়েই নগরীর ছন্নছাড়া দশা ও নাগরিকগণের ভীত ত্রস্ত ভাব লক্ষ্য করিয়াই আসিয়াছিলেন। পণ্যশালার সমুদয় ক্রয় বিক্রয় বন্ধ, দোকানগুলি রুদ্ধদ্বার, রাজপথচারী জনগণ কদাচিৎ পথ চলিতেছে; চিরশব্দায়মান যানবাহন ও পথচারী সহস্র সহস্র জন দ্বারা অধ্যুষিত রাজমার্গ জনহীন ও নিস্তব্ধ। কোন একটা ভয়াবহ ঘটনা যে ঘটিয়া গিয়াছে, অথবা ঘটিবার জন্য প্রতীক্ষা

করিয়া আছে, উহা অনুমান করিয়াই মহামাত্যপুত্র প্রশ্নহীন নীরব বিস্ময়ে পথ অতিবাহন করিয়া আসিয়াছিলেন। রাজবাক্যে বর্দ্ধিত-বিস্ময় হইয়াও অদম্য কৌতূহলকে দমনে রাখিয়া ধীরবাক্যে কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ! আমরা পুরুষানুক্রমে আপনার বংশের কল্যাণকামী মিত্র, আমার এ দেহে শোণিতবিন্দু প্রবাহিত থাকতে আপনি সকল অবস্থাতেই অন্ততঃ একজন মাত্র মিত্রের সহায়তা লাভ করতে পারবেন, এ কথা নিশ্চিতরূপে জানবেন। এখন বলুন দেখি, বরেন্দ্রী কিসে বিপন্ন? প্রবলপ্রতাপ পাল-সম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'বার যোগ্যতা কার হয়েছে?"

রাজাধিরাজ এই উত্তরেই তাঁর অন্তরের শেষ সংশয়কে নিশ্চিন্তে বিলোপ পাইতে দিয়া ঈষৎ আশ্বাস-প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, "আমার প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে, সমস্ত নৌবল এদের হাতে, সেনাপতি দণ্ডমাধব ভদ্রপাল, বুদ্ধবন্ধু যুদ্ধে হত, সমস্ত অভিজাতবৃন্দই প্রায় একে একে সমরশায়ী, একমাত্র মহাপ্রতীহার অবশিষ্ট অনিচ্ছুক সৈন্যদল সাজিয়ে প্রাণপণে তাদের বাধা দিচ্চেন। জানি না, আর কতক্ষণ সমর্থ হবেন; এ সময় তোমার সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তুমি যে রকম দুর্ব্বল ও—"

বোধিদেব গভীর বিষাদের মধ্য হইতেও ক্ষীণ হাসি হাসিলেন, কহিলেন, "এ দুর্ব্বলতায় কোন ক্ষতি হবে না, রাজাধিরাজ! এখনও এ বাহু সহস্রের মুণ্ডপাতে সমর্থ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ প্রজাদ্রোহের অধিনায়ক কে? রামপাল?—কোথায় রামপাল?"

"কোথায় রামপাল? আমিও তোমায় এই প্রশ্নই করতে চাইছিলেম, বোধিদেব! যখন তাকে তুমি মুক্ত ক'রে দিয়েছিলে, সে কি তোমায় তার গম্যস্থানের কোন—"

"যখন তাকে মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেম? আমি ত তাকে মুক্ত করে দিইনি, রাজাধিরাজ! মাত্র মুক্তিদাতার হাতে আপনার কাছে পাওয়া

আদেশপত্রটিই দিয়েছিলেম, দেখা তার সঙ্গে ত আমার হয়নি। আপনি কি সেই পর্য্যন্ত তার কোন সংবাদই পাননি? এ বিপ্লব কি তবে রামপালের নেতৃত্বাধীনে নয়?"

রাজাধিরাজ কহিলেন, "না, এ বিদ্রোহের নায়ক প্রধানতঃ কৈবর্ত্ত দিব্যোক বা ভীম।—কিন্তু কোথায় রৈল শূরপাল, রামপাল? যদি তারা এ সময় আসতো!"

বোধিদেব গভীর দীর্ঘশ্বাস্ মোচন করিলেন, "নিশ্চয় তারা বেঁচে নেই। নতুবা বরেন্দ্রীর এই বিপদে—"

রাজাধিরাজ কহিলেন, "কিন্তু এ'ও ত হ'তে পারে, আমার প্রতি অভিমানে তারা আমার বিপদের সংবাদ জানতে পেরেও নির্লিপ্ততায় নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে, আমারই কাছে তারা কিসের ঋণে ঋণী যে, তাই শোধ করতে এই বিপদের অগ্নিশিখায় ঝাঁপ দিতে আসবে? বোধিদেব! তোমার সে দিনের তিরস্কার আজ আমার দুই কানের কাছে অগ্নিবর্ষণ করচে। সে দিন যদি তোমার পরামর্শে চলতে পারতেম, আজ যদি রামপাল আমার সহায় থাকতো—"

"রাজাধিরাজ! রাজাধিরাজ! প্রভু! অতীত অপগত, কিন্তু ভবিষ্যৎ এখনও আমাদের অধীনস্থ। যদি কিছুমাত্র অবসর থাকে, আবার এই পালসাম্রাজ্যের স্খলিত-প্রায় শাসনদণ্ড সাম্রাজ্যের এই চির দাসানুদাস তার প্রাণপণ শক্তি দিয়ে তা' সাম্রাজ্যেশ্বরের হাতে তুলে দেবে, হয় ত রামপাল এখনও বেঁচে আছে; হয় ত এ বিপৎ-সংবাদ সে জানতে পারে নি। হয় ত এই মুহূর্ত্তেই সে এসে—"

"রাজাধিরাজ! রাজাধিরাজ! আর আমাদের রক্ষার কোন উপায়ই নেই! আমার শেষ সৈন্যদল বিদ্রোহী হয়ে বিপক্ষপক্ষে যোগ দিয়েছে, আমার হতাবশিষ্ট রক্ষী-সৈন্য প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রে একটির পর একটি

ভূমিশয্যা গ্রহণ করছে, হয় ত এতক্ষণ তাদের আর দশটিও বাকি নেই,—আর আমারও শেষ হয়ে এসেছে! যদি বাঁচতে চান, এই মুহূর্ত্তে গুপ্তদ্বারপথে বেরিয়ে পড়ুন,—যান—যান, আর দেরি নয়। ওঃ! কি যন্ত্রণা—! পিঠের বুকের বড় বড় ক্ষত দিয়ে রক্ত ছুটচে! আর বেশীক্ষণ নয়!—ও কি দাঁড়িয়ে আছেন?—এখনও? তবে কি আর বাঁচতে ইচ্ছে নেই?—শীঘ্র পালান, শত্রুদল প্রাসাদ অধিকার ক'রে নিয়েছে এখনই এখানে এসে পড়বে।"

"রুদ্রদমন! রুদ্রদমন! চিরসুহৃৎ! প্রিয়বন্ধু! তুমিও আমায় ছেড়ে চল্লে! আমার কেউ রইলো না! হা বুদ্ধ! এ কি করলে!—"

"না, কেউ রইলো না! কে থাকবে? আপনি নিজেই কি থাকবেন,—এমন নিশ্চেষ্ট থাকলে? আমার যে আর শক্তিবিন্দুও বাকি নেই। শুধু আপনার জন্তেই কোন মতে মৃত্যুকে রোধ ক'রে এত দূরে ছুটে এসেচি। কে? অমাত্যপুত্র বোধিদেব না? ব্রাহ্মণ! তোমারই হাতে আমি পালসাম্রাজ্যের অধীশ্বরকে দিয়ে গেলেম! উঃ! আর হয় না!—আর পারি না। বিদায়—রাজাধিরাজ! বিদায়—বিদায়—বিদায় পৃথিবী—"

মহাপ্রতীহার কুমার রুদ্রদমন তাঁর একনিষ্ঠ প্রভুভক্ত জীবনের পরিসমাপ্তি করিলেন। ভাল হউক, মন্দ হউক, নির্ব্বিচারে প্রভুধর্ম্ম ইনি আজীবনই পালন করিয়া গিয়াছেন। জীবনের শেষ ক্ষণেও ঐ একই চিন্তা—একই কর্ত্তব্যবোধ লইয়াই চলিয়া গেলেন।

তাঁর প্রাণহীন রক্তাপ্লুত শরীরের দিকে অশ্রুপ্লুত আনতনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া রাজাধিরাজ বিলাপপূর্ণ কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—

"রুদ্রদমন! তবে আমাকেও যেতে হবে! আর আমার কোন আশা নেই—"

বোধিদেব রাজার হাত ধরিলেন, "আশা এখনও সম্পূর্ণই আছে।

আশা নেই কেন মনে করচেন? আসুন, আপাততঃ আমরা প্রাসাদ ত্যাগ ক'রে গুপ্তপথে তারাদেবীর মন্দিরে আশ্রয় নিই গে। তার পর আমি নিশ্চয়ই নাগরিকদের মন ফিরিয়ে তাদের আমাদের পক্ষভুক্ত করতে পারবো। কিন্তু এখানে আর দেরি ক'রে কায নেই, রাজাধিরাজ!"

রাজাধিরাজ আবার নূতন আশায় ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। "পারবে বোধিদেব? তা' হয় ত তুমি পারতে পার! তোমার কথায় পাষাণ গ'লে যায়, তারা ত মানুষ। তবে তুমি মহাদেবী ও অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে এস, আমি এইখানে তোমার অপেক্ষায় রইলেম। একটা গুপ্তপথ এরই সন্নিকটে আছে।"

বোধিদেব দ্রুতপদে অন্তঃপুরের অভিমুখে প্রস্থান করিলে, রাজাধিরাজ ধীরে অগ্রসর হইয়া মহাপ্রতীহারের প্রাণহীন শবদেহের নিকটে ভূতলে জানু পাতিয়া বসিলেন। তাঁর দুই চোক দিয়া তখন দ্রুত ধারে উষ্ণ অশ্রুর নির্ঝর বহিতে লাগিল। ধীরে ধীরে মৃদুস্পর্শে তাঁর মৃত্যুকালিমাচ্ছন্ন ললাট স্পর্শ করিলেন; শোণিতসিক্ত বক্ষোবাস সাবধানে অপসৃত করিয়া নিশ্চল হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা করিলেন, তার পর হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া কহিলেন,—

"হায় প্রিয়বন্ধু! প্রিয়তম সখা আমার! আমার জন্যই এ অসময়ে প্রাণ দিলে! উঃ, কি কালসাপিনীকেই তোমায় ধ'রে আনতে আদেশ দিয়েছিলেম রে! বিষে জর্জ্জরিত হয়ে পালসাম্রাজ্য আমার ছারখার *হয়ে গেল!"*

"এই দিকে ভীম!—এই দিকে—" এই বলিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তীকে আহ্বান পূর্ব্বক সহসা সেই রাজকীয় কক্ষমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল দিব্যোক এবং তার পশ্চাতে অসংখ্য বিজয়োন্মত্ত সৈন্যদল সহিত উন্মুক্ত তরবারিহস্তে রক্তনেত্র উদ্ধতমূর্ত্তি ভীম।

মহীপালদেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ভীম নীরবে অগ্রসর হইয়া আসিল।

মহীপাল দুই পদ পিছাইয়া গিয়া ভীমের ভীম গম্ভীর মুখের দিকে চাহিলেন,—

"আমি যদি সিংহাসন ছেড়ে দিই? প্রব্রজ্যা নিয়ে চ'লে যাই?"

ভীমের হাতের অর্দ্ধোত্থিত মুক্ত কৃপাণ মধ্য পথেই নত হইয়া আসিল।

দিব্যোক ডাকিলেন,—"ভীম!"

"জ্যেঠামশাই?"

দিব্যোক কহিলেন, "গুরুমন্তর ভুলে যাচ্ছ না ত? মন্তর ভুল্লে সাধকেরও সঙ্গে সঙ্গেই পতন!"

"ভুলিনি জ্যেঠামশাই! পালসাম্রাজ্যের উচ্ছেদ আমাদের মূলমন্ত্র!—সম্রাটকে প্রাণভিক্ষা দিলেম—"

"জড় রেখে ডাল ছেঁটে দেওয়ার নাম উচ্ছেদ নয়—ভীম! মনে পড়ে মৃত্যুযাতনার আর্ত্তনাদে সেই পাষাণ-গলান বিলাপ কাতরতা? মনে পড়ে মা'কে আমার কোন্ নির্ম্মম কাপুরুষ, কোন্ মনুষ্যাধম মহাপাপী তার সুখের, সাধের, গৌরবের পর্ণশালা থেকে জোর ক'রে টেনে এনে একা অসহায় নিষ্ঠুর মরণে মরতে দিয়ে পালিয়ে এসেছিল? ক্ষমা? ক্ষমা করতে চাও তাকে? এ পাপের ক্ষমা—আ—ছে?"

ভীম স্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পর বলিল, "কিন্তু প্রাণভিক্ষা চাওয়ার পর—"

"বৌমা কি এই পাষণ্ডের পায়ে ধ'রে মুক্তিভিক্ষা করে নি? এ কি তা' তাকে দিয়েছিল?"

ভীমের দুই চোখ অগ্নিদীপ্ত হইয়া উঠিল।

মহীপালদেব ততক্ষণে আত্মসংবৃত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি

বারেক ঘৃণাপূর্ণ তাচ্ছীল্যভরে দিব্যোকের দিকে চাহিয়া সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে ভীমকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—

"এই ঘরে বসে এক দিন যার ভিক্ষার আবেদনে পদাঘাত ক'রে, যাকে শত্রুতার নিতান্ত অনুপযুক্ত বোধেই শুধু দয়া ক'রে ফিরে যেতে দিয়েছি, সে যে আজ আমায় আয়ত্তে পেয়েছে বলেই তার কাছে ভিক্ষা চাইতে যাবো, তা' স্বপ্নেও মনে করো না। ভিক্ষা চাওয়া কা'দের অভ্যাস, তা' পৃথিবীর সব্বাই জানে। রাজা শেষ পর্য্যন্ত রাজাই থাকে।—আমি তোমায় আদেশ করছি ভীম! তুমি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে একা বা একত্র অনেকে মিলেও ন্যায় বা অন্যায় সকল প্রকার যুদ্ধই করতে পারো,—এই আমার তরবারি খুলেছি, এখন এসো, এইবার দু'জনের ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক। বরেন্দ্রীর রাজলক্ষ্মী কা'কে চান।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বাহিরের সমস্ত সংবাদ রাজান্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানকার অবস্থা যে কি ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে, সে কথা বলিবার নয়! যুবতী, বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, বালিকা—এমন কি, অপোগণ্ড শিশুর দলও সমবেত ক্রন্দনে যোগ দিয়া ঘরে ঘরে তুমুল আর্ত্তনাদের সৃষ্টি করিয়াছিল। অন্তঃপুরিকা নারীগণের মধ্যে যারা নিম্নশ্রেণীর তাহারা প্রাসাদ ছাড়িয়া পলাইতেছিল, কিন্তু যাদের সে উপায় নাই, প্রকৃত বিপদ তাদেরই। এদের মধ্যের এক জন বর্ষীয়সী তাঁর দুইটি বিধবা যুবতী কন্যা ও পুত্রবধূকে স্বহস্তে দুই পাত্র তীব্র বিষ প্রস্তুত করাইয়া পান করিতে দিয়াছিলেন। খিড়কির পুষ্করিণীর মধ্যে কয়েকটি অভিজাতবংশীয়া সুন্দরী যুবতীর মৃতদেহ দণ্ড কয়েকের মধ্যেই ভাসিয়া উঠিতে দেখা গেল।

পট্টমহাদেবী সকলকেই যথাসাধ্য সাহস ও সান্ত্বনা দানে চেষ্টিত থাকিলেও তাঁর নিজের মনের ভিতর আর বিন্দুমাত্র যেন বল ভরসা কিছুই ছিল না। গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের অগ্নিবর্ষী ভীম ঝটিকার মতই গভীর উচ্চরোলে তাঁর অন্তরের ভিতরটা হাহা শব্দে আর্ত্তনাদ করিতেছিল। প্রতি শ্বাসে ভয়ার্ত্ত চিত্ত উর্দ্ধস্বরে উচ্চারণ করিতেছিল, "হে বিশ্বেশ্বর! রক্ষা কর।"

রক্ষার যে আর উপায় মাত্র নাই, তাহা তাঁর বুঝিতে বাকি ছিল না, সে জন্য তিনি প্রস্তুতও হইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই এই একটি বিষয়ে তাঁর সমস্ত অন্তঃকরণের বিদ্রোহকে তিনি দমিত করিতে পারেন নাই— তাহা সন্ধ্যা ও তাঁর শিশুর সম্বন্ধে। তারাদেবীর পুরোহিত আচার্য্য তারানাথের গণনায় তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। আচার্য্য বলিয়াছেন, এ দু জনের বর্ত্তমান অতি ঘোরতর দুর্গ্রহ রাহুগ্রস্ত হইলেও ইহাদের সুদূর ভবিষ্যৎ তেমনই পূর্ণোজ্জ্বল আলোকচ্ছটা সমাকীর্ণ! রামপালের অষ্টমস্থ দশম পতি স্বক্ষেত্রস্থ হয়ে সিংহাসনকাগত এই যোগে বহুনৃপপূজ্য প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুবিজয়ী মহারাজ চক্রবর্ত্তী হ'বার কথা। সে কি একেবারেই মিথ্যা হইবে?—কৈ, তাঁদের ত এ কথা তিনি বলেন নাই? ভাগ্যাধীশ পাপযুক্ত হইয়া অষ্টমে অবস্থিত, দশম পতি একাদশ পতি এক, ফলে সম্পূর্ণরূপেই পতন, এর বেশী কোন কথাই তো রাজার সম্বন্ধে বলিতে চাহিলেন না! তবে কেন ভালর সময়েতেই মিথ্যা হইবে? সন্ধ্যাকে তার শিশুটির সহিত কি কোনমতেই রক্ষা করা যায় না? কে তার রক্ষাভার লইবে? এমন বিশ্বাসী বন্ধু কে আছে? কার হাতে এই রূপসী যুবতী রাজবধূকে ভরসা করিয়া তুলিয়া দেওয়া যায়?

বোধিদেব আসিয়া দূর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "মা! রাজার আদেশে আমি আপনাদের গুপ্তপথে বরেন্দ্রী ত্যাগ ক'রে কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরে নিয়ে যেতে এসেছি।"

পট্টমহাদেবীর বোধ হইল, স্বয়ং কৈলাসপতিই তাঁর আকুল আহ্বানে বিচলিত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।

সন্ধ্যার মলিনতর ছায়ার মতই বিশীর্ণা ভীতা কম্পিতা অর্দ্ধচেতনাপ্রায় সন্ধ্যাকে তার শিশুর সহিত টানিয়া আনিয়া মহাদেবী তাহাকে বোধিদেবের পদপ্রান্তে স্থাপন করিলেন।

"ব্রাহ্মণ! আজ থেকে আপনি এর পিতা—এ আপনার কন্যা, এই অনাথা ও অনাথের সব ভার আমি আপনার হাতেই তুলে দিলেম। এর চেয়ে এ অবস্থায় ওদের জন্য আর আমার বেশী কিছুই করবার নেই।"

বোধিদেব রোরুদ্যমান শিশুটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "ইনি আমার কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ, আমার গর্ভধারিণী জননী, যতক্ষণ এ দেহে জীবন থাকবে, এরা নিরাপদ; কিন্তু মা, আপনি—"

মহাদেবী কহিলেন, "বাবা! আমার কর্ত্তব্য যে আমার স্বামীর সঙ্গে জড়িত।"

বোধিদেব একটু ইতস্তত: করিয়া কহিলেন, "আমি এদের কোন নিরাপদ স্থানে রেখে তা হ'লে আবার ফিরে এসে আপনাদের সংবাদ নেব, আপনি বরং ততক্ষণ রাজাধিরাজের কাছেই যান এবং সম্ভব হয়ত কোন গুপ্ত পথে পুরীত্যাগ করে দু'জনে তারা মন্দিরে আশ্রয় নিন, তিনি আমায় আপনাকে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছিলেন, এক সঙ্গে সকলের যাত্রা করা নিরাপদ হবে না।"

সন্ধ্যা মহাদেবীকে প্রণাম করিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাঁর পা দুইখানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া উপুড় হইয়া তার উপর পড়িয়া রহিল, কোনমতেই সেখান হইতে যেন উঠিবে না। পাগলের মত কেবলই বলিতে লাগিল, "দিদি গো! আমায় নিজের হাতে একটুখানি বিষ খাইয়ে দাও, এমন ক'রে বিদায় দিও না।"

মহাদেবী তখন কাঁদিয়া কহিলেন, "ওরে আমার জন্তে তোর একটুও কি দয়া হয় না রে! আমায় তোরা কি মনে করেছিস বল ত? মানুষ কি নই?"

সহসা রাজপ্রাসাদের মধ্যেই তুমুল রোলে ধ্বনিত হইয়া উঠিল,—"শিব শিব ভবানী!"

উপস্থিত তিন জনেই চমকিয়া উঠিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

মহাদেবী দেখিলেন, বিস্ফারিত বক্ষে ক্রূর সগর্ব্ব দৃষ্টিতে চাহিয়া দুই জন অপরিচিত দৃপ্ত মূর্ত্তি পুরুষ তাঁর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহাদের এমন ভাবে তাঁর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে দেখিয়া তিনি তাদের শত্রুপক্ষীয় বলিয়া বুঝিলেও অচঞ্চল নির্ভীক ভাবেই প্রশ্ন করিলেন, "কে তোমরা?"

সম্মুখবর্ত্তী স্থির রক্তনেত্রে তাঁহাকে দেখিতেছিল, তার পিছন হইতে অপর ব্যক্তি উত্তর করিল,—

"সে কি, রে মাগী! মহারাজাধিরাজ দিব্যোকের সেনাপতি মহাবীর যুবরাজ ভীমকে চিনিস্ নে নাকি?"

লজ্জাদেবী এই অপ্রত্যাশিত অবমাননায় কিছুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়াই শান্ত গম্ভীর মুখে ভীমের তীব্র জ্বালাভরা জ্বলন্ত চোখের উপর দৃষ্টি স্থির করিলেন,—

"তুমিই ভীম? আমাদের 'পরে ক্রুদ্ধ হবার তোমার নিশ্চয়ই সমুচিত কারণ আছে। যাই হোক, যা হয়ে গেছে, তা' আর ফিরবে না; পার ত আমার স্বামীকে কখন ক্ষমা করতে চেষ্টা করো। জেনো, আজ থেকে চির-আবহমান কাল ধরেই তাঁর পারলৌকিক মঙ্গলামঙ্গল একমাত্র তোমারই ক্ষমার উপর নির্ভর ক'রে রইলো।"

এই শান্ত, স্নিগ্ধ, ধীর বাক্য ও অকুতোভয়, অচপল দৃষ্টি, প্রতিহিংসা-লোলুপতায় উন্মত্তপ্রায় ভীমকে যেন সহসাই অপরিসীম বিস্ময়ের কশা তুলিয়া মারিল। এই তার মহাশত্রুর স্ত্রী? ইহারই উপর সে তার নির্য্যাতিতা নিপীড়িতা প্রাণাধিকার শোচনীয় অকাল মরণের প্রকৃষ্ট প্রতিশোধ লইতে নিজের সমুদয় ধর্ম্মাধর্ম্ম হিতাহিত জ্ঞান সমস্তকেই জলাঞ্জলি দিয়া মাত্র চিরসুষুপ্ত রাক্ষসী প্রবৃত্তিকে বৃথা জাগাইয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতে চাহিতেছিল? তার পক্ষে চির অপরিচিত, হেয়, ঘৃণ্য—অতি জঘন্য পাশব বৃত্তিগুলাকে সবলে আকৃষ্ট করিতে চাহিয়া নিজেকে নরকের দূতস্বরূপ প্রস্তুত করিবার বৃথা চেষ্টায় সে ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল? বিবেকের আকুল অনুনয়ে—এমন কি, গভীর আর্ত্তনাদে এক তিলও কর্ণপাত করে নাই,—সে এই? এই ক্ষীণ জ্যোৎস্না লেখার মতই নম্র মধুর আবার মধ্যাহ্ন-ভাস্করের মতই দীপ্ত তেজস্বিনী! ইঁহার চারি দিক্ দিয়া ইঁহারই প্রচণ্ড সতীতেজ, ইঁহারই অসীম শক্তিরাশি, যেন ইঁহাকে অগ্নিগোলকের জ্যোতির্ম্মণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া রাখিয়াছে, কার সাধ্য ইঁহাকে স্পর্শ করে!—

সহসা ভীমের বোধ হইল, যেন এই সদ্য-অনাথিনী অরাতিকুল পরিবেষ্টিতা অসহায়া রাজেন্দ্রাণীরূপে, তার চির-উপাস্যা ভবানীদেবী তাকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন! শুধু তাই নয়, তার অতিবড় বিপদের মুহূর্ত্তেই তাকে চিরদিনের মত রক্ষা করিতেও আসিয়াছেন!

ভীমের সহচর হরি অতি কর্কশ বিদ্রূপভরে উপহাসের হাসি হাসিয়া উঠিল,—

"মাগীটা ধূর্ত্ত ত বড় কম নয় তো! ওরে, তোর স্বামীকে ক্ষমা করার দফা যে শেষ ক'রে দিয়েই ভীমচন্দ্র এখন তোকে যে তাঁর পাটেশ্বরী করতে এসেছেন, তার কিছু সংবাদ রাখিস্? তোর আগের বর এখন মাথা-কাটা

কবন্ধ হয়ে মাটীর উপর গড়াগড়ি খাচ্ছে, এখন ভাল চাস্ ত শুড় শুড়্ ক'রে এসে এই নতুন বরের পায়ে ধ'রে আশ্রয় চেয়ে নে',—"

মহাদেবীর স্থির দৃষ্টিতলে ক্ষণেকের জন্য গভীরতর ব্যথার রেখা নিদারুণ হইয়া উঠিল। অপরিসীম যন্ত্রণার একটা উত্তাল তরঙ্গ তাঁর বুকের মধ্য দিয়া স্রোতের মত বেগে বহিয়া গেল, তাহারই আঘাতে তাঁর চোকে, মুখে, নাসিকাগ্রে গাঢ় তপ্ত শোণিতলেখা সবেগে ফুটিয়া উঠিল। চক্ষে তপ্ত অশ্রুর একটা বাষ্পও হয় ত চকিতে দেখা দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে সকলকেই একটি নিমিষের মধ্যে পরাভব করিয়া লইয়া তাঁর অপরাজিত ধৈর্য্য স্বস্থানে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিল।

ক্ষণমাত্র পরেই সেই পূর্ব্বের মত শান্ত ঔদার্য্যে আততায়ীর প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া তিনি ভয়লেশহীন কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—

"এই কি তোমার মনের কথা, ভীম? তাই যদি হয়, তাও সাধারণ মানব প্রকৃতির বহির্ভূত নয়!"

অননুভূত বিস্ময়ে ও ভক্তিতে ভীমের জ্বলন্ত কোপ সহসা কোথায় যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল। এ কি আশ্চর্য্যপ্রকৃতি নারী? এত বড় বিপৎ-পাতকে তুচ্ছ করিয়া উন্মত্ত পুরুষের সাক্ষাতে এমন অচপল থাকিতে পারে, এমন কোন নারীর কথা সে যে কখন কল্পনাও করিতে পারে নাই! তবে সত্যই কি ইনি মা অসুরদলনী ভবানী?

প্রকাশ্যে সমুদয় রূঢ়তা বিসর্জ্জন দিয়া অতি দীনভাবে উত্তর করিল,—

"মা!—তুমি আমার মা!"—আর কিছুই সে বলিতে পারিল না। সহসা হিমালয়ের কঠিন কঠোর হিমশিলা গলাইয়া গঙ্গোত্রীর প্রবল ধারা যেন তার অন্তরের মধ্যে বেগে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল, তার কণ্ঠ কেমন করিয়া সহসা অশ্রুগাঢ় হইয়া উঠিল।

আবার ক্ষণপরে আবেগ-প্রগাঢ় গম্ভীরস্বরে সে কোনমতে উচ্চারণ

করিল, "মা! আমি তোমার অযোগ্য অভাগা পুত্র!"—এই কথা বলি
বলিতে সে নত হইয়া পট্টমহাদেবীর পায়ের কাছে লুণ্ঠিত শিরে প্রণ
করিল। তার দুই চোখ দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু তাঁর পদপ্রান্তে পতি
হইল। ক্ষণপূর্ব্বের সংহারশীল রুদ্রমূর্ত্তি বীরের নেত্রচ্যুত সেই অশ্রুবি
দুইটির যে কি মূল্য, তাহা মহাদেবীই বুঝিলেন। তাঁরও বাষ্পরুদ্ধ ক
হইতে মৃদুতর স্বরে উচ্চারিত হইল, "ধর্ম্মের দ্বারায় রক্ষিত হয়ো।"—

ভীম তার মহাশত্রুর স্ত্রীর এই আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তে সর্ব্বশরীরে শিহরি
উঠিল। পুনশ্চ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক সে এবার তাঁর পদস্পর্শ পূর্ব্বব
পদধূলি লইতে উদ্যত হইয়া কহিল, "মা! অপরাধ নেবেন না, চরণে
একটু ধূলো নিতে চাই—"

লজ্জাদেবী একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু শান্তস্বরেই কহিলেন, "ক্ষমা কর বাপ, যে হাত আমার স্বামী-হত্যা করেচে, সে হাত দিয়ে আমি এ পা দু'খানা ছুঁতে দিতে পারবো না! কিন্তু আমি তোমায় অমনই আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি ভীম, যখন রাজলক্ষ্মী তোমায় নিজে বরণ ক'রে নিয়েছেন, তখন ন্যায়-ধর্ম্ম অটুট রেখে প্রজাপালন ক'রে তাদের আশীর্ব্বাদ লাভ ক'রো।—আমায় এখন বিদায় দাও, বাবা!"

ভীম চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "কোথায় যাবে মা? তুমি যে এ রাজ্যের রাজ্যলক্ষ্মী! তুমি যেমন আছ,—না, তার চেয়েও বেশী—আমাদের মা হয়ে থাকতে হবে যে, মা! তোমায় ত আমি যেতে দোব না।"

এইবার মহাদেবীর কঠিন নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি গাঢ়স্বরে কহিলেন, "এমন কথা বলো না, ভীম! তুমি যত বড়ই হও, আমার স্বামীহন্তা,—তোমার আমি মা হ'লেও আমি তাঁর ধর্ম্মপত্নী, আমার স্থান একমাত্র তাঁরই পায়ের তলায়,—তা' সে যেখানেই হোক!"

শেষ ক্ষণে ভীম আসিয়া মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া বালকের মত—শিশুর

ন্ত কাঁদিল। যেথান দিয়া মহাদেবী চিতারোহণ করিলেন, সেথানকার মৃত্তিকা লইয়া সে মাথায় বুকে মাখিল। তার পর মন্ত্রাহুতি প্রদত্ত লাজপুষ্প-বর্ষিত জ্বলন্ত চিতার মধ্যবর্ত্তিনী, পতিপদ-ক্রোড়ে সমাসীনা, সেই চির-প্রসন্না হাস্যমুখী রাজেন্দ্রাণীর নিকটে উন্মত্তের মত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া সে উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—

"মা! মা! যদি কিছু তোমার বলবার থাকে, আমায় এখনও ব'লে যাও। কারুর জন্যে কিছু কর্‌তে বলবে কি?—কোন আদেশ?—যত বড় কিম্বা যত ছোটই হোক,—ব'লে যাও মা!—কিছু বলে যাও!"

শান্ত মধুর স্বরে মহাদেবী সেই অগ্নিজ্বালার মধ্য হইতে কথা কহিয়া বলিলেন, "তোমার রাজ্যে সতীর অশ্রুজল যেন পতিত না হয় এই আমার তোমার কাছে শেষ অনুরোধ।"

চীৎকার করিয়া ভীম উত্তর করিল, "মা আমার! তোমার আজ্ঞা-পালনে আজ হ'তে এ দেহ প্রাণ সর্ব্বতোভাবেই উৎসর্গ করলেম, আমার যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না, মা!"

শ্মশানবহ্নি ঘোররবে গর্জ্জিয়া উঠিল।

তৃতীয় অংশ

রামপাল
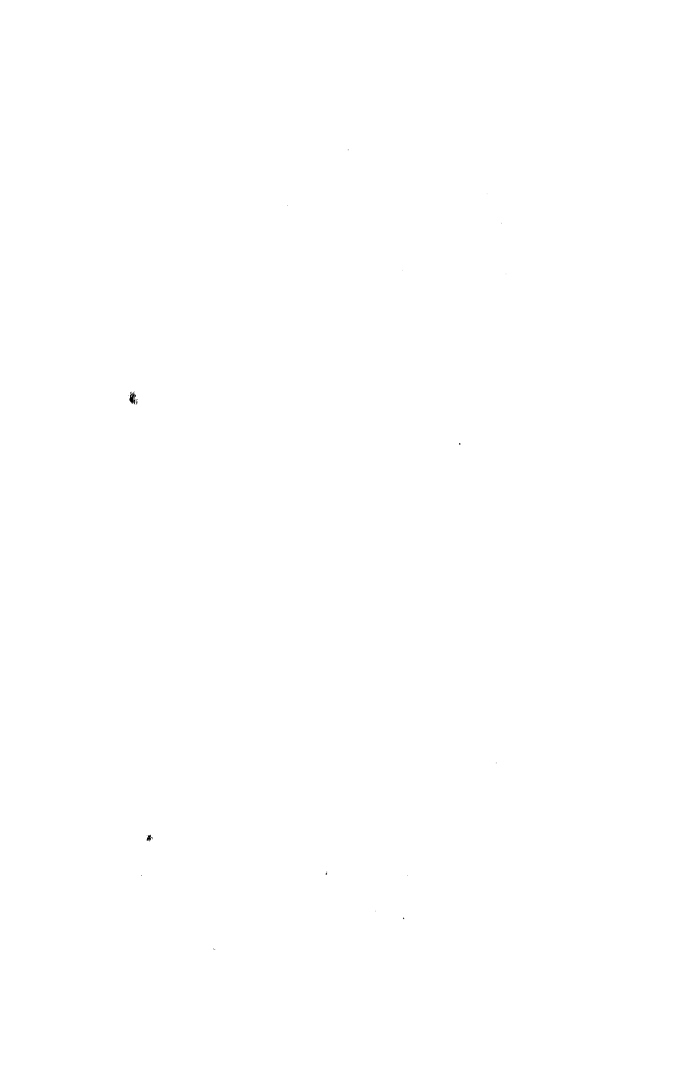
প্রথম পরিচ্ছেদ

কাল অপরাহ্ণ ; উচ্চপর্ব্বতের সানুদেশ হইতে একটি ক্ষুদ্র নির্ঝর ঝুর-ঝুর শব্দ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, তার শ্রুতি-সুখকর রব সেই নির্জ্জন উপত্যকাভূমে একটি অশ্রুত-পূর্ব্ব স্বর্গীয় রাগিণীর মতই শব্দিত হইতেছিল। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের লোহিতাভায় স্ফটিক জলধারা এক্ষণে অনুরঞ্জিত এবং তাহারই সহিত সমুদয় উপত্যকাভূমিই যেন আরক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে! অগণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ড সঞ্চালিত করিয়া ঐ জলস্রোত তীরবেগে নিম্নাভিমুখে প্রধাবিত এবং অরুণী নাম্নীয় একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর সৃষ্টি করিয়াছে, উহার তরঙ্গেও সেই রক্তচ্ছায়া নর্ত্তিত হইতেছিল।

সেই শৈল-তরঙ্গিণীর তীরদেশে একটি দীর্ঘাকৃতি যুবক একাকী পাদচারণ করিতেছিলেন। যুবকের মুখ চিন্তা ম্লান, চরণে তাঁহার শ্লথগতি ; সে গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে, চিত্ত তাঁর গভীর চিন্তাভারে কোন্ অতলে তলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে চিন্তাও একান্তই যে দুশ্চিন্তা, তাহা মধ্যে মধ্যে তাঁর ভ্রূযুগলের কুঞ্চন ও নেত্রের অগ্নিদীপ্তি হইতেই প্রকটিত হইতেছিল। নদীর উপকূলে চারিদিকে পাথর ছড়ান, বর্ষার জলধারা তার সহস্র অঙ্গুলী দিয়া উপত্যকাভূমির রক্তবর্ণ মৃত্তিকাকে খণ্ডে খণ্ডে কাটিয়া নদীর শীর্ণ বক্ষকে ভরাইয়া তুলিয়াছে। উহাদের ফাটলে ফাটলে কোথাও কোথাও এখনও একটুখানি জল জমিয়া তাহাতে কচিৎ দুই একটা জলজ পুষ্পও ফুটনোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। নদীর

তীরদেশে সারি দিয়া বিশাল শাল তরু আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান এবং তাহাদের পাদদেশে তাহাদেরই স্ব-বংশীয় অসংখ্য শিশু-তরু নিজেদের উত্তরাধিকার লইবার জন্ম ঊর্দ্ধপথের অভিমুখে সাগ্রহে মস্তকোত্তোলন চেষ্টা করিতেছিল। নদীর জল এক্ষণে স্ফটিকের মতই স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে তাহার নিম্নদেশস্থ উপলখণ্ড সকল জলতল হইতে নিজেদের শুভ্রতা প্রযুক্ত ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছিল।

যুবক বহুক্ষণ ঐ একই ভাবে পদচারণ করিলেন। বোধ করি, তাঁর অকূল চিন্তাসাগরের কোন কূল-কিনারাই তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না, তাই অবশেষে নদীর কিনারার গৈরিক বালুকার একধারে যেখানে শুভ্র শান্ত জলরেখা গেরুয়া আঁচলে জরির চওড়া পাড়ের মতই উজ্জ্বলতা লইয়া নিঃশব্দে পড়িয়া আছে, সেইখানে নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। দিবসান্তের শেষ রাঙ্গা আলো তখন নিবিয়া আসিয়াছে; নিশাচর প্রাণীদের দীর্ঘ পাখার মতই সন্ধ্যার দীর্ঘ ছায়া পূর্ব্বাকাশকে নিজের পক্ষতলে আবৃত করিয়া লইয়া, পশ্চিম আকাশের দিকে নিঃশব্দে উড়িয়া চলিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে দিবসাধিপের শেষ স্মৃতিটুকু তরল সান্ধ্য অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া গেল, তিমিরবসনা রাত্রি বুকের উপর অসংখ্য তারকাবলীময় শতেশ্বরী হার ঝুলাইয়া, মাথার উপর তীক্ষ্ণ বক্র শুক্লা চতুর্থীর চাঁদের মুকুট পরিয়া সতর্ক ধীরপদে এই নিরালা কাননভূমে নামিয়া আসিলেন। যুবক নিজের চিন্তায় বিভোর, তাঁর চোকে প্রকৃতির এত বড় পরিবর্ত্তনটাও বুঝি ধরা পড়িল না! অন্ধকারে অদৃশ্যপ্রায় সেই মূর্ত্তি এখন কেবল তাঁহারই অগ্নি-জ্বালাময় দীর্ঘশ্বাসশব্দে সজীব হইয়া রহিল মাত্র।

দেখিতে দেখিতে চতুর্থীর ক্ষীণ চন্দ্র অস্তগত হইয়া আসিল, নিস্তরঙ্গ শান্ত জলে সুদীর্ঘ রেখায় তার ক্ষীণ আলোটুকু শেষ বারের জন্ম ঝিকমিক করিয়া উঠিল, প্রবল ঝিল্লীরবে তরুতলের প্রগাঢ় অটল অন্ধকারকে যেন

ঈষৎ কম্পিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ; ইহা ব্যতীত শত শত আরণ্য পশু ও বিহঙ্গের সুপ্তি বহিয়া সেই অরণ্য ভূমি নিজেও যেন তন্দ্রায় ডুবিয়া গেল ; যুবকের চিন্তাসাগরে কূল দেখা দিল না।

যুবকের পশ্চাতে উপমূর্ত্তির মতই সেই জনশূন্য, শব্দশূন্য, নিরালোক কাননভূমে কে আসিয়া দাঁড়াইল। চিন্তাভারাতুর ইহার উপস্থিতি বুঝিতেও পারিল না, ইহা দেখিয়া আগন্তুক ধীরে ধীরে তাহাকে স্পর্শ করিল।

"এমন ক'রে জীবনপাত করলে কি কার্য্যসিদ্ধি হবে ? বৃথা শরীরপাতে কি ফল ?"

যুবক তার ঘোর নিরাশান্ধকারাবৃত মুখ ফিরাইয়া আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল ;—

"এ ব্যর্থ জীবনধারণেই বা কি ইষ্টসিদ্ধি ? এ শরীর পতন হলেই ত মঙ্গল ? আবার নূতন পাওয়া যাবে, সংসারের আশা তৃষ্ণার সঙ্গে আবার নূতন ক'রে পরিচিত হ'তে পারবো।"

আগন্তুক অনুযোগপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "এই কি বিগ্রহ-পালাত্মজ রামপালদেবের যোগ্য কথা ? এ পরিতাপ যে নারীমুখেই শুধু শোভা পায়, তাও ক্ষত্রনারী নয়, বৃষলীর মুখে—"

তখন ঈষৎ সলজ্জভাবে রামপাল মাথা নত করিলেন, পরে একটা দুশ্চিন্তা-দারুণ সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি যে বৃষলীরও অধম হয়ে আছি, মাতুল! এ ভিন্ন আমার মুখে আর কি শুনতে আশা কর তুমি ? ঘরছাড়া, দিশাহারা এই যে জীবন, এর মূল্য কি ? অলক্ষ্মী-সেবিত মৃত্যু-বিতাড়িত শুধু যেন একটা বিড়ম্বনার ভার মাত্র ! এ নিয়ে হবে কি ?"

রামপালের ক্লেশশুষ্ক অধরে এক ফোঁটা ক্ষীণ ব্যঙ্গহাস্য প্রকটিত হইল।

আগন্তুক অঙ্গাধিপ মথনদেব—মথনদেব কহিলেন, "ও কথা যাক, এখন তোমার জন্য সংবাদ আছে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হ'তে দূত ঘোরতর দুঃসংবাদ বহন ক'রে এনেছে; তুমি শোনবার জন্য প্রস্তুত হও, রামপাল! জগতে ধন, জন, মান জীবন কিছুই যখন নিশ্চল নয়, তখন আমাদের নিয়তই এ সকলের বিয়োগ জন্য প্রস্তুত হয়ে ত থাকতেই হবে, এর আর বিচিত্রতা কি?"

রামপালের নিশ্চেষ্ট দেহ মনে এবার সহসাই একটা গভীর স্পন্দন জাগিয়া উঠিল। দুঃসংবাদ? তবে কি—

তিনি সবেগে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, "সন্ধ্যার মৃত্যু ঘটেছে?— অথবা পাল-সাম্রাজ্যের রাজলক্ষ্মী মহাদেবী তাকে ছেড়ে চ'লে গেছেন?"

মথনদেব সস্নেহে রামপাল দেবের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিলেন,—"ব্যস্ত হয়ো না রামপাল, এ সকল সংবাদ সুস্পষ্টভাবে আমি এখনও কিছুই জানতে পারিনি; পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রধান সংবাদটুকুই মাত্র আমি জেনে এসেছি। তা এই,—মহীপাল দেব হত, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন এক্ষণে আর পাল-সাম্রাজ্যভুক্ত নয়; তার রাজা এখন কৈবর্ত্ত নায়ক দিব্যোক, বা ভীম।"

রামপালের কণ্ঠ চিরিয়া বহির্গত হইয়া আসিল—"এত দিনে তবে রামপাল শাপমুক্ত!"

তারপর সুগভীর পরিতাপে সকরুণ স্বরে তিনি কহিলেন, "অন্যায় অনীতিকার্য্যফলে ক্ষুদ্র কৈবর্ত্ত শাসনে প্রাণ দিলে ভাই আমার! নির্ব্বাসিত অভাগা রামপালকে যদি তোমার পাশে রাখতে, যদি তার পরামর্শে কান দিতে, যদি অত্যাচারী না হতে,—মাতুল! আমার জননী-প্রতিমা মহাদেবী কোথায়? চলুন, কোথায় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের দূত; আমার পিতৃ-ভূমি আজ পরহস্তে,—তার ত উদ্ধার চাই!"

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনীয় দারুণ দুঃসংবাদ রামপালের জড়ীভূত চিত্তের উপর যেন

বহ্যাতিক শক্তি প্রয়োগ করিল। এক দিকে দারুণ দুঃখ, শোক ও দুশ্চিন্তায় এবং আর এক দিক দিয়া মুক্তির একটা উৎকট প্রশান্তিতে তাঁর মনের মধ্যটাকে যেন গভীরভাবে আন্দোলিত করিতেছিল। নিরুদ্দিষ্ট স্ত্রীর জন্য গভীর উৎকণ্ঠা, মাতৃ-প্রতিমা পট্টমহাদেবীর বিয়োগ-বেদনা, জন্মভূমির পরহস্তগততা এই সকল মহা মহা বিপৎপাতে মানুষকে যাহাতে পাগল করিয়া দেয়, তাঁহাকে তাঁর মধ্যেও এইটুকু সান্ত্বনা দিতে পারিল যে, যতই যাই হোক না কেন, এখন নিজের প্রাণটাও অন্ততঃ তিনি তাদের সকল দুঃখের বিনিময়ে উৎসর্গ করিয়া দিবার অধিকার লাভ করিলেন। এই হয় অনাবশ্যক জীবনটাকে শুধুই ধরিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই ধারণ করিয়া রাখা, এর কাছে তাঁর সকলই যেন সহজ মনে হইতেছিল।

কিন্তু এ কি হইল? এত অকস্মাৎ এত বড় কাণ্ডটা কেমন করিয়াই ঘটিয়া গেল? হায় মহাদেবী! তোমার অতুলনীয় স্নেহের প্রতিদানে অকৃতজ্ঞ রামপাল তোমায় কি নির্ম্মম কৃতঘ্নতার জ্বলন্ত কশাঘাত করিয়াই ঋণশোধ করিয়াছে! আর একবার ফিরিয়াও সে ত সেই চিরক্ষমাশীলা চির-সহিষ্ণুতাময়ী মাতৃপ্রতিমার পদপ্রান্তে মাথা নামাইয়া বলিতে পারিল না,—'মা আমার! তোমার স্নেহের ঋণ এ জন্মে বা জন্মান্তরেও অপরিশোধ্য! রাজসিংহাসন বাহুবলে লাভ করা যায়, কিন্তু এত বড় স্নেহের আসন যে কত জন্মের অর্জ্জিত পুণ্যের ফলে লভ্য, সে শুধু সেই বিধাতাই জানেন, যাঁর এ দান! হায় রে! যে দিনটা গত হয়, সে দিনকার অখণ্ড সুযোগকেও সে যে সঙ্গে করিয়াই ফিরাইয়া লইয়া যায়, আর ত সে দিন ফিরিয়া আসে না!

তার পর সন্ধ্যা! সন্ধ্যার সংবাদ দুত ত কিছুই বলিতে সমর্থ হইল না।—কোথায় গেল সন্ধ্যা? এত দিন যে রামপাল সন্ধ্যার সংবাদের জন্য অণুমাত্রও চিন্তিত হয় নাই, শুধু তার বিচ্ছেদবেদনাই তাঁহাকে পীড়ন

করিয়াছে; কিন্তু আজ এ কি আকস্মিক বজ্র আকাশ হইতে খসিয়া তাঁর মাথায় পড়িল! কোথায় সন্ধ্যা? কোথায় সন্ধ্যা? সেই দুর্দ্দম শত্রুপরিবেষ্টিত অনাত্মীয় অসহায় পুরমধ্যে নিঃসহায়া বালিকার কে' এমন সহায় হইল? কে' তেমন ছিল?—কেউ না,—কেউ না! হয় ত,—হয় ত মহীপালের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তে তাঁর পুরবধূর নিষ্পাপ পবিত্র জীবনটিকেই আহুতি দিতে হইয়াছে! হয় ত এমন করিয়াই তার কুলব্রত উদ্যাপন করিতে হইয়াছে! আশ্চর্য্য কি? অসম্ভব কোথায়?—ওঃ—ওঃ—ওঃ—

রামপাল ক্ষিপ্তের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন।—'সন্ধ্যা! রাণি! এ-ও আমায় বেঁচে থেকে সইতে হবে? না—না, তা আমি পারবো না। বরেন্দ্রী! মা আমার! না—না, রাক্ষসী তুমি! সত্য যদি তুমি আমার অতটুকু সন্ধ্যা-কমলটিকে এমনি করেই ধ্বংস ক'রে থাক,—না—না জন্মভূমি! তোমার যত দোষ-গুণই থাক, তুমি আমার মা! মায়ের কাযের বিচার করবার আমি কে? শুধু তোমার কাছে আমার অপরিশোধ্য মাতৃঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য আমি, আমায় তা' করতেই হবে। কিন্তু কোথায় তুমি সন্ধ্যারাণি! শুধু যদি জানতে পারতেম যে, তুমি যেমন ছিলে, তেমনই নির্ম্মল নিষ্কলুষিত দেহে মৃত্যুকে বরণ করেছ! শুধু এইটুকু আর বেশী কিছু নয়, শুধু এইটুকু মাত্র!—কে' আমায় ব'লে দেবে?'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফাল্গুনের ফুলগন্ধে বনে বনে চারিদিকে একটা মত্ত ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিতেছিল, বেদনার একটা অব্যক্ত ঝঙ্কার বাতাসে, এমন কি, যেন নীলে ভরা উদাস আকাশকেও ভরাইয়া রাখিয়াছে, এবং নক্ষত্রগুলা যেন কোন্ দিগ-দিগন্তরের চিরপরিচিত প্রিয়জনের চোখের মতই নিমেষহারা ভাষা ভরা

দৃষ্টি মেলিয়া শুধুই চাহিয়া আছে, অথচ আকুল মিনতি-কাতর চোখের জলেরও তারা এতটুকু একটু সান্ত্বনার ইঙ্গিত পাঠায় না! তবে কি এ জগতের বাহিরে স্মৃতির কোন মূল্যই নাই? এত প্রেম, এত স্নেহ, এত ভালবাসাবাসি এ সবই কি শুধু ফাঁকির মূল্যে দেওয়া নেওয়া?

ভীমের কর্ম্ম কঠিন দিবসগুলি চোখের পলক না ফেলিতেই শেষ হইয়া যায়, কিন্তু কি অভিশপ্ত রাত্রিই তার জন্য সৃষ্টি করিয়া রাখা হইয়াছে! এর হাতে কি একটা দিনেরও মুক্তি নাই? এই রাত্রি, এই রাক্ষসীর মত নিষ্ঠুর, ততোধিক নির্ম্মম নিশাচরীস্বরূপিণী নিশীথিনী তার সমস্ত জীবনটাকে শূন্য, চূর্ণ এবং বিদীর্ণ করিয়া দিয়া সর্ব্বস্ব ধন লুণ্ঠন করিয়াছে! একে সহ্য করা যে কি কঠিন! রাত্রির পর রাত্রি আসিয়া আজও তাহাকে সেই কাল-রাত্রির ভীষণ দৃশ্যের পুনরভিনয় প্রত্যহই দেখাইতেছিল, আর মর্ম্মভেদী যন্ত্রণার তুষানলে অত বড় বীরপুরুষটা নিঃশব্দে পুড়িয়া ভস্ম হইতেছিল। বাহিরে তার এ অরুন্তুদ মর্ম্মজ্বালা কে জানিবে, বুঝিবেই বা এ'কে কে?

প্রবল অত্যাচারের স্রোতকে প্রতিহত করিয়া যে সিংহাসন তাহারা লাভ করিল, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তিকেই সে কেন্দ্রাশ্রয়ী করিয়া তুলিয়াছিল। এমন করিয়া না খাটিলে জীবনধারণ তার পক্ষে একান্তই যে কঠিন হইত, তাই বুঝিয়াই যেন তার ভাগ্যনিয়ন্তা তার মাথার উপরে এত বড় একটা বিরাট বিপুল ভার চাপাইয়া দিয়াছিলেন, আর এ কথাটাও তেমনই ঠিক যে, ঠিক এমন করিয়াই সে না পরিশ্রম করিতে পারিলে এ সিংহাসনকে রক্ষা করিবার সামর্থ্যও তাহাদের কাহারও মধ্যে ছিল না। দিব্যোক বিচক্ষণ ও কূট বুদ্ধিশালী হইলেও বৃদ্ধ, ভীমের বাহু এবং কর্ম্মশক্তিই কৈবর্ত্ত কুলের রাজলক্ষ্মী হইল। নিজের স্বতন্ত্র সত্তা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া সে আপনাকে একেবারেই যেন সাম্রাজ্য-গঠনে বিলীন করিয়া দিল। কর্ম্মের স্রোতে নিজেকে নিমগ্ন করিয়া দিয়া

সে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিল বটে, কিন্তু উজ্জ্বলার স্মৃতির জ্বালা হইতে সে বাঁচিতে পারিল না, উঠিতে বসিতে তার বুক ঠেলিয়া আর্ত্তনাদের পর আর্ত্তনাদ উঠিতে লাগিল, "উজ্জলা! উজ্জ্বলা! কোথায় গেলি! একবার যদি ফিরে আস্‌তিস রে! দুটো দিনও যদি দেখে যেতিস্!"

সনকা এখন ঐশ্বর্য্যের গৌরবে মাটীতে পা দিয়া চলে না। তার মাথার আধপাকা চুলের উপরে সোনার সীঁথিপাটি দিয়া সে দিনরাত মুড়িয়া রাখিয়াছে। কানের বালিপাতা দুইখানায় হীরা লাগান, কাঁকালে সোনার ঘন্টি, হাতে খুব চওড়া সোনার খাড়ু ও পায়ে পঞ্চম পরিয়া লালরঙ্গের চেলীর সাড়ীতে গা ঢাকিয়া সে পট্টমহাদেবীর পালঙ্ক-শয্যায় দিনরাতই শুইয়া বসিয়া তাঁর মহল্লিকাদের দিয়া পা টেপায়, গা টেপায়, চামরের বাতাস খায়! সিদ্ধা কৌশল্যা প্রভৃতি দুই একজন প্রধানা দাসী কৈবর্ত্ত-মহাদেবীর পদসেবায় অসম্মত হওয়ায় তিন দিন করিয়া অনাহারে ঘরে বন্ধ থাকিতে হয়, সেই ভয়ে ক্রমশঃই সকলে এঁদের পরিচর্য্যায় সম্মত হইয়া আত্মরক্ষা করিল। নিতান্ত যাহারা অনিচ্ছুক, তাহারা দেশ ছাড়িল। মেজুনী, সেজুনী, ছুট্‌কী প্রভৃতি বধূর দল, ইচ্ছাসুখে কেহ সন্ধ্যাদেবীর মহলে, কেহ সুরপাল-মহিষীর কক্ষে, কেহ রাজকন্যার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল। রাণীদের ঘরে অলঙ্কারহীনতায় তাদের দুঃখের সীমা ছিল না, আবার ভোগ-ঐশ্বর্য্য লাভে যত আনন্দ, ততই গর্ব্ব বাড়িয়াছিল। উজ্জ্বলার মৃত্যুতে ইহাদের কাহারও কোন দুঃখ নাই, আত্মীয়জন কেহ কচিৎ সে বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করিলে ইহারা বরং বিরক্ত হইত, কেহ কেহ স্পষ্টই বলিত,—"মরেছে ত হয়েছে কি? একটা মাগী বই ত আর কিছুই নয়। উ যদি না মরতো ত জ্যেঠশ্বশুর আর ভাঁসুরঠাকুর কি রাজার সাথে যুঝতো গা? এ ত ভালুই হলো, একটা গ্যাচে, এখন শতেকটা হবে।"

তা 'শতেক'টা ছাড়িয়া সহস্রটাও ত হইতে পারিত। কিন্তু সহস্রটা

ছাড়িয়া একটাও যে আর হইল না, সকলেই ইহাতে অবাক্ হইয়া গেল। ভাল ভাল ঘরের মেয়ে, অনেক অনেক সুন্দরী মেয়ে বরেন্দ্রীর ভবিষ্যৎ-মহারাজার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া থাকিলেও যুবরাজ ভীম কন্যাদানেচ্ছুক অভিভাবকবৃন্দের একান্ত মনস্তাপের কারণ হইয়া রহিল। সহস্রের অনুরোধেও তার সে দৃঢ় সংকল্প বিন্দুমাত্র শিথিল হইল না। সনকা কাঁদিয়া বলিল, "আবাগী কত জন্মের শত্তুর ছিলো গো, ম'রে গিয়েও তার 'তুক' গেলো না! ছেলেটার দশা হবে কি?"

সনকার তোষামোদ-কারিণীর বেশ একটা বড় রকম দল জুটিয়াছিল, তাহারা তার মন রাখিয়া অনেক হা হতোস্মির মধ্য দিয়া মন্তব্য করিল, "বোধ করি, বউটা কামিক্ষ্যের ডাকিনী ছিল! ওদের কুহক না কি মরিলেও যায় না। তা' এর জন্য সিদ্ধপুরুষ তারানাথকে ধরিয়া দেখিলে কি হয় বলা যায় না! একবার দেখা ভাল।"

সনকা ছেলের বিবাহ-বিতৃষ্ণ চিত্তকে ফিরাইবার উদ্দেশ্যে অনেক মানতপূজা তন্ত্র মন্ত্র তুক-তাক্ করিতে লাগিল। কান্না, শাসন, উপরোধ, আদেশ সে-ও সমান বেগে চলিল, ভীম টলিল না।

এ দিকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন মহানগরী নূতন বেশ ধরিয়াছিল। ইহার প্রশস্ত বিশাল বিস্ফারিত বক্ষে ঐশ্বর্য্যমদ-গর্ব্বিত ধনিকের চতুরশ্ব-যোজিত রথ-যানাদি আর তেমন অজস্রভাবে ছুটিয়া চলে না; ইহার পণ্য আপণাদি আর সুদুর্গম দেশজাত দুর্ল্লভ পণ্যসম্ভারে সুশোভিত নাই; নৃত্যশালা শূন্য, পানাহার গৃহ জনহীন, সুবৃহৎ উদ্যানবাটিকাগুলি রাজবংশীয় সম্ভ্রান্ত পুরুষবর্গের এবং বাণিজ্যব্যবসায়ী মহাধনী শ্রেষ্ঠিকুলের বিলাস কাননের পরিবর্ত্তে কৈবর্ত্ত নাগরিকগণের বাসগৃহে পরিণত হইয়াছে। ইহার সযত্ন-রক্ষিত সুসজ্জিত হর্ম্ম্যতলে পূর্ব্ব-দারিদ্র্যের চিহ্নযুক্ত ছিন্ন শয্যা, ভগ্নপেটিকা, মলিন বস্ত্র ইতস্ততঃ রক্ষিত এবং সুবেশধারিণী চটুলকটাক্ষ-

সম্পন্না সুন্দরী বারকন্যার পরিবর্তে এই সকল গৃহোদ্যানে এক্ষণে বিলাস বেশবাসবিহীনা সলজ্জা গৃহস্থবধূর সঙ্কুচিত প্রতিষ্ঠালাভ ঘটিয়াছিল।

বৈদেশিক ক্রয়-বিক্রয়-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সদ্ধর্ম্ম প্রচারকগণ আর সুদূর সিংহল, চীন, ব্রহ্ম, তাতার, তিব্বত যাত্রার জন্য রাজসাহায্য পায় না। ভারতের ধর্ম্ম ও সভ্যতা যে বৃহত্তর ভারতের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকে সে আর পুষ্টিদান করিতে সমর্থ হইতেছে না। নবজাত শিশু তার জন্মের পরেই মায়ের সঙ্গে নাড়ীর যোগকে হারাইতে বাধ্য হয়; কিন্তু তখন হইতেই মাতৃস্তন্যকে সে একান্তভাবেই লাভ করে, যে হতভাগ্য তাহা পায় না, তাহার পুষ্টি দূরের কথা, জীবনই সংশয় হইয়া উঠে।

উন্নতি হইয়াছিল কৃষির। দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে নাগরিকমাত্রেই বিলাসিতায় নিমজ্জিত হইয়া কৃষি ও কুটীরশিল্পের প্রতি তাচ্ছীল্য করিয়াছিল। তখন বাহিরের আনা পণ্য ও শস্য রাজধানীর অভাব দূর করিয়া মাগধী প্রভৃতিকে ধনশালী করিয়া তুলিত। খাদ্যশস্য দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গই জোগাইয়া দিত। নূতন রাজা সর্ব্বপ্রথম এই বিষয়েই মনোযোগী হইলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনীয় কৃষিকার্য্যে মন দিল।

আজ নগরীর আশেপাশে সকল ক্ষেত্রেই পরিপূর্ণ শস্যসম্ভার। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কৃষাণ-যুবকের শ্রমোৎফুল্ল সঙ্গীতময় কণ্ঠ, পথে পথে কৃষকবধূর হাসিভরা মুখ। এমন কি, রাজাদেশে কৃষির উন্নতির জন্য স্থানে স্থানে যজ্ঞাদিও সম্পন্ন হইতেছিল, যজ্ঞধূমের মধ্য হইতে ঋত্বিকগণের মুখে মুখে, উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত সুবিশুদ্ধ স্বরে উচ্চারিত হইতেছিল,

শুনং নঃ কালা বিস্যবন্তঃ ভূমিং—
শুনং কীনাশা অভিবান্ত বাহৈঃ।
শুনং পর্জ্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ—
শুনাসীরা শুনমস্মাসুধাম॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর দক্ষিণ ধারের একটি সুপ্রশস্ত রাজপথের উপরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ প্রবাসী মধ্যবিত্ত লোকদের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। এই গৃহসমষ্টির অধিকারী কয়েক জন কয়াল ও প্রধান যথেষ্ট পরিমাণেই অর্থ লইয়া এই সকল গৃহে প্রবাসাগত অপরিচিত বিদেশীয়-গণকে আশ্রয় প্রদান করিতেন। এই কার্য্যের জন্য তাঁহারা বেতনভুক্ কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

প্রথম বৈশাখের এক পরিচ্ছন্ন প্রভাতে, সূর্য্য যখন সবেমাত্র তাঁর সারাদিনের ভ্রমণপথের প্রথম সীমারেখায় পদার্পণ করিয়াছেন, ঠিক তেমন সময়ে এই সকল গৃহদ্বারের একতমের সম্মুখে আসিয়া একজন দীর্ঘাকার পুরুষ পথশ্রমে পরিক্লান্ত অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। আগন্তুক এ প্রদেশীয় নহেন, সুদূর দাক্ষিণাত্য বা অপরান্তনিবাসিগণের মতই তাঁর প্রশস্ত ললাটে দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্র রেখা, কেশমধ্যে সুদীর্ঘ শিখাগুচ্ছ গ্রন্থিনিবদ্ধ; মস্তকে প্রকাণ্ড শিরস্ত্রাণ এবং পীতবস্ত্র মল্লের ন্যায় পরিহিত। ঐ বর্ণেরই উত্তরীয় দ্বারা তাঁর বিশাল উরস অর্দ্ধাবৃতমাত্র হইয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে, রজতগিরিসন্নিভ হিম-পর্ব্বতের উপর স্থানে স্থানে মেঘচ্ছায়া নিপতিত হইয়া আছে!

আগন্তুকের বয়স ত্রিশ বৎসরের অনধিক, তাঁর অনবদ্য সুন্দর মুখে একটা গভীর দুঃখের ছায়া অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তথাপি তাহার মধ্য হইতে স্থিরপ্রতিজ্ঞা এবং দৃঢ়তার একটি অচঞ্চল রেখা সেই বেদনার কালিমাকে যেন পরাস্ত করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছিল।

যুবক গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান গৃহাধিকারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দিন কয়েকের জন্য একখানি ঘর ভাড়া লইলেন। এই বাড়ীখানি দেশমুখ্য বন্ধুবর্ম্মার।

তাঁহার পুত্র নীতিবর্ম্মা আগন্তুকের মুখের দিকে বার ... চাহিয়া দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, "মশাই কি এর আগে এ দেশে আর ক... এসেছিলেন? আপনাকে যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে যে!"

আগন্তুকের মুখ অকস্মাৎ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি একটু চলচিত্ততার সহিত অন্যদিকে চাহিয়া উত্তর করিলেন, "আশ্চর্য্য! আমি এই প্রথমবারের জন্য এদেশে পদার্পণ করেছি মাত্র।"

"ওঃ, তা হ'লে আমারই ভুল! তা বেশ! আপনি ঘর নেবেন, নিন, কিন্তু ভাড়া আজকাল কিছু বেশী লাগবে, সেটা জেনেই নেবেন। প্রতিদিন অর্দ্ধনিষ্কে এখন আর পাবেন না, প্রত্যহ এক নিষ্ক দাম দিতে পারবেন ত?"—গৃহস্বামীর প্রতিনিধি আগন্তুকের অর্দ্ধ-মলিন, অসম্ভ্রান্ত বেশভূষা এবং তার মলিন গামছায় বাঁধা ক্ষুদ্র পুঁটুলিটা বক্র কটাক্ষে দেখিয়া লইল।

আগন্তুক একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে উত্তর দিলেন,—"যদি তা' না হ'লে না পাই, তা হ'লে অগত্যা তাই—দিব, আমায় একখানি নির্জ্জন ঘর দেবেন।"

গৃহস্বামী সঙ্গে করিয়া আনিয়া ঘর দেখাইল, রাস্তার উপরেই ...তলের একটি ছোট্ট কোটর খালি ছিল, আগন্তুক প্রাত্যহিক এক রজত নিষ্ক মূল্যে তাহাই লইলেন। গৃহাধিকারী জিজ্ঞাসা করিল, "খাওয়া দাওয়ার কিরূপ হ'বে? সে সব নিজেই কি ব্যবস্থা ক'রে নেবেন, না তার জন্য আমায় সাহায্য করতে হবে?"

আগন্তুককে বিপন্ন দেখাইল। ক্ষণকাল চিন্তিত থাকিয়া তিনি উত্তর করিলেন, "দেখুন, আমি পাক করতে জানি না, যদি প্রস্তুত রুটি কিম্বা ভাত পাই, আমার পক্ষে ভাল হয়।"

নীতিবর্ম্মা সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিল, "ব্রাহ্মণ হয়ে আপনি অন্যের প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ করবেন? আপনি কি বৌদ্ধ? তবে এ বেশ কেন?"

যুবকের মুখে ভীতি-বিপন্নতা প্রস্ফুট হইয়া উঠিল। তিনি সহসা স্তম্ভিত হইয়া গিয়া ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকার পর নিজের ললাট হইতে উত্তরীয় দ্বারা ঘর্ম্মমোচন করিতে করিতে একটু কাসিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিলেন, "বিদেশে অত বাছ-বিচার করতে গেলে চলবে কেন? অবশ্য ব্রাহ্মণেতর জাতির হাতে নিশ্চয়ই খাই না।"

নীতিবর্ম্মা ঈষৎ হাসিল। তার পর ঈষৎ নিম্নস্বরে কথা কহিয়া বলিল, "দেখুন, আপনি পরদেশী, এ দেশের রীতি নীতি জানেন না, তাই আপনাকে একটু ব'লে রাখাই ভাল। এখন এ রাজ্য আর পালসম্রাট্‌দের হাতে নেই, এখন দিব্যোক কৈবর্ত্ত বরেন্দ্রীর রাজা। নূতন রাজা বৌদ্ধাচারের মহা শত্রু, তাঁর রাজ্যে সনাতন ধর্ম্মেরই আদর বেশী; অনাচার যথেচ্ছাচার আর এখন কারুর করবার উপায় নেই, এই সে দিন একজন মস্ত বড় নামজাদা বৌদ্ধাচার্য্য—ভূতপূর্ব্ব রাজগুরুর প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হয়ে গেল! সমস্ত বৌদ্ধসঙ্ঘ থেকেই ঘোর আপত্তি উঠেছিল, কিন্তু কিছুই ফল হয় নি। ভৈরবীচক্র ও তান্ত্রিক কুমারী সাধনার জন্য কয়েকটী কুমারী কন্যাকে অপহরণ করার অপরাধে তাঁর এই দণ্ড হ'ল।" এই বলিয়া নীতিবর্ম্মা আগন্তকের দিক্ হইতে কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া তাঁর দিকে চাহিয়া দেখিল।

আগন্তুক একান্ত বিমনা হইয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন, বক্তাকে নীরব হইতে দেখিয়া তাঁহারও সহসা চটকা ভাঙ্গিয়া গেল, ঈষৎ অপ্রতিভভাবে আরক্তমুখে বলিয়া উঠিলেন, "আমায় কিছু ফল মূল এনে দিলেই হবে।"

নীতিবর্ম্মা কহিল, "সে যা হয় ক'রে দেবো'খন, হ্যাঁ, কি বলছিলুম? ওঃ—হ্যাঁ, ঐ ভূতপূর্ব্ব রাজগুরুর কথা! নূতন কি একটা ধর্ম্ম না কি সৃষ্টি হয়েছে, তাতে চণ্ডালী রজকী প্রভৃতি কুমারীদের নিয়ে সাধনা করতে হয়, ফলে সাধকের অষ্টসিদ্ধি ও ষড়ৈশ্বর্য্যলাভ! মহীপালদেব এই সাধনা শিখতে

গিয়েই ক্রমশঃ কুমারী ছেড়ে সধবায় টান দিয়ে প্রাণ হারালেন, আর তাঁর গুরুদেবেরও অষ্টসিদ্ধি আর ষড়ৈশ্বর্য্যের বদলে মশানতলায় মাথা কেটে গড়াগড়ি গেল! এ দেখে কিন্তু আর কেউই বোধ হয়, ঐ আট আর ছয়ে মিলে চৌদ্দর ধাঁধায় মাথা গলাতে ভরসা করবে না, কি বলেন?"

যাহাকে সম্বোধন করিয়া এই কথাগুলি বলা হইল, তার মন কিন্তু তখন অনেক দূরেই পর্য্যটন করিয়া ফিরিতেছিল, বর্ত্তমানের চেয়ে অতীতের সমাধিক্ষেত্রই হয় ত বা তখন তাঁর সেই ভ্রমণ পথের লক্ষ্যকেন্দ্র। তিনি একান্ত বিমনা ও বিষাদ ক্লিষ্ট কণ্ঠে সংক্ষেপে উত্তর করিলেন, "সম্ভব বটে!"

কিন্তু নীতিবর্ম্মার এতটা অনাগ্রহের সহজ উত্তরটা বেশ মনঃপূত হইল না, সে নিজের যুক্তি নিজেই খণ্ডন করিতে চাহিয়া পুনশ্চ ঈষৎ বেগের সহিত কহিল, "তাই না কি আবার হয়? দৃষ্টান্ত দ্বারা যদি সমাজ শাসন সম্ভব হ'ত, তা হ'লে এত দিন পৃথিবী থেকে পাপ জিনিষটা উঠেই যেত। রাবণ এবং কুরুকুলের ধ্বংস কাহিনী থেকেই অন্যায় অত্যাচারকে লোকে ভয় করতে শিখত। ওটা যে একটা অপ্রতিহত প্রবল প্রবৃত্তি! ও কি কেউ সহজে ছাড়তে পারে? তবে হ্যাঁ, রাজার আদর্শে প্রজা অনেকটাই ভালমন্দ হয় বটে,—কি বলেন? হয় না?"

আগন্তুক ধীরকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "নিশ্চয়!"—তার পর একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাসকে ভিতরে ভিতরে সন্তর্পণে মিলাইয়া যাইতে অবসর দিয়া ক্ষণপরে ঈষৎ চাঞ্চল্যের সহিত প্রশ্ন করিলেন, "তা' হ'লে এ রাজ্যে এখন প্রজাপালন এবং প্রজারঞ্জন ভালই হচ্চে! নূতন রাজা—নূতন রাজার শাসনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনীয় সুখী হয়েছে?"

আগন্তুক এবার আর অন্তঃস্থল হইতে সবেগে উত্থিত দীর্ঘনিশ্বাসটাকে কোনমতেই বাধা দিতে পারিলেন না।

নীতিবর্ম্মা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "নূতন রাজার রাজত্বে প্রজাপালনের

ব্যবস্থাটা যে নেহাৎ মন্দ হয় নি, সে কথা অবশ্য অস্বীকার করা চলে না। এ সব দিকে, তা হ্যাঁ—এক রকম ভালই হয়েছে বলা যেতে পারে ? তবে কি না, কি জানেন, সব্বাইকে সুখী করা বড়ই কঠিন। সে আর কবে ক'জন পেরেছিল ? ত্রেতায় রামচন্দ্র, দ্বাপরে যুধিষ্ঠির আর এই কলিযুগে—সে হয়ত এখনও হয়ে উঠে নি—এর পর যদি কেউ পারে। অবশ্য কেউ কেউ চন্দ্রগুপ্ত অশোক সমুদ্রগুপ্ত বা হর্ষবর্দ্ধনেরও নাম করে, কেউ ধর্ম্মপালের কথাও বলে থাকে. যা হোক, সুখী এই রাজ্যশাসনে দুই কারণে কতক লোকে হ'তে পারে নি ; তার একটা কারণ এই যে, মহারাজা দিব্যোক অভিজাত বংশীয় নন, তাঁর রাজ্যে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের চেয়ে তাঁর স্বজাতীয়ের শক্তিই দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই অশিক্ষিত, উচ্চ বংশীয়ের বিরোধী এবং উদ্ধত। তারা দেবতার ভক্ত বটে, তবে ব্রাহ্মণের নয় এবং ক্ষত্রিয় বিদ্বেষী।"

শ্রোতা মনোযোগের সহিত এই কথাগুলি শুনিতেছিলেন, বক্তাকে থামিতে দেখিয়াই সাগ্রহে প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন,—আর "দ্বিতীয় কারণ ?"

নীতিবর্ম্মা আলস্য ভাঙ্গিয়া একটু নড়িয়া চড়িয়া দাঁড়াইয়া উত্তর করিল, "আর একটা কারণ, এই যে নূতন রাজা আমোদপ্রমোদের অত্যন্ত বিরোধী। আমাদের মহীপতি মহীপাল দেবের সময়ে রাজকীয় আনন্দের স্রোত প্রাসাদ থেকে বয়ে এসে তাঁর ক্ষুদ্রতম প্রজাদের কুটীরগুলোকে শুদ্ধ প্লাবিত করত। মেয়েমানুষের সতীত্ব জিনিষটাকে যে এত বড় দাম দিতে হয়, সে কথাটা ত সাধারণ নাগরিকরা প্রায় ভুলেই গেছল! যার খুসী হ'ল,—শক্তি আছে—গরীব প্রজার ঘরের বউ-ঝিদের হয় ছলে, নয় বলে, না হয় ত কৌশলেও নিজের ভোগের জন্য অধিকার ক'রে নিলে। এর বাছও বড় ছিল না, বিচারও সঙ্গত মতন হ'ত না ; কিন্তু এখন আর সেটি হবার মোটেই উপায় নেই। সতী নারীর অপহরণে প্রাণদণ্ড, উভয়ত ব্যভিচারে

নির্ব্বাসন, আর এমন কি,—বারনারী সঙ্ঘও এখন রাজদণ্ডের অধীনস্থ হয়ে পড়েচে। নূতন রাজার এই কঠোরতায় অনেক বার নায়িকাই বরেন্দ্রীর বাইরে চ'লে গেছে, কেউ কেউ সজ্ঘাশ্রয় করেছে, আবার যারা নিম্নশ্রেণীর বারযোষা, তাদের ভিতর অনেকেই দাসীবৃত্তি বা পাণের দোকান খুলে উদরপূর্ত্তি করচে। রাত্রি প্রথম প্রহরের পর কোন নাগরিক বা নাগরিকারই রাজপথে যথেচ্ছ যাতায়াতের নিয়ম আর নেই। যদি কোন বিশেষ প্রয়োজনে যেতে হয়, রাজ প্রহরীকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, এ নিয়ম ভঙ্গ হ'লে প্রহরী ও অপরাধী উভয়েই কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে থাকে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া গৃহাধিকারীর পুত্র নীতিবর্ম্মা পুনশ্চ সহাস্যে যোগ করিল, "ভূতপূর্ব্ব রাজ-প্রেয়সী বিদ্যুন্মালার কি পরিণাম হয়েচে, জানেন না বুঝি? নর্ত্তকীর কাছে যে ঐশ্বর্য্য ছিল, নূতন রাজার শূন্যকোষে সেগুলোকে নিতে পারলে তাঁর রাজকোষকে প্রায় পূর্ণই বলা যেতে পারত, কিন্তু এমনই ওঁদের গোঁড়ামী যে, তাই দিয়ে দেশের বাইরে দেউল জাঙ্গাল তৈরী করাবার ব্যবস্থা করা হ'লো, তবু নর্ত্তকীর ধন রাজ ভাণ্ডারে উঠতে পেলে না। বিদ্যুন্মালা মনের দুঃখে ভিক্ষুণী-ব্রত গ্রহণ ক'রে তক্ষশিলা না বিক্রমশিলা না মৃগদাব না মহাবোধির উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেচেন।"

শ্রোতা নীরব বিস্ময়ে সমস্ত কথাগুলিই শ্রবণ করিলেন। তাঁর শান্ত গম্ভীর মুখের দৃঢ় পেশীগুলি কোন এক আভ্যন্তরিক বিপ্লবের আলোড়নে ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল, বিষাদ বিবর্ণ মুখের শীর্ণ পাণ্ডুতা স্ফুটতর দেখাইতে লাগিল। তিনি একটা বক্ষোভেদী তীব্রশ্বাসকে অতি সন্তর্পণে গ্রহণ ও মোচন করিয়া বিমনাভাবে সম্মুখবর্ত্তী রাজপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পথে জনতা করিয়া লোক চলিতেছিল। রজকের দল গাধার উপর ময়লা কাপড়ের মোট চাপাইয়া চলিয়াছে, নরসুন্দর তার যন্ত্রপাতি লইয়া,

ফলওয়ালারা তাজা ফলের ঝুড়ি মাথায়, তরকারীওয়ালীগণ ডালায় শাকসব্জী সাজাইয়া পথ দিয়া হাঁকিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অশ্বারোহণে কোন দণ্ডপট পট্টনায়ক, স্তম্ভভেদী বা পতাকী ইতস্ততঃ শান্তিরক্ষার্থ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কচিৎ শিবিকা বা রথে চড়িয়া কোন বিশেষ সম্মানিত পুরকায়স্থোপাদিক অথবা মণ্ডল বা প্রধান স্বীয় কার্য্যক্ষেত্রে যাতায়াত করিতেছেন। একটি প্রকাণ্ড কালো ঘোড়ায় চড়িয়া একজন কোন বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী সদম্ভে চলিয়া গেলেন, পিছনে তাঁর দশ জন সাধারণ অশ্বারোহী সৈনিক।

নীতিবর্ম্মা আত্মগতই উচ্চারণ করিল,"মহাবলাধিকৃত মহাকুমার স্কন্দ"—

দক্ষিণী চমকিত হইয়া উঠিয়া সেই উচ্চৈঃশ্রবা সমতুলিত প্রকাণ্ডাকার অশ্বরাজের দিকে স্থির সতৃষ্ণ নেত্রে চাহিয়া ছিলেন। উহাকে দেখিতে দেখিতে তাঁর নেত্র সজল হইয়া আসিল আরোহীসমেত অশ্ব দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলে মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "কে' ঐ অশ্বারোহী ?"

নীতিবর্ম্মা কহিল, "বল্লাম ত মহাবলাধিকৃত মহাকুমার স্কন্দ !"—.

"সে কথা না, নূতন রাজার ইনি কে' হ'ন ?"

নীতিবর্ম্মা ঈষৎ হাসিল,—"এক হিসাবে ভাইপো আবার এক হিসাবে ভাই।—অর্থাৎ কি না, 'নূতন রাজা' বলতে এখন মহাকুমার যুবরাজ ভীমকেই বুঝায়। রাজাধিরাজ দিব্যোক নামেই সিংহাসনে বসেছেন, সত্যকার রাজা তাঁর ভাইপো ভীম। মহাবলাধিকৃত মহাক্ষ-পটলিক, মহাসামন্ত এঁরা সকলেই ভীমের ভাই। এ ভিন্ন মহানায়ক সেনাপতি হরি, মহাপ্রতীহার রাজশ্যালক প্রদ্যুম্ন মহাসান্ধি বিগ্রহিক রাজভ্রাতা রুদ্দোক, কিন্তু আসলে এ সমস্ত এবং তা ছাড়া রাজা এ সবই একাধারে যুবরাজ ভীম !"

"পূর্ব্বতন রাজকর্ম্মচারীদের এক জনও কি স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত নেই ?"

নীতিবর্ম্মা ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে উত্তর করিল, "একটা প্রাণীও না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের উপর এঁদের একটু ঈর্ষা দেখতে পাওয়া যায়; আর সেটা ওঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। যেহেতু, ব্রাহ্মণরা ব্রহ্মার মুখ থেকে, ক্ষত্রিয় হাত এবং ওঁরা তাঁর পা থেকে জন্মেছেন, এ কথা ব্রাহ্মণরাই রটনা করে থাকেন, তা' হাতের চেয়ে পায়ের ব্যবহারে একটু বৈষম্য ত থাকতেই পারে! হাত মুখে ওঠে, পা ত ওঠে না। ঐ দেখ! এ যে সদলবলে রাজা আসছেন দেখচি! কি জানি, নগর পরিভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন কেন? যাই, রাস্তা থেকে ভাল ক'রে দেখা যাবে'খন।"

নীতিবর্ম্মা চলিয়া গেলে আগন্তুক গৃহভিত্তি-গ্রথিত ক্ষুদ্র গবাক্ষটির নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজপথের চলন্ত জনতা নিশ্চল হইয়া দুই পাশে দাঁড়াইয়া পড়িল। সুপ্রশস্ত রাজমার্গের দুই ধারে শত শত গৃহপ্রাসাদ কৌতূহলী দর্শকদলে দেখিতে দেখিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আগন্তুক চাহিয়া দেখিলেন, সকলেরই মুখ প্রায় কৌতুকোজ্জ্বল এবং অপ্রসন্নতার কোন রেখাই কোথাও দেখা যায় না।

রাজ-শোভাযাত্রা আসিয়া পৌঁছিল। সম্মুখে শিব-ভবানী নামাঙ্কিত এবং ত্রিশূল ও সিংহমূর্ত্তি-অঙ্কিত রাজপতাকাধারীগণ, পতাকীদের পশ্চাতে একদল বাদ্যকর, ইহার পশ্চাতে সুসজ্জিত চতুরশ্ব-বাহিত রাজরথে মহারাজা দিব্যোক, তাঁর কাশ-শুভ্র মস্তকে গৌড় ও মগধের বরেন্দ্রীর মহারাজাধিরাজগণের 'ভূপতিবৃন্দের শিরোমণি দ্বারা যাঁদের পাদপীঠোপল চুম্বিত হইত,— তাঁদের সেই চির সম্মানিত রত্ন-মুকুট শোভা পাইতেছে। ইঁহার বামে দক্ষিণে রাজভ্রাতা মহাসান্ধিবিগ্রহিক রুদোক এবং রাজগুরু মহামাত্য (এই একমাত্র ব্রাহ্মণ), ইঁহার রথের উভয়পার্শ্বে রাজভ্রাতুষ্পুত্র এবং

মহাবলাধিকৃত, মহাক্ষপটলিক, মহাসামন্ত এবং মহাপ্রতীহার-রাজশ্যালক অশ্বারোহণে চলিয়াছেন। রাজরথের পশ্চাতে বিশালমূর্ত্তি রাজহস্তী সুপ্রতীক তার মর্য্যাদার উপযুক্তভাবে সগর্ব্ব গম্ভীর চলনে চলিয়া শোভাযাত্রার সর্ব্বাঙ্গীনতা পরিপূর্ণ করিতেছিল। এই রাজকীয় মহাহস্তী সুপ্রতীকের পৃষ্ঠে, সুবর্ণময় আবেষ্টনে ইন্দ্রাসনতুল্য আসনতলে দ্বিতীয় বাসবতুল্য রূপেই শোভা পাইতেছিল—মহারাজাধিরাজের প্রতিনিধি এবং নবীন রাজ্যের একমাত্র সর্ব্বজনপূজ্য দেশ-নায়ক যুবরাজ ভীম।

দ্রষ্টা ক্ষুদ্র গবাক্ষের উপর একান্ত আগ্রহে ললাট রক্ষা করিয়া একাগ্র দৃষ্টিতে এই সকল দৃশ্য দেখিতেছিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁর বিশাল বক্ষ অনিঃশ্বসিত যন্ত্রণা-রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসের বেগে সঘনে ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁর চিন্তা-কুটিল গভীর রেখাঙ্কিত প্রশস্ত ললাট ঘর্ম্মজলে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল; তাঁর অন্তরেরও অন্তঃস্থল হইতে হতাশায় ফাটিয়া পড়া যন্ত্রণাদিগ্ধ আর্ত্তস্বরে উত্থিত হইল—"হায় সুপ্রতীক! হায় বরেন্দ্রী!—ভীম আজ বরেন্দ্রীর রাজাধিরাজ! আর আজ আমি কোথায়?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুদূর-বিস্তৃত অরণ্যের কোথাও স্নিগ্ধশ্যাম শোভা, আবার কোথাও ভীমদর্শন পর্ব্বতমালা সুবিস্তৃত। কোনখানে নির্ঝরের ঝর্ ঝর্ রবে দশ দিক প্রতিধ্বনিত; কোথাও পুণ্যতীর্থরাজি, কোথাও তপস্যাপরায়ণ সিদ্ধপুরুষের পুণ্যাশ্রম, আর সর্ব্বত্রই রুক্ষদর্শন পর্ব্বতশ্রেণী, সলিলধারাময়ী ছোট বড় নদী এবং অনন্ত পাদপমালা বিরাজিত নিবিড় অরণ্যানী। সেই অরণ্য উন্মত্ত হিংস্র পশু গর্জ্জনে ভয়ত্রস্ত, আবার ইহারই কোন কোন স্থানে অ-হিংসানীতি বিরাজিত।

অরণ্যের অভ্যন্তর প্রশান্ততর, ময়ূরের কণ্ঠের মত কোমল হরিদ্বর্ণ পর্ব্বতে পর্ব্বতে অবকীর্ণ; ঘন-সন্নিবিষ্ট স্নিগ্ধ শ্যামকান্ত দীর্ঘকায় বৃক্ষগণে সুশোভিত এবং নিশ্চিন্ত বিচরণশীল মৃগযূথে পরিপূর্ণ। ইহাদের পাদদেশে স্বচ্ছতোয়া তটিনীগুলি খরস্রোতে বহিতেছে। আনন্দ কলরবে মত্ত পাখীর দল তীরস্থিত পুষ্পিত লতার উপর উড়িয়া বসিতেছে, তাহাতে ফুলগুলি বৃন্তচ্যুত হইয়া জলে পড়িতেছে ও উহার পরাগ-রেণুতে বাতাসকে সুরভি-স্নিগ্ধ করিয়া দিতেছে। কোথাও বৃক্ষ হইতে সুপক্ক ফলচ্যুতির মৃদু রব কোথাও শ্বাপদের কণ্ঠ ধ্বনি, কোনখানে ওষধিতরুর শাখা পত্র হইতে নানারূপ গন্ধ বাহির হইয়া বায়ুমধ্যে মিশিতেছে। শব্দজালে ও গন্ধভারে পর্ব্বতারণ্য প্রপূরিত।

এই নির্জ্জন নিরালা পার্ব্বত্যভূমে পর্ব্বতনন্দিনী পার্ব্বতীরই ন্যায় এক সুকুমারী কিশোরী কতকগুলি অরণ্য পুষ্প সংগ্রহ করিয়া গুচ্ছ বাঁধিতেছিল। মেয়েটির বয়স সপ্তদশের অনধিক, কিন্তু তার মুখখানিতে এমন একটু সহজ সারল্য ও বাল-চাপল্য আজও একসঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে যে, তাহাকে দেখিয়া কোনমতেই ষোড়শী মনে হয় না; বোধ হয়, একটি একাদশবর্ষীয়া সংসারানভিজ্ঞা বালিকা। অথচ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যপ্রভায় তাহাকে এই বনের বনদেবী অথবা দণ্ডকারণ্য-নিবাসিনী সীতা-সখী দেবী বাসন্তী বলিয়া ভ্রম জন্মে।

বালিকা উঠিয়া আসিয়া নদীতীরে একখানি পরিচ্ছন্ন শিলাতলে উপবেশন করিয়া একরাশি বিচিত্রবর্ণ ফুল লইয়া মালা গাঁথিতে লাগিল। তাহার অদূরে স্বভাব-রচিত বিচিত্র কানন-কুঞ্জে সন্ধ্যাচর পক্ষীর গম্ভীর রব শোনা গেল, বায়ুযোগে শব্দিত বংশগুচ্ছ সঘনে স্বনিয়া উঠিল, ময়ূরের কেকা-রবে ভীত হইয়া সর্পেরা গর্ত্তের ভিতর পলায়ন করিল। অদূর পর্ব্বত-কুহরে চির-নিঃস্রবণীল জলরাশি কলকলধ্বনি করিতে লাগিল। চির দিবা-

রাত্রি ধরিয়া তাহার এই কল-কল গদ্-গদ ধ্বনি কোমল গম্ভীর-রবে এখানের আকাশকে পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছে, ইহার কোন দিনই বিরাম নাই—আবার বৈচিত্র্যেরও সীমা নাই। কখনও এ ধ্বনিকে অনাদি-প্রণবের নাদ বলিয়া মনে হয়, কখনও ইহা প্রণয়ীর প্রেম-গদ্‌গদ প্রণয়বাণীর সারূপ্য ধারণ করে, কখনও সখা সখীর অজস্র হাস্যরঙ্গভরা বিশ্রম্ভালাপ বলিয়া ভ্রম জন্মে, কখন বা শিশুদের কল-হাস্যরূপে শ্রুতিমূলে ভাসিয়া আসিতে থাকে। প্রকৃতিদেবী সর্ব্বশক্তিমতী, তাই তাঁর শোভাবৈচিত্র্যও যত, ভাবের বিচিত্রতাও ততোধিক। শুধু কি এই? কখন মাথার উপর তাঁর সূর্য্যকিরীটিনী উষার গোলাপী চাদর, কখনও মধ্যাহ্নের সমুজ্জ্বল জরির ওড়নায় তাঁর মস্তকাবরণী প্রস্তুত হয় আবার কখন বা শিরোদেশ মেঘমালায় সমালঙ্কৃত হইয়া নীলবর্ণ ধারণ করে।

পর্ব্বতকুমারীর মালা গাঁথা শেষ হইল। সে এইবার মুখ তুলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। বোধ করি—মালা পরাইবার পাত্রান্বেষণে! কিন্তু কাছাকাছির মধ্যে একটা হরিণ অথবা একটা ময়ূর—এমনও একটা কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না, একটা কাঠবিড়ালী শুধু তড়বড়্ করিয়া গাছের উপর উঠিয়া গেল এবং তাহার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া গোটা দুই পাহাড়িয়া পাখী ত্রস্তেব্যস্তে উড়িয়া পলাইল। তা' দেখিয়া কিশোরী তার সূক্ষ্ম অধর কুন্দদন্তে চাপিয়া ধরিয়া স্নিগ্ধ মধুর হাসি হাসিল!

"আঃ! আর কত দূরে লোকালয়। হে বিশ্বনাথ! ক্ষুদ্র শিশুটিকে তবে কি আর বাঁচাতে পারলেম না!"

মনুষ্য-কণ্ঠের এই নিদারুণ হতাশার কাতর অভিব্যক্তিতে চমকিয়া পার্ব্বতী মুখ ফিরাইতেই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য তার চোখে পড়িল। রাহু-গ্রাসে অর্দ্ধ-পতিত হীনতেজা সূর্য্যের মতই এক শীর্ণমূর্ত্তি ম্লানকান্তি যুবাপুরুষ একটি ক্ষুধাক্লিষ্ট রোরুদ্যমান সুন্দর শিশুকে কোলে লইয়া অগ্রসর হইতে

হইতে এইরূপ আক্ষেপোক্তি করিয়া উঠিয়াছে, পশ্চাতে তার ততোধিক শীর্ণাঙ্গী ও মলিনবসনা একটি ক্ষুদ্রকায়া নারী। তাহাকে দেখিয়া ভিখারিণী বলিয়াই মনে হয়।

বিজনবাসিনী মালা ফেলিয়া দিয়া ইহাদের কাছে আসিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি মধুসূদনের যাত্রী?"

এই নির্জ্জন বনমধ্যে সহসা নারী-কণ্ঠের এই প্রশ্নে নির্ভীক যুবক সহসা চমকিয়া উঠিয়াছিলেন, উহাকে দেখিতে পাইয়া সাগ্রহে কহিলেন, "তবে কি এটা মন্দার পর্ব্বত? আমরা কি মহারাজা লক্ষ্মীশূরের রাজ্যে এসেছি?"

মেয়েটি বলিল, "তাও জানেন না? এই পাহাড়টার ওদিকেই ত মধুসূদনের মন্দির।—আপনারা যাবেন?"

শিশুটি কাঁদিতেছিল, তাহাকে তার পথশ্রান্ত অর্দ্ধ-মৃত মাতৃ-অঙ্কে প্রদান করিয়া আগন্তুক কহিলেন, "মধুসূদন যদি অনাথদের একটুখানি আশ্রয় দেন, তা' হলেই না যেতে পারি, তা নৈলে দেব-দর্শনে ত শুধু শান্তি পাবো না,—সে রকম ভাগ্য কোথায়? ব'স মা! এইখানে এ[illegible] ব'সে পড়ো, আহা! দুর্ব্বল শরীরে আর কতই সহ্য হবে!—হা, মধুসূদন!"

নারী শিশুকে কোলে লইয়াই একখানা পাথরের উপরে বসিয়া পড়িল, দেখিয়া পর্ব্বতকুমারী দয়ার্দ্র স্নেহার্দ্র স্বরে কহিয়া উঠিল, "তোমাদের বুঝি খাওয়া হয় নি? অনেক দূর থেকে আসছো না?—আমার সঙ্গে এলে আমি তোমাদের আশ্রয় দিই,—আসবে?"

যুবা ঈষৎ হাসিলেন, "নিজেই যে তুমি বনবাসিনী মা! আমাদের আশ্রয় দে'বার সুবিধা তোমার কেমন ক'রে হবে, বুঝতে পারছি না ত।"

মেয়েটি হাসিল। অত্যন্ত মিষ্ট হাসি হাসিয়া সে উত্তর করিল, "মন্দারেশ্বরের মেয়ে আমি, আমি আর দু'তিনটি লোককে একটুখানি

আশ্রয় দিতেও পারবো না ? মায়ের সঙ্গে মধুসূদন দেখতে এসেছি, তাই বনবাসিনী হয়েছি, নৈলে থাকি আমরা নগরেই।"

সসম্ভ্রমে আগন্তুক এই লক্ষ্মীরূপিণী মেয়েটিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে কহিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি চির-সৌভাগ্য-বতী হবে।—আমি নিশ্চিন্ত হলেম।"

রাজকন্যা মদনিকার বক্ষ মথিত করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইয়া আসিল, সে তাহা অতি সন্তর্পণে মোচন করিল।

মদনিকা যাহাদের আশ্রয় দান করিল, স্বপ্নেও সে জানিতে পারিল না যে, তাহারা গৌড়েশ্বরের ভ্রাতৃবধূ এবং তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র। বোধিদেব অনেক যত্নে একখানি গো-শকট এবং সামান্যমাত্র পাথেয় সহায়ে বাহির হইয়া পথে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে কোনমতে মন্দাররাজ্যের সীমানায় পৌঁছিলে সেখানে বলদ দুইটিই ব্যাঘ্রহস্তে নিপতিত হয়। তার পর কয়েক দিবস সন্ধ্যার কষ্টের সীমা রহিল না। অরণ্যে ভিক্ষা মিলে না, আরণ্য ফলও পর্য্যাপ্ত নয়, বিশেষতঃ তার শীর্ণজীর্ণ, উপবাস ও দুশ্চিন্তা শুষ্ক দেহ, শিশুকেও তার খাদ্য প্রদান করিতে পারিতেছিল না। বোধিদেব অনেক চেষ্টাতেও কোন উপায় করিতে পারিলেন না, অগত্যা শিশুটিকে কোলে লইয়া ঝরণার জল পান করাইতে করাইতে, ময়ূর, হরিণ দেখাইয়া ভুলাইতে ভুলাইতে এক দিন একটি সাধুর আশ্রমে একটু দুগ্ধ ভিক্ষা পাইয়া তাহাই পান করাইয়া কোনক্রমে তিন দিন অতিক্রম করার পর রাজকন্যার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। বোধিদেবের মনে হইল, সাক্ষাৎ মধুসূদনই যেন নিজে যাচিয়া ঐ অভাগা অভাগিনীর আশ্রয় হইলেন।

মদনদেবী তাঁহার পটাবাসে আনিয়া সন্ধ্যার ছেলেটিকে দুধ খাওয়াইল, সন্ধ্যাকে স্নানান্তে নববস্ত্র পরিধান করিতে দিয়া তাহারও ভোজনের ব্যবস্থা করিল। স্নানান্তে সন্ধ্যা একটু সিন্দুর চাহিয়া লইয়া সীমন্তে ধারণ করিলে

সে বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "ওমা! তোমার স্বামী বেঁচে আছেন? তবে তোমার অমন দশা কেন ভাই?"

সন্ধ্যা কহিল, "তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন কি না—" বলিতে বলিতে তার বহু আয়াসে চাপিয়া রাখা অশ্রুস্রোত বাঁধ ভাঙ্গিবার উপক্রম করিল।

মদনিকা কহিয়া উঠিল, "নিরুদ্দেশ হয়েছেন? ও মা গো! কি মানুষ তিনি! এমন সুন্দর স্ত্রী পুত্র ফেলে! হয় তিনি মহা পাষণ্ড, আর না হয়, আমরা আর এক জন দ্বিতীয় বুদ্ধদেব দেখবো।"

সন্ধ্যা তার স্বামীর প্রতি আরোপিত এ অনুযোগ ও বিদ্রূপে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়াও কোনমতে তাহা চাপা দিয়া রাখিয়া উত্তর করিল, "তিনি কি ইচ্ছা সাধেই আমাদের ছেড়ে গেছেন! অনেক দুঃখই তাঁকে ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছে।"—এবার তার নিরুদ্ধ অশ্রুপ্রবাহ আর বাধা মানিল না।

তাহা দেখিয়া মদনিকা দুঃখিত হইয়া বলিল, "থাক তবে, ও সব কথায় যদি কষ্ট পাও ত, ও কথা কয়ে কায নেই। তোমার খোকাটি ভাই বেশ! কি নাম ওর?"

সন্ধ্যা আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে "রাজ্যপাল" বলিতে গিয়া বোধিদেবের সাবধানতা স্মরণে সহসা থামিয়া পড়িয়া উত্তর করিল, "রাজীবলোচন।"

"ঠিক তাই! কেমন সুন্দর চোক! আচ্ছা, ওর মুখ ত তোমার মতন নয়, ও বুঝি ওর বাপের মতন হয়েছে? তা হ'লে ওর বাপও ত খুব সুন্দর!"

অশ্রুগাঢ় কণ্ঠে প্রাণখোলা আনন্দ-গৌরবে আত্ম-বিস্মৃতা সন্ধ্যা সাগ্রহে কহিয়া উঠিল, "সুন্দর! খুব সুন্দর ভাই! তেমন সুন্দর এ পৃথিবীতে আর কেউ আছে কি না জানি না।"

মন্দার দুহিতা সমবেদনাপূর্ণ উত্তপ্ত নিশ্বাস মোচন করিয়া মৃদু মৃদু উচ্চারণ করিল, "আহা!" তার পর কি ভাবিয়া সহসা কহিয়া উঠিল, "কিন্তু ভাই! তুমি যে বল্লে, পৃথিবীতে আর অমন আছে কি না, জানো না! তা' আমি কিন্তু জানি যে, আর এক জনও অন্ততঃ আছেন, তাঁর সঙ্গে অন্তের হয় ত তুলনাই হয় না।"

সন্ধ্যার শোকোদ্বিগ্ন ভগ্নচিত্তেও তার অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্বামি-গৌরবের এ আঘাতটুকু সহ্য হইল না। সে ঈষৎ আহত হইয়া ক্ষুণ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কে? আপনার স্বামী বুঝি?"

রাজকন্যা হাসিয়া ফেলিল, "দূর বোকা! আমার আবার স্বামী কোথায়? আমি কি তোমার মতন সিঁদুর পরেছি? হ্যাঁ, তবে এক রকম তাই-ই বটে! তিনি ইচ্ছা করলেই আমার স্বামী হ'তে পারতেন, এক সময় তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা নিয়ে আমার বাবা তাঁর দাদার কাছে ঘটকও পাঠিয়েছিলেন।—তিনি আমায় নিলেন না।"

সন্ধ্যা ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত এই স্বভাব-সরলা এবং প্রাণখোলা মেয়েটির মুখের দিকে চাহিল, দুঃখিতভাবে কহিল, "আহা, তিনি যদি একবার আপনাকে চোখে দেখতে পেতেন, আপনার স্বভাবের সংস্পর্শ লাভ করতেন, তা হ'লে আপনাকে ভাল না বেসে কখনই থাকতে পারতেন না। রাজপুত্র নিশ্চয়? তা হ'লে আপনার বাবা কেন আপনার জন্য স্বয়ম্বরসভা আহ্বান ক'রে তাঁকে নিমন্ত্রণ দিলেন না? তা হ'লে আপনি নিজেই ত তাঁকে বরণ ক'রে নিতে পারতেন? আপনাদের ত এ নিয়ম আছে। ক্ষত্রিয়সন্তান ও রাজপুত্র যুদ্ধের ও স্বয়ংবরের নিমন্ত্রণ যে সমানভাবেই নিতে বাধ্য।"

মদনদেবী কহিল, "তা' বটে,—তবুও এ ক্ষেত্রে তাতেও হয় ত কোনই ফল হ'তো না। তিনি হয় ত আসতেনই না। বাবার অনেক দিন

থেকে—আমার ছোটবেলা থেকেই ওঁকে জামাই করার ইচ্ছে, মাও আমায় ছোট্ট থেকে ঐ কথা সর্ব্বদাই ব'লে এসেছেন, অথচ, যখন বিয়ের কথা ওখানে এঁরা ব'লে পাঠালেন, তখন তিনি দেশভ্রমণে গিয়ে কারুকে কিছু না জানিয়েই নিজে পছন্দ ক'রে হঠাৎ এক জনকে বিয়ে ক'রে এসেছেন! আশ্চর্য্য না?—আচ্ছা, রাজপুত্রের এমন রুচি তুমি আর কোথাও দেখেছ? তিনি আমাদের দ্বিতীয়বার প্রেরিত লোককে নিজে ডেকে স্পষ্টই ব'লে দিলেন যে, 'তিনি বিবাহিত, অপর বিবাহ তাঁর পক্ষে অসম্ভব, তাঁকে এর জন্য মন্দারেশ্বরকে ক্ষমা করতে হবে।' আমার বাবা কিন্তু তা' করেন নি। তিনি বলেছেন, 'এ অপমানের একমাত্র ক্ষমার উপায়—আমার মেয়েকে নিজে যেচে এসে বিয়ে করা!'—আমি কিন্তু তা' বলি না, আমি বলি, নাই বা আমায় বিয়ে করলেন? আমি ত তাঁকেই আমার স্বামী ব'লে জানি। —ও কি ভাই! ব্রাহ্মণি! তুমি অমন হয়ে গেলে কেন? অসুখ করছে! করবেই ত, কত কষ্ট ক'রে হেঁটে এসেছ। খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে, তুমিও ওর পাশে একটু শুয়ে পড়ো।"

সন্ধ্যার শীর্ণদেহের সমস্ত রক্তটা অকস্মাৎ আগুনের মত গরম হইয়া তার মাথার উপর উঠিয়া গিয়াছিল। তাহার বিবর্ণ মুখ ও নিরক্ত অধর যেন দারুণ শৈত্যে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল, দাঁতে দাঁতে ঠকঠক্ করিয়া একটা অনিবার্য্য শব্দ হইতেছিল। তার বুকের মধ্যের আড়ষ্ট হৃদ্‌যন্ত্র যেন অসাড় হইয়া জমিয়া পড়িতেছিল, আর একটা ব্যক্তি-বিহীন উদ্দাম হাহারবে তার যন্ত্রণাবিদ্ধ অন্তর আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে চাহিতেছিল, ওগো, আমি সেই অভাগিনী গো! যে তাঁর সকল সৌভাগ্যের, সকল সুযোগের, মূলকে গোড়া ধরে কেটে দিয়েছে! আজ রাজ-জামাতা হ'লে তাঁকে হয় ত পথের ভিখারী হ'তে হ'ত না। কেন তিনি আমায় দেখলেন? কেন করুণা-সাগর মমতায় ভিজে গিয়ে এ হতভাগিনীকে পথের

ধূলা হতে কুড়িয়ে নিয়ে বুকের হার করে তার সৌভাগ্যের ঈর্ষ্যায় সুভাগিনী রাজকন্যাদেরও ঈর্ষ্যাপাত্রী করে তুললেন, আর সেই সঙ্গে নিজেকে এমন করে ধ্বংস হ'তে দিলেন! কেন আমি জন্মেই মরি নি?

কিছু পরে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া সন্ধ্যা আবার উঠিয়া বসিল। এই প্রাণঘাতী অথচ প্রাণারাম প্রসঙ্গ হইতে কিছুতেই সে আপনাকে বঞ্চিত করিতেও পারিতেছিল না; সসঙ্কোচে প্রশ্ন করিল,—"কিছু মনে করবেন না, দিদি! আপনার সেই অদ্বিতীয় সুন্দরের নামটি শুনতে ইচ্ছে করে, যদি কোন বাধা না থাকে—"

মদনিকা হাসিয়া উত্তর দিল, "বাধা কিসের? আমায় ত আর তিনি বিয়ে করেন নি যে, স্বামীর নাম ধরলে আমায় দুধে-ভাতে খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে! আচ্ছা, আগে তুমি তোমার নামটা বল ত? ক্রমাগত 'বামনী বামনী' ক'রে তোমায় কতবারই বা ডাকি? 'বামুনদিদি'ও বলতে পারি, তবু নামটা জেনে রাখাই ভাল। তোমার ভাসুর ঠাকুর ত তীর্থভ্রমণে গেলেন, এখন অনেক দিনই ত তোমায় এখানে থাকতে হবে।"

সন্ধ্যা একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে কহিল, "আমার নাম ঊষা।"

"বেশ নাম ত! আমার মানস-প্রভুর প্রেয়সীটির কিন্তু ঠিক এর উল্টো! তাঁর নাম শুনেছি না কি সন্ধ্যা! আচ্ছা, সন্ধ্যা নাম কি ভাল?"

সন্ধ্যার বিবর্ণ মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে বিব্রতভাবে মুখ নত করিয়া কষ্ট-কল্পিত মৃদু হাস্যের সহিত উচ্চারণ করিল, "ভাল, আবার কি? ছাই?"

মদনিকা খুসী হইয়া কহিল, "আমিও তাই বলি! 'সন্ধ্যা' 'রাত্রি' 'দু'পুর বেলা' এ আবার নাম কি? তার চাইতে তোমার এই ঊষা নামটি ঢের ভাল! তা বল্লে আর কি হবে? আমার মানস-প্রভু গৌড়েশ্বরের

কনিষ্ঠ, বরেন্দ্রীর মহাকুমার রামপালদেবের পছন্দর শ্রী ঐ রকমই অদ্ভুত! দেখ না, দেশে বিদেশে এত 'বাসন্তিকা' 'লক্ষ্মীশ্রী', 'শ্রীলেখা', 'চিত্রলেখা' 'ইন্দুরেখা', 'বকুলবালিকা', এমন কি, 'মাধবিকা', 'সাগরিকা' এবং মদনিকা পর্য্যন্ত এত সবই থাকতে তাঁর পছন্দ হয়ে বসলো—কি না কোথাকার এক সন্ধ্যা! না সে রাজার মেয়ে—না সে কিচ্ছু! সুন্দরী সে কি রকমই একবার সেটা বড্ডই দেখতে আমার ইচ্ছে করে, কিসে কুমার রামপাল এতই মুগ্ধ!"

সন্ধ্যার আরক্ত মুখ পুনশ্চ বিবর্ণতর হইয়া গেল। সে ক্ষীণ স্খলিত-বাক্যে মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "তোমায় দেখেন নি ব'লে,—দেখলে হয় ত তোমাতেই মুগ্ধ হবেন।"

মদনিকা ঈষৎ বিমনা হইয়া কহিল, "দূর ভাই! তা কি হয়? যে মন এক জনকে দিয়ে ফেলা যায়, তা কি আবার অন্যের কাছে ফিরে আসে?—"

বিবর্ণ ওষ্ঠাধরে ম্লান হাস্য সচেষ্টায় ফুটাইয়া সন্ধ্যা কহিল, "কেন, রাজাদের ত অনেক রাণী থাকে।"

মদনদেবী উত্তর করিল, "তারা তো স্ত্রী নয়,—রাণী। আমার রাণী হবার সখ নেই ভাই। স্ত্রী যদি হ'তে পারতুম—তবেই হতুম। আর তা' ছাড়া তিনি ত আর রাজাও নন, তাঁর ত রাণী থাকা আর সাজে না! না ভাই, এ জন্মটা আমায় আইবুড়ই কাটাতে হবে, তা হলেই বা? হোক্ গে যাক্?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর পশ্চিম-দক্ষিণ বিভাগে বাশিভা সঙ্ঘারাম হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে সুপ্রসিদ্ধ তারাদেবীর মন্দির যথাপূর্ব্ব বিরাজ করিতেছে। এই তারামঠের প্রধানাচার্য্য তারানাথ এক জন সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ উন্নতচরিত্র পবিত্রচেতা পুরুষ। মহাযাণী বৌদ্ধ হইলেও তাঁর চরিত্র-মাধুর্য্যে এবং দ্বেষভাব বিবর্জ্জিত ব্যবহারে সকল সাম্প্রদায়িক বৌদ্ধ এবং সনাতন-ধর্ম্মী তাঁহাকে তুল্যরূপেই শ্রদ্ধা করিত। নূতন রাজার অভ্যুদয়ে যখন বৌদ্ধ-সঙ্ঘ একবারেই হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল, বাশিভা সঙ্ঘের সঙ্ঘাচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ শান্তি পর্য্যন্ত যখন রাজনীতির কূটচক্রে নিষ্পিষ্ট হইতেছিলেন, ছোট বড় অনেক বৌদ্ধ-সঙ্ঘ যখন পূর্ব্ব শত্রুতার প্রতিশোধে ছোট বড় অত্যাচারে উপদ্রুত হইতেছিল, তখনও সনাতনধর্ম্মী রাজার আদেশে তারানাথের উপর কোন উপদ্রব ঘটিতে পারে নাই। ইহার অপর আর এক প্রবল কারণও বর্ত্তমান ছিল। আচার্য্য তারানাথ অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত জ্যোতিষশাস্ত্রেরও খুব সূক্ষ্মভাবেই অনুশীলন করিয়াছিলেন। জন্মপত্রী, করকোষ্ঠী, প্রশ্ন-গণনা তিনি এত সুন্দররূপে বিচার করিতে পারিতেন যে, সকলেরই নিকট তাঁর প্রয়োজনীয়তার শেষ ছিল না। পণ্ডিত তারানাথের দ্বারে তাই এই রাজ-পরিবর্ত্তন এবং রাজকীয় ধর্ম্ম-বিবর্ত্তনের যুগেও কোন যুগান্তরের সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

মধ্য বৈশাখের একটা দর্ঘ্যাবয়ব অপরাহ্ণ-শেষে এক জন দাক্ষিণাত্যবাসী পথিক রাজধানীর এই বিখ্যাত দেব-মন্দিরের অভিমুখে যে সরল পথরেখা বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহা ধরিয়া নীরবে চলিতেছিল। পথিকের বেশভূষা অর্দ্ধ মলিন পদদ্বয় ধূলি ধূসরিত এবং কঙ্কর কণ্টক দ্বারা ক্ষত বিক্ষত; মুখ একান্ত চিন্তাশুষ্ক। তিনি লক্ষ্যহীন বিমনাভাবেই পথ অতিবাহন

তোমাদের নিয়ত মন্ত্রণা শোনাচ্চে, না হ'লে তোমাদের দশা এত দিনে কি যে হতো! মহাকুমার রামপালদেব যতই ছদ্মবেশ ধারণ করুন, তাঁকে তাঁর পিতৃ-প্রজাদের চিনতে বেশী দেরী হবে না। যেখানে ছিলে, ফিরে যাও, তোমার যা কায, সে অনায়াসেই আমি সাধন ক'রে যাব এবং তারই চেষ্টা আমি করচি। তবে এটা নিশ্চিত যে, বরেন্দ্রী অন্ততঃ এখন কিছু দিন তোমায় চায় না। তোমার উপরে এদের খুব বেশীরকমই বিতৃষ্ণা। তোমায় হয় ত যুদ্ধ দিয়েই প্রমাণ ক'রে দেখাতে হবে যে, তুমি যুদ্ধ-ভীত কাপুরুষ নও। আর আমার মনে হয়, ভবিষ্যৎ পাল-সম্রাটকে তাঁর প্রজারা দয়ার চেয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে ডেকে নেয়, সেই ভাল।—তোমার কি মনে হয়?"

রামপালের বিবর্ণ মুখ আরক্ততর হইয়া উঠিল, দৃঢ় স্থির কণ্ঠে তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "বোধিদেব! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! আমি তোমার আদেশের দাস।"

"না না, প্রিয় বন্ধু! আমার আদেশের নয়—অনুরোধের—"

রামপাল হাসিলেন, "চির-বান্ধব! আজ থেকে তুমি শুধু বন্ধু নও, আমার কল্পনা-সাম্রাজ্যের মহামাত্য! তোমার উপদেশ—তোমার আদেশ রামপাল পালন করতে-সম্পূর্ণ বাধ্য যে।"

বোধিদেবের সুন্দর মুখ অন্তর্জাত গূঢ় আনন্দ-সম্মিলিত সলজ্জ ছটায় সুন্দরতর দেখাইল, আত্মসম্বরণ করিবার জন্য ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সহাস্যে কহিলেন, "বেশ, তাই হোক, আমার আদেশ,—পথে পথে দাক্ষিণাত্যবাসী পথিক-বৃত্তি না ক'রে আজই ফিরে চলে যাও। কিন্তু তুমি ত আমায় আর কোন সংবাদই জিজ্ঞাসা করলে না? তবে কি রাজ্য ভিন্ন আর কার'ও কথা তোমার মনেই নেই?"

রামপালের বক্ষের মধ্যে চলন্ত রক্তস্রোত সহসা জমাট বাঁধিয়া গেল,

সভয়ে তিনি উচ্চারণ করিলেন—"সে আমি শুনতে পারবো না, বোধিদেব! আমি যে তার কোন সন্ধানই পাইনি, হয় ত সে—"

মহাকুমার ইহার পরের যে ভীষণ সম্ভাবনা, সে কথা আর উচ্চারণ করিতেও পারিলেন না।

বোধিদেব কহিলেন, "সন্ধ্যাদেবী বেঁচে আছেন, তুমি যাও, আমি যথাকালে তাঁকে তোমার কাছে পৌঁছে দেবো। এখন এস, একবার আচার্য্য তারানাথের দর্শন ক'রে যাত্রারম্ভ ক'রে দাও।"

মন্দির বহু প্রাচীন, অতি সুন্দর কারুকার্য্যভূষিত, সুবর্ণ সদৃশ উজ্জ্বল পিত্তলকারুযুক্ত স্তম্ভ, তাহার উপর সারি সারি সুবর্ণময় বুদ্ধমূর্ত্তি। প্রতিমাগুলি প্রত্যেকে বিভিন্ন মুদ্রায় অবস্থিত। পদ্মনাভ, অমিতাভ, শাক্যমুনি প্রভৃতির বিশাল মূর্ত্তি সকল বিভিন্ন মন্দিরে সংস্থাপিত। প্রধান মন্দির তারাদেবীর। তারাপীঠে সমুজ্জ্বল বেশভূষায় বিভূষিতা স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি। দেবীর সহাস্য মুখে ভক্তজনের প্রতি বরাভয় সূচিত হইতেছে। বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে চিরপ্রজ্বলিত আলোকাধারে অনির্ব্বাপিতশিখ আলোক জ্বলিতেছে। শাক্যমুনির মন্দিরে ঘৃতদীপযুক্ত সহস্রবর্ত্তিকাস্তম্ভ দীপালীর বেশে দণ্ডায়মান। স্থানে স্থানে কয়েক জন ভোট দেশীয় ও গান্ধার দেশস্থ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণ জপমালা হস্তে বসিয়া আছেন। মণিপদ্মে ওঁ ক্ষোদিত জপ-মন্ত্র ঘুরাইয়া কেহ কেহ একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ জপ ক্রিয়া সমাধা করিতে নিযুক্ত ছিলেন।

রামপাল নগ্নপদে গল-লম্বিত-বস্ত্রে সসম্ভ্রমে মন্দির চত্বরে প্রবেশ করিয়া একে একে দেব দেবী সকলকে প্রণামাদি সমাধা করিলেন, পরে তারা-মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে এক নিভৃত স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন, চারি দিকে পলাশ, মন্দার, আম, পনস ও নিম্ববৃক্ষের ছায়াচ্ছন্ন তলদেশে একটি অনতিবৃহৎ গৃহ এবং তাহার সম্মুখে একটুখানি সুপরিচ্ছন্ন শিলামণ্ডিত

চত্বর। একখানি কুশাসনে অশীতিপর বৃদ্ধ আচার্য্য তারানাথ বসিয়া ছিলেন। তাঁর সম্মুখে দুইখানি কুশাসন বিস্তৃত ছিল।

রামপাল আচার্য্যকে ভূমিস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। তারানাথ একখানি তালপত্রে লিখিত কীট-জীর্ণ প্রাচীন পুঁথি পাঠ করিতেছিলেন, রামপাল তাঁর পদতলে প্রণত হইতেই পুঁথিপাঠ হইতে বিরত হইয়া তাঁর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, রামপাল মাথা তুলিতেই দক্ষিণ হস্তের দ্বারা তাঁর ধূলি-লগ্ন বিশাল ললাট স্পর্শ পূর্ব্বক প্রশান্ত কণ্ঠে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন,—"স্বস্তি,—শ্রী—রামাবতীপুরীর অধিষ্ঠাতা, অধুনা-বিলুপ্ত পাল-সম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা ও একচ্ছত্র সম্রাট মহারাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী পরমসৌগত পরমকুশলী রামপালদেব বুদ্ধ ভট্টারক ও পরমভট্টারিকা ভগবতী তারাদেবীর দ্বারা সর্ব্বতোভাবেই সুরক্ষিত হউন।"

রামপাল দেবের আনত শির পুনশ্চ শুভাশীর্ব্বাদকের চরণ স্পর্শ করিল। গদ্‌গদস্বরে তিনি কহিয়া উঠিলেন,—"আচার্য্যদেব! আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়েছি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দুপুরবেলাকার জ্বলন্ত সূর্য্য তখন শীতল হইয়া পশ্চিমের নীল সমুদ্রে তাঁর অর্দ্ধাঙ্গ ডুবাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু পৃথিবীর ম্লান মুখের দিকেই তখনও তাঁর ক্লান্ত করুণ শেষ দৃষ্টিটুকু লাগিয়া রহিয়াছিল। ডুবন্ত সূর্য্যের দিকে চাহিয়া চাহিয়া রামপালের মনে হইল, পাল বংশের যশঃ সূর্য্যও হয় ত এখনও অস্ত গত হয় নাই; নবীন আশার উৎসাহে তাঁর বক্ষে আবার অসীম বল দেখা দিল।

দিনের আলো একটু একটু করিয়া কম হইতে হইতে ... ঘিরিয়া

আসিল ; যেন কার মসীমাখা করস্পর্শে বিশ্ব-জগত সহসাই কালো হইয়া গেল ; আবার রামপালের বক্ষের মধ্যে স্ফীত উদ্বেলিত আশা-স্রোতঃ যেন সহসা অচলস্পর্শে থমকিয়া থামিয়া পড়িল। মানসিক সকল শক্তি যেন কোথায় মিলাইয়া গেল।

কিন্তু কেমন করিয়া সেই সুযশ-কেতন আবার তিনি উদ্ধার করিবেন ?—কেমন করিয়া ? বরেন্দ্রী তাঁর জনকভূমি, তাঁর পূর্ব্ব-পিতৃ-পিতামহের লীলাস্থল—তাঁর শৈশব যৌবনের আনন্দস্থান—সে ত আর তাঁকে চায় না ! এক দিন চাহিয়া পায় নাই,—বড় দুর্দ্দিনে, বড় অসহায় অবস্থায় বড় কাতরতার সহিতই একান্ত আপনার জানিয়া তাঁকেই তার দুঃখ নিরাশার ব্যথা জানাইতে আসিয়া হতাশা লইয়া ফিরিয়া গিয়াছে ; সেই অভিমানে, সেই অপমানের প্রতিশোধে সে নিজের ক্ষুদ্র শক্তিকে আজ বৃহত্তর করিয়া সঙ্ঘশক্তির বিজয়ঘোষণা জানাইয়াছে। আর কেন ? আর কিসের জন্যই বা সে তার অমর্য্যাদাকারীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইবে ? বরং সময় পাইয়া সুযোগ বুঝিয়া তাদের দ্বারে দণ্ডায়মান তাঁকেই আজ খেদাইয়া দিয়া পূর্ব্ব-অবহেলার প্রতিশোধ লইয়াছে, অন্যায় অসঙ্গত কিছুই ইহাকে বলা চলে না।

এই ঠিক সঙ্গত প্রতিশোধ !—"রামপাল ! সেই দুর্ব্বল ভীরু, অত্যাচারের প্রতিবিধানে অসমর্থ, আশ্রিতে অভয়দানে অপারগ, তাকে রাজা হতে দিয়ে লাভ ?"—ঠিক কথাই বলেছ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনবাসি ! ভীরু রামপালের এখন তোমাদের কাছে প্রমাণ করবার সময় এসেছে, আর আবেদনের নিবেদনের অবসর নেই—এখন অস্ত্রে অস্ত্রে বাহুতে বাহুতে প্রকৃষ্ট প্রমাণ হওয়া চাই যে, বাস্তবিকই রামপালের পালবংশ-সিংহাসনে আরোহণ করবার অধিকার আছে কি না। হাঁ এই ভাল। ভিক্ষার দান যে

তোমরা তাকে দাও নি, সে খুব ভালই করেছ ! দিলে শুধুই তোমরা নয়, রামপালকে শুদ্ধ তোমাদের সঙ্গে হীনতার চিরপঙ্কে নিমজ্জিত ক'রে রাখতে। সাধু পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন প্রজা, সাধু !—

শান্ত শীতল সান্ধ্য সমীরণস্পর্শে একই ক্ষণে রামপালের দেহ-মন যেন জুড়াইয়া গেল।

"মামার কথাই ঠিক ! সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ভ্রমণ ক'রে এখন আমাকে বল সংগ্রহ ক'রে নিতে হবে। সামন্তচক্র রচিত হ'লে অঙ্গাধিপ মাতুলের সাহায্যে তাদের সঙ্গে নিয়ে ভীষণ সমরসজ্জায় সজ্জিত হয়ে অতি যত্নে ধীরে ধীরে হয় ত বহু বর্ষে বরেন্দ্রীর দ্বারে উপস্থিত হ'তে হবে, সেই ভাল। বরেন্দ্রী ! পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ! তোমার কাছে বিজয়ী রামপাল যদি যেতে পারে, তবেই যাবে ; প্রাণভয়ে পলাতক রামপাল আর ভিখারীর বেশে যাবে না, এতে তোমারও অগৌরব।

"রামপাল ! আজও তুমি বালক ! এখানে এই নির্জ্জনে বসে চিন্তা করলেই কি তোমার বরেন্দ্রী উদ্ধার সমাধা হবে ? মনে বল কর, উদ্যম দেখাও—

'উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
ন চ সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ ॥'

এ কথাটা মান ত ? চুপ ক'রে ব'সে ব'সে জড়ত্ব লাভ হ'তে পারে, তাতে অভীষ্টলাভ কখনই হবে না। যদি বল, কবিগুরু বাল্মীকির তা'ও হয়েছিল। তিনি ধ্যান করতে করতেই "মা নিষাদ"রূপ আদি শ্লোককে ক্রৌঞ্চ-মিথুনের মৃত্যুদৃষ্টে জন্মদান করেছিলেন। তার উত্তর এই যে, তাঁর আর তোমার ইষ্টলাভ এক পর্য্যায়ভুক্ত নয়। তোমার মত অবস্থায় থেকে বহুতর মুনি তপস্বী হয় ত তপঃসিদ্ধ হ'তে পেরেছেন, কিন্তু তুমি তা-ও ত পারবে না ?—যেহেতু [illegible] নয়—

রাজ্যলাভ ; এবং সেটা একান্তই চেষ্টা ও পৌরুষ সাপেক্ষ। নিদ্রিত থাকলে পশুরাজ সিংহকেও কৃপা ক'রে পশুরা তার মুখবিবরে এসে প্রবেশ করে না, চেষ্টা ক'রে ধ'রে খেতে হয়।"

রামপাল মাতুল অঙ্গাধিপের এই সব্যঙ্গ তিরস্কারে ঈষৎ লজ্জিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মৃদুস্বরে সলজ্জে কহিলেন, "এ অসম্ভব চেষ্টা এই দুঃখাভিহিত দেহমন নিয়ে কেমন করেই যে সম্পন্ন ক'রে তুলবো, এ যে কোনমতেই স্থির ক'রে উঠতে পারছি নে' মাতুল! কৈবর্ত্ত-নায়কের ভয়ে কোন সামন্তপতিই ত আমাদের পক্ষাবলম্বন করতে ভরসা করচে না, এত অল্প দিনেই ভীম যে এমন প্রবলতা লাভ কেমন করেই করতে পারলে, এ দেখে বিস্ময়ানুভব হচ্ছে!"

"দুঃখ! দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যদি তাকে পরাস্ত করতেই না পারলে, তবে এ দুঃখ পাওয়ার সার্থকতা কোথায়? দুঃখ কি ঐ ভীমই কিছু কম পেয়েছে? কিন্তু দুঃখ তাকে ঐ অসীম বল দিয়েছে, দুর্ব্বল করে নি।"

নিগূঢ় লজ্জার গাঢ় রক্তিমায় রঞ্জিত হইয়া রামপাল গভীর স্বরে কহিয়া উঠিলেন, "আপনার এই তিরস্কারই আমার উপযুক্ত! আসুন মাতুল, কেমন ক'রে আমাদের কার্য্যারম্ভ করতে হবে, পরামর্শ করা যাক।"

"প্রথমতঃ আমাদের নূতন ক'রে এক সামন্তচক্র প্রণয়ন করতে হবে, তার জন্য আবশ্যক হয়, পৃথিবী পর্য্যটন করা যাবে। তুমি, আমি, সুবর্ণদেব, শিবরাজ, বোধিদেব, প্রজাপতি নন্দী এই কয় জন আছি, এস, দিকে দিকে বেরিয়ে পড়ি। আহা, এ সময়ে শূরপাল থাকলে বড় ভাল হ'ত। মগধ তাকে চিনত, তাকে ভালবাসত, এখন মগধের মহাসামন্তপতি কৈবর্ত্ত-অধীনতা ত্যাগ ক'রে রাজা হয়ে বসেছেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি পাল-সাম্রাজ্যের জন্য যত্নবান হবেন, এমন ত আশা হয় না; কারণ, তা

হ'লে তাঁর স্বাধীন স্বাতন্ত্রিকতা আবার নষ্ট হবার আশঙ্কা। পীঠীপতিকে সহজে বশ করা যাবে না, আর আমার অপর চিন্তা মন্দারের রাজার জন্য। যাই হোক, আপাততঃ অন্যত্র চেষ্টা দেখা যাক। মন্দারেশ্বর এ দিকের মধ্যে যথেষ্ট প্রবল, তাই তাঁর সাহায্য পেলে আমাদের পক্ষে খুবই ভাল হয়, নিতান্ত যদি এটা না হয় কযঙ্গলের পথ ধ'রে আমাদের বরেন্দ্রীর অভিমুখে ফিরতে হবে। সুবর্ণদেব, শিবরাজ, প্রজাপতি নন্দী, বোধিদেব এদের দিকে দিকে পাঠিয়ে দিয়েছি, এখন মন্দার আর কযঙ্গল এই প্রধান দুটো তোমায় স্বয়ং গিয়ে চেষ্টা করতে হবে। যেহেতু, এদের সহায়তা না পেলে আমাদের যাত্রাপথই যে বিমুক্ত হবে না। আমার মনে হয়, আগামী কল্যই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা ত্রয়োদশীতে তুমি সর্ব্বপ্রথম মন্দারযাত্রা করলেই ভাল হয়। তার পর সেখান থেকে ফিরে এসে, পীঠীপতির বিরুদ্ধে যদি সহজে হয়, ভালই, নতুবা যুদ্ধাভিযানই করতে হবে। সেবারে দেবরক্ষিত পরাজিত হয়ে গেছে, সহসা কোন্ সময় এসে যে আমাদের আক্রমণ ক'রে বসবে, তার ত কিছুই স্থিরতা নেই, ও বিষয়ে পূর্ব্ব-সাবধানতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু মন্দার সম্বন্ধে—"

রামপাল সলজ্জমুখে বাধা দিলেন, কহিলেন, "তার চেয়ে মগধ ও পীঠীর যুদ্ধ আমার হাতে দিয়ে মন্দারের ভারটা আপনি আর কারুকে দিন না, মামা! ছোটমামা বা শিবরাজ এঁরা কেউ যদি—"

মথনদেবের ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, "কেন, তোমারই বা যেতে আপত্তিটা কিসের? লক্ষ্মীশূর লোকটা কিছু অভিমানী, সেও ত বলতে পারে যে, যার বিপদ, সে নিজে কি আসতে পারতো না? তার চেয়ে তুমি যাওয়াই ভাল।"

রামপাল তথাপি কুণ্ঠিত রহিলেন, পরে বলিলেন, "আমার যাবার

কথা বলিয়া, বলিলেন, "শুনেছি, তিনি বলেছেন, তাঁর মেয়েকে বিয়ে না করলে তিনি আমায় কখনই ক্ষমা করবেন না। অগত্যাই আমাদের ও দিক দিয়ে যাবার চেষ্টা ত্যাগ করাই ভাল,—যদি তিনি আপনাদের কথায় আমাদের পক্ষে যোগদান না করেন।"

মথনদেব ঈষৎ বিমনা হইয়া থাকিয়া পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন, "রামপাল!"

"বড়মামা!"

মথনদেব কহিলেন, "তুমি জানো, সম্বন্ধে ভাগিনা হ'লেও তুমি আমার ছেলের চেয়েও প্রিয়তম। আমার মত হিতৈষী তোমার সংসারে হয় ত আর কেউই নেই, না হয় ত কমই আছে,—আমার উপদেশ নেবে?"

রামপাল মস্তক নত করিলেন, কি উপদেশ পাইবেন বুঝিয়াই কথা কহিলেন না।

"তুমি মন্দারের রাজকন্যাকে বিয়ে কর। লক্ষ্মীশূরকে সহায় পেলে দেবরক্ষিতও হয় ত আমার পূর্ব্বশত্রুতা ত্যাগ করতে পারে, পীঠীপতি মদনদেবীর মাতুল। এমন সুযোগ তোমার মত বিপন্ন রাজার ছাড়া উচিত নয়,—আর তা ছাড়বেই বা কেন?"

রামপাল নীরব রহিলেন। কিছুক্ষণ তাঁর উত্তর পাওয়ার বৃথা প্রত্যাশা করিয়া অবশেষে একটু উত্তেজিত কণ্ঠে মথনদেব কহিতে লাগিলেন, "রাজবংশে বহুবিবাহ কোন কালে কোন যুগেই নিন্দনীয় নয়, আবহমানকাল ধ'রেই—যত পুরাণ ইতিহাস আছে, খুঁজে দেখ গে যাও, আবহমানকাল ধরেই সকল রাজা মহারাজ একাধিক বিবাহ ক'রে এসেছেন, বিশেষ ক'রে এ রকম রাজনৈতিক কারণে ত রাজাদের যখন তখনই বিয়ের বর

করেন, ভুলে গেছ? তুমি ত এই ছেলেমানুষ, যদি এ বিয়েটা করলে সব দিকে ভাল হয়, কেনই বা করবে না?"

এবার রামপাল মুখ তুলিলেন, বিষাদপরিলিপ্ত অথচ দৃঢ়তার আভায় অনুরঞ্জিত চিরসুন্দর মুখ মাতুলের কর্ত্তব্য-রূঢ় দৃষ্টির সম্মুখে উঠাইয়া ধীরকণ্ঠে কহিলেন, "আমি জানি, আপনি আমার জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সুহৃৎ, সহায় এবং শ্রদ্ধাস্পদ; তা' সত্ত্বেও আমি আপনাকে মিনতি জানাচ্ছি, আপনি আমায় ও আদেশ দেবেন না, আমি তা রাখতে পারবো না।"

মথনদেব মনের মধ্যে বিষম আঘাত পাইলেন, আশাহত হইয়া রুষ্ট হইলেন, কিন্তু একান্ত স্নেহাস্পদের সকল অপরাধই মানুষের পক্ষে মার্জ্জনীয় হয়, তাই, অন্য কেহ হইলে এত বড় অবাধ্যতায় যত বেশী ক্রুদ্ধ হইতেন, ততটা না হইয়া কতকটা শান্তভাবে কথা কহিলেন, বলিলেন,—"তুমি কি আশা কর, এত বড় কাণ্ডের পরেও বউমা এখনও বেঁচে আছেন? তাঁকে আবার তুমি ফিরিয়ে পাবে?"

এই নিষ্ঠুর মন্তব্যে রামপালের বীর চিত্তও এক মুহূর্ত্তের জন্য যেন তীক্ষ্ণ শব্দভেদী তীর দিয়া বিদ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু এক মুহূর্ত্ত পরেই তাহা সহিয়া লইয়া তিনি দৃঢ় বিশ্বাসের অটল স্বরে উত্তর করিলেন, "আমার বিশ্বাস, সে বেঁচে আছে, আমি তাকে ফিরে পাবো।"

মথনদেবের মনের মধ্যে যত বড় অসন্তোষই জাগ্রত হইয়া উঠুক, মুখে তিনি তখনকার মতন আর কিছুই বলিলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দিন মাস বর্ষ, বর্ষ মাস দিন কালচক্রের নর্ত্তনতালে অহরহই অতীতের পর অতীতের গর্ভে প্রবেশ করিতে চলিয়া গেল। আজ যাহা বর্ত্তমান ছিল, কাল তাহাই শুধু জন কত মানবচিত্তের স্মৃতির পটে লিখিত পুরাতন চিত্রে পরিবর্ত্তিত হইল। দু'দিন পরেই আবার তাহা বিস্মৃতির গর্ভে চিরপ্রবেশ করিতে বাধ্য হইবে।—এ শুধু আজি নহে, চির-যুগ এবং চিরন্তন যুগান্তর ধরিয়াই এই খেলা নিরবধিকাল পর্য্যন্ত চলিতেছে। বর্ত্তমান চির-বর্ত্তমান থাকে না বলিয়াই শুধু জগতে নিত্য নিয়মিত কত যে অঘটন ঘটনা ঘটিয়া যায়, তাও মানুষের সহ্য হয়। আজ যে রাজাধিরাজ ভিক্ষাজীবী এবং যে ভিখারীর রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিল, কাল সেই দুজনকারই বর্ত্তমানের নিগূঢ় দুঃখ এবং প্রগাঢ় আনন্দ অতীতের সর্ব্বংসহ শক্তির অধীনে পড়িয়া তাদের দুজনকেই উহা সহিয়া লইতে সামর্থ্য প্রদান না করিলে হয় ত দুজনকারই সহ্য করা দুরূহ হইত। কিন্তু অতীতই, কালই তাহাদের এত বড় পরিবর্ত্তনেও অটল থাকিবার একমাত্র শক্তিদাতা।

রামপাল এই দীর্ঘ দিন নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই। তিনি সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যটনে সামন্তচক্র গঠন করিতেছিলেন। তাঁহার পিতার প্রতি মৈত্রী-ভাবাপন্ন এবং অধীনস্থ বহুতর রাজা ও রাজন্যবর্গ (নিতান্তই যাঁহারা বরেন্দ্রীর পার্শ্ববর্ত্তী নহেন) তাঁহারই পক্ষাবলম্বন করিতেছিলেন, এখন হইতে বরেন্দ্রী যাত্রার প্রথম দ্বার মন্দারের পথ রামপালের পক্ষে রুদ্ধ জানিয়া তিনি দ্বিতীয় দ্বার কযঙ্গলেশ্বরকে নদীতীরবর্ত্তী ভূমি ও কিছু ধনরত্ন প্রদানে তাঁহাকে স্বপক্ষাবলম্বী করিলেন। অন্যান্য রাজারাও তাঁহাকে অশ্ব, হস্তী ও পদাতি সৈনা দিয়া সহায়তা করিতে লাগিলেন। অসংখ্য নাসির সৈন্ত মায়ন ও শিবরাজ নিজেরাই গঠন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে

কতকগুলি ঘটনাপরম্পরা ঘটিয়া গেল। উদ্দণ্ডপুরে শূরপাল বন্দিদশা হইতে মুক্ত হইয়া সামান্য দিনমাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে উদ্দণ্ডপুর এত দিন মগধের মহাসামন্তপদাভিষিক্ত পালবংশীয় রাজকুমার বিত্তপালেরই অধীনস্থ ছিল, রামপাল মগধরাজ্যের উত্তরাধিকার চাহিয়া পাঠাইতে প্রথমতঃ বিত্তপাল রামপালের দূতকে উপহাস করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "রাজবন্দী রামপালদেব আবার পালসম্রাট কবেকার কোন্ স্বপ্নযোগে হয়ে বসলেন, আমরা ত তা' জানতে পারিনি! যা হোক, পাল-সাম্রাজ্যই যখন নেই, তখন তার সিংহাস[illegible]ন সম্রাটকেই বা কে স্বীকার করে? মগধ আমায় ভূতপূর্ব্ব মহারাজাধিরাজ [illegible] পালদেব দিয়ে গেছেন, উদ্দণ্ডপুর আমায় নিজে ডেকে নিয়েছে, এতে তাঁর [illegible] অধিকার?"

রামপালের দূতক শিবরাজ উত্তর দিয়া আসিলেন, "তবে বিজয়ীর অধিকারই স্থাপিত হ'বে। আপনি তাঁর আত্মীয় বলেই অনুরোধ করা হয়েছিল।"

ইহার পর রামপাল তাঁহার নবগঠিত সুশিক্ষিত সৈন্যদল লইয়া মগধ আক্রমণে অগ্রসর হইতেছেন জানিয়া বিত্তপাল আত্মরক্ষার জন্য এক কূট-কৌশল খুঁজিয়া বাহির করিলেন। পীঠীপ'ত দেবরক্ষিত অঙ্গাধিপের পুরাতন শত্রু। দেবরক্ষিতকে এই সময় অঙ্গরাজ্য আক্রমণের জন্য অনুরোধ ও উৎসাহিত করিয়া তুলিয়া বিত্তপাল মনে মনে আত্মবুদ্ধির প্রশংসা করিলেন। তাঁর বিশ্বাস হইল, অঙ্গপতি ও রামপালের স্বল্প বল দেবরক্ষিতের হস্তেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে, মগধ পর্য্যন্ত আর আসিয়া পৌঁছিবে না। ফলে তাহাই ঘটিবার উপক্রম যে না হইয়া উঠিয়াছিল, তাও নয়। পীঠিপতি দেবরক্ষিতের অত্যন্ত সহসা এবং প্রচণ্ড আক্রমণে অঙ্গাধিপ ও রামপাল অত্যধিক বিপন্ন বোধ করিলেন। তাঁহাদের

দেবরক্ষিতের সহিত যুদ্ধে প্রথমতঃ মথনদেবপক্ষীয়গণ পরাজিত হইলেন। মথনদেবের অঙ্গরাজ্যের সীমানায় মগধের যে অংশ তাঁহার অধীনস্থ ছিল, দেবরক্ষিত সেই স্থল অধিকার করিয়া গৌড়ীয়-মগধের দ্বারাবরোধ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মথন ও রামপালের সমস্ত আশা ভরসাই বিধ্বস্ত হইয়া গেল। মথনদেব কহিলেন, "এখনও কি মন্দারে যেতে তোমার আপত্তি আছে রামপাল? এখনও ভেবে দেখ, এ সময় লক্ষ্মীশূরের সাহায্য না পেলে তোমার রাজ্যোদ্ধার ত দূরের কথা, আমাকেই হয় ত রাজ্যচ্যুত হ'তে হবে।"

রামপাল বিষাদমগ্ন চিত্তে নীরবে রহিলেন, ক্ষণ পরে কহিলেন, "অসম্ভব মাতুল! আত্ম-বিক্রয় আমার দ্বারা হবে না। আসুন, আমরা প্রাণপণ চেষ্টায় আবার দ্বিতীয় আক্রমণ করি। কে জানে? হয় ত এবার আমাদেরই জয় হ'তে পারে।"

মথন কহিলেন,—"কিন্তু লক্ষ্মীশূর—"

রামপাল সাগ্রহে বাধা দিলেন, "বোধিদেবের মুখে শুনেছি, তিনি কায়মনোবাক্যে পূর্ণরূপেই আমার বিদ্বেষী, তবে এইটুকু স্থির যে, কৈবর্ত্ত-পক্ষেও তিনি যোগদান করবেন না, এ বিষয়ে তিনি অত্যধিক গর্ব্বিত। আমাদের পক্ষে সেই যথেষ্ট!"

মথনদেব দুঃখিতচিত্তে নীরব রহিলেন।

এই দ্বিতীয় আক্রমণ প্রবলতরই হইল। বিন্ধ্যমাণিক্য নামধারী মহা হস্তিপৃষ্ঠে দ্বিতীয় বজ্রধারী বাসবের মতই মহাবীর মথনদেব যেন কালান্তক কালের মতই ভয়াল হইয়া উঠিলেন। দেবরক্ষিত এই যুদ্ধে পরাভূত হইয়া পলায়ন করিলেন। রামপাল-মথনের অস্তমিত আশা-রবি পুনরুদিত হইল।

কিন্তু এ সমরে এইখানেই শেষ হইল না। বিগ্রহপালের প্ররোচনা ও

সহায়তা লাভ করিয়া দেবরক্ষিত আবার অঙ্গরাজ্য আক্রমণার্থ প্রস্তুত হইতেছেন সংবাদ পাইয়া, প্রজাপতি নন্দী এবং বোধিদেবের পরামর্শে মথনদেব তাঁহার সহিত নিজ কন্যা শঙ্করীদেবীর বিবাহপ্রস্তাব করিয়া তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূতরাজ স্বয়ং বোধিদেব।

বিবাদ-নিষ্পত্তি এবং বিবাদের সূত্র ছেদিত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে পরমাত্মীয়তার সুমধুর সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়া গেল। অঙ্গাধিপের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন,—তাঁহারই পরম স্নেহাস্পদ জামাতা। রাজকন্যা সুশীলা শঙ্করী উভয় রাজ্যের মধ্যে মিলনসেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া বহুতর মহাসমস্যার সমাধান করিল।

বিবাহরাত্রিতে সকৃতজ্ঞ নেত্রে চাহিয়া মথনদেব কন্যাকে কহিলেন, "ভাগ্যে তুই আমার ঘরে জন্মেছিলি মা আমার! তাই আজ আমার গভীর বিষাদ বিপুল আনন্দে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। আমি দেবরক্ষিতকে আমাদের অভীষ্ট কার্য্যের সহায় পেলেম।"

ইহার পর আর মগধ-বিজয় কঠিন রহিল না।

মহাকুমার রামপালদেব অঙ্গাধিপ মথনদেব ও দেবরক্ষিতের সহিত অসংখ্য সুশিক্ষিত নাসির সেনা সঙ্গে মগধ-বিজয়ে আসিতেছেন সংবাদ পাইয়াই পালবংশের ও শূরপালের অনুরক্ত অসংখ্য নাগরিক দলে দলে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ নগরতোরণের অভিমুখে অগ্রসর হইল। সমুদ্র-কোলাহলের ন্যায় সমুচ্চ রোলে পাটলীপুত্রের আকাশ-বাতাসকে কম্পিত করিয়া লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল—"মগধ-গৌড়ের ভবিষ্যৎ মহারাজচক্রবর্ত্তী রামপালদেবের জয় হোক!"

ভয় পাইয়া বিত্তপাল দীনভাবে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—"ক্ষমা করুন মহাকুমার! মগধ আপনারই, আপনি গ্রহণ করুন।"

রামপাল শরণাগতকে সাদরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সস্নেহে কহিলেন,—“মগধ পাল সাম্রাজ্যের,—এস ভাই, আমরা দুজনের সম্মিলিত চেষ্টায় মগধ-গৌড়ের একীকরণকার্য্য সম্পন্ন ক'রে তুলি, আমাদের উভয়েরই পিতৃভূমি আজ পরের হাতে।”

মগধের প্রজা রামপালকে রাজাধিরাজরূপে সাগ্রহচিত্তে বরণ করিয়া লইল।

মানুষের সুদিন এবং দুর্দ্দিন কখন্ আসে, কখন্ যায়, কেহ তার হিসাব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। দুঃখের দিন যখন আসে, সে তার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতেই যেন সহস্র প্রকারের বিপদ্, বাধা বিপত্তিকেও আকর্ষণ করিয়া আনে। সে দিনে যা কিছুই ঘটে, অমঙ্গলের অশুভ হস্ত তাহার মধ্যে বর্ত্তমান দেখা যায়। আবার যে দিন মানুষের সদা পরিক্রমণ-শীল ভাগ্যচক্র আবর্ত্তিত হইয়া তার সুখস্থানের অধিপতি শুভগ্রহের সুফল প্রাপ্তির দশা লাভ করে, সে দিন তার অযাচিত, অপ্রত্যাশিত সহস্র সুখের উপাদান ও উপায় আপনি আসিয়া তাহাকে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, তাদের খুঁজিতে যাইতেও বিলম্ব সহে না। রামপালের ভাগ্যাধিপতি ও সুখাধিপতিরও হয় ত এই সময়ে দেবরক্ষিত ও বিত্তপালের মতই পরস্পর মৈত্রী সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহার প্রবলপ্রতাপান্বিত কর্ম্মপতিও মহাবীর অর্জ্জুনের মত অজ্ঞাতবাস ছাড়িয়া এইবার স্বক্ষেত্রস্থ ও ফলপ্রদ হইয়া উঠিলেন। বরেন্দ্রী আক্রমণের সমুদয় উপাদান প্রস্তুত হইয়া উঠিল।

কেবল সন্ধ্যার বিরহে তাঁর সারা চিত্ত সুখলেশহীন হইয়া রহিল। বোধিদেব বলিয়াছেন, সন্ধ্যা বাঁচিয়া আছে, সময় আসিলেই সে আসিবে। কিন্তু, কৈ, এখনও কি তার আসিবার সময় আসিয়া পৌঁছিল না? রামপাল আজ ত আর পরগৃহপ্রবাসী, মাতুলকুলের দয়াজীবী ভিখারী নহেন, এখন বরেন্দ্রী ব্যতীত প্রায় অধিকাংশ পালরাজ্য তাঁহাকেই তাহাদের

প্রভু স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কেহ ভয়ে, কেহ মৈত্রীতে, কেহ পরাজিত হইয়া অধিকাংশ করদ রাজাই এখন রামপালের স্বপক্ষ। মহীপালের নিজ মাতৃস্বস্পতি বর্ম্মণরাজও একদা দিব্যোকের নিকট পরাস্ত হওয়ায় রামপালের সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সবই ত প্রস্তুত, পিতৃভূমি যেন হাত বাড়াইয়া তাঁর নির্ব্বাসিত বিতাড়িত পুত্রকে আহ্বান করিতেছেন, কিন্তু এ সময়েও কি একবার সেই হারামণিটিকে দেখিয়া পরিতৃপ্ত প্রসন্নচিত্তে জনকভূমি উদ্ধারে যাত্রা করিতে পারিবেন না?

বোধিদেবের দেখা নাই। মগধ যে দিন বিনা যুদ্ধে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করিল, রামপাল যেদিন পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, মহামাত্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই বোধিদেব সহসা বিশেষ প্রয়োজনীয় তীর্থযাত্রায় সেই রাত্রেই মথনদেবের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছেন, যাত্রার সম্বন্ধে একটি কথাও তিনি রামপালকে জানাইবার আবশ্যকতা পর্য্যন্ত বোধ করেন নাই!

যে দিন রামপাল মগধের রাজাসন এবং বোধিদেব মহামাত্যের সম্মানাসন গ্রহণ করেন, সে দিন সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে গিয়া সহসা স্মিত-গম্ভীর মুখে রামপাল উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন,—রাজ-পুরোহিতের হস্তে অভিষেকের সপ্ততীর্থজল ও সুবর্ণদেবের হস্তে সুবর্ণময় রাজদণ্ড, তাঁরা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, রামপাল সোপান অবতরণপূর্ব্বক নতমস্তকে বোধিদেবের আসনের সম্মুখীন হইলেন,—নম্রস্বরে কহিলেন, "মহামাত্য! আদেশ করুন, পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতিমত আপনার সাক্ষাতে উপবেশনের অধিকার ত আমার নেই!"

বোধিদেবের সহসা সেই সুদূর দিনের সমতটের সমুদ্র তীরের পরিহাস-বাণী স্মরণ হইল। প্রবল হাস্যবেগকে বহু কষ্টে দমনে রাখিয়া তিনিও সেই মত হাস্যপ্রফুল্ল গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর করিলেন—"জয়োঽস্তু রাজাধিরাজ! আমি আপনাকে আদেশ করছি আপনি রাজাসনে

উপবিষ্ট হোন, এইরূপ প্রতিদিনই আপনি আমাদের নিকট হ'তে এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপেই সহায়তা লাভ করতে পারবেন।"

মন্দহাস্যে সভাসীন সকল ব্যক্তিরই অধরপ্রান্ত স্ফুরিত হইয়া উঠিল, কোথাও কোথাও হইতে ঈষৎ উচ্চ হাস্যও শ্রুত হইতে লাগিল, বয়োবৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণ এই দৃশ্যের দ্রষ্টা হইয়া সুপ্রসন্নচিত্তে নূতন রাজার উদ্দেশ্যে আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিলেন। কেহ কেহ স্পষ্টই বলিলেন,—"ধর্ম্মপাল প্রভৃতির যশোরাশি যে এঁর হস্তে এসে বর্দ্ধিততর হ'তে পারবে, এ আমরা দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্চি। অঙ্কুর থেকেই বৃক্ষ চেনা যায়।"

রামপাল সলজ্জ-স্মিত মুখে অপাঙ্গে বারেক প্রিয়সখার প্রীতি-স্মিত মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সিংহাসনারোহণ করিলেন।

সেই রাত্রেই বোধিদেব তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া গিয়াছেন, মাসাধিক কাল অতীত হইয়া গেল, আজও তাঁর দেখা নাই!

সে দিন বর্ষা-মধ্যাহ্নে অলস মন্থরগামী মেঘচ্ছায়ায় ক্ষণে ক্ষণে আলোকান্ধকারের বৈচিত্র্যপূর্ণ দীর্ঘ দিবসে মথনদেব ও রামপাল তাঁদের সমাগতপ্রায় যুদ্ধযাত্রার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। শ্রাবণ মাস প্রায় বিগত, ভাদ্র শেষ হইয়া আশ্বিন দেখা দিলেই শরতের মেঘ-নির্ম্মুক্ত নির্ম্মল আকাশ মাথার উপর লইয়া এবং শরৎলক্ষ্মীর সুপ্রসন্ন লীলাঞ্চল পদতলে ধরিয়া তাঁহাদের নিশ্চিত বিজয়ের বিরাট বাহিনী বিজয়াদশমী-দিবসে জয়যাত্রায় বাহির হইবে। নদী-মাতৃক বঙ্গভূমে নৌবাহিনীর প্রয়োজন অল্প নয়, পূর্ব্বতন পালসাম্রাজ্যের জলযান সমস্তই প্রায় কৈবর্ত্ত-জাতীয় নাবিকগণের হস্তে ছিল। তাহারাই সুদূর যবদ্বীপ প্রভৃতি সামুদ্রিক দ্বীপে বাণিজ্যব্যপদেশে বণিকদিগকে লইয়া গিয়া তথায় বহুতর আর্য্য উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া আসিয়াছে। সেই জলপথে দুর্দ্ধর্ষ, নির্ভীকচেতা কৈবর্ত্তরা এখন পালসাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। মথনদেব কহিতে

লাগিলেন, "নাসির ও পদাতি সেনা যথেষ্ট সংগ্রহ হয়েছে, এখন নাবিক ও নৌবাহিনীর প্রতিই আমাদের মনোযোগী হ'তে হবে।"

"এই যে! এস এস অমাত্যবর বোধিদেব! প্রণাম ব্রাহ্মণ! কি সংবাদ?"

বোধিদেব ধূলি-লাঞ্ছিত চরণে শ্রান্তদেহে গৃহ প্রবেশ করিলেন। দূর পর্য্যটনের সকল চিহ্নই তাঁহার মধ্যে প্রকটিত। অঙ্গাধিপকে যথোচিত সম্ভাষণপূর্ব্বক তিনি রামপালের ঔৎসুক্য উত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন, "কৈ, মিষ্টান্ন বার করছো না যে বড়? অমনিতে ত হবে না।" বলিয়া পিছনে ফিরিয়া ডাকিলেন, "মা! এই দিকে আসুন!"

ধীরপদক্ষেপে একখানি ম্লান সন্ধ্যাচ্ছায়ার মতই একটি ক্ষীণাঙ্গী নারী ঈষৎ অগ্রসর হইয়া আসিয়া জড়িত কুণ্ঠিতপদে কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং থমকিয়া দাঁড়াইল। এত দীর্ঘ দিনের পরেও, এত বড় রূপ পরিবর্ত্তনের মধ্যেও রামপাল কম্পিত স্পন্দিত চমকিত রামপাল, মুহূর্ত্তমধ্যেই চিনিতে পারিলেন, এই যে দীনহীনা ভিখারিণী মূর্ত্তিধারিণী নারী,—এ সন্ধ্যা,—এ তাঁহারই সেই আদরের সন্ধ্যারাণী!

মথনদেব তৎক্ষণাৎ কক্ষ ত্যাগ করিলেন। বোধিদেব তাঁহার পশ্চাতে গেলেন, যাত্রাকালে বলিয়া গেলেন, "প্রিয়সখা! সেবার সমতটের সমুদ্র-কুলের ঘটক-বিদায় এখন পর্য্যন্ত বার করতে পারিনি, এবার কিন্তু আর ঋণ রাখা চলবে না।—'মিষ্টান্নমিতরে জনা' কথাটা স্মরণ রেখ!"

রামপাল গাঢ়স্বরে কহিলেন, "তোমার ঋণ অপরিশোধ্য যে বন্ধু! এ ঋণ শোধ দে'বার সাধ্য রামপালের নেই।"

অগ্রসর হইয়া গিয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন, "সন্ধ্যা! রাণী আমার! এখনও বেঁচে আছিস সে?"

বিবশা, বিহ্বলা, আত্মহারা সন্ধ্যারাণী আপনাকে সেই প্রিয় ভু
একেবারে বিলীন করিয়া সঁপিয়া দিল।

"মা গো! এ'কে মা গো? এ কেন তোমায় ধ'রে রেখেছে? ওকে ছেড়ে দিতে বল না।"

শিশুকণ্ঠের এই তীব্র মধুর অনুযোগে গভীর বিস্ময়ের সহিত গৌড়-মগধের অধিপতি সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—একটি অপূর্ব্ব-দর্শন সুন্দর শিশু!

রামপাল বিস্মিত স্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, চাহিয়া দেখিতে দেখিতে তাঁর বিশাল বক্ষ গভীর আবেগের সঘন আন্দোলনে স্ফীত হইয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে তাঁর বিস্ফারিত পদ্মপলাশনেত্র ভেদ করিয়া উষ্ণ জলের তপ্ত বাষ্পে দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি উন্মত্ত আবেগের বশে শিশুকে সবেগে কোলে তুলিয়া লইয়া, তাহাকে সবলে উল্লাসবেগে আলোড়িত নিজবক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁর প্রতি শিরা উপশিরার মধ্য দিয়া অপরিসীম আনন্দের তড়িৎ তীব্রবেগে ছুটিয়া ফিরিতে লাগিল। তাঁর সুদীর্ঘ দিনের অপরিমেয়ভাবে সঞ্চিত অসীম বেদনার রাশি সেই মহামুহূর্ত্তে যেন কার মায়া-যষ্টির স্পর্শসুখে একই ক্ষণে চিরদিনের মতই লঘু, লঘুতর ও লঘুতম হইয়া গেল। তিনি প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করিয়া তাঁর ক্রোড়স্থ শিশুকে পুনশ্চ বক্ষে চাপিয়া প্রগাঢ় স্নেহে তাহাকে পুনঃপুনঃ চুম্বন করিলেন।

"সন্ধ্যা! সন্ধ্যা! রাণি! এ কি আমার অযাচিত পুরস্কার? এত আশা ত আমি কোন দিনই করিনি রে? হে সুগত! কি করুণাময় তুমি!"

শিশু রাজ্যপাল পিতার বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে অনুযোগপূর্ণ অভিমানের সহিত ছলছল চোখে মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "এটা আমায় অত ক'রে চেপে ধ'রে কেবল কেবলই চুমো [illegible]? আমার বাবা পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ

রামপালদেবকে ব'লে দিয়ে এই দুষ্টুটাকে আমি এর পর খুব দণ্ড দেওয়াবো কিন্তু,—তখন খুব হবে! এ আমার মুখ যে এঁটো ক'রে দিলে মা গো!"

পিতা মাতা দু'জনেই শিশুর কথায় হাসিলেন, অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে হাস্যরঞ্জিত অধরে সন্ধ্যারাণী পুত্রের চিবুকস্পর্শে তাহাকে আদর করিয়া কহিল, "বুঝতে পারলে না রাজু! ইনিই যে তোমার পিতা মহারাজাধিরাজ—"

বিস্ময়মুগ্ধ নেত্রে পিতাপুত্র পরস্পরকে এক মুহূর্ত্তকাল নীরবে পর্য্যবেক্ষণ করিল। পিতা কহিলেন, "হাঁ বাবা, আমিই তোমার বাবা রামপালদেব। তোমার নাম কি রাজু?"

শিশু তার মিষ্টকণ্ঠে মধুর ঝঙ্কার তুলিয়া সগর্ব্বে উত্তর করিল, "পরমভট্টারক যুবরাজ শ্রীরাজ্যপালদেব। বাবা! আপনি আমার নাম জানেন না? আমি কিন্তু জানি। আপনি দেখতে অনেক বড় হয়েছেন কিন্তু তবু খুব ছোট্ট আছেন, না?—না,—মা গো?"

আবার দু'জনে একসঙ্গে বড় সুখের হাসি হাসিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাজকার্য্যের মধ্যে একটুখানি অবসর করিয়া লইয়া রামপাল সন্ধ্যার সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলে, সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যারাণী সন্ধ্যা-পূর্ব্বের পশ্চিমাকাশের মতই সমুজ্জ্বল রক্তপট্টে তার সুকুমার তনুদেহ আবৃত করিয়া মাঙ্গলিক কার্য্যে ব্যাপৃতা রহিয়াছিল। পরিশ্রমে তার ললাটের উপর নিটোল মুক্তাবলীর মতই ঘর্ম্মবিন্দুগুলি সঞ্চিত হইয়াছিল [illegible]

চন্দ্রের আশে পাশে খণ্ড মেঘের মতই তাহা সুদৃশ্য দেখাইতেছিল। আনন্দোজ্জল স্মিত মুখ স্বামীর দিকে ফিরাইয়া সে কহিল,—

"হ্যাঁ, ডেকে পাঠিয়েছিলেমই ত, নৈলে যে আর দর্শনই পাইনে!"

রামপাল ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে হাসিয়া কহিলেন,—"দর্শন দে'বার অবসর কৈ, রাণি? তবু ত সময় পেলেই ছুটে আসি। এই দেখ না, এক্ষণই আবার আমায় ফিরে যেতে হবে। প্রজাপতি নন্দী বিশেষ কাজের জন্যে আমার প্রতীক্ষা করছেন।"

সন্ধ্যা তার আরব্ধ কার্য্য ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিল, স্বামীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে পার্শ্বের মুক্তদ্বার গৃহের দিকে আকর্ষণ করিয়া কহিল,— "আমার একটা নিবেদন আছে, আজই আমি তোমায় সেটা জানাতে চাই। একটুখানি ব'সে শুনে যেতেই হবে, তা' তোমার যতই কায থাক।"

রামপাল স্ত্রীর মুখের দিকে প্রীতিপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া সস্নেহে কহিলেন,— "নিশ্চয়ই সেটা শুনে যেতে হবে বৈ কি! নন্দীমশাই না হয় একটুখানি অপেক্ষাই করবেন।"

"বসো"—বলিয়া সন্ধ্যা স্বামীকে একখানা আসন জোগাইয়া দিল এবং তিনি আসন গ্রহণ করিলে নিজে তাঁর পদপ্রান্তে উপবেশন করিল। ইহা দেখিয়া রামপাল হাসিয়া তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া তাহাকে নীরব দেখিয়া রামপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ, কি বলবে, বল্লে না?"

"এই যে বলি—" এই বলিয়া নিজেকে একটুখানি প্রস্তুত করিয়া লইয়া সন্ধ্যা সহসা ঈষৎ মিনতির স্বরে কহিল,—"আজ বরেন্দ্রী অভিযানের সমস্ত আয়োজন পূর্ণ হওয়ায় দেব ব্রাহ্মণের তুষ্টির জন্য অনেক কিছুই ত দান করলে, ভিখারীদেরও যথেষ্ট ভিক্ষা দিয়েছ, আমারও কিছু দাও—"

রামপাল হাসিয়া উঠিলেন,—হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "ভিক্ষা?

ভিখারীর কাছে ভিক্ষা চাও, সন্ধ্যা! কি আছে তার, কি দেবে সে তোমায়? সবই ত তোমায় দিয়ে দিয়েছি, রাণি!"

"সবই ত দিয়ে দিতে পারনি, যেটুকু দিতে বাকি আছে, আজ সেইটুকুই আমি ভিক্ষা চাইচি। দেবে না?"

"সে, কি—সন্ধ্যা? যা তোমায় আজও আমি দিতে পারি নি, আছে কি তেমন কিছু? কৈ, মনে ত পড়ে না?" রামপালের স্বরে ঈষৎ বিস্ময় ধ্বনিত হইল।

"আছে বৈ কি, নৈলে কি আর চাইচি? বল দেবে?" সন্ধ্যা মুখ টিপিয়া হাসিল।

"আগে বলতে হবে কি তোমায়—আজও আমার দিতে বাকি আছে?"

"আত্মাভিমান।" এই বলিয়া সন্ধ্যা টিপিটিপি হাসিতে লাগিল।

"ওঃ"—বলিয়া রামপাল তার সেই হাস্যস্ফুরিত রক্তাধরে হাসিয়া চুম্বন করিলেন,—"সেটাও তোমার চাই? ঐটুকু বাকি থাকতে দে' না রাণি! সবই ত কেড়ে নিয়েছিস্।"

সন্ধ্যা প্রাণ খোলা সুখের হাসি হাসিতে হাসিতে কহিল, "না, তা হবে না, ঐটেই আমার আজকের দিনে চাই। আচ্ছা বল, আমি আজ যা ভিক্ষা চাইবো, তা' দেবে?"

"যদি অসাধ্য না হয়, তা হ'লে তোমার প্রার্থনা যে অপূর্ণ থাকবে না, এও কি আবার আজ স্পষ্ট ক'রে বলতে হবে, রাণি!—তা' কি তুমি জানো না?"

সন্ধ্যা এ কথার পর ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, যে কথাটা তার মনকে তোলপাড় করিয়া তুলিতেছিল, সেটা বলিতে সে মনে মনে একটুখানি ভয়ও পাইতেছিল; অথচ এখন আর পিছাইবারও উপায় নাই, এতখানি ভূমিকার পর আর [illegible]

যে মায়ন এবং প্রজাপতি নন্দীর প্রতীক্ষিত মূর্ত্তিটাই আপাততঃ তাঁর প্রিয়তমা সন্ধ্যাদেবীর অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বাহ্য লক্ষণে যতই ঢাকা থাকুক, তবু অনুভবে জানা যায়। বিশেষ প্রয়োজনীয় রাজকার্য্যে তিনি যে কয়েক দিনের জন্য অন্যত্র যাইবেন, তাহাও সন্ধ্যা জানে, কাযেই কোনমতে চোককান বুজিয়া কথাটা বলিয়া ফেলিতেই হইবে, আর বিলম্ব করা অবিধেয়!

স্বামীর বাহুমূলে ছোট্ট মুখখানা লুকাইয়া ফেলিয়া সন্ধ্যা ধীরকণ্ঠে কহিল, "তুমি লক্ষ্মীশূরের মেয়ে মদনিকাকে বিয়ে করতে সম্মত হও।"

রামপাল বাস্তবিকই ততক্ষণে নন্দীর বিষয়েই উৎকণ্ঠানুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সন্ধ্যা যে এখনও নেহাৎ ছেলেমানুষই আছে, শুদ্ধ সে তাঁহাকে একটিবার কাছে পাওয়ার সুখের জন্যই ছল করিয়া ডাকাইয়া আনিয়াছে, ইহাও সস্নেহ কৌতুকে মনে করিয়া তার প্রতি সপ্রেম অনুকম্পায় তাঁর অনুরক্ত চিত্ত গভীরতর অনুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল; কার্য্যহানির কোন ক্ষোভই তার কাছে যেন স্থান করিতে পারিতেছিল না। সহসা এই কথাটা যেন কোথা হইতে নিক্ষিপ্ত একটা তীক্ষ্ণ তীরের ফলার মতই তাঁহাকে অতর্কিতভাবে আসিয়া বিদ্ধ করিল। ইহা শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন; ত্বরিতস্বরে কহিলেন, "কি বল্লে? কি করতে বল্লে আমায়, সন্ধ্যা?"

স্বামীর সচমক সাশ্চর্য্য প্রশ্নে সন্ধ্যা ঈষৎ প্রমাদ গণিয়াছিল, তার ভয় হইল, হয় ত এখনই তার তেজস্বী ও আত্মমর্য্যাদাশীল স্বামী তাহাকে তিরস্কার করিয়া চলিয়া যাইবেন, আবার কত দিনে দেখা হইবে, তাহারও ঠিকানা কিছু নাই, এমন করিয়া যদি আজ এই মনোমালিন্যের মধ্যে তাঁর সঙ্গে হঠাৎ বিচ্ছেদ ঘটে, যত দিন না আবার দেখা হইবে, সন্ধ্যার যে সে মর্ম্মজ্বালা শান্তি চলিবে। তাই সে ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া প্রথমটা কথা

কহিতে পারে নাই, তার পর সহসা কিসের বলে যেন একটুখানি অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়া সে তার লুকানো মুখখানা তুলিয়া অথচ স্বামীর দিকে না চাহিয়াই উত্তর দিল,—"মন্দারের রাজকন্যা মদনদেবীকে বিয়ে করলে যখন আমাদের সব দিকে সুবিধা হচ্চে, তখন তোমার এতই বা তাতে আপত্তি কেন?"

রামপাল স্থিরনেত্রে স্ত্রীর দিকে চাহিলেন, কহিলেন, "ওঃ,—তোমার তা হ'লে তাতে আপত্তি নেই?"

তাঁর কণ্ঠ বিশেষরূপ গম্ভীর। এই স্বরের জটিলতার মধ্য দিয়া জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সঠিক উদ্দেশ্যটাও বেশ বুঝিতে পারা গেল না। তথাপি সামান্য ক্ষণ নীরব থাকিবার পর সন্ধ্যাও যথাসাধ্য সহজভাবেই ইহার উত্তরে সংক্ষেপে কহিল,—"না—" বলিয়াই সে সযত্নে স্বামীর দৃষ্টি হইতে নিজের মুখখানাকে গোপন করিবার জন্য চেষ্টা করিল।

রামপাল অধিকতর গাম্ভীর্য্য বিরসকণ্ঠে কহিলেন—"আমার 'পরে তোমার এই রকম ভালবাসাই বটে! না হ'লে আর অন্যের হাতে আমায় বিলিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছ!" এই বলিয়াই তিনি অসন্তোষপূর্ণ দৃষ্টি সন্ধ্যার নত মুখে তীক্ষ্ণভাবে নিক্ষেপ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে গমনোদ্যত বুঝিয়া সন্ধ্যাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া তাঁর হাত ধরিল, কহিল,—"রাগ ক'রে চ'লে যেও না, শুনে যাও—"

সন্ধ্যার কণ্ঠে যে করুণ মিনতি ধ্বনিত হইল, তাহাতে রামপালকে গতিহীন করিয়া দিল, তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষাকৃত শান্তকণ্ঠে কহিলেন, "কি শুন্‌বো? তোমার পাগলামী? সে শোনবার অবসর আমার নেই।"

সন্ধ্যা কাছে সরিয়া আসিয়া স্বামীর হাত দৃঢ় করিয়া চাপিয়া ধরিল।

"পাগলামী কেন বলচো? আমি কি তোমার সময়ের মূল্য বুঝি না? আত্মবিজ্ঞাপনেই এই ... তোমার

জানাচ্চি, তুমি মদনদেবীকে বিয়ে ক'রে মন্দারেশ্বরকে সহায় লাভ কর।" এক মুহূর্ত্ত থামিয়া আবার কহিল, "বরেন্দ্রীর মঙ্গলের জন্যে এত অসাধ্য-সাধন যখন করতে পারচো, আর এটা পারবে না?"

রামপাল সন্ধ্যার এই কথায় ও তার ধীর গম্ভীর শান্তভাবে যেন সহসা অতিমাত্র বিস্ময়ানুভব করিলেন। সন্ধ্যা যে এতখানি ভাবিতে, বুঝিতে আবার বুঝাইতেও শিখিয়াছে, তাহা যেন তাঁর ধারণায় ছিল না, ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত চাহিতেই দেখিতে পাইলেন, সন্ধ্যার সন্ধ্যাতারার মত স্নিগ্ধোজ্জ্বল নেত্র দুইটি তাঁর মুখের উপরে নির্নিমেষে সংস্থাপিত, তার স্বভাবসুন্দর মুখখানিতে কি অপূর্ব্ব প্রীতিপূর্ণ মাধুর্য্য! একটা মৃদুশ্বাস মোচন পূর্ব্বক রামপাল স্নেহসিক্ত কণ্ঠে কহিলেন, "বরেন্দ্রীর মঙ্গলামঙ্গল আমারই চিন্তনীয়, তোমার স্বামীর শুভাশুভই তোমার দ্রষ্টব্য,—সন্ধ্যা! মিছামিছি এত সব ভেবে মাথা খারাপ করো না, বরেন্দ্রীর জন্য যা সঙ্গত উপায়, তা আমিই করবো।"

স্বামীর কথায় সন্ধ্যা ঈষৎ লজ্জা পাইলেও সে তাহা প্রকাশ করিল না, বরং ঈষৎ সাহসের সহিত কহিল—"রাজাধিরাজ! বরেন্দ্রীর মঙ্গলের উপরেই যে আমার স্বামীর মঙ্গল নির্ভর ক'রে রয়েছে; বরেন্দ্রী যে তোমার কত প্রিয়, তা কি সত্যিই আমি জানিনে?"

রামপাল আবারও বিস্মিত হইলেন। সেই সন্ধ্যা! ভীরু নির্ব্বোধ অশ্রু-বিবশা! এ কি তাঁর সেই সন্ধ্যা?—হাতে করিয়া তাহার সতী-তেজোদ্দীপ্ত স্মিত সুন্দর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া আবেগপূর্ণচিত্তে কহিয়া উঠিলেন, "তা যদি জেনে থাক, সন্ধ্যা! তা হ'লে এটাও জেনো যে, তোমার স্বামী তার প্রাণপ্রিয় জন্মভূমির উদ্ধারসাধন করতে তার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করবে, কিন্তু, তার জন্য সে তার আরও এক জন প্রাণতমকে উৎসর্গ করতে পারবে না। মন্দারেশ্বরের সহায়তালাভই যে বরেন্দ্রী

উদ্ধারের একমাত্র উপায়, তাও ত নয়? আর তাও যদি হতো, তা হ'লেও সে পথ ছেড়ে আমায় পথান্তরের সন্ধানে যেতে হ'তো। সন্ধ্যা! এ জীবনে তুমি ভিন্ন আর কোন নারী আমার এ বুকে স্থান লাভ করতে পারে না, এ যিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, তিনি জানেন বলেই এত বাধা-বিপত্তি-বিপ্লবের মাঝখান দিয়েও আবার তিনি তোমায় আমার কাছে এনে দিয়েছেন। এ জীবনে একমাত্র তুমিই আমার, আর কারু আমি হ'তে চাই নে;—আর তুমিও আমায় অন্যের হাতে বিলিয়ে দিতে উদ্যোগী হ'ওনা রাণি! তোমার হয়েই থাকতে দিও, তাতেই আমি সুখী হব।"

এই বলিয়াই রামপাল কর্ত্তব্য-বিমূঢ়া বাক্যহীনা সন্ধ্যাকে নিজের আবেগ স্পন্দিত বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহার আনত মুখে প্রগাঢ় চুম্বনরেখা অঙ্কিত করিয়া দিলেন, এবং পরক্ষণেই তাহাকে কথা কহিবার অবসরমাত্র না দিয়াই ত্রস্তপদে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

স্বামী দৃষ্টিপথের অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়া গেলে, রুদ্ধকণ্ঠা সন্ধ্যারাণী আত্মগতই কহিল—"রাজাধিরাজ! ক্ষুদ্র সন্ধ্যাকে এত ভালবাস তুমি? সে যে তোমার কত অযোগ্যা, তা জেনেও কি এ ভালবাসার সমুদ্র তোমার এতটুকুও শুকাতে জানে না? কিন্তু সে-ও কি তোমার এত প্রেমের এতটুকু ক্ষুদ্র প্রতিদানও দিতে পারবে না? যে বরেন্দ্রী তোমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, সেই বরেন্দ্রী লাভের সহায়তা যখন এ থেকে হ'তে পারে, তখন আমার জন্যে তুমি যে তা ত্যাগ করবে, সে ত আমায় কিছুতেই সইবে না। তোমায় হারিয়ে যে আমি তোমায় মূল্য বুঝেছি।"

নবম পরিচ্ছেদ

এ পর্য্যন্ত আর সে দিনের সেই প্রসঙ্গটাকে উত্থাপিত হইতে না দেখিয়া রামপাল তাঁর পক্ষে সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গটাকে এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, সন্ধ্যাও সে কথা ভুলিয়াছে। সন্ধ্যা কিন্তু সে কথা ভুলে নাই, তবে ইদানীং স্বামীকে বিশেষরূপেই শ্রম-শ্রান্ত ও চিন্তান্বিত দেখিয়া এ কথার উল্লেখে সে ভরসা করে নাই মাত্র। আজ রামপাল অনেক দিন পরে বিজয়ীর আনন্দ ও গৌরবপূর্ণ চিত্তে কতকটা সুস্থিরভাবে যখন তার মন্দিরে বিশ্রাম লইতে আসিলেন, তখন সে-ও নিজের রুদ্ধ ইচ্ছাকে পুনর্জ্ঞাপনের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল।

শয্যা-শায়িত স্বামীর পদতলে বসিয়া পড়িয়া সন্ধ্যাও তাঁর পদসেবায় মনোযোগী হইতেই রামপাল হাত বাড়াইয়া তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া কহিলেন,—"পায়ে আমার কিছুই হয় নি, তুমি তার চেয়ে আমার কাছে এস।"

সন্ধ্যা তার কোমল ছোট্ট হাতখানি স্বামীর কঠিন চরণতলে স্থির রাখিয়া মিনতি করিয়া কহিল,—"নাই বা হ'ল, অমনিই কি দিতে নেই? দিই না একটু পা টিপে, লক্ষ্মীটি!"

রামপাল পা সরাইয়া লইয়া কহিলেন,—"ও সব বদ অভ্যাসে কায কি? যাকে রাতদিন হাতী চ'ড়ে, ঘোড়া ছুটিয়ে দিক্‌বিদিকে দৌড়ে বেড়াতে হবে, তার কি অত সুখী হ'তে গেলে চলে রে? তুমি বরং আমার কাঁছে স'রে এস, কত দিন তোমায় দেখিনি, একটু দেখি।"

সন্ধ্যা অগত্যাই পা ছাড়িয়া স্বামীর পাশে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

"তুমি চিরদিনই আমায় যেন কচি খুকীটি মনে করবে, না? কিছু একটু করতে দেখলেই ব্যস্ত হও, কেন বল ত?"

হাসিয়া রামপাল কহিলেন,—"করি কি বল্? সন্ধ্যা বলতে আমার সেই নোলক-পরা ঝাপটা-কাটা ঘোমটা-টানা খুকীটিকেই যে মনে পড়ে যায়!"

সানন্দে—উল্লাসে ক্ষণকাল অসীম সুখে সন্ধ্যার চোখের পাতা দু'খানি যেন নিমীলিত হইয়া আসিল। গভীর একটা তৃপ্তিভরা শ্বাস গ্রহণ করিয়া সে ছোট্ট একটি বালিকার মতই সহকার তরুর বক্ষোবিলম্বিতা লতার মত তার স্বামীর বিশাল বক্ষে লীন হইয়া রহিল। স্বামি-গৌরবে তার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি যেন ভরা ভাদ্রের পূর্ণ নদীর মতই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে দিনও তাই কিছু বলা ঘটিল না।

যুদ্ধ চলিতে লাগিল। রামপাল-পক্ষীর বিজয়ী সেনাসমাবেশিত জয়স্কন্ধাবার ক্রমশই অগ্রসর হইতে লাগিল। পশ্চিমবঙ্গ রামপালের হস্তগত হইয়া গেল, পরে নৌকা-মেলক যোগে গঙ্গা পার হইয়া মহাপ্রতীহার শিবরাজ কৈবর্ত্ত-সেনার সহিত ভীষণ যুদ্ধে উত্তরবঙ্গের দ্বার পর্য্যন্ত পাল অধিকার পুনঃসংস্থাপন করিলেন। এ সংবাদে গঙ্গাতীরবর্ত্তী জয়স্কন্ধাবারে সে দিন উৎসবের আনন্দের সীমা রহিল না। মথন দেব, সুবর্ণদেব, প্রজাপতি নন্দী, বোধিদেব, দেবরক্ষিত, মায়ন, রুদ্রশেখর, কাহ্নুরদেব ও শিবরাজ সকলেই এইবার সম্মিলিত আটবিক রাজন্যবর্গ ও সামন্তচক্রসম্বলিত সকল বল একত্রিত করিয়া বরেন্দ্রী আক্রমণে প্রস্তুত হইবার পরামর্শ দান করিলেন।

মথনদেব কথাপ্রসঙ্গে সে দিনও একবার দুঃখের সহিত বলিলেন,— "এই সময়ে আমরা লক্ষ্মীশূরকে বন্ধু-স্বরূপে পেতে পারলেই আমাদের আর কোন ভাবনার বিষয় ছিল না। তা' যাই হোক, এতেও আমাদের

সুবর্ণদেব জ্যেষ্ঠের এই মন্তব্যের ইঙ্গিত বুঝিয়াই যেন ইহার সমর্থন জন্ম বলিতে গেলেন—"কিন্তু এটা যখন রামপালের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করছে, তখন—"

রামপাল মাতুলের মুখ বন্ধ করিবার জন্যই সহাস্য মুখে অথচ স্নেহের স্বরে তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"যাঁর নিজের ছেলের বীরত্বের গাথা আজ পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্রই গীত হচ্চে, তিনি তাঁর ভাগিনেয়কে এত বড় পৌরুষহীনতার হীন আশ্রয় নে'বার পরামর্শ নিশ্চয়ই দিচ্চেন না? যা হোক, মাতুল! আমাদের এই অভিযানে কে' কোন্ পদ গ্রহণ করবেন, এখন হ'তেই সেটা স্থির ক'রে ফেলা কর্ত্তব্য। বোধিদেব, প্রজাপতি নন্দী, শিবরাজ, মায়ন, কাহ্নুর এঁদের কার প্রতি কোন্ ভার দিতে চান? নৌ-বাহিনী আমাদের যথেষ্ট প্রবল রয়েছে। বোধিদেব, মায়ন, ছোটমামা এঁরা বোধ হয় ঐ দিকে থাকাই ভাল। কি বলেন, বড়মামা?"

মথনদেব মনে মনে ঈষৎ দুঃখিত হইয়াও প্রকাশ্যে সে মনোভাব তাঁর প্রিয় ভাগিনেয়ের অজ্ঞাতই রাখিয়া যথাকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। এ বিবাহ হইলে রামপালের জনবল অতি দ্রুত বর্দ্ধিত হইতে পারিত ও তাঁহাকে আরও সহজেই বরেন্দ্রবিজয়ী করিয়া দিত, কিন্তু তাঁহার মানসিক দৃঢ়তা জানিতেও ত আর মথনদেবের বাকি নাই। কাযেই শেষ আশাটুকু এক প্রকার ত্যাগই করিলেন।

সন্ধ্যা সে দিন স্বামীর বিজয়-সংবর্দ্ধনা শেষ করিয়া এক নিশ্বাসে কথাটা পাড়িয়া ফেলিল, বলিল,—"বল, যা বলবো, রাগ করবে না?"

রামপাল হাসিয়া তার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন, সস্মিতমুখে কহিলেন,—"তোর উপর কবে রাগ করেছি রে?"

"ঈস্! তা' বই কি! একটুখানি মনের মতন কথা না হ'লেই রেগে

যেন যান না ! আবার বলা হচ্ছে, কবে রাগ করেছি রে ? ইঃ ! ভারি শান্ত কি না !"

রামপাল তাহার কৃত্রিম অভিমানে ফুলানো ঠোঁটের উপর অঙ্গুলীর মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"তবে কিছু বল্‌বি কেন ?—বলিস্ নি ।"

সন্ধ্যা প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া আবদারের সুরে কহিল, "না, তা হবে না, প্রত্যহ তুমি আমার মুখ বন্ধ ক'রে দেবে, সে আমি শুন্‌বো না কিন্তু,—আজ তোমায় আমার কথা শুন্‌তেই হবে ।"

রামপাল তাহার ভূমিকার ঘটা দেখিয়াই বক্তব্য-বিষয় বুঝিয়াছিলেন। সে দিনের সেই রুদ্ধ ইচ্ছার অস্তিত্বের পুনঃ পরিচয়ে মন তাঁর খুব সন্তুষ্ট রহিল না, তথাপি মুখের উপর হাস্য সরসতা রক্ষা করিয়াই মিষ্ট স্বরে কহিলেন—"তবে বল্, কি বল্‌বি,—শুনি ।—"এই বলিয়া তিনি স্থির হইয়া মনোযোগের অভিনয় করিলেন ।

এমন করিয়া শুনিতে গেলেই কি এমন সব কঠিন কথা বলিতে পারা যায় ? সন্ধ্যার যেন মনের বল কমিয়া আসিতে লাগিল । তাহার বুক দুড় দুড় করিতে লাগিল । এই হাসিমুখে তাহাকে এখনই হয় ত ছায়াপাত করিতে হইবে । এত প্রেমের এই প্রতিদান—এই কি তার কাছে ইঁহার পাওনা হইল ? অথচ কর্ত্তব্যও যে কঠোর ! তাঁহাদের পরম হিতৈষী মাতুল সে দিন বলিয়া দিয়াছেন, 'রামপালের এই মহৎ উপকারটুকু শুধু বৌমার উপরে নির্ভর কচ্চে । তিনি যেন মনে রাখেন, এর সঙ্গে পাল-সাম্রাজ্যের উত্থান পতন বিজড়িত । সামান্যা স্ত্রীর মতন সপত্নী ভীতির বশে যেন সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ না ক'রে ফেলেন ।' দৃষ্টি নত ও অপরাধীর মতই সভয় সন্দিগ্ধ স্বরে সন্ধ্যা কোনমতে বলিয়া ফেলিল, "তুমি মদনদেবীকে বিয়ে কর—লক্ষীটি । তোমার পায়ে পড়ি ।"

"তোকে ভূতে কিলোচ্চে না কি?"

স্বামীর মুখে সরোষ তিরস্কারের পরিবর্ত্তে এই লঘু বিদ্রূপে ভীতা সন্ধ্যার একটুখানি ভরসা বাড়িয়া গেল। সে তখন ঈষৎ হাস্যের সহিত স্বামীর মুখের দিকে চকিত নেত্রপাত করিয়া কোমলকণ্ঠে কহিল—"না, আমি সুখে আছি, যে নামের আশ্রয় নিয়েছি, ভূতে আমার নাগাল পেলে ত! আচ্ছা, তুমি কি মনে করচো, তাতে আমি অসুখী হব?"

রামপাল ব্যঙ্গ পরিহার করিয়া সহজস্বরেই প্রত্যুত্তর করিলেন। কহিলেন, "না, আমি অসুখী হব।"

ধীরকণ্ঠে সন্ধ্যা বলিল—"অসুখী হবে! কিন্তু তুমি কি আজ ভুলে গেছ যে, পিতৃপুরুষের সম্মানের জন্য—দেশের জন্য কত বড় বড় স্নেহ প্রেম ভালবাসাকে তুচ্ছ বস্তুর মতই অবলীলাক্রমে জলাঞ্জলি দিয়ে কত বড় আত্মোৎসর্গ ক'রে তাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হয়?"

রামপাল চমকিয়া উঠিলেন, চকিত কটাক্ষে ক্ষুদ্র সন্ধ্যার ছোট্ট যূঁই-ফুলের মতই সুন্দর মুখখানার দিকে চাহিলেন। সেই নম্র শান্ত সরল মুখ, দৃষ্টি তার প্রেমের নির্ভরতায় তেমনই পরিপূর্ণ, কিন্তু তার মধ্যে আর সেই ছল ছল ভীতি বিহ্বলতার যেন কোথাও স্থান নাই। সে যেন আজ আপনার পূর্ণতায় আপনি পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া অন্যকেও তাহার অংশ বিলাইয়া দিতে উদ্যত। মলয় বহিলে যে ক্ষুদ্র লতিকা হেলিয়া পড়িত, আজ যেন সে কানন ব্রততীরূপে অপরের ভারবহনে সমর্থা। রামপাল সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ তার নতমুখে নিজের পর্য্যবেক্ষণ দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ রাখিয়া পরে গাঢ়স্বরে কহিলেন,—"পাগলের কথা এখনও মনে ক'রে রেখেছিস্? তখন কি আমার মাথার ঠিক ছিল রে! আর সেই অভিমানে আজ নিজেকে আহুতি দিবি?"

সন্ধ্যা ত্রস্তে মুখ তুলিয়া, বিস্ফারিতনেত্রে স্বামীর ঈষৎ সলজ্জ মুখের

দিকে চাহিল, "ও কথা বলো না! 'অভিমানে আপনাকে আহুতি দিচ্ছি?' ছি ছি, এ'—কি কথা বল্লে! তোমার উপর অভিমান? এই এত স্নেহ, এত আদর, এত ভালবাসা, এর বদলে প্রতিশোধ? ছি ছি, না; ও কথা বিশ্বাস করো না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

রামপাল ক্ষণকাল বিস্ময়স্তব্ধ হইয়া নীরবে চাহিয়া রহিলেন। শরতের রাত্রি অত্যুজ্জ্বল জ্যোৎস্নাময়ী, অদূরে পরিপূর্ণা জাহ্নবীর গদগদ কলতান, তীর তরুদলে সুশোভিত। সুশ্যামল তীরভূমে রাজাধিরাজ রামপালদেবের বিজয়স্কন্ধাবারের বিচিত্র পট্টাবাস সারি সারি শোভা পাইতেছে। গঙ্গার রজত তরঙ্গের উপর নৌ-বাহিনীর সারি বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ সকল রণতরী হইতে অসংখ্য আলোকমালা গঙ্গাবক্ষ সুবর্ণখচিত বস্ত্রোপরি হীরকহারের মতই জ্যোৎস্নাজালের মধ্যে ঝলমল করিতেছিল। পট্টাবাসের একটি ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথে জাহ্নবী সলিল সম্পৃক্ত শীতল নৈশ বায়ু রাজকীয় কক্ষমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া গৃহবাসীর উষ্ণ শোণিতে ঈষৎ শীতলতা আনিয়া দিল।

আকস্মিক বিস্ময়াবেগ হইতে মুক্ত হইয়া উঠিয়া রামপাল ডাকিলেন—"সন্ধ্যা!"

"কি?"—বলিয়া সন্ধ্যা তাঁর গায়ের কাছে ঘেঁসিয়া আসিল। উহাকে স্পর্শ করিয়া রামপালের সহসা বিষাদিত চিত্ত অনেকখানি সুস্থির হইলে তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—"মদনদেবীকে বিয়ে না করেও যখন আমি বরেন্দ্রীর দ্বারে এসে পৌঁছতে পেরেছি, তখন অনর্থক আবার একটা বিয়ে করে লাভটা কি, সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা স্বামীর দিকে না চাহিয়াই মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "তোমায় যে শুধু এরই জন্য আমি এত অনুরোধ করছিলেম তাও নয়, এ ভিন্ন অন্য কারণও আছে।"

কৌতূহলহীন কণ্ঠে রামপাল প্রশ্ন করিলেন, "অন্য কারণ আছে?—সেটা কি?"

সন্ধ্যা একটুখানি ইতস্ততঃ করিল, "তোমায় এটা জানাবো নাই মনে করেছিলেম, কিন্তু অগত্যাই জানাতে হ'লো,—সে তোমায় ভালবাসে, তোমায় না পেলে সে জীবন বিসর্জ্জন করবে, তবু অন্যকে বিয়ে করবে না।"

"ক্ষেপেছ! কে বলেছে এমন কথা?"

"সে নিজেই বলেছে, আবার কে বলতে যাবে?"

"সে তোমায় নিজেই এই কথা বলেছে? খুব মেয়ে ত! যেমন তোমায় বোকা দেখেছে! তুমি অমনি এই সম্বাদে গ'লে গিয়ে তোমার স্বামীর ভাগ তাকে বেঁটে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছ? কারণ, তোমার স্বামীতে তার লোভ পড়েছে,—আশ্চর্য্য তুমি! বাঃ!"

সন্ধ্যার ক্ষণকাল কথা জোগাইল না, তার পর একটুখানি ভাবিয়া লইয়া সে বলিল, "তখন ত সে জান্‌তো না যে, আমি তোমার কে, তাই না বলেছিল তার মনের কথা! জানলে কি আর বলতো?"

"তখনই বলেছিল না কি? নিশ্চয়ই সে জান্‌তে পেরেছিল।"

সন্ধ্যা উত্তেজিত হইয়া উঠিল—"বাঃ! কেমন ক'রে জান্‌বে? সে আমায় ভালবেসে তার মনের গোপন কথা আমার কাছে প্রকাশ করেছিল। তখন ত তুমি নিরুদ্দিষ্ট পথের ভিখারী মাত্র, ঐশ্বর্য্যের লোভে, এমন কি, কখনও তোমায় পাবার আশামাত্র নিয়েও সে ত তোমায় ভালবাসেনি। শুধু তোমায়, তার—হয় ত বা জন্মজন্মান্তরের সংস্কারবশেই ভালবেসেছিল। সে কি তখন জান্‌তো, সেই দুর্ভাগ্য লোকটিই আবার মহারাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী হয়ে উঠবেন? শুধু শুধু এমন মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছো কেন?"

রামপাল কিছু বিস্মিত, কিছু সস্মিত মুখে সন্ধ্যার স্মিত-গম্ভীর মুখের

দিকে সাশ্চর্য্যে চাহিলেন ;—"এই যে তুমি মনের কথা ধ'রে ফেলতে শিখেছ দেখছি! তা এত সব কখন্ শিখ্‌লি, রাণি ?"

"বাঃ! আমি কি এখনও তোমার সেই ছোট্ট সন্ধ্যাই আছি না কি? এখন আমি পালসাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবী, না?" বলিয়াই সন্ধ্যা তার উচ্চ মর্য্যাদার অনুরূপ গাম্ভীর্য্যাবলম্বন করিতে গেল, কিন্তু ফলে তাহার বিপরীতই ঘটিল। সহসা তার ভিতর হইতে কিসের একটা দুর্নিবার উচ্ছ্বাসে তার পাতলা রাঙ্গা ঠোঁট দুখানা বাতাসলাগা পদ্মপাপ্‌ড়ির মত থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং তার পদ্মপলাশ দুটি চক্ষু স্বচ্ছ শিশির তুল্য অশ্রুর আভাসে ছল-ছল করিতে লাগিল। পাল-সাম্রাজ্যের যিনি পট্টমহাদেবী ছিলেন, সন্ধ্যার সেই জীবন্ত জাগ্রত দেবী-প্রতিমাকে মনে পড়িয়া গিয়া তার সারা চিত্ত যেন গভীর শোকে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। আজ তার এই সুখের দিনে কোথায় তিনি? আ তাঁর স্থানে বসিতে পাইয়াছে বলিয়াই সে কি না নির্লজ্জার মতই গর্ব্ব করিতেছে? এ কি অকৃতজ্ঞ সে!

রামপাল তার এই মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেন নাই, তিনিও এই উত্তরে ঈষৎ বিমনা হইয়া পড়িয়া কিছু সত্যে কিছু রহস্যে মিশ্রিত করিয়া সব্যঙ্গে উত্তর করিলেন,—"অর্থাৎ কি না, ভবিষ্যৎ পট্টমহাদেবী! বর্ত্তমানে পালসাম্রাজ্যই যখন অসম্পূর্ণ, তখন তার পট্টমহাদেবীটিই বা সম্পূর্ণরূপে তাঁর পদখানি অধিকার ক'রে বসলে চলবে কি ক'রে? এখনই অতটা ধূর্ত্ত হয়ো না, একটু একটু কম গম্ভীর হয়ো, আর কূটবুদ্ধির সবটাই শিখে ফেলো না। দোহাই পট্টমহাদেবি, নইলে আমার হাঁফ ধরবে! আমি আমার কঠোর পরিশ্রমের পর একটুখানি জুড়াতে এসে আমার সেই ছোট্ট সন্ধ্যাটুকুকেই চাই যে!"—এই কথা বলিতে বলিতে রামপাল তাঁর প্রিয়তমাকে নিজের হৃদয়ের উপর টানিয়া লইলেন। প্রগাঢ় স্নেহে তাহাকে

চুম্বন করিয়া গভীর স্বরে কহিলেন—"একমাত্র তোমায় ভিন্ন অন্য কোন নারীকে কোন দিন আমি ভালবাসতে পারবো, এ কি তোমার মনে হয়? আমার কিন্তু তা হয় না সন্ধ্যা!"

সন্ধ্যা এইবার বড় বিপদেই পড়িল। বড় কঠিন সমস্যাই তাহার সম্মুখে! এবার সে কোন্ পথে যাইবে, বুঝিতে না পারিয়া ক্ষণকাল যেন কর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া রহিল। তার পর বুদ্ধি করিয়া এই কথা বলিল,—"তুমি যে তাকে ভালবাসবে না, সে কথাও সে জানে, সব জেনেশুনে তবুও যখন তোমায় পেতে চায়, তখন তার এইটুকু ইচ্ছাপূরণে দোষ কি?"

রামপাল কহিলেন, "তোমার যুক্তিটি ভাল বটে! এ যেন বৈদ্যের দেওয়া একটুখানি কটূ কষায় ঔষধ সেবন করা মাত্র; নাক মুখ টিপে এক চুমুকে খেয়ে ফেল্লেই হলো! ভাল, আমি যে তাঁকে ভালবাসবোই না, তাই বা তিনি জান্‌লেন কি ক'রে? তোমার তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র-টাস্ত্রও প'ড়ে থাকবেন বোধ হচ্ছে!"

সন্ধ্যা রাগিয়া গিয়া স্বামীর বাহুমূলে একটা ক্ষুদ্র চপেটাঘাত করিল, "যাও! কেবলই কথা কাটিয়ে দেবে। এমন মানুষকেও মানুষে আবার পেতে চায়! ওগো! জ্যোতিষ পড়বার তার দরকারটা কি হ'ল শুনি? আমি তাদের বাড়ীতে যে তিন তিনটে বৎসর ধ'রে বাস করলাম, তা আমার কাছ থেকে আমার স্বামীর পরিচয় সে কি কিছুই জানতে পারেনি? আমি যে কে সে কথা ত আমিও আগে কাকেও কিছু বলিনি; শুধু দুজনে সব কথাবার্ত্তাই হতো। স্বামীর নাম নিতে নেই বলেই কাটিয়ে দিতুম। তার পর যে দিন জান্‌তে পারলে, সে দিন তার মনে যত আনন্দ, ততই বিষাদ উপস্থিত হলো। সে স্পষ্টই বল্লে যে, আজ থেকে তোমার স্বামীর প্রেমের আশা আমি ছেড়ে দিলাম। আমি বুঝেছি, তিনি একান্তই তোমাগত প্রাণ. অন্য নারী কখনও স্পর্শ করেন নি, হয় ত করবেনও না। শুধু

আমার ক্ষমা কর বোন্‌ তাঁর চিন্তাটুকু হ'তে এ জন্মে বা জন্মান্তরে আমি আর নিজেকে কিছুতেই বঞ্চিত করতে পারবো না। এই অধিকারটুকু শুধু আমায় নিজগুণে দান ক'রে যাও।' বল দেখি, এ কি কম ভালবাসা? তাই ত বলচি, তার জীবনটা ব্যর্থ করে দিও না, তাকে পায়ে স্থান দাও।"

রামপালের সস্মিত মুখ এইবার বস্তুতই একটু চিন্তাগম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি একটা মৃদু শ্বাস সন্তর্পণে মোচন করিয়া দুঃখিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "যাকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারবো না, তাকে কি পায়ে স্থান দেওয়া উচিত, সন্ধ্যা? নারীকে আমি সামান্য ক্রীড়নক ব'লে ত কখনও মনে করি নি। ভালবাসি না বাসি, তাকে নিয়ে যে দুদিন খেলা ক'রে নেবো, সে ত আমি পারবো না. রাণি! আমায় মাপ কর, তাঁকেও করতে ব'লো, আমার কাছে তোমরা তুচ্ছ নও—পূজ্য! পূজার বস্তু কখনই বিলাসের উপাদান হ'তে পারে না।"

সন্ধ্যা স্বামীর প্রশস্ত বক্ষের উপর হাত রাখিয়া তিরস্কারপূর্ণ হাসিমুখে প্রতিবাদ করিতে গেল—"এত বড় চওড়া বুকখানা আর আমি এই ছোট্ট মানুষটি, এর সবটাতেই না কি আমি জুড়ে রয়েছি? এতটা যায়গার একটুখানি কোণেও না কি আবার কারুকে একটু স্থান দিতে পারা যায় না? তুমি রাজাধিরাজই হও, আর মহারাজাধিরাজই হও, ভারি কৃপণ কিন্তু!"

রামপাল এবার অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া তাহার মুখের উপর হাত চাপা দিলেন, কহিয়া উঠিলেন,—"তা—হোক হোক,—হই আমি কৃপণ! আজ তুমি এইখানেই সাঙ্গ কর, সন্ধ্যা! ও সব কথা বরেন্দ্রীজয়ের পর তখন বরং নিশ্চিন্ত হয়ে বসে বসে শোনা যাবে, যুদ্ধজয়ের অস্ত্র-স্বরূপ আমি তোমার মদনদেবীকে ব্যবহার করতে পারবো না, তাতে আমার তার কাছে উপকার-মূল্যে বিক্রীত হ'য়ে যেতে হবে। এক ত শত্রুবীর বিরেই এ সম্বন্ধে

যথেষ্ট হয়েছে, নিজেকেও আর এমন ক'রে বেচতে বলো না। এইটুকু মনুষ্যত্ব বাকি থাকতে দাও, রাণি! বরেন্দ্রীজয়ের পূর্ব্বে আর এ কথার তুমি উল্লেখ করো না।"

সন্ধ্যা স্বামীর মনের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া এইবার নীরব হইল এবং 'বরেন্দ্রীজয়ের পর তখন শোনা যাবে,' এইটুকুতেই যথেষ্ট আশ্বস্ত হইয়া রহিল। অন্তরের সঙ্গেই সে মদনদেবীকে ভালবাসিয়াছিল ও তাহাকে সুখী করিয়া তাহার অশোধ্য ঋণজাল পরিশোধে আন্তরিকই সে ইচ্ছুক ছিল, তাই এত বড় ত্যাগ স্বীকারেও তার মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ ছিল না।

দশম পরিচ্ছেদ

বরেন্দ্রীর সীমানার উপর সুদৃঢ় দুর্গপ্রাচীর সন্নিবেশিত করিয়া পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনকে ভীম প্রায় অজেয় করিয়া তুলিয়াছিল। রামপালপক্ষীয় অসংখ্য সেনা ও অপরিসীম শক্তিসম্পন্ন সেনানায়করা অনেক দিনের অনেক চেষ্টার পর সেই অভেদ্য দুর্গপ্রাচীরও ভেদ করিল। পাল আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য এই কয় বৎসর ধরিয়া রাজ্যসীমার স্থানে স্থানে বহুতর দুর্গ প্রাচীর ও পরিখায় মহারাজাধিরাজ ভীম বরেন্দ্রীকে সুরক্ষিত করিবার চেষ্টা প্রাণপণেই করিয়াছে। বৃদ্ধ দিব্যোকের মৃত্যুর পর বরেন্দ্রীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া চারি বৎসর ধরিয়া ভীম রামপালের আক্রমণ প্রতীক্ষায় বরেন্দ্রীকে প্রস্তুত করিতেছিল। সুশিক্ষিত সৈন্যদল প্রস্তুত এবং দুর্গাদি নির্ম্মাণ, ইহাতেই তাহার অধিকাংশ রাজকোষ ক্ষয় হইতেছিল, কিন্তু তার জন্য তার কোনই ক্ষতি ছিল না। রাজভোগ যাহাকে বলে, ভীম নিজের জন্য তাহার কিছুই গ্রহণ করিত না। দাসদাসী তার নিজের সেবার জন্য বলিতে গেলে ছিলই

না ; মিতাহারী মিতাচারী সংসারবিরাগী ভাবেই সে শুধু তার গুরু কর্ত্তব্যের ভারকে কর্ত্তব্যবোধেই পালন করিয়া চলিয়াছে। দরিদ্র সাধু সজ্জনরা এই রাজাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ইঁহারই বিজয় কামনা করিতেছিল। বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, এবং অভিজাত সম্প্রদায় মনে মনে তখনও পুরাতন রাজবংশেরই অনুরাগী।

বরেন্দ্রীর দক্ষিণদ্বারে অবশেষে ঘোরতর সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। কয়েক দিনের মহাযুদ্ধের পর পাল সৈন্যের হস্তে কৈবর্ত্ত-সৈন্যের পরাভব আরম্ভ হইল। কৌশাম্বী ও পদুবম্বারাজ এতদিন নিশ্চেষ্ট থাকার পর এবার পূর্ব্বতন রাজবংশের সাহায্যেই অগ্রসর হইলেন। রামপালের বল বর্দ্ধিত হইল।

সুবিশাল দিব্য-দীঘির পূর্ব্বতটে শিব-ভবানীর যে মন্দির মহারাজা দিব্যোক প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যুদ্ধযাত্রার দিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া মহারাজাধিরাজ ভীম স্নানান্তে সেইখানে তার ইষ্টদেবতার যথাবিহিত পূজার্চ্চনা সমাধা করিয়া নির্জ্জন মন্দিরে দেবতার উদ্দেশ্যে লুণ্ঠিতশিরে মুক্ত হৃদয়ে বলিল,—"দেবাদিদেব! জানি না, এ যাত্রার কি পরিণাম! তোমার কাছে আর আমায় তুমি ফিরিয়ে আনবে কি না, সে একা তুমিই জানো। যদি আনতে চাও, আমারও আসতে আপত্তি নেই, আর যদি আমার রাজা রাজা খেলার এইখানেই শেষ হয়ে যাওয়া তোমার ইচ্ছা থাকে,—তাহলে তাইই হবে,—তাতেই বা এমন ক্ষতি কিসের? শুধু তোমায় আমি আজ এইটুকু মাত্র জানিয়ে যাচ্ছি,—পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সতীকুলের রক্ষার ভার যে পুণ্যবতী সতীকুলরাণী আমার দিয়ে গিয়েছিলেন, সে ভার আজ আমি তোমারই হাতে ফেরৎ দিয়ে গেলেম। আজ থেকে তাদের রক্ষাকর্ত্তা তুমিই রৈলে। দেখ, যেন আবার তাদের মধ্যে দুর্দ্দশার দিন এনে দিও না।

রাজ্যে 'যেন সতীর অশ্রু পতিত না হয়!'—আমার যদি আজ শেষ হয়েই যায়, তবু আমার এই কায়মন তপস্যার ফল যেন এ দেশ আর কখনও না হারায় এইটুকু দেখ।"—

সুপ্রতীক নামধারী হস্তিপৃষ্ঠে ভীম যখন যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা দিল, তার স্থির প্রশান্ত মুখে যেন একটা অনৈসর্গিক দিব্যজ্যোতি দীপ্ত তেজে জ্বলিতেছিল, যুদ্ধ যেন তার মনের মধ্যে এতটুকুও ছায়াপাত করিতে পারে নাই, উদ্বেগ আশঙ্কা হিংস্রতা বিজীগিষা কিছুই যেন তার তপস্যা-সমাহিত চিত্ততলে স্থান করিতে পারে নাই। সে যেন তার কর্ত্তব্য-সমাধানেরই অঙ্গস্বরূপে যুদ্ধ করিতেছিল। রামপাল মথনদেবের প্রিয় হস্তী বিন্ধ্যমাণিক্যের পৃষ্ঠে ভীমের সম্মুখীন হইয়াই এই সত্যকে উপলব্ধি করিলেন। তাঁর গীতার সেই অমর উপদেশ মনে পড়িয়া গেল।

"সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।"

শস্ত্রপাণি রামপালের হস্তে কঠোর অস্ত্রমূল শিথিল হইয়া আসিল। তিনি ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ বিহ্বলতায় তাঁহার আততায়ীর নিশ্চিন্ত ও নির্লিপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁর হঠাৎ মনে পড়িল না যে, তাঁহারা পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছেন। তাঁর মনে হইল, বীর বীরের, রাজা রাজার সম্মুখে আসিয়াছেন, এখন যেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য পরস্পর পরস্পরকে স্নেহে সাদরে গৌরবে অভ্যর্থিত করিয়া লওয়া।

পিছন হইতে রাজার শরীররক্ষী সেনাদলের অগ্রবর্ত্তী শিবরাজ রামপালের এই নিশ্চেষ্টতা লক্ষ্যে, ডাকিয়া বলিল,—"সাবধান রাজাধিরাজ!"

চকিত হইয়া রামপাল ভীমের উদ্যত অস্ত্র হইতে আত্মরক্ষা করিলেন।

যুদ্ধে ভীম বন্দী হইল। রাজ-আত্মীয় এবং মহাবলাধিকৃত বিত্তপালের

"আহত বীরের সেবার যেন ত্রুটি না হয়, মহাবলাধিকৃত! রাজবৈদ্যকে এই মুহূর্ত্তে সংবাদ পাঠাও এবং ইঁহাকে সসম্মানে উত্তম পটাবাসে স্থান দাও।"

মূর্চ্ছাহত ভীমকে লইয়া বিত্তপাল রাজাজ্ঞাপালনে চলিয়া গেল। রামপালপক্ষীয় সৈন্যদল মহোৎসাহে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, কৈবর্ত্তবাহিনী ভীম বন্দী হওয়ার সংবাদে একবারেই ছত্র ভঙ্গ হইয়া গেল।

রামপাল বিজয় লাভ করিলেন।

ভীমের চিরসখা এবং ইদানীন্তন সেনাপতি হরি ছত্রভঙ্গ কৈবর্ত্ত-বাহিনীকে আবার যথাসম্ভব একত্র এবং পুনর্গঠিত করিয়া পুনশ্চ ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ করিল। জীবন-মরণ পণে প্রায় সমুদয় কৈবর্ত্ত নাগরিক (শিশু ও বৃদ্ধ ব্যতীত) এই যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল।

যুদ্ধে হরি রামপালের হস্তে হতসৈন্য এবং নিহত হইলে কৈবর্ত্ত যুদ্ধের চির অবসান হইয়া গেল। শরণাগত শত্রুসৈন্যদের রামপাল অভয় প্রদান-পূর্ব্বক নিজ সৈন্যমধ্যে গ্রহণ করিলেন।

রাজকবি রামপালের এই কীর্ত্তিগাথা শ্লোকছন্দে গ্রথিত করিয়া দিলেন, বন্দী যুবকেরা এই শ্লোকে সুর সংযোজিত করিয়া গাহিতে লাগিল—

যুদ্ধসাগর লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভীমরূপ রাবণ-বধ দ্বারা জনকভূ (জন্মভূমি বা বরেন্দ্রভূমি) উদ্ধারকারী মহারাজাধিরাজ রামপালদেব ত্রিজগতে দাশরথি রামের মতই বিস্তৃত-যশা হইলেন!

একাদশ পরিচ্ছেদ

করতোয়া ও গঙ্গাদেবীর সম্মিলন স্থানে অপুনর্ভবা মহাতীর্থে পরম-সৌগত মহারাজাধিরাজ রামপালদেবের প্রতিষ্ঠিত নূতন রাজধানী রামাবতী নগরীতে রাজ্যাভিষেকক্রিয়া মহাসমারোহেই সুসম্পন্ন হইয়া গেল। নিদারুণ দুঃখময় অতীত স্মৃতিতে পরিপূর্ণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রামপালের

পক্ষে অসহ্য বোধ হইল। শ্রীহেতুর অধিপতি চণ্ডেশ্বর ও ক্ষেমেশ্বর নব-রাজধানীর স্থান নির্ণয় করিয়া দিলে অত্যল্পকালের মধ্যেই নূতন রাজধানীর নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে তাহা অত্যন্ত রমণীয় হইয়া উঠিল। এই নব নগরী জগদ্দল মহাবিহার এবং অসংখ্য পরিমাণে দেবদেবীর মন্দিরে সুশোভিত হইল। নগরীর মধ্যভাগে বুদ্ধ, তারাদেবী এবং অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি নৃপতির স্বধর্ম্মপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ স্থান পাইল। তাঁহার পরধর্ম্ম দ্বেষহীনতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ব্যক্ত রহিল,—হারীতি মঞ্জুশ্রী প্রভৃতির মতই শিব, ভবানী, চতুর্ভুজা, সারদা, লক্ষ্মীনারায়ণ, মহিষমর্দ্দিনী অষ্টাদশভুজা প্রভৃতি অসংখ্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরে। সমস্ত মন্দিরই স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সম্ভূত, সযত্ন গঠিত। মন্দির গাত্রে দারুময় দেবদেবী ও অতিমানবীয় নানারূপ আশ্চর্য্যদর্শন মূর্ত্তি, দ্বারে ধাতুময় লতাপত্রের শিল্পচাতুর্য্য। মন্দির-সোপানের উভয় পার্শ্বে ইষ্টকনির্ম্মিত অতি সুন্দর গঠনের হস্তী, অশ্ব, সিংহ ও প্রহরী মানবের অনুকৃতি। নগরীর মধ্যস্থলে রামপালদীঘি নামক দীর্ঘিকা, তাহার চারি-পার্শ্ব পর্ব্বতের মতই উচ্চ, সেই সমুচ্চ পাহাড়গুলি নানারূপ বৃক্ষলতায় সমাকীর্ণ হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে এই নূতন রাজধানীতে শতসংখ্যক বিদ্যাগার সংস্থাপিত হইল। দেশবিদেশের পণ্য-সম্ভারে ইহার আপণগুলি অল্পদিনেই ভরিয়া উঠিল। বাণিজ্যতরী এবং বৌদ্ধাচার্য্যগণ আবার রাজসহায়তা-লাভে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া সুদূর সমুদ্রপথে যাত্রারম্ভ করিলেন। সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলেই সমান অধিকার লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কেহ বিদ্যা, কেহ অর্থ, কেহ পদলাভাশায় দলে দলে রামাবতীতে বাস আরম্ভ করিল। ফলে অল্পদিনেই রামাবতী ধনেজনে ও বিদ্যার গৌরবে জগতের শীর্ষস্থানীয়দেরই মধ্যে একতম হইয়া উঠিল।

রাজান্তঃপুরে পট্টমহাদেবী সন্ধ্যা তার সমস্ত সুখৈশ্বর্য্য ও গৌরবানন্দের মাঝখানে দাঁড়াইয়াও অসম্বরণীয় অশ্রুবিন্দু পুনঃপুনঃই নিজের পট্টাঞ্চলে মুছিয়া ফেলিতেছিল। হায়, আজ কোথায় সেই মাতৃরূপিণী স্নেহপ্রতিমা!— যিনি নিদারুণ ভাগ্য বিপর্য্যয়ের অসহনীয় বিপৎ-কঠোর দিবসেও এই ভবিষ্যৎ শুভ দিনের একান্ত লোভনীয় প্রলোভন দেখাইয়া তার দুঃখাভিহত জীবনকে ধারণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন! সেই ত সবই হইল, শুধু আজ যদি তিনি দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁর বড় আদরের সন্ধ্যার এই সুখটুকু চোখে দেখিতেন!

মহাসমারোহে শ্রীবামাবতী নগরী-সমাবেশিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারে পরম-সৌগত মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর, পরমকুশলী, পরমভট্টারক শ্রীরামপাল-দেবের সাম্রাজ্যাভিষেকক্রিয়া যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গেল। এই শুভ-কার্য্য উপলক্ষে নানা দিগ্‌দেশ হইতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত পালসাম্রাজ্যের হিতকারী বন্ধু, আত্মীয় এবং অধীনগণ সকলেই নবরাজধানীতে সমাগত হইয়া বিরাট্ আনন্দোৎসবে যোগদান করিলেন। ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, ভিক্ষুগণ এবং ভিক্ষুকেরা অপর্য্যাপ্ত ভোজনে ও যথাক্রমে এবং যথোপযুক্তরূপে প্রচুরতর অর্থ বস্ত্র মিষ্টান্নাদিতে পরম পরিতুষ্টি লাভ করিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া জয়ধ্বনি করিল।

এই আনন্দ সমারোহের ঠিক পরের দিনেই এক বিশেষ অপ্রিয়তর কঠিন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল; তাহা কৈবর্ত্ত-রাজ ভীমের বিচার।

এত দিন আহত ভীমের আঘাত ক্ষত সকল নিরাময় না হওয়ায় তাঁহার বিচারকার্য্য স্থগিত ছিল।

সে দিন রাজসভায় তিলধারণেরও স্থান ছিল না। মহামাত্য বোধিদেব হইতে আরম্ভ করিয়া নূতন সাম্রাজ্যের সমস্ত নবনিযুক্ত রাজকর্ম্মচারী,

সান্ধি বিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দী, মহাপ্রতীহার শিবরাজ, মহামাণ্ডলিক
হুরদেব, মহাবলাধিকৃত বিত্তপাল, মহাসামন্ত, মহাসেনাপতি মায়ন,
চূড়ামণি ভদ্রেশ্বর, মহাক্ষপটলিক, মহাকুমার অমাত্যবর্গ, রাজ-
নীয়োপাধিক, দৌঃসাধসাধনিক, চৌরোদ্ধরণিক, দাণ্ডিক, দণ্ডপাশিক,
লিক, ক্ষেত্রপ প্রান্তপাল, কোট্টপাল, তদাযুক্তক, হস্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌবল-
পৃতক, দূতপ্রেষণিক, গমাগমিক, তরিক, শৌল্কিক, গৌল্মিক প্রভৃতি
ত্যকেই নিজ নিজ পদমর্য্যাদার অনুরূপ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।
পালের মিত্ররাজ ও মাতুল-জামাতা পীঠিপতি দেবরক্ষিত, দেবগ্রামের
কেশরী, কূজবটীর সুরপাল, তৈলকম্পপতি রুদ্রশেখর, উচ্ছালপতি
লসিংহ, ঢেক্করীয় প্রতাপসিংহ, কযঙ্গলের রাজা নরসিংহার্জ্জুন এবং
বলের বিজয়, কৌশাম্বীর দোরপবর্দ্ধন প্রভৃতি অভিষেকোৎসবে সমাগত
া ও রাজন্যবর্গ এই বিচারসভায় সমুপস্থিত ছিলেন। বর্ম্মণরাজ শ্যামল-
ও এ সভায় সমুপস্থিত ছিলেন।

বিশীর্ণ অথচ বৈরাগ্য প্রশান্ত ধীরমূর্ত্তি বিদ্রোহি-বীর আসিয়া যখন বন্দীর
অধিকার করিল, সহস্র দর্শকের সহস্র বিভিন্ন চিত্তভাব একমুখী হইয়া
তপস্বিজনোচিত শান্তমূর্ত্তি বীরের প্রতি স্থির হইয়া গেল। অধিকাংশের
ই তাদের এই অশেষ যুদ্ধক্লেশদাতা বিদ্রোহীর প্রতি একটা সহানুভূতি-
করুণার ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিল। অনেকেই রাজার কর্ণ বাঁচাইয়া
ত দীর্ঘশ্বাস সন্তর্পণে মোচন করিল, কাহারও চক্ষু সলিলার্দ্র হইয়া
সত্তেও কোনরূপ বাধা মানিল না।

বিচার আরম্ভ হইল। বিচারক মহারাজাধিরাজ স্বয়ং।

রামপাল স্থির ও গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার প্রতি রাজদ্রোহ এবং
হত্যার অপরাধ আরোপিত, এ সম্বন্ধে তোমার কিছু বলবার আছে?"

ভীম তার সম্মুখস্থ সিংহাসনাসীন—যে স্বর্ণসিংহাসনের অম্লান গজ-

মুক্তাবলিযুক্ত স্বর্ণচ্ছত্রতলে কিছুদিনমাত্র পূর্ব্বেই সে নিজেই এইভা উপবিষ্ট হইয়া অন্তের বিচার করিত, সেই তার সুপরিচিত এবং উপভু রাজাসনে উপবিষ্ট নূতন রাজার প্রতি কৌতূহলপূর্ণ স্থিরদৃষ্টিতে বারেকমা চাহিয়া দেখিল, তার পর যথাপূর্ব্ব নতনেত্র হইয়া ভয়, উদ্বেগ, অহঙ্কা এবং নৈরাশ্যের ছায়ামাত্রপরিশূন্য সংযমপ্রশান্তমুখে রাজার আরোপি ভীষণ অভিযোগের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদমাত্র না করিয়াই ধীরস্ব প্রত্যুত্তর করিল, "না।"

"তোমার স্বপক্ষসমর্থন জন্য অপর কোন প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে তু সমর্থ। অবসর যদি নিতে চাও, আমরা তাও তোমায় প্রদান কর অনিচ্ছুক নই।"

অতি ক্ষীণ মৃদুহাস্য ভীমের দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠাধরপ্রান্তে অর্দ্ধনিমেষ কালে জন্যই যেন অস্পষ্ট দামিনীলেখার মতই উচ্চকিত হইয়া উঠিল। পর মুহূর্ত্তেই পূর্ব্বের মত সংকল্প স্থির প্রশান্ত কণ্ঠেই সে উত্তর করিল, "কো প্রয়োজন নেই।"

"তোমার প্রতি আরোপিত অপরাধ তুমি সম্পূর্ণরূপেই স্বীকার ক' নিচ্ছো?"

এক মুহূর্ত্তের জন্য ভীমের মাংসপেশী দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহে মতই রোষদীপ্তিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তার প্রসুপ্ত জ্বলন্ত কোপব উচ্চশিখায় যেমন করিয়া এক দিন প্রবলপরাক্রান্ত পালসাম্রাজ্যকে ভস্মীভূ করিয়াছিল, তেমনই করিয়াই জ্বলিয়া উঠিতে চাহিল।—অপরাধ? মহী পালদেবকে হত্যা তার পক্ষে অপরাধ?—মহীপালদেবের অধিকৃত রাজ কাড়িয়া লইয়া ভোগ করা তাহার পক্ষে রাজদ্রোহ! সবেগে মুখ খুলিয়া তীব্র কঠোরতার সহিত কোন কথা কহিতে গিয়াই কিন্তু সহসা সে মুখ ব করিয়া ফেলিল। কথনোদ্যত কথা আর তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না

র পর মাত্র এক মুহূর্ত্তকালের চেষ্টায় সেই প্রচণ্ড বেগবান্ আগ্নেয়গিরিবৎ হসা প্রজ্বলিত চিত্তকে প্রাণপণে সংযত করিয়া ফেলিয়া যথাপূর্ব্ব স্থিরকণ্ঠে দ পুনশ্চ উত্তর দিল—"হ্যাঁ।"

বিচারক প্রথমে মহামাত্য, পরে সভাসীন সকল ব্যক্তির এবং তার পর ন্দীর প্রতি চাহিয়া সেইরূপ গাম্ভীর্য্যময় কণ্ঠে কহিলেন, "প্রাণদণ্ড!"

ভীমের ওষ্ঠপ্রান্ত এবার আনন্দের স্মিতহাস্যে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ঘোর অন্ধকারময় কারাকক্ষের অনাবৃত মৃত্তিকায় অপরিচ্ছন্ন মরাজোচিত শয্যার উপর করচরণে শৃঙ্খলিত রাজাধিরাজ ভীম নিদ্রাহীন চিন্তাসাগরে নিমগ্ন রহিয়াছিল। এই নিদ্রাহীনতা তার আজিকার নয়, গার জীবনের সেই করালকালরাত্রির পর আজ সুদীর্ঘতর চারিটি বৎসর ্যাপিয়াই তার চোখের ঘুম তাকে উজ্জ্বলার মতই জন্মের মত ছাড়িয়া গয়াছে। সমস্ত দিনের প্রাণান্তকর কঠোর পরিশ্রমের পর সে কি কঠিন াস্তি! আর তার সঙ্গে যদি প্রতি দণ্ড, প্রতি পল, প্রত্যেক বিপলে ারিপূর্ণ হইয়া থাকে,—অতীতের অফুরন্ত যন্ত্রণাময় তীব্র স্মৃতি, যদি জ্বলন্ত ইয়া জাগিয়া উঠে, অনির্ব্বাণ স্মৃতির দহনজ্বালা; আর অরুন্তুদ হইয়া ঠে—অসহ্য অনুতাপের সহস্র বৃশ্চিক দংশন! ক্ষণে ক্ষণে অপরিসীম ানসিক যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া তার সারা চিত্ত তাহাকে এই কথা ালিয়াই ধিক্কার দিয়া আসিয়াছে যে, কোন্ প্রমাণে তুই তাকে অবিশ্বাসিনী 'লে—বিশ্বাসঘাতিনী ব'লে নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলি? একটা দিন আগেও দি তুই তা'কে আনতে যেতিস্, সে ত মরতো না। এই অপ্রতিবিধেয় মপরিবর্ত্তনীয় অনুতাপের কশা লাঞ্ছিত হইতে হইতে সে যেন ভিতরে ভিতরে একেবারে জর্জ্জরিত—জীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। লোকে বলে,

কালে শোকের হ্রাস হয়, কিন্তু ভীমের এ শোক যেন নিত্য নূতন হই
বর্দ্ধিত হইতেছিল। বিশেষতঃ তার অভিষেকের দিনে সে আর আপনা
সম্বরণ করিতে পারে নাই। কোনমতে বাহ্যধৈর্য্য রক্ষা করিয়া সব
কর্ত্তব্য সম্পাদন সে করিয়াছিল বটে, কিন্তু ভিতরে আসিয়া রুদ্ধ-দ্ব
কক্ষে স্বর্ণপর্য্যঙ্ক ছাড়িয়া কঠিন মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইতে হইতে সে আর্ত্তক
হাহাকার করিয়া উঠিয়াছিল,—

"উজ্জ্বলা! উজ্জ্বলা! কোথা তুমি আজ? ভিখারী ভীম যে আজ বরেন্দ্র
অধিপতি, আজ কোথা রইলে তার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী? তোমা বিনা
পৃথিবী, এ রাজসম্মান, এই স্বর্ণচ্ছত্র সিংহাসন, এ সবই যে আমার অস
অর্থহীন, সমস্ত পৃথিবীই যে আমার শূন্যময়!"

আজ কিন্তু এই ভীষণতর কারাকক্ষে অস্ত্রক্ষতময় শরীরে আসন্ন মৃ
দণ্ডকে মাথায় লইয়া এত দিনের সেই অসহনীয় অসম্বরণীয় মনের জ্বা
তাহার বহুলাংশে প্রশমিত হইয়া গিয়াছিল, প্রশান্ত নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে
শুধু তার স্বর্গগত জ্যেষ্ঠতাতের চরণোদ্দেশ্যে প্রণত হইয়া মনে মনে তাঁহা
উদ্দেশ করিয়া বলিল, "যে ব্রত গ্রহণ করিয়েছিলে, জ্যেঠামশাই! আম
যথাসাধ্য তা পালন করতে আমি চেষ্টাও করেছি। রাজ্যভোগে আমার স্
ছিল না ব'লে কর্ত্তব্যের ক্রটি করেছি বলে মনে হয় না; কিন্তু তাও ব
আমার এ পরাজয়ে আমি খুবই দুঃখিত হইনি। রামপাল পাল সিংহাসে
অনুপযুক্ত নয়, তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার সে গ্রহণ করেছে, সে ভা
হয়েছে। এখন আমায় আশীর্ব্বাদ করো, জীবনে যে শান্তি আমি খুঁ
পাই নি, মরণ যেন আমায় সেইটুকু শুধু দিতে পারে।"

তার পর ক্ষণকাল ধ্যান স্তিমিত নেত্রে মনে মনে কাহাকে (
স্মরণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তার ক্লেশশুষ্ক অধরপ্রান্ত এক
[illegible]টা পরম সুখের মন্দহাস্যে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল! সে যেন চি

১ ...

তৃপ্তির একটি সানন্দ শ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক তাহারই নিকটে উপবিষ্ট কাহার সঙ্গে কহিয়া উঠিল, "আর কি? এইবার তোমায় পেলেম ত? এই টুকু শুধু অপেক্ষা ক'রে থাক, সেও আর বেশীক্ষণ দেরি নেই;—তার র সহস্র মহীপাল এলেও আর আমাদের ছাড়াছাড়ি করাতে পারবে না।"

সন্তর্পণে কে যেন কারাকক্ষের অর্গল মুক্ত করিয়া অত্যন্ত সাবধানে ঘরে কিল। অন্ধকারে সাবধানরুদ্ধপদধ্বনি শ্রুত হইল, মূর্ত্তি কিন্তু দৃষ্ট হইল া। ভীম প্রথমটা জানিতে পারিয়াও কথা কহিল না, তার মনে হইল, য় ত ভোর হইয়াছে, প্রহরী তাহাকে বধ্যভূমে লইবার জন্যই আসিয়া াকিবে। তার পর সহসা সেই অন্ধকারের মধ্যে তার অত্যন্ত নিকটে কান অপরিচিত কণ্ঠের সম্বোধনে তার নাম ধরিয়া আহ্বান করিতে শুনিল,—"ভীম! তুমি কোথায়?"

সবিস্ময়ে ভীম শব্দানুসরণে ফিরিয়া বলিল, "কে আমায় ডাকে?"

আগন্তুক কহিল, "কৈ তোমার হাত?"

ভীমের হস্তে লৌহ শৃঙ্খল ঝনঝনা শব্দে বাজিয়া উঠিল।

"আস্তে"—বলিয়া প্রশ্নকারী শব্দ লক্ষ্যে হাত বাড়াইয়া যন্ত্র সাহায্যে তার হাতের ও পায়ের বাঁধন এক মুহূর্ত্তে কাটিয়া দিল। তেমনই মৃদুকণ্ঠে কহিল, "এস, চ'লে এস।"

ভীম অধিকতর বিস্মিত হইয়াছিল, অনিচ্ছার সহিত সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাব? বধ্যভূমে? কিন্তু তার জন্যে এত সাবধানতা কেন?"

শৃঙ্খলমুক্তকারী পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "না, মুক্তি দিতে,—বিলম্ব অবিধেয়।"

ভীম তথাপি উঠিল না, কহিল, "মুক্তি ত আমার কাম্য নয়? আমি যাব না।"

আগন্তুক ঈষৎ হাসিল, "কি তোমার কাম্য? বরেন্দ্রীর সিংহাসন?"

ভীম উত্তর করিল, "তাও না—"

আগন্তুক সেইরূপ মৃদু হাসিল, "তবে ?"

ভীম কহিল, "মৃত্যু !"

এবার আর সেই স্নিগ্ধমধুর হাসিটুকু শুনা গেল না। গম্ভীর প্রশান্ত স্বরে অজ্ঞাত ব্যক্তি কহিল, "সে ত আমাদের প্রাপ্য আছেই ভাই! এ জীবন ত মৃত্যুরই রূপান্তর। তার জন্যে ব্যস্ত হয়ে তাকে অন্বেষণ করবার কোনই প্রয়োজন ত দেখি না, সে নিজেই আমাদের প্রয়োজন হ'লে খুঁজে নেবে। এখন তুমি আমার সঙ্গে চ'লে এস দেখি। বিলম্বে প্রহরীরা এসে পড়তে পারে।"

নিরতিশয় বিস্মিত ও বিচলিত হইয়া ভীম এবার নীরবেই তাহার আদেশকারীর অনুজ্ঞা মন্ত্রমুগ্ধের মতই প্রতিপালন করিল। আজ্ঞাকারীর কণ্ঠের মৃদুতা তার আদেশ দিবার শক্তিকে পরাস্ত করিতে পারে নাই।

দুই জনে নীরবে ও সাবধানে চলিয়া কারাকক্ষ এবং কারাগৃহের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া বহু পথ অতিক্রম করিল। তার পর ক্রমশঃ উভয়ে নগরীর বহির্ভাগে করতোয়ার তটভূমে আসিয়া দাঁড়াইবার পর সহসা ভীমের পথ-প্রদর্শক তাহার মুখের উপর, হইতে বস্ত্রাচ্ছাদনী খুলিয়া ফেলিয়া ভীমের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল।

তখন অতি বিস্ময়ে ভীমের মুখ দিয়া বহির্গত হইয়া গেল—"মহাকুমার—মহারাজাধিরাজ রামপালদেব !"

রামপাল শুধু স্বীকৃতির ভাবে মাথা নত করিলেন।

সাশ্চর্য্যস্বরে প্রায় বিহ্বল ভীম পুনশ্চ উচ্চারণ করিল, "তুমিই আমায় মুক্তি দিলে ? নিজের মুখে মৃত্যুদণ্ড দে'বার পর !"—

রামপাল নম্রকণ্ঠে কহিলেন, "সে এমনই আশ্চর্য্য কি ভীম ? যে রাজা তোমাকে দণ্ড দিয়েছিল, সে রাজা রামপাল—সে ত তোমায় মুক্তি দিচ্চে

না,—মানুষ রামপাল—যে তোমার মনুষ্যত্বের পূজা করে, এ মুক্তি তোমায় সেই দিচ্চে।”

ভীমের বক্ষ মথিত করিয়া তাহার নেত্র অশ্রু স্পন্দিত হইয়া আসিল, পাছে তার সেই দুর্ব্বলতাটুকু ধরা পড়িয়া যায়, সেই ভয়ে সে কথা কহিল না। তখন রামপাল পুনশ্চ কহিলেন, “আমি বিদ্রোহীর শাস্তিবিধান করেছি, কিন্তু যে রাজা এত অল্পদিনে এমন প্রজারঞ্জক হ’তে পেরেছিল, তার অমূল্য জীবন নষ্ট করবার অধিকার আমার নেই; কে ব’লতে পারে? আমি নিজে হয় ত তোমার মত প্রজাপালক হ’তে পেরে উঠবো না। তাই বলি, আমাদের এখন দুটি উপায় আছে, হয় আমার সঙ্গে একত্র ব’সে তুমি আমি দুজনে মিলেই বরেন্দ্রী মগধ শাসন, কামরূপ-কলিঙ্গ জয় করি এস, আর না হয়, প্রজাদেরই তাদের ভবিষ্যৎ-রাজা নির্ব্বাচনের অধিকারটা দান করা যাক। তারা যদি তোমায় চায়, আমি আনন্দের সহিত তোমায় সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে নিঃশব্দে ফিরে চলে যাব, আর তারা যদি আমায় চায়, তোমার স্থান তুমি ছেড়ে দেবেই। এ কি মন্দ?”

এবার ভীম কথা কহিল, রামপালের সম্মুখে সহসা নতজানু হইয়া সে কৃতজ্ঞতা গদ্‌গদকণ্ঠে কহিল, “আমিই প্রজাদের পক্ষ থেকে তাদের রাজ নির্ব্বাচন কায়মনোবাক্যে ক’রে দিলুম। তুমিই বরেন্দ্রীর উপযুক্ত রাজাধিরাজ!”

রামপাল দুই হাতে তুলিয়া তাঁর ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরম মিত্রের মতই নিজ বক্ষে আলিঙ্গন করিলেন, কহিলেন;—“তবে আমার সঙ্গী হবে এস।”

ভীম আত্মস্থৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিল, সে দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, “না, আমার জন্য দণ্ড পরিবর্ত্তন করবার দরকার নেই। দেওয়া জিনিষ ফিরিয়ে নেওয়া রাজাধিরাজের যোগ্য হবে না।”

সহাস্যে রামপাল কহিলেন, “কে রাজাধিরাজ? রাজাধিরাজ আমি

হ'লে তুমি আমায় 'তুমি' না ব'লে 'আপনি' বলতে। শোন ভীম! মৃত্যুদণ্ড তোমায় যে দিয়েছিল, তার তাই করাই তখন কর্ত্তব্য ছিল, তাই সে করেছিল; কিন্তু আমার কর্ত্তব্য, তোমায় মুক্তি দেওয়া। এ যদি তুমি না নাও, অগত্যাই আমায় রাজ্য ছেড়ে এবার চির নির্ব্বাসনে ফিরে যেতে বাধ্য হ'তেই হবে। অতীতে যা' ঘ'টে গেছে, তার উপর আবার তোমার রক্তে অনুরঞ্জিত হয়ে এ সিংহাসনে বসলে সে আমার কিছুতেই সহ্য হবে না।"

ভীম মুগ্ধ হইল। তার সমস্ত মনপ্রাণ গৌরবের সুখে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে বিস্ময়াপ্লুতস্বরে কহিয়া উঠিল, "তোমার মত শত্রু লোকের শ্লাঘনীয়! কিন্তু রাজাধিরাজ! জীবনের অপেক্ষা মৃত্যুই এখন আমার প্রার্থিত। শ্রীরামচন্দ্রের মৈত্রীর চেয়ে তাঁর শত্রুতাই রাবণের পক্ষে ইষ্টজনক হয়েছিল, আমার পক্ষেও তাই। আমারও এ জীবন বড় ভারাক্রান্ত। একে আর বৃথা বহনের দুঃখ আপনি অনর্থক কেন আমায় দিতে চাইচেন?"

রামপাল ক্ষণকাল নীরবে উর্দ্ধে চাহিলেন। আকাশের শত শত গ্রহনক্ষত্র যেন অপরিসীম কৌতূহলে পৃথিবীর এই দুই বীরপুরুষকে সাগ্রহে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল, যাহারা আজিকার এই মুহূর্ত্তের কতটুকুই বা পূর্ব্বে দুই জন অপ্রতিহত ভীষণ আততায়ী মাত্র ছিল, আর এক্ষণে দুই জনেই দুজনকার বীরত্ব ও মহত্বমুগ্ধ, দুই জন অকৃত্রিম স্নেহপাশে নিবদ্ধ প্রিয়সখা। সে দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া রামপাল অদূরস্থ করতোয়ার বক্ষে দৃষ্টিপাত করিলেন, চন্দ্রহীনা যামিনীর ক্ষীণতর নক্ষত্রালোকে অর্দ্ধোদ্ভাসিত সেই নদীবক্ষে মৃদুমন্দ বীচিবিক্ষেপের অর্দ্ধস্ফুট কলতানে কাহাদের কথা না জানি সে তার বক্ষোধৃত তারকার প্রতিচ্ছায়া-গুলিকে শুনাইতেছিল সেও কি এই ইহাদেরই কাহিনী?—যাঁহাদের মধ্যে

নিদারুণ জিঘাংসা ও প্রতিহিংসা ব্যতীত আর অপর কিছুই এ পৃথিবীর সাধারণ লোকে আশা করিতে পারে না!

রামপাল সেখান হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ভীমের মুখের পানে চাহিলেন। গভীর অন্যমনস্কতায় ভীম তাঁর সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিল না, সে গাঢ় চিন্তা-সমুদ্রে যেন নিমজ্জিত হইয়া একই ভাবে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রামপাল সরিয়া আসিয়া তার কাঁধের উপর হাত রাখিলেন, ধীরগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তুমি আমায় অযাচিতভাবে বারেবারেই 'রাজাধিরাজ' ব'লে সম্বোধন করেছ। আমায় যখন রাজা ব'লে স্বীকার করেই নিয়েছ ভীম! তখন তোমার রাজার আদেশ তুমি পালন করতেও ত বাধ্য? আমি তোমায় আদেশ করছি,—তোমায় বাঁচতে হবে। জীবন কারু খেলার বস্তু নয়, বহু যুগের তপস্যালব্ধ ফল, তাকে ইচ্ছাসাধে বিসর্জ্জন দেবার অধিকার তোমার আমার নেই; বেঁচে থেকে আমার দক্ষিণহস্ত স্বরূপে, আমার পাশে ব'সে এই সিংহাসনের এবং এর গুরু দায়িত্বের অর্দ্ধাংশ—"

আর্ত্তস্বরে ভীম বাধা দিল—"ক্ষমা কর রামপাল!—না না, রাজাধিরাজ! আমায় ক্ষমা করুন। অতদূর নিষ্ঠুর হবেন না, মরণের চেয়ে এ শাস্তি আমার পক্ষে বড় বেশী কঠিন হবে!"

রামপাল তাহার হাত ধরিলেন, "জানি ভীম! তবু এ শাস্তি তোমায় নিতেই হবে। তুমিও ত আমায় কম কষ্ট দাও নি, অনেক দুঃখই দিয়েছ, মনে কর, এ তারই প্রায়শ্চিত্ত।"

ভীম ব্যাকুল উর্দ্ধনেত্রে যেন কাহার সহায়তার বৃথা আশাতেই একবার প্রত্যাশাপন্নভাবে চির রহস্যময়, চির অপরিবর্ত্তিত, অনন্ত আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল। কৈ? কে কোথায়? অন্ধকার রন্ধ্রবিহীন কারাকক্ষে তার মনঃকল্পিত চিদাকাশে যে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিকে আসন্ন

মিলনের আনন্দে উদ্ভাসিত স্মিত প্রফুল্ল মুখে দাঁড়াইতে দেখিয়া সে তার দীর্ঘ বিরহজ্বালাদগ্ধ অন্তরে সান্ত্বনার শীতল প্রলেপ লাভ করিয়াছিল, কৈ, কোথায় সেই দিব্যরূপিণী? এই কঠিন সমস্যার মাঝখানে তাহাকে অসহায় করিয়া দিয়া কোথায় সে চলিয়া গেল? উজ্জ্বলা! উজ্জ্বলা! তবে কি তার এই দুঃসহ দীর্ঘ বিরহব্রতের উদ্‌যাপনকাল এখনও সমুপস্থিত হয় নাই? আরও সহিতে হইবে? আরও দুঃখ কি বাকি আছে?

প্রকাশ্যে রামপালের আগ্রহোত্তেজিত মুখের দিকে শান্তনেত্রে চাহিয়া ভীম পূর্ণ সংযমের সহিত স্থির এবং ধীরকণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল, "তবে তাই হোক রাজাধিরাজ! আপনার স্নেহের দণ্ডই আমি মাথায় ক'রে তুলে নিলেম। কিন্তু যেখানে এক দিনের জন্যও আমি রাজা ছিলেম, সেখানে রাজ্যচ্যুত হয়ে আপনার দাক্ষিণ্যের দান নিয়ে আর আমি বাস করতে পারি নে। আমায় যদি মুক্তি দিয়ে থাকেন, তবে একেবারেই মুক্তি দিয়ে দিন, এই মুহূর্তে এ রাজ্য ছেড়ে জন্মের মতই আমি চ'লে যাচ্চি। এই সর্ত্ত ভিন্ন আপনার দেওয়া এ মুক্তি আমি নিতে পারবো না।"

ঈষৎ দুঃখিত অথচ অনেকখানি নিশ্চিন্ত হইয়া সাগ্রহে রামপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু কোথায় যাবে তুমি, আমায় সেটা ব'লে যাও ভীম! অর্থ এবং লোকবল যত তোমার প্রয়োজন, এই মুহূর্ত্তেই আমি তোমার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করে দিচ্চি এবং—"

হাসিয়া ভীম তাঁহাকে বাধা দিল, কহিল,—"শুধু এই দেহ এবং একমাত্র পরিধেয়, এর বেশি এ জগতে ভীমের আর কিছুরই প্রয়োজন নেই,—যদি যেতে হয়, এই নিয়েই যাব!"

"কিন্তু বল, তবে কোথায় যাবে? এমন নিঃসম্বলে কেমন করে আমি তোমায় বিদায় দেবো ভীম?"

"কি সম্বল নিয়ে এ পৃথিবীতে এসেছিলুম? যাবার সময়ই বা কি সঙ্গে
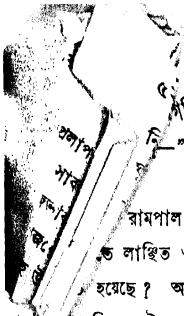
কি জানি, কোথায় ? হয় ত দেশে দেশে গিরিগুহায় তপস্যা করবো, আর না হয় ত নি—”

রামপাল ! তুমিও ত একদিন এমনই নিঃসহায় ত লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হয়েছিলে, তা’তে কতটুকুই হয়েছে ? আমার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র ! আমার জন্য দুঃখ পাবার কিছু নেই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, তোমার রাজ্য অতীতের রামরাজ্য হোক।”

রামপাল বিদায় লইয়া ভারাক্রান্ত চিত্তে ফিরিয়া গেলে, বহুক্ষণ ভীম নীরবে তাঁর গতিপথে চাহিয়া থাকিয়া তার পর ধীরে ধীরে একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচনপূর্ব্বক মুখ ফিরাইল।

ত্রিযামার শেষ যামে ক্ষয়প্রাপ্ত ক্ষীণচন্দ্র ততক্ষণে ধীরে ধীরে করতোয়ার পরপারের বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য হইতে ক্লান্তিমাখা ম্লান বিষণ্ণ অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছেন। সুষুপ্ত চরাচর গভীর শান্তিমগ্ন। মৃদু জ্যোৎস্না-ছায়ায় করতোয়ার শান্ত বক্ষ অর্দ্ধালোকিত হওয়ায় এক্ষণে তাহার পূর্ব্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। শুভ্র আস্তরণ-বিস্তৃত একখানি কোমল সুপ্তিশয্যার মতই তাহাকে পরম লোভনীয় বোধ হইতেছিল, উহার তীরভূমে মৃদু মৃদু লহরীলীলাভঙ্গের অস্পষ্ট কলতান এবং তীরতরুশিরে ঝিঁঝিঁদলের অতি মৃদু সঙ্গীতময় স্বর একত্র মিশ্রিত হইয়া যেন ঘুম পাড়ানিয়া গানের মতই শুনাইতেছিল। রাজকীয় শয্যাগৃহের দ্বাররক্ষী প্রহরীদের মতই অসংখ্য তারকা দীপহস্তে অক্লান্তভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

ভীম ধীরে ধীরে অনতি উচ্চ তটভূমি অবতরণ পূর্ব্বক তীর বেলাভূমে নামিয়া দাঁড়াইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে রামাবতী নগরীর নাগরিকগণ নিদ্রাভ... রুদ্ধশ্বাসে প্রতি মুহূর্ত্তে যে সংবাদের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছিল, বেলা অ... ানি বাড়িয়া গেলেও তাহাদের সেই প্রতিক্ষণে প্রতীক্ষিত বিশেষ সংবাদ রা...পথে ঘোষ ঘোষকের দ্বারা প্রচারিত হইতে শুনিতে পাওয়া গেল না। যাহ... কৈবর্ত্ত-রাজের আত্মীয়বন্ধু, অথবা মনে মনে উঁহাদের পক্ষপাতী, তাহারা ...শবস্মরণে ...নে মনে প্রার্থনা করিল, 'তাই হোক্ কোন দৈবিক ঘটন...ও যদি ...হারাজাধিরাজ ভীম রক্ষা পেয়ে গিয়ে থাকেন!' যাহারা সর্ব্বদা ...তনের ...ক্ষপাতী, অথবা স্বভাবতঃই নির্ম্মম প্রকৃতি, তাহারা মনে মনে ...টুখানি ...শাহত হইল। তবু ত একটা নূতন কিছু হইত!

অবশেষে প্রকৃত সংবাদ জানা গেল।

সকালবেলায় রাজসভার অধিবেশন হইয়াছে। রাজসিংহাসনের ...ক্ষিণপার্শ্বে মহামাত্য বোধিদেবের সম্মানাসন; যে আসনকে ইতিপূর্ব্বে ...হার পূর্ব্বপিতামহগণ সমালঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন,—গর্গ, সোমেশ্বর, গুরব ...া, কেদার মিশ্র প্রভৃতির, সেই লোকপূজ্য বিচারাসনে পালাসম্রাজ্যের ...ন বিচারক ও উপদেষ্টৃবেশে তাঁহাদেরই যোগ্য বংশধর বোধিদেবকে ...খিয়া গুণগ্রাহিজন পরম পরিতুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। রাজসিংহাসনের ...। রাজ-মাতুল এবং বরেন্দ্রী-বিজয়ের সর্ব্বপ্রধান সহায় অঙ্গাধিপ মথনদেব, ...দেব এবং মহাপ্রতীহার শিবরাজ, মহাসান্ধিবিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দী, ...সনানায়ক মাহ্মন মহামাণ্ডলিক কাহ্নুরদেব এবং পীঠিপতি দেবরক্ষিত ...তি নৃপতিবৃন্দ যথাযোগ্য আসনে শোভা পাইতেছিলেন। সকলেই

সকল দুঃসংবাদে স্ব [illegible] মলিন এবং ভগ্নচিত্ত। মথনদেবের মুখ আভ্যন্তরিক [illegible]পের তাঁরতাপে [illegible]রক্তাভ। সভায় রামাবতীনিবাসী গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠাপন্ন মন্ত্র ভদ্র ব্যক্তি [illegible] অনুপস্থিত হইয়াছিলেন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত পরাজিত করতপতির [illegible]ময় পলায়নের বার্ত্তা সকলকেই প্রায় বিস্ময় স্তম্ভিত করিয়াছিল। [illegible] সংবাদে পালসম্রাটের হিতাকাঙ্ক্ষিগণ চিন্তিত ও পুনশ্চ দ্বারতে [illegible] কিছু শঙ্কিতও হইয়াছিলেন, তবে যাঁহারা মনে মনে এখনও করতপতি [illegible] হিতকামা, তাঁহাদের আনন্দের সীমা ছিল না।

[illegible]ই উদ্বিগ্নচিত্তে রাজ আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। উৎকণ্ঠা-চাঞ্চল্যে মথনদেব ঈষৎ অধীরভাবে মহামাত্যকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "রাজাধিরাজের আজ এত বিলম্ব হবার কারণ কি?"

স্বল্প পরে ভ্রাতুষ্পুত্রের দিকে ফিরিয়া অধৈর্য্যের সহিত কহিলেন, "তুমি একবার সংবাদ লও দেখি, শিবরাজ! রাজার শরীর অসুস্থ হলো না ত? নিয়মের এরূপ ব্যতিক্রমতো কখন তাঁর হয়না!"

তার পর ভীত ত্রস্ত অর্দ্ধমৃতবৎ অবসন্ন কারাধ্যক্ষের দিকে মুখ ফিরাইয়া তার কম্পিত বক্ষকে অধিকতর কম্পিত করিয়া তীব্র কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি নিশ্চিত ক'রে বল্‌তে পার যে, বন্দি-গৃহের কুঞ্চিকা দুটি ভিন্ন তিনটি থাকা কোনমতেই সম্ভব নয়? আর তার একটি রাজাধিরাজের আজ্ঞাতে তুমি তাঁর নিজের হস্তে প্রদান করেছিলে, আর অপরটি সমস্তক্ষণ তোমার কাছেই ছিল এবং এখনও আছে?"

ভয়ার্ত্ত কারাধ্যক্ষের আপাদমস্তক কম্পিত হইতে লাগিল। স্খলিত জড়িত কণ্ঠে সে কোনমতে উচ্চারণ করিল, "দেব! এর চেয়ে আর বেশী কিছু আমার বল্‌বার নেই! এই তালকটি এ দেশের প্রস্তুত নয়, গান্ধার দেশ হ'তে বিশেষ কৌশলে প্রস্তুত করিয়ে আনানো হয়েছিল। সর্ব্বদা এর ব্যবহার হয়না,—বিশেষ অপরাধীর জন্যই এর ব্যবহার হয়ে থাকে, এবারও

...হয়েছিল। নিশ্চয়ই এ ভৌতিক ব্যা... র স...

...দেওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়।"

...ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিলেন, "শিশুর ...

...কারু কোন দিন চাকা পড়েনি কারাধ্যক্ষ সা...

তার পর ঈষৎ ... আত্মসংবরণ পূর্বক কথঞ্চিৎ সম্ভ...

...হইয়া পুনশ্চ ঐ হতভাগ্যকেই প্রশ্ন করিলেন, "রাজাধি...

...কে কুঞ্চিকা প্রদান করেছিলে? সেখানে তখন আর কে...

...লে?"

কারাধ্যক্ষ উত্তর করিল, "কেউ না, পরতরাত্রে ... মহা-

রাজাধিরাজ স্বয়ং একাকী আমার গৃহে এসে আমায় নিজেই জিজ্ঞেস

করলেন, 'কৈবর্ত্তপতির বন্দি-গৃহের কুঞ্চিকা কোথায় আছে?' আমি

...দেখালে, তিনি বললেন, 'দুটোই তোমার হাতে থাকা সঙ্গত হবে

..., একটা আমার কাছে দাও দেখি।' তার পর আরও বললেন, 'দেখ,

সাবধানে রক্ষা করো, কোনমতে যেন হস্তচ্যুত হয় না।' আমিও আমার

যথাসাধ্য—"

"পরিবারপালক! সেই জন্যই অত যত্ন ক'রে তোমার রাজার আদেশ

তুমি পালন করেছ? জীবন্ত শূলে চড়ালে তবেই তোমার উপযুক্ত দণ্ড হয়।

রাজদণ্ডের অধীন গুরু অপরাধে অপরাধীকে মুক্তি দিলে সেও যে রাজদ্রোহী

গণ্য হয়, এ কথা কি তুমি জানতে না পাপিষ্ঠ?"

দ্বারের প্রহরীবৃন্দ নতজানু হইয়া কাহার উদ্দেশে সসম্মানে জয় শব্দ

উচ্চারণ করিল, প্রবর্দ্ধমান জনতা শশব্যস্তে ও সসঙ্কোচে কাহার গতিপথ

ছাড়িতে মুক্ত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল।

মহারাজাধিরাজ রামপালদেব সভা প্রবেশ করিলেন।

...বিস্ময়... সকল চক্ষুই একসঙ্গে বিস্ফারিত হইয়া রাজবেশপরিশূন্য

ভূমিকা
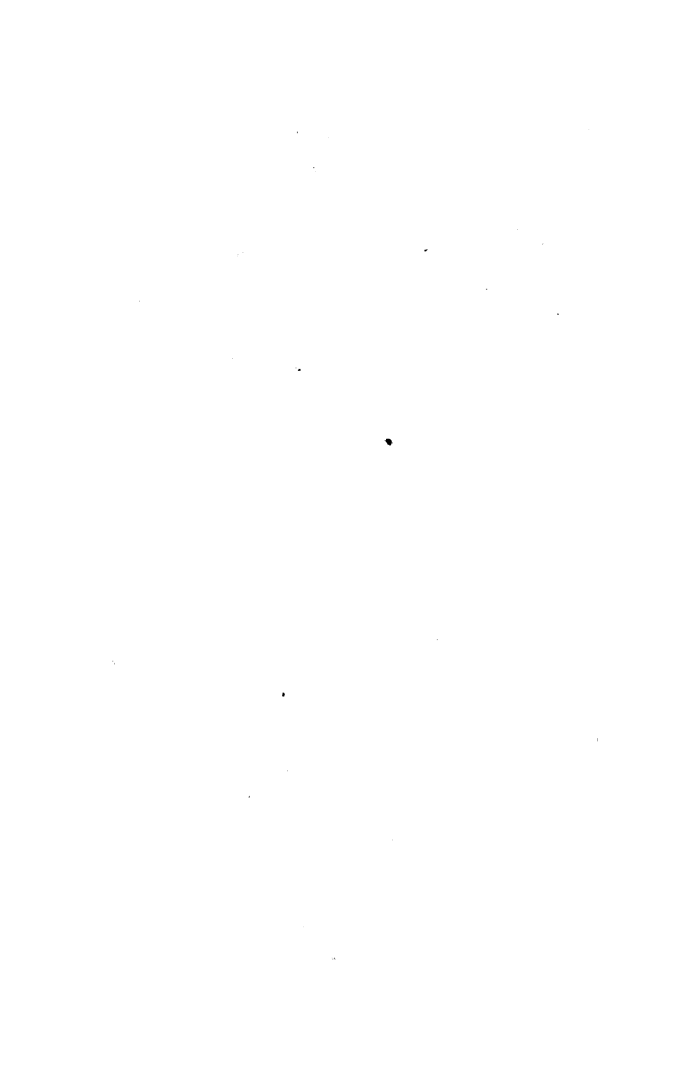
মাসিক বসুমতীতে প্রকাশকালে আমার এই উপন্যাসে দিব্যোক ও ভীম প্রভৃতিকে "জালিক" কৈবর্ত্তরূপে অঙ্কিত করায় কয়েকজন মাহিষ্য-পাঠক ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ; কেহ কেহ ইহার জন্য আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন ; কেহ বা আমার লেখা প্রত্যাহার না করিলে "তীব্র প্রতিবাদ হইবে"—বলিয়া ভয়ও দেখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের যুক্তি এই, প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথের "আর্লি হিষ্ট্রী অব ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে, শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ীর "পৃথিবীর ইতিহাসে", ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদারের "ভারতবর্ষের ইতিহাসে" দিব্যোক-ভীমাদিকে চাষীকৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য জাতি বলা হইয়াছে। আমি না কি ইহার ব্যতিক্রম করিয়া উঁহাদের মনে নিদারুণ দুঃখ দিয়াছি! মাহিষ্য সমাজ পত্রিকায় "ত্রিবেণীর পঙ্ক" শীর্ষক প্রবন্ধে আরও অনেক কথাই উঁহারা এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন। সমস্ত অযৌক্তিক তুচ্ছ কথার উত্তর দেওয়ার আবশ্যকতা বোধ করি নাই ; কিন্তু কতকগুলি বিষয়ের উত্তর দিবার জন্য কয়েকটী ফুটনোট ঐ সকল সময়ে "ত্রিবেণীর" সঙ্গে ছাপাইতে বাধ্য হই ; এখন পুস্তক প্রকাশকালে তাহার সমস্তগুলির প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও ভবিষ্যতের জন্য এ সম্বন্ধে একটুখানি সাবধানতা অবলম্বন করাই শ্রেয় বোধ করিলাম। পূর্ব্ব-বিচারিত বিষয়ের যাহাতে আর পুনশ্চ আলোচনা করিতে না হয় ইহার জন্য ঐ ফুটনোটগুলি (সাময়িক বিষয়সমূহকে পরিত্যাগ করিয়া) একত্র গ্রথিত করিয়া ভূমিকারূপে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি।

আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে বিরচিত ইতিহাসের সা
পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন যে, ব্যক্তিবিশেষের মত বলিয়াই
কথা অবিসংবাদী সত্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, সে দিন আর :
প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিক পণ্ডিত এইরূপ বলিয়াছেন
সে মত অভ্রান্ত, এরূপ ধারণার দিন বহুকাল চলিয়া গিয়াছে।
তর্কের সাহায্যে যে সিদ্ধান্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা মহা
পণ্ডিত বা প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বা ঐতিহাসিক-ধৃত মতের বিরো
গ্রহণীয়। সুতরাং স্মিথ সাহেব, বা লাহিড়ী মহাশয় বা ডাঃ
নাম দেখিয়াই যে ভয় পাইতে হইবে বা তাঁহারা যে কথা বলিয়াছে
যে বিরুদ্ধ আলোচনা নাই, এরূপ মনে করি না।

কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে আর একটি কথা বলা
বোধ করিতেছি। পরলোকগত পণ্ডিত ভিনসেণ্ট স্মিথ কোন
"প্রত্নতত্ত্ববিদ্" ছিলেন না ; এমন কি, 'ঐতিহাসিক' বলিতে ঠিক যা
তিনি তাহাও ছিলেন না। 'ঐতিহাসিক' ও 'ইতিহাস লেখক' ি
নহেন। স্মিথ সাহেব প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহা লিখিলেও
সংস্কৃত ও পালি ভাষা এবং প্রাচীন ভারতীয় বর্ণমালা-সমূহের সহিত
দিন সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। সুতরাং সংস্কৃত ও পালি ভাষায়
গ্রন্থাদি বা প্রাচীন অনুশাসন সমূহের পাঠের জন্য তাঁহাকে অপরের
উপর নির্ভর করিতে হইত। বলা বাহুল্য, এ প্রকার গুরুতর
যাঁহাতে বর্তমান, তিনি প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক হইতে পারেন না।
সাহেবকে "প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিক" না বলিয়া "প্রসিদ্ধ ই
সঙ্কলক" বলাই অধিকতর সঙ্গত। যাঁহারা স্মিথ সাহেবের "আর্লি
অফ ইণ্ডিয়া" গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের এ
অজ্ঞাত নহে যে, স্মিথ সাহেবের নিজের বলিয়া কোন মতই ছিল না ;

যে মত তিনি অপরের লেখায় সঙ্গত মনে করিয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। পরে সম্পূর্ণ বিরোধী অপর এক মত অধিকতর সঙ্গত বোধ করিয়া তিনি পূর্ব্ব মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই; আবার কিছুকাল পরেই এই দ্বিতীয় মত পরিত্যাগ করিয়া প্রথম মতে তিনি ফিরিয়াও আসিয়াছেন। তাঁহার এত ঘন ঘন মত-পরিত্যাগের কারণ এই যে, কোন সিদ্ধান্তেরই স্বপক্ষের ও বিপক্ষের যুক্তিগুলি নিজ হইতে আলোচনা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ কথা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, স্মিথ সাহেবকে পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া বা তাঁহার গ্রন্থের কোন মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় তিনি যাহা করিয়াছেন, সত্যই তাহার তুলনা নাই এবং নানা দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁহার গ্রন্থ ইতিহাসজ্ঞানলাভেচ্ছুর পক্ষে অপরিহার্য্য এবং এখনও দীর্ঘকাল থাকিবে বলিয়াই আমরা বিবেচনা করি।

তবে দুঃখের বিষয়, লাহিড়ী মহাশয়ের 'পৃথিবীর ইতিহাস" সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। আধুনিকতম তথ্যসমূহের সন্ধান না রাখিয়া প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দীকাল পূর্ব্বে বিরচিত ইংরাজী গ্রন্থাদি অবলম্বন বা অনুবাদ করার ফলে 'পৃথিবীর ইতিহাসে' অনেক স্থলেই ভ্রান্ত বা অধুনা পরিত্যক্ত মতাদি দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকে কতদূর ইতিহাস বলিতে পারা যায়, তাহা বিবেচ্য।

সুতরাং কোন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের মত এই বা কোন গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে বলিয়াই যে উহাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিতে হইবে অথবা তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়াই অসঙ্গত, এরূপ মনে করিবার কোনই হেতু নাই। আমার ঐতিহাসিক রচনার সমালোচনা করিতে গিয়া কোন কোন মাসিক পত্রিকার সমালোচক এরূপ কথাও বলিয়াছেন

দেখিয়াছি যে, আমার ইতিহাস জানা বা পড়া নাই, সুতরাং ঐতিহা
উপন্যাস লিখিবার স্পর্দ্ধা ত্যাগ করিয়া সামাজিক উপন্যাস লেখা লই
আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সমালোচকগণ যে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হ
পারেন, সে কথা ইতঃপূর্ব্বে আমার জানা ছিল না! কে কোন্ বি
জানেন বা না জানেন, অন্তর্দৃষ্টি ব্যতিরেকে সমালোচকের পক্ষে ত
অবগত হওয়া আর কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

নানা কারণেই এত কথা বলিতে হইল। কিন্তু যাবতীয় "প্রা
প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকের" ইতিহাসের মূলসূত্র যাহাতে নিহিত, সে
'মনহলি লিপি' বা "রামচরিত" কাব্যে এমন কোন প্রমাণ নাই, যাহা হই
অবিসংবাদিরূপে বুঝাইতে পারে যে, দিব্যোকাদি জালিক কৈবর্ত্ত ছিলে
না। মূলে তাঁহাদিগকে মাত্র "কৈবর্ত্ত" বলিয়াই অভিহিত করা হইয়াছে
ইহা হইতে সকলেই নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে 'জালিক' বা 'হালিক' সমস্যা
মীমাংসা করিতে পারেন।

যাহা হউক মাহিষ্য-জাতীয় পাঠকগণের আত্যন্তিক তীব্র ইচ্ছার খাতিরে
দিব্যোকাদিকে হালিক কৈবর্ত্ত বলিয়াই মানিয়া লওয়া গেল। নদী-মাতৃক
বঙ্গদেশে বাস নিবন্ধন পালরাজাদের সৈন্যবলের মধ্যে নৌবল যে প্রধান বল
ছিল, বহুতর তাম্রশাসন হইতে তাহা প্রমাণিত হইয়া থাকে। ঐ নৌ-বাহিনী
কাহাদের দ্বারা পরিচালিত হইত, যদিও ইহার কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ
পালশাসনাদি হইতে পাওয়া যায় নাই, তথাপি প্রাচীন ভারতে বহুকাল
হইতেই নৌযুদ্ধের অধিনায়ক সৈন্যদল যে কৈবর্ত্ত জাতীয় হইত, তাহার
বিশেষ প্রমাণ রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডের ৮৪ অধ্যায়ের এই শ্লোক হইতে—

"নাবাং শতানং পঞ্চানাং কৈবর্ত্তানাং শতম্ শতম্।
সন্নদ্ধানাং তথা যুনাস্তিষ্ঠন্তিত্যভ্যচোদয়ৎ॥

পাওয়া যায়।

শ্রীরামচন্দ্র কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণায় বনবাসী হইয়াছেন, চিত্রকূটে বাস করিতেছেন, এদিকে মাতুলালয় প্রত্যাগত ভরত অযোধ্যায় ফিরিয়া সকল সংবাদ শ্রবণে পরিজনসহ শ্রীরামচন্দ্রকে ফিরাইয়া লইবার জন্য আসিতেছেন, গুহক চণ্ডালের রাজধানী শৃঙ্গবেরপুর হইতে যমুনা পার হইয়া চিত্রকূট যাইতে হইবে, সসৈন্য ভরতের আগমনবার্ত্তা পাইয়া গুহক তাঁহাকে রামচন্দ্রের শত্রুবোধে নিজের শতশত নৌসৈন্যের দ্বারা বাধা প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই "শতশত" নৌসেনা যে কৈবর্ত্ত-জাতীয় তাহাই সুস্পষ্টাক্ষরে রামায়ণকার লিখিয়া গিয়াছেন।

এই শতশত জলযুদ্ধকারী কৈবর্ত্ত যুবকদের কি "চাষী কৈবর্ত্ত" বলিয়া বুঝিতে হইবে? অথবা জলযানারোহী (জলের উপর বাসপ্রযুক্ত অবসর সময়ে মৎস্যাহরণ নিযুক্ত) জালিক কৈবর্ত্তেরই সন্দেহ হয়? চাষী-কৈবর্ত্ত হল ছাড়িয়া হাল ধরিতে আসিলে অনুত্তর বঙ্গে কুমারপালের জয়পতাকা উড়িত কি? (জালিক কৈবর্ত্তরা অনেকেই বৌদ্ধযুগে মৎস্যাহরণ ত্যাগ করিয়া লাঙ্গল ধরিয়াছিল এবং ইহাতেই তাহারা চাষী কৈবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ হয়, এ মত নিতান্ত তুচ্ছ নয়।) "ত্রিবেণীর পঙ্ক" লেখক প্রশ্ন করিয়াছেন "দিব্যোক ভীম প্রভৃতি কি ক্ষেপ্লা জাল দিয়া পাল সাম্রাজ্য জয় করিয়াছিলেন?" আমার মনে হয় পাল সাম্রাজ্যের (এটা হয়ত আধুনিক মাহিষ্যরা খবর রাখেন না?) নৌ বাহিনী যাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল, সেই কৈবর্ত্তদলের দ্বারা সহজেই পালসাম্রাজ্য ধ্বংস সম্ভব হইয়াছিল এবং সেই নৌসেনারা হালিক না হইয়া জালিক হওয়াই অধিকতর সম্ভব. নতুবা হল-লাঙ্গল দিয়াও পালসাম্রাজ্য বিজয় করা সম্ভবপর হয় নাই বোধ হয়?

"ত্রিবেণীর পঙ্ক" লেখক লিখিয়াছেন, "এখনও উত্তর বঙ্গে মাহিষ্য জাতীয় অনেক জমিদারের বাস আছে, লেখিকা বোধ হয় সে খবর রাখেন না?"—ইহার উত্তরে আমি বলি, তা রাখেন বই কি! তাঁদের মধ্যে

লেখিকার বন্ধুস্থানীয় লোকও আছেন যে! তবে তিনি এ সংবাদটাও রাখেন যে, জালিক কৈবর্ত্ত জমিদার—এমন কি রাজাও ওসব অঞ্চলে ছিলেন এবং এখনও এক আধজন যে আছেন, সে সংবাদটাও উপরন্তু এই লেখিকার জানা আছে।

কাশীদাসী মহাভারতে যে দাস রাজার উল্লেখ আছে তিনিও জালিক কৈবর্ত্ত। কাজেই এ, কল্পনাটাও একেবারেই অসম্ভব, বা অসঙ্গতও নয় যে জালিক কৈবর্ত্তরাও এককালে নিতান্ত তুচ্ছ ছিল না।

যাহা হৌক, আমার বিশ্বাস যাহাই হোক, আমি প্রত্নতত্ত্ব লিখিতে বসি নাই,—লিখিতেছি উপন্যাস। জালিকে-হালিকে আমার যখন খুব বেশি আসিয়া যায় না, তখন এদের হালিক করায় আমার আপত্তি নাই এবং আমার বিশ্বাস পূর্ব্বতন জালিকই হালিকরূপে হল ধরিয়াছিল মাত্র, মূলে কোনই প্রভেদ ছিল না!

কিন্তু সমস্যা শুধু ইহাতেই মিটে নাই।

২। এই উপন্যাস লিখিতে বসিয়া অনেক প্রকার ভয় মৈত্রীপূর্ণ পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে, কিন্তু একখানি বিনা-স্বাক্ষরিত পত্র পা[illegible] কিছু অধিকতর স্তম্ভিত হইতে হইয়াছিল!

ভীমের স্ত্রীর চরিত্রে কলঙ্কার্পণ করা হইয়াছে বলিয়া ঐ পত্র-লেখক আমায় অভিযুক্ত করিয়াছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসেরও কোন চরিত্র সম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি নিয়ম রাখা যে মোটেই হয় না, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের জেব-উন্নিসায়, ডি, এল্, রায়ের প্রায় সমস্ত পুরাণ এবং ঐতি[illegible]ক নারী চরিত্রে, রাখালদাস বাবুর কুমারগুপ্ত, অনন্তা প্রভৃতিতে (যাঁ[illegible]ই ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির খবর রাখেন, তাঁহারাই জানেন) কত বড় ব্যতিক্রম! তথাপি (আমার নিজের চোখে এই জিনিষটা অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকে বলিয়াই) ঐতিহাসিক বিদ্বান্ পাঠকমাত্রেই একটু প্রণিধান করিয়া পাঠ করিলে

বুঝিতে পারা সম্ভব যে, আমার লিখিত 'রামগড়' অথবা 'ত্রিবেণীর' ঐতিহাসিক চরিত্র (যতটুকু অবশ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়) যতদূর সম্ভব ইতিহাস-সম্মতভাবেই অঙ্কিত করা হইয়াছে কি না! ভীম ঐতিহাসিক ব্যক্তি, ; তাঁহার সম্বন্ধে লেখকের একটা দায়িত্ব নিশ্চয়ই আছে, তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে লেখক কাহারও নিকট তেমন ভাবে নিশ্চয়ই দায়ী হইতে পারেন না ; তবে বিশেষভাবে যে কোন চরিত্রকেই অযথা কলঙ্কিত করিলে অবশ্য সমালোচনার অধিকার সকলেরই নিশ্চয় আছে! কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্র কোন জাতিরই সম্পত্তি নহে। কানিংহাম, স্মিথ হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত ঐতিহাসিক এবং লেখক তাঁহাদের কল্পনানুযায়ী এবং বিশ্বাসানুগত ভাবে ইঁহাদের লইয়া প্রবন্ধ, নিবন্ধ, উপন্যাস ও কবিতা যাঁহার যাহা খুসী লিখিতে পারেন। যাঁহাদের সহিত মতভেদ ঘটিবে, তাঁহারা প্রকাশ্য সংবাদপত্রে বা মাসিকে অথবা পুস্তক লিখিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে সমর্থ। বিনা স্বাক্ষরিত এরূপ পত্র লেখা কাপুরুষতা ও ধৃষ্টতার চরম !!

তার পর আসল কথা এই যে, "ভীমের স্ত্রীর চরিত্রের" কোন্‌খানটায় "কলঙ্ক লেপন করিয়া" আমি "মাহিষ্য-সমাজের মাথা হেঁট করিয়াছি", তাহা আদৌ দেখিতে পাইলাম না!

উজ্জ্বলার চরিত্রে "কলঙ্ক" বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার স্থান কোথাও নাই। রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা দেবী সীতার, দুঃশাসন কর্ত্তৃক অপমানিতা যাজ্ঞসেনীরও তাহা হয় নাই, বরং তাঁহাদের সতীত্ব-খ্যাতি তাহাতে উজ্জ্বলতরই হইয়াছিল। উজ্জ্বলাকে মহীপালের দূতী তার স্বামীর নাম করিয়া ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাতে বাহিরে তাহার একটা অপকলঙ্ক রটিয়াছে, বটে! এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই এই ভীম-ভক্ত পাঠকটি লেখকের প্রতি মহাত্মা স্বামী ৺শ্রদ্ধানন্দের মতই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, "সাবধান! শ্রদ্ধানন্দের কথা স্মরণ রাখিবেন!"

আর ইহার পর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন! তবে এই পর্য্যন্ত বলিলেই হইবে যে, আমার উপন্যাসের যে প্লট আমি স্থির করিয়া লইয়া উহাকে পরিচালিত করিতেছি, তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই, এবং কোন ব্যক্তি-বিশেষের ভয়ে তাহা করা উচিত বলিয়াও মনে করি না। পাঠকের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য্য যদি না থাকে, অগত্যাই আমি নিরুপায়!

আমি ইহাতে দেখাইতে চাহিয়াছি, ধার্ম্মিক ক্ষুদ্রের হাতে পাপী প্রবলতমের পরাজয়! আমি ইহাতে দেখাইতে চাহিয়াছি, মর্ম্মান্তিক আঘাতে দুর্ব্বলও সবল হইয়া উঠিয়া অসাধ্যসাধন করিতে পারে, আমি দেখাইতে চাহিয়াছি, অত্যাচারী মহীপালের পাপের ফলে অত বড় পাল-সাম্রাজ্যের ধ্বংস কত সহজে তাহার নিজের মধ্য হইতেই সম্ভব হইয়াছিল।—আর ঐতিহাসিক সত্যও ইহাই।

তবে যদি বলা হয় ভীমকেই বা এই রাজ-অত্যাচারে অত্যাচারিত করিলাম কেন? ইহার উত্তর এই যে, ইহাই স্বাভাবিক। যে আঘাত পায়, সে-ই ঠিক প্রবলভাবে প্রত্যাঘাত করিতেও পারে। মানব-চরিত্র-জ্ঞান যাহাদের সামান্য ভাবেও আছে, তাহাদের এ কথাটাও এত স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে হয় না। শাস্ত্রী মহাশয়ের রামচরিতের ভূমিকায় "The Kaivartas were smarting under oppression of the king." দিব্বোকাদিও রাজ-অত্যাচারে যে অত্যাচারিত হইয়াছিলেন, তাহা মনে করা যায় এবং মানুষকে সব চেয়ে বিচলিত করিতে এ অত্যাচারের মত অপর কোন অত্যাচারই যে জগতে নাই, শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠিরাদি হইতে আধুনিকতম খড়্গবাহাদুর সিংহ প্রভৃতিই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ! হিন্দুর নিকট সতী নারীর অবমাননা মহাপাপ এবং অত্যাচারের চরম। এই পাপে রাবণের ও কুরুকুলের ধ্বংসপ্রাপ্তি হইয়াছিল।

"ত্রিবেণী" সম্বন্ধে উক্ত পত্রপ্রেরক আরও লিখিয়াছেন,—"পরসংখ্যা হইতে যেন 'কৈবর্ত্ত-নায়ক' না লিখিয়া 'মাহিষ্য-নায়ক' শব্দ ব্যবহার করা হয়।"

কিন্তু এ অনুজ্ঞার কোন অর্থবোধই হইল না। 'মাহিষ্য-নায়ক' শব্দ কোন্ শিলালিপি বা তাম্রশাসনের কোন্‌খানে লিখিত আছে যে, আমার পত্রলেখক উহা লিখিতে আদেশ দিয়াছেন? রামচরিতের ২৯ শ্লোকের টীকায় আছে,—

"দ্বিষঃ শত্রোঃ কৈবর্ত্তস্য নৃপস্য।"—১।২৯।

কাযেই 'মাহিষ্য' 'মাহিষ্য' বলিয়া চীৎকার আমি এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে না করায় আমার অপরাধ আমি দেখিতে পাইলাম না এবং ইতিহাসের সম্মানরক্ষার্থেই ঐ শব্দ পরিবর্তন করা সঙ্গতও মনে করিতেছি না। সম্ভবতঃ, সে সময়ে 'মাহিষ্য' শব্দের প্রচলন অন্ততঃ সেখানে ছিল না। থাকিলে রাজকবি সন্ধ্যাকর নন্দী ঐ শব্দই প্রয়োগ বাধ্য হইয়াই করিতেন! অথবা আমার প্রথম সন্দেহই ঠিক, দিব্যোকাদি মাহিষ্য নহেন, পরন্তু জালিক কৈবর্ত্তই ছিলেন! আমি যথাসাধ্য প্রকৃত ইতিহাসকেই অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক এবং সে জন্য যথেষ্টই পরিশ্রম করিয়াছি। যদি নূতন কোন শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রাচীন পুঁথি কখন আবিষ্কৃত হয় এবং তাহাতে ভীম প্রভৃতিকে 'মাহিষ্য' শব্দে অভিহিত করা থাকে, তাহা হইলে সেই সময়ের "ত্রিবেণীর" নূতন সংস্করণে কোথাও 'কৈবর্ত্ত,' কোথাও বা 'মাহিষ্য' শব্দ আমিও বসাইতে বাধ্য হইব। আমার ঐতিহাসিক কোন পুস্তকেরই ব্রাহ্মণ-নায়ক সম্বন্ধে তাঁর কোন্ শ্রেণী, কোন্ গোত্র, কাহার সন্তান, কুলীন বা কাপ অথবা বংশজ, তাহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ কোথাও এ পর্য্যন্ত করি নাই। কাল্পনিক পাত্রদের ইচ্ছামত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, সুবর্ণবণিক সকল বর্ণেই স্থান দিয়াছি। ব্রাহ্মণ-পাত্রীকে বড় করিয়াছি বলিয়া সুবর্ণবণিক-পাত্রীদের

ছোট করি নাই। উপাখ্যানগঠিত চরিত্রে যার অংশে যাহা পড়ে, তাহা বর্ণ ধরিয়া হিসাব করা হয় না। ব্রাহ্মণী পতিতপাবনী বা সিদ্ধেশ্বরী, (মহানিশা ও পোষ্যপুত্র) বড় বধূ (বাগদত্তা) বৈদ্যজায়া মঙ্গলাদেবী (পথহারা) ইঁহাদের কুটিলা ও কলহপরায়ণা প্রভৃতি করিয়াছি, ইহাতে কোন দিনই কোন প্রশ্ন উঠে নাই, আর ক্ষত্রিয়া মহীপালজননী যৌবনশ্রীকেও ত খুব গুণবতী করিয়া অঙ্কিত করি নাই? অথচ ভীমের মাকে বধূ-নির্য্যাতিকা করায় উহা 'ঈর্ষ্যাপ্রসূত' বলিয়া পত্র আসিয়াছে! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্! ভীমের মা যে বধূ-নির্য্যাতিকা ছিলেন না, অশিক্ষিতা ছিলেন না, ইহার কোন প্রমাণ আছে কি? তার পর 'ঈর্ষ্যা' যে দিব্যোক রুদ্যোক এবং ভীমের কয়টি বৎসর রাজ্য করায় কেনই বা ... মনে এতই প্রবল হইল, এইটেই ত খুঁজিয়া পাওয়া গেল না? আমি ... 'স্বজাতি' বলিতে শুধু ব্রাহ্মণ বর্ণকেই বুঝি না এবং বোধ করি, পূর্ব্ব... মাজ স্রষ্টা তেজস্বী ও ত্যাগী ব্রাহ্মণেরাও তাহা বুঝিতেন না, নতুবা ব্যাস ... প্রভৃতি মহাতেজস্বী ঋষিদিগকে মহা মহা রাজাধিরাজের পরিবর্ত্তে (আধুনিকের চক্ষে) সামান্য শাস্ত্রজীবীমাত্র দেখা যাইত না।

পত্রলেখকের অপর আদেশ "কোন মাহিষ্য-চরিত্রই খারাপভাবে অঙ্কিত করিবেন না!"—

ইহার উত্তর দিবারও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না! যে সব পাঠক এত বড় সঙ্কীর্ণতা লইয়া পুস্তক পাঠ করিতে বইসেন, তাঁহাদের জন্য নূতন লেখক তাঁহারাই যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক গড়িয়া তুলেন এবং অন্যের লেখা দয়া করিয়া 'বয়কট' করেন। কাহারও ফরমায়েস লইয়া বা আবদার শুনিয়া উপন্যাস,—বিশেষতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা চলে না।

কোন ক্ষত্রিয়-সন্তান যদি আজ আমায় অন্য দিক হইতে ধমক দিয়া

বলেন, "মহীপালকে অমন নরাধম অঙ্কিত করিলে কেন? তিনি যে আমার স্বজাতি।"—হয়ত বা এখন আর আশ্চর্য্য হইব না!

কিন্তু এই উপন্যাসের আদর্শ দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যক্রমে ঠিক বিপরীতই লওয়া হইয়াছিল। সমস্ত স্থির-মস্তিষ্ক ইতিহাসজ্ঞ পাঠক যাঁহারা দ্বিতীয় মহীপাল সম্বন্ধীয় এই কাহিনীর সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারাই জানেন যে, রামচরিতকার ভীমকে উজ্জ্বল চরিত্রেই চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস যখন স্পষ্টাক্ষরেই দেখাইতেছে যে, প্রবলপরাক্রান্ত রাজাধিরাজ হইলেও তাঁহার সামান্য প্রজা সম্বন্ধে অনীতিপরায়ণতায় ধ্বংস ঘটে, তখন মাহিষ্য সমাজকে তুষ্ট বা রুষ্ট করিবার জন্য না হইলেও আমাকে আমার ঐতিহাসিক ধারাকেই অনুবর্ত্তন করিয়া শেষ সীমায় পৌঁছিতে হইবে। উত্যক্ত বা বিরক্ত হইয়াও এর অনুকূলে বা প্রতিকূলে পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিব না, আমার পক্ষে এখন বৈদান্তিকের মতই "তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী" হইতে হইবে।

* * * *

দিব্যোককে রাজা করিয়া উপন্যাসে নামানো হয় নাই বলিয়া এক জন মাহিষ্যজাতীয় পত্রপ্রেরক ঘোর অপছন্দ প্রকাশ করিয়াছেন! দিব্যোকাদি পূর্ব্বাবধি রাজা থাকিলে আমার উপন্যাসের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয় ত হইত না। হয় ত বা আমার লেখার উদ্দেশ্যের সহিত এক নয় বলিয়া এই ঐতিহাসিক প্লটটি লইতামই না, অথবা যদিই বা লইতাম, এত লোকের কাছে জবাব লিখিতে হইত না। কি করিব, দুর্ভাগ্যক্রমেই হয় ত ইতিহাসে উহা মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় নাই। 'কৈবর্ত্তরাজ' শব্দ যেখানে বসান আছে, তাহাতে পূর্ব্বাবধি রাজা থাকা বুঝায় না, এবং তৎপূর্ব্বে অপর শ্লোকে অন্য প্রমাণও পাওয়া যায়, তাই

তাহা করিতে পারি নাই। এই শ্লোক ও শ্লোকার্থ হইতে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি।

মাংসভুজোচ্চৈর্দ্দশকেন জনকভূর্দস্যুনোপধিব্রতিনা।

দিব্যাহ্বয়েন সীতাবাসালংকৃতির (রা) হারি কান্তাস্য,

(৩৮) কুলকম্।

* * * *

অন্যত্র,—

অস্য রামপালস্য জনকভূঃ পৈত্র (পৈত্র্য) ভূমির্বরেন্দ্রী সীতাবাসালঙ্কৃতিঃ লাঙ্গলপদ্ধতিগত্যলঙ্কারা চাবাসসংপন্নেত্যর্থঃ। অতএব কান্তা কমনীয়া *দিব্যাহ্বয়েন দিব্যনাম্না দিব্বোকেন মাংস (শ) ভুজা লক্ষ্ম্যা অংশং (সং) ভুঞ্জানেন ভৃত্যোনোচ্চৈর্দশকেন* উচ্চৈর্মহতী দশা অবস্থা যস্য অত্যুচ্ছ্রিতেনেত্যর্থঃ। দস্যু (শু) না শত্রুণা তদ্ভাবাপন্নত্বাৎ অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া আরব্ধং কর্ম্ম ব্রতং ছদ্মনি ব্রতী, যদ্বা আচার ক্বিপ, হেতুমন্নিজ (ব ন্তাদিণি অহারি গৃহীতা। ৩৮

এই শ্লোকে রামচরিতকার সন্ধ্যাকর নন্দী দিব্বোকাদিকে মাহিষ্য-রাজ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার লেখা হইতে দেখা যায় যে, যেন কোন পূর্ব্বতন রাজভৃত্য হইতে সহসা অতিশয় উচ্চাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন। আমার 'ত্রিবেণী'তেও তাহা ব্যতীত আর কিছুই নাই।

৩। বোধিদেবকে ব্রাহ্মণরূপে চিত্রিত করা সম্বন্ধে আমার প্রমাণগুলি উপস্থাপিত করিয়া দিলাম, ইহা হইতেই পত্রলেখক মহাশয় আমার উত্তর পাইবেন।

গরুড়স্তম্ভলিপি হইতে পালরাজগণের মন্ত্রিবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। উহাতে পালবংশীয় দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম নৃপতির মন্ত্রিবৃন্দের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ লিপি হইতে জানা যায় যে, পালরাজগণের মন্ত্রিপদ বংশানুগত ছিল। নিম্নে নৃপতিদের ও তাঁহাদের মন্ত্রিবৃন্দের নাম

ঐ লিপি হইতে প্রদত্ত হইতেছে। এই মন্ত্রিবংশ ব্রাহ্মণ ছিলেন। উক্ত লিপিতে উঁহাদের বিদ্যা, শিক্ষা দীক্ষা, নীতিজ্ঞানের এবং তাহার সহিত বাহুবলেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

গোপাল
|
ধর্ম্মপাল—গর্গ = ইচ্ছা
|
দেবপাল দর্ভপাণি = শর্করাদেবী
|
সোমেশ্বর = রল্লাদেবী
|
দেবপাল ও শূরপাল কেদার মিশ্র = বব্বাদেবী
|
নারায়ণপাল গুরব মিশ্র

নারায়ণপালদেবের ভাগলপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে ইনি ভট্ট-গুরব বলিয়া উল্লিখিত। উক্ত তাম্রলিপির ২০শ শ্লোকে ইঁহার যুদ্ধবিদ্যার পরিচয় দেওয়া আছে। ৯ম শ্লোকে সোমেশ্বর বিক্রমে ধনঞ্জয়ের সহিত তুল্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণও যুদ্ধক্ষেত্রে বিক্রম প্রকাশ করিতেন, ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। বৈদ্যদেব কামরূপ জয় করায় তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে, তাহা মনে করিবার কোন কারণই দেখিতেছি না।

শ্রীবামনভট্ট মহীপালের মন্ত্রী (বাণগড়লিপি, ২০শ শ্লোক) ছিলেন। ভট্টনাম হইতেই জানা যাইতেছে যে, ইনিও ব্রাহ্মণ।

১ম মহীপালের পৌত্র ৩য় বিগ্রহপালের রাজত্বের ১৩শ বর্ষে উৎকীর্ণ একটি তাম্রশাসন দিনাজপুর জিলার আমগাছি নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। লিপিটির এক্ষণে নিতান্তই চরমদশা। তাহার শেষাংশের পাঠ এখনও উদ্ধৃত হয় নাই। তাই উহাতে (১ম মহীপালের বাণগড়-

লেখের অনুরূপ) রাজমন্ত্রীর নাম দূতকরূপে প্রদত্ত হইয়াছিল কি না, ঠিক বলা যায় না। কিন্তু কামরূপরাজ বৈদ্যদেবের কমৌলীলিপি হইতে এই তৃতীয় বিগ্রহপালের মন্ত্রীর নাম পাওয়া যাইতেছে। বৈদ্যদেবের পিতামহ যোগদেব বংশক্রমে বিগ্রহপালের মন্ত্রী হইয়াছিলেন বলিয়া উহাতে লিখিত আছে।

যস্য বংশক্রমেণাভূৎ সচিবঃ শাস্ত্রবিত্তমঃ।
যোগদেব ইতি খ্যাতঃ স্ফুরদ্দোর্দ্দণ্ডবিক্রমঃ॥ ৩ শ্লোক।

৩য় বিগ্রহপালের পুত্র রামপালের মন্ত্রী ছিলেন এই যোগদেবের পুত্র বোধিদেব (৫ম শ্লোক)। রামপালের পুত্র কুমারপালের মন্ত্রী ছিলেন বোধিদেবের পুত্র বৈদ্যদেব (৯ম, ১২শ শ্লোক)।
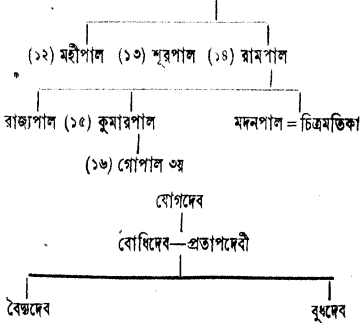
'কুলদেব' বলিয়া বৈদ্যদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতার উল্লেখ তাম্রশাসনে পাওয়া যায় না। কুলপঞ্জিকার মত তাম্রশাসনের নিকট যে নিতান্তই অগ্রাহ্য, তাহা বোধ করি কাহাকেও বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, যখন যোগদেব বংশক্রমে পাল-সম্রাটের মন্ত্রী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে বামনভট্টের বংশীয় না বলিবার কারণ কি? মাত্র নয়পালের মন্ত্রীর পরিচয় অজ্ঞাত। তিনি কায়স্থবংশীয় কেহ হইলেও তৎপুত্র যোগদেব সম্বন্ধে "বংশক্রমেণ" কথাটা ব্যবহৃত হইত না। অন্ততঃ দুই তিন পুরুষ না গেলে এ শব্দের ব্যবহার সম্ভব নহে। ইহা ভিন্ন বৈদ্যদেব যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা কমৌলি লিপির ১৬শ শ্লোক হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। নিম্নে উক্ত শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইল।

দোর্দ্দণ্ডারণিজে হবির্ভুজি ভটব্রাতেন্ধনৈরেধিতে,
সংগ্রামাধ্বরপূজিতে রিপুশিরঃশ্রেণীলসৎশ্রীফলৈঃ।
কৃত্বা হোমবিধিং পরক্ষিতিভুজা দত্বাথ পূর্ণাহুতিং,
লব্ধোদগ্রযশো মহৎ ফলমসৌ শ্রীবৈদ্যদেবো বভৌ॥

অরণিরূপে ব্যবহৃত নিজ বাহুদণ্ডজাত, ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত শত্রুসেনা-শরীর দ্বারা প্রজ্বলিত যুদ্ধরূপ যজ্ঞে শ্রীফলরূপে ব্যবহৃত রিপুশিরঃসমূহে হোম-বিধির অনুষ্ঠান করিয়া ও শত্রু-নৃপতিগণ দ্বারা পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া এই বৈদ্যদেব যশোলাভে দীপ্তিমান হইয়াছিলেন।

এই শ্লোকে হোমকার্য্যের যে উপমা প্রদত্ত হইয়াছে, বৈদ্যদেব ব্রাহ্মণ না হইলে তাহা কখনই তাঁহার সম্বন্ধে প্রদত্ত হইত না। অরণি, ইন্ধন, যজ্ঞে শ্রীফলের ব্যবহার, পূর্ণাহুতি দান ইত্যাদি যজ্ঞকার্য্যসম্বন্ধীয় সকল উপমাই বৈদ্যদেবের ব্রাহ্মণত্বের একটা বিশেষ প্রমাণ। যজ্ঞানুষ্ঠান ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। প্রশস্তিকার বলিতে চাহিতেছেন যে, যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইলেও বৈদ্যদেব সে কার্য্যে নিবৃত্ত হয়েন নাই। তিনি তখনও যেন যজ্ঞকার্য্যই করিতেছিলেন, তবে এ ক্ষেত্রে তাঁহার এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপাদানগুলি বিভিন্ন মাত্র। ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর পক্ষে যুদ্ধকার্য্য তখন নিতান্ত

অসাধারণ ব্যাপার যে ছিল না, এই প্রসঙ্গে সোমেশ্বর ও গুরবমিশ্রের কথা স্মর্ত্তব্য।

পরিশেষে এ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বৈদ্যদেবের অনু-শাসনের যিনি প্রথম পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ডাঃ ভিনিস, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতি সকলেই বৈদ্যদেবকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে করেন।—(E. I. II. p 348—'There can be little doubt that he was a Brahman." এবং গৌড়লেখমালা পৃষ্ঠা ৮৪।)

এই সকল প্রমাণে আমি আমার 'ত্রিবেণী' উপন্যাসে মহীপালদেবের ভূতপূর্ব্ব মহামাত্যপুত্র বোধিদেবকে ব্রাহ্মণরূপেই চিত্রিত করিয়াছি। আমার মনে হয়, আমগাছি লিপির শেষাংশের পাঠোদ্ধার সম্ভব হইলেই এই অনুদ্ঘাটিত রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটিত হইয়া সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিবে। এক্ষণে বৈদ্যদেবের পিতামহ যোগদেব বংশক্রমে বিগ্রহপালের মন্ত্রী হওয়া শব্দটির উপর নির্ভর করিয়া আমার উপন্যাসে আমি বোধিদেবের ব্রাহ্মণ্যই বজায় রাখিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, অনুমান ব্যতীত তেমন কোন অখণ্ডনীয় উচ্চ প্রমাণ না পাইলে পত্রলেখক মহাশয় ইহার জন্য দুঃখিত হইবেন না।

ত্রিবেণী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

তিন টাকা

উৎসর্গ

হে আমার সংসারের নূতন অতিথি!

তোমার ছোট্ট দুটী হাতে আমার

এই নূতন বইখানি তুলে

দিলেম,—

বড় হয়ে পড়ে দেখ।

আশীর্ব্বাদ করি

আমার বাবার মত

এবং

তোমার বাবার মত,

স্বদেশের ইতিহাসকে

ভালবেস।